Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা

তানিয়া তাসনিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি, ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব তানিয়া তাসনিম কর্তৃক উপস্থাপিত ‘বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. রফিকউল্লাহ খান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(অধ্যাপক নিসার হোসেন)
যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
অংকন ও চিত্রায়ন বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। একটি দেশের সভ্যতা নিরূপণ করার জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির আদি অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। আর এই অনুসন্ধানে মৃৎশিল্প সবসময় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের মৃৎশিল্পেরও রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য। নদীমেঘলা বাংলাদেশের মানুষের মাটির সঙ্গে শৈল্পিক সখ্যতা অনেকদিনের পুরনো। মাটিই এ অঞ্চলের শিল্প তৈরীর প্রধান উপাদান। ফলে এদেশের লোকায়ত জীবনে মৃৎশিল্পের ব্যবহার শুরু থেকেই বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। এদেশের কৃষিজীবী ও শিল্পমনা মানুষ মাটিকেই বেছে নিয়েছিলো তাদের সকল কর্মকাণ্ডের উপকরণ হিসেবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এ মাটি থেকেই আমরা পেয়েছি আমাদের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে। ঐতিহ্যের পথে বেয়েই বাংলাদেশের মৃৎশিল্প সামনে এগিয়ে চলছে। তাইতো এই মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত হাজার হাজার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, তাদের শিল্পকর্ম, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনসংগ্রামের সমস্যা সর্বোপরি শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। লোকশিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প হচ্ছে আদি ও মূল শিল্প। এই শিল্পের ব্যাপকতার জন্য এর পূর্ণাঙ্গ গবেষণা সম্ভব হয়নি। গতিশীল এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প শুধুমাত্র বংশপরম্পরার শিল্পীদের কাছেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সময়ের প্রয়োজনে ধারাবাহিকভাবে বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে উদ্ভাবনীশক্তি ও অভিজ্ঞতার তথ্য-উপাত্ত এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত শিল্পীদের হাতে আধুনিক রূপ লাভ করেছে।

মৃৎশিল্প হচ্ছে মানবসভ্যতার এক অনবদ্য সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্ট শিল্পকর্মগুলির মধ্যে সম্ভব সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রথম হচ্ছে এই মৃৎশিল্প। তাই মৃৎশিল্প নিয়ে যে কোন ধরনের গবেষণার শুরুতেই এর ইতিহাস পর্যালোচনা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। সঙ্গত কারণেই তাই অভিসন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে মৃৎশিল্পের আদি ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধানপূর্বক সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মৃৎশিল্প নিদর্শনসহ মিশর, মেসোপটেমিয়া, ইনকা, আজটেক, আরবীয় ইরান, গ্রিক, চীন, জাপান, কোরিয়া, আমেরিকার মৃৎশিল্প নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত মৃৎশিল্প সামগ্রীর সূত্র ধরেই আলোচনা এগিয়েছে। যেহেতু অতীত বাদ দিয়ে বর্তমান অসম্ভব তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই মৃৎশিল্পের আদি ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

আমাদের হাজার হাজার বছরের শিল্প-ঐতিহ্যকে অনুধাবন করতে হলে এদেশের মাটি খুঁড়ে পাওয়া মৃৎসামগ্রীর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বাংলাদেশের পোড়ামাটির ফলকের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত ভারতবর্ষের প্রায় সকল অঞ্চলের মতোই বাংলা অঞ্চলেও প্রত্নখননে উঠে এসেছে প্রাচীন সময়ের নানা উপকরণ। পাহাড়পুর, ময়নামতি, মহাস্থানগড়, বানগড়, আলুক, চন্দ্রকেতুগড়, কর্ণসুবর্ণ, পাণ্ডু রাজার ঢিবি, কান্তজীর মন্দির, উয়ারী-বটেশ্বরসহ আরো বহু অঞ্চলেই প্রাচীন নিদর্শনের দেখা মেলে। এখান থেকে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক মৃৎপাত্র। মৃৎভাস্কর্য, টেরাকোটা। এই

Dhaka University Institutional Repository

নিদর্শন গুলো থেকেই সমকালীন সভ্যতার প্রমাণ মেলে। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুযায়ী এখানে ঐতিহাসিক স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণ কাদামাটির শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় অসাধারণ শিল্প হয়ে ওঠে আর আমাদের বিস্মিত করে। নদী-অববাহিকা থেকে উপযোগী মাটি সংগ্রহ করে তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় মৃৎশিল্প তৈরির উপযোগী করে নেয়া হয়। অতঃপর শিল্পীর হাত দুটো প্রধান সম্বল করে সেই সাথে খুব সাধারণ কিছু সরঞ্জামাদি নিয়ে বংশপরম্পরার শিল্পীরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মৃৎসামগ্রী আবার নান্দনিক মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরি করে আসছেন। শিল্পসামগ্রী তৈরির পর নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুকানো, নক্সা করা, পোড়ানো, রং করাসহ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াই বংশপরম্পরায় অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে করেন। বিক্রির বন্দোবস্ত ও নিজেরাই করে থাকেন অধিকাংশ সময়। এই অধ্যায়ের আলোচনায় এই বিষয় গুলিই উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের গৌরবময় সুবিশাল ক্ষেত্রের মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম। এই শিল্প লোকজীবনের সাথে যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তেমন লোককথায় ও তার শক্ত অবস্থান রয়েছে। অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ এই শিল্প যে লোকসাহিত্যকে আলোকিত করেছে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

জল-মাটি-হাওয়া-অগ্নি আর সৃজনক্ষমতার মিশেলে মৃৎশিল্পের প্রকাশ। এই শিল্পের শিল্পীরা আমাদের কাছে, পাল, কুমার, কুম্ভকার, কুলাল, বিভিন্ন নামে পরিচিত। যে নামেই চিনিনা কেন, যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে ধারণ করা শিল্পীদের গুরুত্ব অপরিসীম। বংশপরম্পরার এই শিল্পীদের জীবনাচার, তাদের কাজের বিষয় বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান গুরুত্বের সাথে অনুসন্ধান করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তকারে বংশপরম্পরার মৃৎশিল্পীদের সাক্ষাৎকারও তুলে ধরা হয়েছে অভিসন্দর্ভের এই পর্যায়ে।

'মৃৎশিল্প' শব্দটির মধ্যেই নিহিত আছে, মাটিকে শিল্পকলায় উত্তীর্ণ করার অভিনিবেশ। আর এই কাজটি শতভাগ সফলতার সাথে করে যাচ্ছেন প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পীরা। এই অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নের আদি অন্ত। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ঢাকা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পী মীর মোস্তফা আলীর উদ্যোগে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধারায় আধুনিক উপাদান উপকরণের সমন্বয়ে সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণের গতিপথ তৈরি হয়। পরবর্তীতে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৃৎশিল্প চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের শক্তিশালী পরম্পরার দক্ষতার সাথে ধীরে ধীরে যুক্ত হতে থাকে মৃৎশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। সমকালীন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নির্মিত মৃৎশিল্পের ধারাবাহিক পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এই আলোচনায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্বনামধন্য শিল্পীদের কাজের গতিপ্রকৃতি, বিষয়শৈলী এবং উপস্থাপনার প্রাচুর্য সম্পর্কেও তথ্য দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত শিল্পীদের প্রধান গবেষণার বা কাজের জায়গা স্টুডিও পটারি ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটারিও আলোচনায় সঙ্গত কারণেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়টিতে মৃৎশিল্পীদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরম্পরার শিল্পীদের প্রায় সবাই হিন্দুধর্মালম্বী। ধর্মীয় বিভিন্ন আচার

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান নিয়েই তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। আবার ধর্মীয় বিভিন্ন আচার তাদের শিল্পকর্মের সাথেও যুক্ত। এই অধ্যায়ের এই সকল বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। মানব সমাজের ইতিহাস ক্রমবিবর্তনের ধারার সঙ্গে মৃৎশিল্পের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশেরধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৃৎশিল্পের বিবর্তন এখনও অব্যাহত। কোথাও কোথাও এর জৌলুস হারাতে বসলেও কোথাও আবার অপার সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সম্ভাবনার কাণ্ডারী হিসেবে প্রশিক্ষিত শিল্পীরা কাজ করে যাচ্ছেন। মৃৎশিল্পের বর্তমান অবস্থা, সম্ভাবনা নিয়ে বংশপরম্পরার মৃৎশিল্পী, প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পীদের মতামতের ভিত্তিতে এই পর্বটি সাজানো হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় মৃৎশিল্প, মৃৎশিল্পের ইতিহাস, বংশপরম্পার মৃৎশিল্পী ও তাদের শিল্পকর্ম প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পী ও তাদের শিল্পকর্ম, প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষিত শিল্পীদের কাজ ও গবেষণার ফলাফল, ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক মৃৎশিল্পের সংমিশ্রণ এবং সেই সাথে মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাময় দিকগুলিকে আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান-কে। তিনি গবেষণাকর্মটি তত্ত্বাবধায়নের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনসহ অভিসন্দর্ভ রচনার সকল পর্যায়ে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করেছেন। লোকশিল্প তথা মৃৎশিল্প নিয়ে তাঁর আগ্রহ, সুগভীর জ্ঞান ও সাম্প্রতিক ধারণার সাহচার্য এবং শিল্পরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা আমার গবেষণাকর্মকে সাবলীল ও সহজতর করেছে। তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণায় যৌথভাবে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক নিসার হোসেন। আমি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আমার সেমিনারে উপস্থিত থেকে এবং বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করে আমাকে উপকৃত করেছেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. ভীস্মদেব চৌধুরী, তিনি আমাকে "মাটির একটি লোকজ ব্যবহার 'মাটির বিস্কিট' সম্পর্কে জানান, যা আমার গবেষণাকর্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। শুধু তাই নয় তিনি সিলেট থেকে এই 'মাটির বিস্কিট' সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন।" তাঁর এই আন্তরিক সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে আজীবন স্মরণ করবো। আমার সেমিনারে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর ভীস্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর বেগম আকতার কামাল, ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক ডক্টর সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ্ কাদেরী, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, ডক্টর নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা, ডক্টর সোহানা মাহবুব, ডক্টর তাশরিক-ই-হাবিব, জনাব মো. জসিম উদ্দিন, জনাব মো. রাফাত আলম এবং জনাব কানিজ ফাতেমা-র মতো বিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর মতামত ও নির্দেশনা অভিসন্দর্ভ রচনায় আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ প্রসঙ্গে বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর ভীস্মদেব চৌধুরী এবং আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান-এ আন্তরিক সহযোগিতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

এই গবেষণাকর্মের শুরু থেকে যে দুজন মানুষ আমাকে নিরন্তন উৎসাহিত করেছেন, নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য ও সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন জাদুঘরের সাবেক কীপার ডক্টর নীরু শামসুন নাহার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ গ্রন্থাগারিক (গবেষণা) শাহীন সুলতানা। গবেষণা কর্মের যে কোন প্রয়োজনে এই দুইজন মহিয়সী নারী অভিভাবক, বোন, বন্ধুর মতো আমার পাশে থেকেছেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং সহযোগিতার কথা আজীবন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো।

এই গবেষণাকার্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শ্রদ্ধেয় শিল্পী শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। শ্রদ্ধেয় শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, শিল্পী দেবাশীষ পাল, শিল্পী রবিউল ইসলাম, শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য, উপাদান, মতামত, বই, ছবি এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করে নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী, শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার তাদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন । রাজশাহী চারুকলা অনুষদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিল্পী আবদুল মতিন তালুকদার এবং শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন তাদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন।

স্বনামধন্য এই শিল্পীদের মৃৎশিল্প বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান ও সাম্প্রতিক ধারণা এবং শিল্পরূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা আমার গবেষণাকর্মকে সাবলীল ও সহজতর করেছে।

মৃৎশিল্পের বংশপরম্পরার শিল্পীদের কাছেও আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। পরম্পরার এই শিল্পীরা আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে উপকৃত করেছেন। এই প্রান্তিক শিল্পীগোষ্ঠীর মৃৎশিল্পের প্রতি গভীর ভালোবাসা গবেষণা কর্মটির সাথে আমার আত্মিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চারুকলা অনুষদের লাইব্রেরী, জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের লাইব্রেরি। বরেন্দ্র গবেষণা লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি বিপণন কেন্দ্র, টিএসসি বই বিপণন কেন্দ্র ও অন্যান্য মৃৎশিল্প বিপণন কেন্দ্রের ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। গবেষণাকর্মটি কম্পিউটার ও কম্পোজ ও বর্ণবিন্যাসের অত্যন্ত দূরূহ কাজটি সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে যিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন গতি প্রকাশনীর মো. মাসুদুর রহমান মাসুদ। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তার কথা স্মরণ করছি।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি শিক্ষানুরাগী বাবা-মাকে। বাবা মো. আবদুল মালেক এবং মা রাশিদা নাহার, এই অভিসন্দর্ভ রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্র বিষয়ের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ, উৎসাহ, ত্যাগ ও নিরন্তর সহযোগিতা দিয়ে আমাকে গবেষণাকর্মে অবিচল রেখেছেন। আমার মাঠ পর্যায়ের গবেষণাকর্মে বাবা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গবেষণা কর্মের যে কোন প্রয়োজনে ছোট দুই ভাই তানভীর মাহামুদ পাশা এবং তারিক মাহামুদ পাশা-কে সবসময় পাশে পেয়েছি। তাই বাবা-মা আর ছোট দু'ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমার জন্ম-জন্মান্তরের।

আরো একজনের অন্তহীন উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রেরণা ছিল আমার গবেষণাকর্মের অন্যতম শ্রমউৎস; যিনি নিজের পেশাগত কর্তব্য পালনের মাঝেও এই গবেষণাকর্ম সচল রাখতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি মো. মুশফিকুর রহমান পরাগ, আমার জীবন সংগ্রামের নিত্য-সহযাত্রী। আমার মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কর্মের সহযোগীও তিনি। সেই সাথে উল্লেখ করছি সময় ও সান্নিধ্যবঞ্চিত আমার আত্মজা 'মুহতাসিম লাবিব'-কে। আমার গবেষণা কর্মে তার আগ্রহ এবং তার সাধ্যের মধ্যে সাহায্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা আমাকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করেছে।

এই গবেষণাকর্মের শুরু থেকে শেষ অবধি যে, যেভাবে আমার পাশে থেকেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন তাদের সবার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

ঢাকা

জানুয়ারি, ২০২০ (তানিয়া তাসনিম)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচি

চিত্র নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মাটির উট, শোরতু ঘাই	৩১
২	প্রস্তর যুগের মৃৎশিল্প	৫৩
৩	প্রস্তর যুগের মৃৎশিল্প	৫৩
৪	প্রস্তর যুগের মৃৎশিল্প	৫৩
৫	প্রস্তর যুগের মৃৎশিল্প	৫৩
৬	প্রাথমিক মাইনোয়ান মৃৎপাত্র	৫৩
৭	প্রাথমিক মাইনোয়ান মৃৎপাত্র	৫৩
৮	মধ্য মাইনোয়ান মৃৎপাত্র	৫৪
৯	মধ্য মাইনোয়ান মৃৎপাত্র	৫৪
১০	উচ্চ মাইনোয়ান মৃৎপাত্র	৫৪
১১	মধ্য মাইনোয়ান মৃৎপাত্র	৫৪
১২	নিও লিথিক মৃৎপাত্র	৫৪
১৩	নিও লিথিক মৃৎপাত্র	৫৪
১৪	মেসোপটেমিয়ান মৃৎপাত্র	৫৫
১৫	মেসোপটেমিয়ান মৃৎপাত্র	৫৫
১৬	ব্যাবিলনের মৃৎপাত্র	৫৫
১৭	ব্যাবিলনের মৃৎপাত্র	৫৫
১৮	গ্রিক এ্যাম্ফোরা-র মৃৎপাত্র	৫৫
১৯	গ্রিক এ্যাম্ফোরা-র মৃৎপাত্র	৫৫
২০	গ্রিক ক্রেটার মৃৎপাত্র	৫৬
২১	গ্রিক ক্রেটার মৃৎপাত্র	৫৬
২২	প্রাচীন মিসরের মৃৎপাত্র	৫৬
২৩	প্রাচীন মিসরের মৃৎপাত্র	৫৬
২৪	প্রাচীন মিসরের মৃৎপাত্র	৫৬
২৫	হরপ্পার মৃৎপাত্র	৫৬
২৬	হরপ্পার মৃৎপাত্র	৫৭
২৭	হরপ্পায় প্রাপ্ত মাটির খেলনা	৫৭
২৮	হরপ্পায় প্রাপ্ত মাটির খেলনা	৫৭
২৯	হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল	৫৭
৩০	হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল	৫৭
৩১	হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল	৫৭
৩২	হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল	৫৮
৩৩	মহেঞ্জদারো-র মৃৎপাত্র	৫৮
৩৪	মহেঞ্জদারো-র মৃৎপাত্র	৫৮
৩৫	মহেঞ্জদারো-র খেলনা	৫৮
৩৬	মহেঞ্জদারো-র খেলনা	৫৮
৩৭	প্রাচীন চীনের মৃৎপাত্র	৫৮
৩৮	প্রাচীন চীনের মৃৎপাত্র	৫৯
৩৯	প্রাচীন ইরানের মৃৎপাত্র	৫৯
৪০	প্রাচীন ইরানের মৃৎপাত্র	৫৯
৪১	প্রাচীন কোরিয়ান মৃৎপাত্র	৫৯

Dhaka University Institutional Repository

৪২	প্রাচীন কোরিয়ান মৃৎপাত্র	৫৯
৪৩	শাং মৃৎপাত্র	৫৯
৪৪	শাং মৃৎপাত্র	৬০
৪৫	মিং মৃৎপাত্র	৬০
৪৬	মিং মৃৎপাত্র	৬০
৪৭	ট্যাঙ্গ মৃৎপাত্র	৬০
৪৮	ট্যাঙ্গ মৃৎপাত্র	৬০
৪৯	গানশু মৃৎপাত্র	৬০
৫০	গানশু মৃৎপাত্র	৬১
৫১	কোয়েটা মৃৎপাত্র	৬১
৫২	কোয়েটা মৃৎপাত্র	৬১
৫৩	মহাস্থানগড়	৬১
৫৪	মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত মৃৎফলক	৬১
৫৫	ময়না মতি	৬১
৫৬	ময়না মতিতে প্রাপ্ত মৃৎফলক	৬২
৫৭	ময়না মতিতে প্রাপ্ত মৃৎফলক	৬২
৫৮	ময়না মতিতে প্রাপ্ত মৃৎফলক	৬২
৫৯	পাহাড়পুর	৬২
৬০	পাহাড়পুর	৬২
৬১	পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মৃৎফলক	৬২
৬২	পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মৃৎফলক	৬৩
৬৩	পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মৃৎফলক	৬৩
৬৪	কান্তজীর মন্দির	৬৩
৬৫	কান্তজীর মন্দিরের মৃৎফলক	৬৩
৬৬	কান্তজীর মন্দিরের মৃৎফলক	৬৩
৬৭	কান্তজীর মন্দিরের মৃৎফলক	৬৩
৬৮	উয়ারী বটেশ্বর	৬৪
৬৯	উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র	৬৪
৭০	উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র	৬৪
৭১	উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র	৬৪
৭২	উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র	৬৫
৭৩	উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র	৬৫
৭৪	উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র	৬৫
৭৫	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি সংগ্রহ	২৫০
৭৬	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি সংগ্রহ	২৫০
৭৭	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি সংরক্ষণ	২৫০
৭৮	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি সংরক্ষণ	২৫০
৭৯	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫০
৮০	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫০
৮১	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫১
৮২	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫১
৮৩	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫১
৮৪	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫১
৮৫	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫১
৮৬	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫১
৮৭	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫২
৮৮	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫২
৮৯	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫২

Dhaka University Institutional Repository

৯০	মৃৎপাত্র তৈরির মাটি প্রস্তুতকরণ	২৫২
৯১	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫২
৯২	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫২
৯৩	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫৩
৯৪	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫৩
৯৫	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫৩
৯৬	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫৩
৯৭	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫৩
৯৮	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫৩
৯৯	মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি	২৫৪
১০০	মৃৎসামগ্রী নকশাকরণ পদ্ধতি	২৫৪
১০১	মৃৎসামগ্রী নকশাকরণ পদ্ধতি	২৫৪
১০২	মৃৎপত্র শুকানোর চিত্র	২৫৪
১০৩	মৃৎসামগ্রী নকশাকরণ পদ্ধতি	২৫৪
১০৪	মৃৎসামগ্রী নকশাকরণ পদ্ধতি	২৫৪
১০৫	মৃৎসামগ্রী নকশাকরণ পদ্ধতি	২৫৫
১০৬	পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো	২৫৫
১০৭	পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো	২৫৫
১০৮	পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো	২৫৫
১০৯	পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো	২৫৫
১১০	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৬
১১১	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৬
১১২	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৬
১১৩	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৬
১১৪	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৬
১১৫	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৬
১১৬	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৭
১১৭	মৃৎপণ্য পোড়ানোর জন্য চুল্লী প্রস্তুত	২৫৭
১১৮	মৃৎপণ্য রং করণ	২৫৭
১১৯	মৃৎপণ্য রং করণ	২৫৭
১২০	মৃৎপণ্য রং করণ	২৫৭
১২১	খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য বড় মটকা	২৫৭
১২২	খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য বড় মটকা	২৫৮
১২৩	খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য বড় মটকা	২৫৮
১২৪	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৮
১২৫	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৮
১২৬	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৮
১২৭	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৮
১২৮	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৯
১২৯	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৯
১৩০	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৯
১৩১	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৯
১৩২	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৯
১৩৩	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৫৯
১৩৪	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৬০
১৩৫	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৬০
১৩৬	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৬০
১৩৭	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৬০

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮	বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য	২৬০
১৩৯	শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম	৩৫৫
১৪০	শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম	৩৫৫
১৪১	শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম	৩৫৫
১৪২	শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম	৩৫৫
১৪৩	শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম	৩৫৫
১৪৪	শিল্প আবু সাঈদ তালুকদারের শিল্পকর্ম	৩৫৮
১৪৫	শিল্প আবু সাঈদ তালুকদারের শিল্পকর্ম	৩৫৮
১৪৬	শিল্প আবু সাঈদ তালুকদারের শিল্পকর্ম	৩৫৮
১৪৭	শিল্প আবু সাঈদ তালুকদারের শিল্পকর্ম	৩৫৮
১৪৮	শিল্প আবু সাঈদ তালুকদারের শিল্পকর্ম	৩৫৮
১৪৯	শিল্প আবু সাঈদ তালুকদারের শিল্পকর্ম	৩৫৮
১৫০	শিল্পী অলক রায়ের শিল্পকর্ম	৩৬২
১৫১	শিল্পী অলক রায়ের শিল্পকর্ম	৩৬২
১৫২	শিল্পী অলক রায়ের শিল্পকর্ম	৩৬২
১৫৩	শিল্পী অলক রায়ের শিল্পকর্ম	৩৬২
১৫৪	শিল্পী অলক রায়ের শিল্পকর্ম	৩৬২
১৫৫	শিল্পী অলক রায়ের শিল্পকর্ম	৩৬২
১৫৬	শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৬৬
১৫৭	শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৬৬
১৫৮	শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৬৬
১৫৯	শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৬৬
১৬০	শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৬৬
১৬১	শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৬৬
১৬২	শিল্পী দেবাশীষ পালের শিল্পকর্ম	৩৭১
১৬৩	শিল্পী দেবাশীষ পালের শিল্পকর্ম	৩৭১
১৬৪	শিল্পী দেবাশীষ পালের শিল্পকর্ম	৩৭১
১৬৫	শিল্পী দেবাশীষ পালের শিল্পকর্ম	৩৭১
১৬৬	শিল্পী দেবাশীষ পালের শিল্পকর্ম	৩৭১
১৬৭	শিল্পী দেবাশীষ পালের শিল্পকর্ম	৩৭১
১৬৮	শিল্পী মো. রবিউল ইসলামের শিল্পকর্ম	৩৭৫
১৬৯	শিল্পী মো. রবিউল ইসলামের শিল্পকর্ম	৩৭৫
১৭০	শিল্পী মো. রবিউল ইসলামের শিল্পকর্ম	৩৭৫
১৭১	শিল্পী মো. রবিউল ইসলামের শিল্পকর্ম	৩৭৫
১৭২	শিল্পী মো. রবিউল ইসলামের শিল্পকর্ম	৩৭৫
১৭৩	শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম	৩৭৯
১৭৪	শিল্পী ডক্টর. আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম	৩৭৯
১৭৫	শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম	৩৭৯
১৭৬	শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম	৩৭৯
১৭৭	শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম	৩৭৯
১৭৮	শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম	৩৭৯
১৭৯	শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম	৩৭৯
১৮০	শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চলের শিল্পকর্ম	৩৮৪
১৮১	শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চলের শিল্পকর্ম	৩৮৪
১৮২	শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চলের শিল্পকর্ম	৩৮৪
১৮৩	শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চলের শিল্পকর্ম	৩৮৪
১৮৪	শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চলের শিল্পকর্ম	৩৮৪
১৮৫	শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চলের শিল্পকর্ম	৩৮৪

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬	শিল্পী ডক্টর নুরুল আমীনের শিল্পকর্ম	৩৮৮
১৮৭	শিল্পী ডক্টর নুরুল আমীনের শিল্পকর্ম	৩৮৮
১৮৮	শিল্পী ডক্টর নুরুল আমীনের শিল্পকর্ম	৩৮৮
১৮৯	শিল্পী ডক্টর নুরুল আমীনের শিল্পকর্ম	৩৮৮
১৯০	শিল্পী ডক্টর নুরুল আমীনের শিল্পকর্ম	৩৮৮
১৯১	শিল্পী ডক্টর নুরুল আমীনের শিল্পকর্ম	৩৮৮
১৯২	শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজীর শিল্পকর্ম	৩৯০
১৯৩	শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজীর শিল্পকর্ম	৩৯০
১৯৪	শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজীর শিল্পকর্ম	৩৯০
১৯৫	শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজীর শিল্পকর্ম	৩৯০
১৯৬	শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজীর শিল্পকর্ম	৩৯০
১৯৭	শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজীর শিল্পকর্ম	৩৯০
১৯৮	শিল্পী চিন্ময়ী সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৯৩
১৯৯	শিল্পী চিন্ময়ী সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৯৩
২০০	শিল্পী চিন্ময়ী সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৯৩
২০১	শিল্পী চিন্ময়ী সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৯৩
২০২	শিল্পী চিন্ময়ী সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৯৩
২০৩	শিল্পী চিন্ময়ী সিকদারের শিল্পকর্ম	৩৯৩
২০৪	মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র	৪০৯
২০৫	মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র	৪০৯
২০৬	মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র	৪০৯
২০৭	মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র	৪০৯
২০৮	মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র	৪০৯
২০৯	মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র	৪০৯
২১০	শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১২
২১১	শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১২
২১২	শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১২
২১৩	শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১২
২১৪	শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১২
২১৫	শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১২
২১৬	ফার সিরামিকস লি.-এর শোপিস	৪১৫
২১৭	ফার সিরামিকস লি.-এর শোপিস	৪১৫
২১৮	ফার সিরামিকস লি.-এর শোপিস	৪১৫
২১৯	ফার সিরামিকস লি.-এর শোপিস	৪১৫
২২০	ফার সিরামিকস লি.-এর শোপিস	৪১৫
২২১	ফার সিরামিকস লি.-এর শোপিস	৪১৫
২২২	প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১৮
২২৩	প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১৮
২২৪	প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১৮
২২৫	প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১৮
২২৬	প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১৮
২২৭	প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র	৪১৮
২২৮	ইনসুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী	৪২১
২২৯	ইনসুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী	৪২১
২৩০	ইনসুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী	৪২১
২৩১	ইনসুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী	৪২১
২৩২	ইনসুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী	৪২১
২৩৩	ইনসুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী	৪২১

Dhaka University Institutional Repository

২৩৪	আর. এ. এক. সিরামিকের তৈজসপত্র	৪২৩
২৩৫	আর. এ. এক. সিরামিকের তৈজসপত্র	৪২৩
২৩৬	আর. এ. এক. সিরামিকের তৈজসপত্র	৪২৩
২৩৭	আর. এ. এক. সিরামিকের তৈজসপত্র	৪২৩
২৩৮	আর. এ. এক. সিরামিকের তৈজসপত্র	৪২৩
২৩৯	আর. এ. এক. সিরামিকের তৈজসপত্র	৪২৩
২৪০	ফু-ওয়াং সিরামেকের সামগ্রী	৪২৫
২৪১	ফু-ওয়াং সিরামেকের সামগ্রী	৪২৫
২৪২	ফু-ওয়াং সিরামেকের সামগ্রী	৪২৫
২৪৩	ফু-ওয়াং সিরামেকের সামগ্রী	৪২৫
২৪৪	ফু-ওয়াং সিরামেকের সামগ্রী	৪২৫
২৪৫	ফু-ওয়াং সিরামেকের সামগ্রী	৪২৫
২৪৬	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৮
২৪৭	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৮
২৪৮	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৮
২৪৯	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৮
২৫০	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৮
২৫১	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৮
২৫২	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৯
২৫৩	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৯
২৫৪	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৯
২৫৫	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৯
২৫৬	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৯
২৫৭	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৩৯
২৫৮	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৪০
২৫৯	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৪০
২৬০	পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান	৪৪০

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় (১৭-৩৩)

মৃৎশিল্পের ইতিকথা

মৃৎশিল্পের ইতিহাস বর্হিবিশ্ব

দ্বিতীয় অধ্যায় (৩৪-৩৫)

বাংলাদেশের মৃৎশিল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ (৩৬-৪৬)

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ মহাস্থানগড়,

ময়নামতি, পাহাড়পুর, উয়ারী-বটেশ্বর ও অন্যান্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৪৭-৫১)

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

তৃতীয় অধ্যায় (৬৬-৬৭)

মৃৎশিল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ (৬৮-৭৯)

মৃৎশিল্প নির্মাণে প্রয়োজনীয় উপকরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৮০-৮৯)

মৃৎশিল্পের করণকৌশল, অলঙ্ককরণ, রং করণ পদ্ধতি এবং মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর কৌশল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (৯০-২৪৮)

বিপণন প্রক্রিয়া

চতুর্থ অধ্যায় (২৬১-২৮৮)

লোককথায় মৃৎশিল্প

পঞ্চম অধ্যায় (২-০০)

মৃৎশিল্পী পরম্পরার

প্রথম পরিচ্ছেদ (২৯১-২৯৬)

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের জীবনাচার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (২৯৭-৩০৯)

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের কাজের বিষয় বৈচিত্র্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (৩১০-৩৩৩)

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা

থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ

ষষ্ঠ অধ্যায় (৩৩৪-৩৩৬)

প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ (৩৩৭-৩৪৭)

প্রতিষ্ঠানসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৩৪৮-৩৯৩)

প্রশিক্ষিত শিল্পী ও শিল্পকর্ম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (৩৯৪-৪০৩)

স্টুডিও পটারি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (৪০৪-৪২৬)

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটারি

সপ্তম অধ্যায় (৪২৭-৪৩৬)

মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান

অষ্টম অধ্যায় (৪৪২-৪৪৩)

মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা

প্রথম পরিচ্ছেদ (৪৪৪-৪৫১)

মৃৎশিল্পের সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণালব্ধ আলোচনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৪৫২-৪৬২)

মৃৎশিল্পীদের মতামত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (৪৬৩-৪৬৮)

মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ আলোচনা

উপসংহার ৪৬৯

গ্রন্থপঞ্জি ৪৭৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মৃৎশিল্পের ইতিকথা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মৃৎশিল্পের ইতিকথা

মানবসভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষের উদ্ভাবন ও সৃজনশক্তির অন্যতম বিকাশ ঘটেছিল মৃৎশিল্পে। এজন্য মৃৎশিল্পকেই মানবজাতির প্রাচীনতম শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশও জাতির মৌলিক শিল্প ও সংস্কৃতিক নিদর্শনের মধ্যে মৃৎশিল্প একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্প। একটি দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি অনেকাংশেই তার প্রাচীন শিল্পকর্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এভাবেই মৃৎশিল্প মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই শিল্প কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় সমগ্র বিশ্বেই মৃৎশিল্পের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

নব্য প্রস্তরযুগের প্রায় দশ-বারো হাজার বছর আগে মৃৎশিল্পের আবির্ভাব। সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের মতে অনুকূল সামাজিক পরিবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রধারায় মৃৎশিল্পের বিকাশ হয়েছে। নব্যপ্রস্তর যুগে সর্বপ্রথম মৃৎশিল্প আবিষ্কার হয় বলে ধারণা করা হয়। ধীরে ধীরে উপাদানের ব্যবহার, প্রয়োগ নীতির ও প্রযুক্তির ক্রমন্নোতির ফলে মৃৎশিল্পের আঙ্গিক নকশা ও কারুকুশলতারও উন্নতি হয় এবং মৃৎশিল্প পরম্পরাগত পারদর্শিতা নির্ভর বিশিষ্ট কারুশিল্পে পরিণত হয়।

প্রকৃতির অফুরন্ত উপাদান, তার জলীয় পদার্থ তাপ দিয়ে নিঃসৃত করে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো হলো, তার ফলেই বিকাশ হরো মৃৎশিল্পের। মাটির প্রধান উপাদান 'হাইড্রেটেড অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট নিয়মিত তাপ সংযোগে অনার্দ্রকরণ ও নমনীয়তা হরণ, বেশ একটা বড় ধরনে প্রযুক্তিগত বিপ্লব।'

সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই উপমহাদেশের বাঙালি অঞ্চলে যে সব শিল্পকীতি আত্মপ্রকাশ করেছে, তা নির্মাণে তখনকার মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করে আসছে। বাংলার মাটি, বাংলার জল এই সহজলভ্য উপকরণ সম্বল করে বাংলার ঐতিহ্যময় মৃৎশিল্পের পথ চলা শুরু হয়। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। আবহমানকাল থেকেই নদীবহুল বাংলাদেশের পলিমাটি শুধু প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার নানা কাজে যে লেগেছে তাই নয় বরং বাংলাদেশের শিল্পকলার অন্যতম উপাদান হিসেবেও তা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে মৃৎশিল্প একটি ব্যাপক, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প।

বাংলা অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই মৃৎশিল্পের প্রচলন ঘটেছিল। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজলভ্য মাটি থেকে গড়ে তুলেছিল দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার উপযোগী মৃৎপাত্র ও গৃহসজ্জার বিচিত্র উপকরণ। বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মৃৎশিল্পের অজস্র প্রত্মাবশেষ। দেশের প্রতিটি প্রত্মাস্থান উৎখননে পাওয়া গিয়েছে মৃৎশিল্পের সমৃদ্ধ নির্দশনসমূহ। প্রাচীন বাঙালির জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মৃৎশিল্প জড়িয়ে আছে। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা উপকরণ হিসেবে মৃৎশিল্পের ব্যবহার সর্বজনীন। এছাড়া লক্ষ্মীর সরা, ঘট, ব্রত পালনের পাত্র, পূজার উপাচার রাখার নানা ধরনের পাত্র, বিবাহ-সৎকার কাজে মৃৎপাত্রের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার প্রভৃতি নানারকম ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গেও যুক্ত। এইসব মৃৎপাত্র অলঙ্করণের নানারকম নকশা ও রঙের ব্যবহার বাঙালির শিল্পপ্রতিভার পরিচয় বহন করছে।

বাংলাদেশের মৃৎশিল্প ও পোড়ামাটির কাজ যে একসময় চরম উৎকর্ষতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা বিভিন্ন বিহার, স্তুপ, প্রক্ষলনকরণকে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতি চিত্র, মূর্তিখোদিত চিত্র, পাণ্ডুলিপি চিত্র এবং সেই সাথে বিভিন্ন চিত্রিত হাড়ি-পাতিল কলস ইত্যাদি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। বাঙালি কুম্ভকার ও শিল্পীরা সেই আদিকাল থেকে রকমারী মৃৎশিল্প এবং পোড়ামাটির মাধ্যমে তাদের রূপ-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, লোকাচার সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুষমা প্রকাশ করে আসছেন।

মৃৎশিল্প বাঙালির সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্প। আদিকালের বাঙালি মানস ও চিন্তাধারার পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে এই মৃৎশিল্পে। তাই মৃৎশিল্পকে বলা যায় আমাদের জাতীয় পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্পের ইতিহাস : প্রাচীন বহির্বিশ্ব

বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিল্পকরার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে কারুকলার। আর কারুকলার মধ্যে 'মৃৎশিল্প'ই ছিল অগ্রগামী, কেননা একদিকে জীবনের তাগিদ, অন্যদিকে মানবিক চাহিদা– এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করেছে মৃৎশিল্প। নবপলীয় যুগে এই শিল্পের উদ্ভব ঘটে।

মৃৎশিল্প হচ্ছে মানবসভ্যতার এক অনবদ্য প্রকাশ। মৃৎশিল্পের সঙ্গে মানব জাতির পরিচয়ের ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং মানবসমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে মৃৎশিল্পের দানও অপরিসীম। বিশ্বররেণ্য নৃতত্ত্ববিদ লুই হেনরি মর্গান (Henry Morgan) মৃৎশিল্পের উদ্ভাবনকে মানব জাতির আদিমতম বন্যবস্থা থেকে বর্বরাবস্থায় উত্তরণের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই আদিম অবস্থা থেকে মিশর, সুমের, ব্যাবিলন, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো ইত্যাদি মানবসৃষ্ট আদিম সভ্যতা উত্তরিত হয়ে সমগ্র মানব ইতিহাসের ধারায় অদ্যাবধি বিদ্যমান। ব্যাপ্তি ও গুরুত্বে মৃৎশিল্প অতুলনীয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে নব্য প্রস্তর যুগের ঝুড়ি কাঠামোতে তৈরি খুব স্থূল মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। একই ধরনের তৈরি আরও উন্নতমানের মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। নীল ইউফ্রেটিস ও সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে। পাত্রগুলি ছিল নকশা অলঙ্কৃত। এ থেকেই ধারণা করা হয়ে থাকে সর্বপ্রথম মাটির পাত্র তৈরি হয় মধ্যপ্রাচ্যে। জেমস মেলাট ১৯৬০ সালের প্রথমদিকে তুরস্কের আনাতোলিয়া উপত্যকা খনন করে নানা ধরনের মাটির পাত্র উদ্ধার করেন। পাত্রগুলো কমপক্ষে ৯০০০ বছর আগের তৈরি। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০০ অব্দের আগে আরো উন্নত মানের পোড়ানো এবং রঙ করা হাতে তৈরি মাটির পাত্রও একই জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (ইরাক) "উরম" (Ur) অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার লিউনার্দ উলে ৩০০০ হাজার বছরের আগের তৈরি মৃৎপাত্র উদ্ধার করেন।

মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে উন্নতমানের অলঙ্কৃত মৃৎপাত্র তৈরি হতো। দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের 'মুসা' অঞ্চলের মৃৎপাত্রগুলোতে জ্যামিতিক নকশা ছাড়া জলপ্রপাত ও কুকুর দৌড়ানোর ছবি পাওয়া যায়। তাছাড়া আলো-ছায়ার ব্যবহারও দেখা যায়। প্রাচীন মিশরের ঝুঁড়ি কাঠামো ও চামড়ার কাঠামোর তৈরি মৃৎপাত্র পাওয়া যায়, যা ট্যাসিয়ান পটারী নামে খ্যাত। অন্যদিকে প্রাচীন মিশরে ক্যাকলেরিয়ান মৃৎশিল্পের নির্দশনগুলোকে অনেক বিশেষজ্ঞ তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে উন্নতমানের শিল্পরূপে আখ্যায়িত করেন। প্রাচীন মিশরীয় মৃৎপাত্রের গায়ে গাছ-পালা, প্রাণী, নৌকাসহ দৈনন্দিন জীবনের নানা দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাচীন মিশরের তুলনায় মেসোপটেমিয়াতে আরো উন্নতমানের মাটির পাত্র পাওয়া গেছে। এগুলো 'আল আবেদ' নামে পরিচিত। মৃৎপাত্রগুলি ছিল মসৃণ এবং এগুলো তৈরি হতো মন্থরগতিসম্পন্ন চাকায়। রঙ ছিল ফ্যাকাশে লাল, সবুজ অথবা হালকা হলুদ রঙের। পাত্রের আকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুলির সাহায্যে পাত্রের গায়ে বিভিন্ন বিমূর্ত নকশা অলঙ্কৃত ছিল। মেসোপটেমিয়ার "জ্যামলেট নাসের" নামে পরিচিত পাত্রগুলি প্রাচীন মৃৎশিল্পের অন্যতম নিদর্শন। পাত্রগুলি ঢাকে নির্মিত। গায়ে সাদার উপর কালো রঙের রেখা

Dhaka University Institutional Repository

ও বিমূর্ত জ্যামিতিক নকশায় অলঙ্কৃত ছিল। অনেক পাত্রের ফলক ও সিলিন্ডারের উপর লিপি খোদিত। এই পাত্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন আকারের কলস, জগ, গ্লাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতোই প্রাচীন মৃৎশিল্পের নিদর্শন সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল চীন, পারস্য, এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। এছাড়াও প্রাচীন "ক্রটে" খ্রীস্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বের তৈরি মৃৎপাত্রগুলি ছিল ঈষৎ হলুদ, যার উপর গাঢ় বাদামি ও কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া। ফুল-লতাপাতা ও নাবিক জীবনের নানা দৃশ্য অঙ্কন করা হয়েছে। মাটির পাত্র তৈরির কৌশল ক্রীটবাসীরা শিখেছিল মিশরীয়দের কাছ থেকে। প্রায় তিন হাজার চারশত খ্রীস্ট পূর্বাব্দ থেকে এক হাজার দুইশত খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত ক্রীট ছিল প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রাণকেন্দ্র। ক্রীটের এই সভ্যতা মিনোয়া সভ্যতা নামে পরিচিত।

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন মাটির পাত্র উদ্ধার করেছেন। এসব পাত্রের একটির সঙ্গে অপরটির যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ দিকে উত্তর মেসোপটেমিয়ার জারমো (Jarmo) তে ৭০০,০০০ হাজার বছর আগেকার মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে অনেক কাঁচা মাটির ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, যা থেকে ধারণা করা হয় যে তারা মাট পোড়ানো পদ্ধতি জানত না।

চীন : প্রাচীনকালে চীনদেশে মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিস্তার করেছিল, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে চীনদেশে নব্য প্রস্তর যুগের সূচনা হয়।

চীনের : প্রাচীনকালে চীনদেশে মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিস্তার করেছিল, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে চীনদেশে নব্য প্রস্তর যুগের সূচনা হয়।

এই সময়েই সেখানে মৃৎশিল্প চর্চা শুরু হয়। চীনে মৃৎশিল্প পরবর্তীতে ইউরোপ, দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মৃৎশিল্পের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। চীনা মৃৎপাত্র বহির্বিশ্বের পরিচিত হয় টাঙ্ রাজত্বকালের সময় থেকে।

চীনা ইতিহাসের মৃৎশিল্পের স্বর্ণযুগ হচ্ছে টাঙ্ (Tang) রাজবংশের আমল (৬১৮-৯০৭)। এই আমলের মৃৎপাত্র 'তনি-র টাঙ্ ([Try-coloured Tang (Tangsancai)] ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সাংকাই বলতে তিন-রঙা গ্লেজযুক্ত, মৃৎপাত্রকে বোঝায়। সেলভনের সময় থেকেই এর নির্মাণ শুরু হয়। তিন-রঙা মৃৎপাত্রে হলুদ, সবুজ ও সাদা রঙ ব্যবহৃত হতো। সারা বিশ্বে এই মৃৎপাত্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

নীল রঙের মৃৎপাত্র (Blue ware) আবিষ্কৃত হয়েছে জিয়াংজি প্রদেশের কিংজিয়াং কাউন্টির উওচেং গ্রাম থেকে। সঙ্ (৯৬০-১২৭৯) ও মিঙ্ (১৩৬৮-১৬৪৪) রাজত্বকালের পোর্সালেইন 'সেলাডন' (Celadon) হিসেবেই নির্মিত হয়েছে। সেলাডনের চীনা নাম হচ্ছে "কিংচি" (Qingchi) যার অর্থ 'সবুজাভ পোর্সলেইন'।

Dhaka University Institutional Repository

লাল রঙের মৃৎপাত্র [Red ware (zisha taoqi)] ইকজিং জিংসু প্রদেশে নির্মিত হতো। ইকজিং জিংসু চীনের মৃৎপ্রদেশ হিসেবে পরিচিত। এই স্থানে যে সমস্ত চায়ের পাত্র নির্মিত হতো সেগুলো হাজার বছর পূর্বে সুঙ রাজবংশের সময় শ্রেষ্ঠ মৃৎপাত্র হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। চীনের মানুষের কাছে এই চায়ের পাত্র 'আর্দশ পাত্র' হিসেবে পরিচিত ছিল।

ডিমের খোসার মতো মৃৎপাত্র [Egg-shell china (Botaici)] চীনা মৃৎশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ সাদা এবং অর্ধস্বচ্ছ একইসাথে অত্যন্ত পাতলা এই মৃৎপাত্র এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। ছায়াযুক্ত সেলাডনের পূর্বসূরি হচ্ছে এই পাতলা মৃৎপাত্র। ডিমের খোসার মতো এই মৃৎপাত্র কোন ব্যবহারিক কাজে নয় বরং সৌন্দর্যবর্ধক সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

জিংদেজেন চীনের মৃৎশিল্পের রাজধানী হিসেবে পরিচিত ছিল। সোঙ্ রাজবংশের সম্রাট ঝেনজং আদেশ দেন চাংলালঝেন যেন রাজ পরিবারের জন্য পোর্সেলেইন তৈরি করে। এই সময় থেকে 'জিংদেজেনের মৃৎপাত্র' আলাদাভাবে পরিচিত লাভ করে। জিংদেজেনের মৃৎশিল্প মিঙ্ ও কিঙ্ রাজবংশের সময় (১৪-১৯ শতাব্দী) আরো উন্নতি লাভ করে।

চীনের কানসু প্রদেশ থেকে পেট মোটা ও চিকন গলাবিশিষ্ট মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কানসু মৃৎপাত্র–ইয়াং শাও যুগের শেষ দিকের। দ্রুতগামী চাকায় উজ্জ্বল কালো রঙে রঞ্জিত হতো এই মৃৎপাত্র। এগুলো ছিল ডিমের খোসার মতো পাতলা তীক্ষ্ণ নক্সা এবং কৌণিক আকৃতির।

হান যুগে (খ্রিঃ পুঃ ২০২–২২০) প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় যা অধিকাংশ কবর খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়। এই মৃৎপাত্রগুলো ছিল বাদামি সবুজ ও ছাইরঙের এক শক্ত ও গ্লেজযুক্ত। অনুমান করা হয় হান-শাসন আমলেই প্রচুর পরিমাণে বসু নামক ফুলদানী তৈরি করা হয়।

সোঙ যুগ (৯৬০-১২৭৯) চীনের মৃৎশিল্প ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগকে মৃৎশিল্পের ধ্রূপদী যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করণ হয়। সোঙ অমলের অসাধারণ ও বিখ্যাত মৃৎপাত্রের নাম ছিল উয়িং চিং অথ্যাৎ নীল রঙের প্রতিচ্ছবি। এই পাত্রের নিদর্শন আল ফাস্টাল অর্থাৎ প্রাচীন কায়রোর ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সোঙ আমলের আরেকটি বিখ্যাত পাত্র হচ্ছে দিং (তিং) মৃৎপাত্র। ধ্রুপদী জ্যমিতিক নক্সাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছিল সোঙ মৃৎশিল্পীরা।

শাঙ্ রাজবংশ শুরু হয় খ্রি. পুঃ ১৫০০ অব্দে। শাঙ্ আমলের মৃৎপাত্রে ফেলসপেথিক গ্লেজ ব্যবহার করা হয়েছে। আকৃতি ও সৌন্দর্যের জন্য এই সময়ের পাত্রগুলি বিখ্যাত হয়েছিলে। শাঙ্ রাজত্বের শেষ দিকে তারা খাঁটি কাওলিন দিয়ে সাদা মৃৎপাত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পাত্রের গায়ের নকশায় চীনারা দিয়েছে বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের পরিচয়।

মিঙ্ ও কিঙ্ আমলে (১৬৬২-১৭৭২) উদ্ভব হয়েছিল বিভিন্ন নকশার। মিঙ্ রাজত্বকালেই চীনের মৃৎশিল্প তার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। মিঙ্ ও কিঙ্ পাত্রগুলি ছিল পোর্সালেইন। নক্সার গুণগত মানের জন্য এই

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎপাত্র সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। চীনাদের এই পোরসিলিনের পাত্র পরবর্তীতে কোরিয়া ও জাপানে প্রসার ঘটে। ক্রমে ক্রমে এই ধারা ইউরোপের মৃৎপাত্রের উপর প্রভাব ফেলে।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পোরসিলিন ইউরোপের প্রবেশ করে, পরে ফ্লোরেন্সে পোরসিলিনের পাত্র তৈরি হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ানরা চীন থেকে পোরসিলিন আমদানি করেনি কেননা নিজেরাই তখন পোরসিলিন তৈরি করতে সক্ষম ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকাতে পোরসিলিন তৈরি পদ্ধতি অনেক উন্নতি লাভ করে। এতকাল যা ছিল হস্তশিল্প এখন সেখানে যান্ত্রিক প্রযুক্তি যুক্ত হলো। ফলে অলঙ্করণ ও রঙকরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শিল্পী ও দক্ষ কারিগরদের কাজ হ্রাস পেল ফলে মৃৎশিল্প কিছুটা শৈল্পিক গুণ হারাতে লাগলো। পরবর্তীতে এই শতাব্দীর গোড়াতে আধুনিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে মৃৎশিল্প স্বসম্মানে ফিরে পায় নিজের যোগ্য জায়গা।

কোরিয়ান মৃৎশিল্প : কোরিয়ান মৃৎশিল্পে চীনা মৃৎশিল্পের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে টাঙ্ এবং হান আমলের মৃৎশিল্প দ্বারা কোরিয়ার আর্থেওয়্যার নির্মিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ অব্দে। সিল্লা, জোগোরিভ ও বোয়েকজি এই তিন রাজবংশের আমলে কোরিয়ান মৃৎমাত্র নির্মাণ শুরু হয়। চীনা হান আমলের মৃৎদ্রব্যের আদলে উন্নত ধরনের ফিগার, ঘোড়া ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো ব্যবহৃত হতো গৃহসজ্জায় এবং ধর্মীয় কাজে। এছাড়া অভিজাতদের সমাধিতে ব্যবহারের জন্য নির্মিত হতো। নির্মাণ পদ্ধতি হিসেবে 'গতানুগতিক পিটিয়ে অথবা কয়েক পদ্ধতিতে আবার কখনও কুমোরের চাকার উপর নির্ভর করত।

কোরিয়ান মৃৎপাত্রের সাথে চীনা মৃৎমাত্রের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য কোরীয় মৃৎশিল্পীরা তাদের নকশাকে সরলীকরণ করতেন। সিল্লা যুগের (৬৬৮-৯৩৫) মৃৎপাত্রের আকার ও রঙ হতো খুব সহজ-সরল; ১৪ শতকে এগুলির উন্নতি লক্ষ্যণীয়। এ সময় উন্নততর মাটির ব্যবহার শুরু হয় এবং গ্লেজের ব্যবহারে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়।

"বিকজা" মৃৎপাত্র জোসিউন রাজবংশের আগে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। "বিকজা" মৃৎপাত্র নির্মিত হতো উন্নত সাদা মাটি দিয়ে। ফেল্ডস্পার দিয়ে গ্লেজ দেয়া হতো এবং পোড়ানো হতো পরিচ্ছন্ন বিশাল চুল্লিতে। ডায়মন্ড পাহাড়ে এই ধরনের পাঁচটি মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এগুলোর গায়ে কোরীয় ক্যালিগ্রাফি দ্বারা অঙ্কিত ছিল। ঐতিহ্যগত ভাবে দেখা যায় ধর্মীয় ও রাজকীয় কাজে সাধারণত এই ধরনের সাদা মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হতো।

কোরিয়ান 'সেলাডন' মৃৎপাত্রের সাথে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের একটি পবিত্র সম্পর্ক রয়েছে। 'চিয়ংগিয়া' পোর্সালেইন সেলাডন পাত্রগুলো জৈবিক আকৃতিতে নির্মিত হতো এবং বিভিন্ন মোটিফ ও প্রাণীর নকশা আঁকা হতো। উন্নত ও পরিশুদ্ধ মাটি দিয়ে চিয়ংগিয়া পাত্র নির্মিত হতো; সেই সাথে লৌহচূর্ণ ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে আবার পোড়ানো হতো। এতে গ্লেজটি স্থায়ী হতো এবং চকচকে আভাযুক্ত ফিনিশিং হতো।

জাপানের মৃৎশিল্প : ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে জাপানে মৃৎশিল্প সামগ্রী নির্মাণ শুরু হয়। হিদোয়েশি নামক এক মৃৎশিল্পী মাগা অঞ্চলে ইজুমি পর্বত এলাকায় আরিতা নামক স্থানে এক ধরনের মাটি আবিষ্কার করেন যা পোর্সালেইন নির্মাণে উপযোগী ছিল। এই সময় থেকেই জাপানে পোর্সালেইন নির্মাণ শুরু হয়।

আরিতার মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত ছিল সাফাইদা পরিবার। প্রথমদিকে আরিতা (Arita) মৃৎপাত্রে নীল রঙের আন্ডার গ্লেজের ব্যবহার হতো। এগুলি ছিল সরল ও গুণগত দিক থেকে অনবদ্য। এই পরিবারই একচ্ছত্রভাবে এই রীতিতে মৃৎপাত্রও নির্মাণ করতে থাকেন। ওদের নির্মিত পাত্র সহজেই চেনা যেত। এরা ব্যবহার করত লোহিতলাল, নীলাভ সবুজ, হালকা নীল, হলুদ এবং কখনো সোনালী আভামুক্ত বর্ণ। এছাড়াও অরিতা সিরামিকের রয়েছে উজ্জ্বল ও বহুবর্ণের গ্লেজ। আলা, সোনালী, সবুজ নীল, হলুদ ও কালো এমন রঙ ব্যবহারের বহুমুখিতা অন্য কোন সিরামিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আরিতার মৃৎশিল্পীরা ফুল, পাখি এবং জ্যামিতিক প্যাটার্ন এই সমস্ত মৃত পাত্রের উপর নক্সা করত।

"ইমোরি" মৃৎপাত্র হতো কালো ও সোনালী রঙের এবং এগুলো ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। শিল্পীরা এখানে সিঁদুর (vermillion) রঙের সাথে কালো ব্যবহার করে এক অপরূপ কন্ট্রাস্টপূর্ণ আকর্ষণীয় ডিজাইনের উদ্ভব করেছে ইমোরি মৃৎপাত্রের শরীর হতো দুধ-সাদা। আরিতার সাথে এর পার্থক্য শুধু রঙের সংখ্যা ও গ্লেজের তারতম্যে। আর একটি পার্থক্য হচ্ছে "আকারি' রীতি আরিতা মৃৎপাত্রের ব্যবহৃতে হতো পক্ষান্তরে ইমোরি মৃৎপাত্রে ব্যবহৃত হতো 'সোমেতযুগে' রীতি। 'সোমেতযুগে' রীতিতে মৃৎশিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের ফিগার আঁকতেন যেমন–ছোট ছোট শিশু মাছ, বাঁশের গাছ। এগুলি আঁকা হতো সাদা পটভূমিতে ইন্ডিগো নীলে। 'সোমেতযুগে' রীতিতে শিল্পীরা এক রঙই (monochromic) কাজ করতে এবং কোন জ্যামিতিক নক্সা আঁকত না।

আমেরিকার মৃৎশিল্প : আমেরিকার সর্ব প্রাচীন মৃশিল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগের। আমেরিকার শিল্পকলার একটি বড় অবদান হচ্ছে তার আদিবাসী শিল্পকলা। নক্সা, নির্মাণশৈলী ও অন্যান্য দিকসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমেরিকার মৃৎশিল্প অনেক উন্নত পর্যায়ের ছিল। প্রাচীন মৃৎশিল্প নির্মাণ পদ্ধতি (কয়েল ও রিং) তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আমেরিকার মৃৎশিল্প তৈরিতে চাকার ব্যবহার অনুপস্থিত। চাকার ব্যবহার ছাড়াই আমেরিকানরা বেশ সফলতা লাভ করেছিল। যদিও চাকার ব্যবহার না থাকায় তাদের মৃৎশিল্পে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন মৃৎশিল্পের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বিখ্যাত অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী প্রথায় এখনও মৃৎপাত্র তৈরি করে থাকেন।

আমেরিকান বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আনাসাজি (Anasazi) জাতির লোকেরা 'কয়েলিং (coiling) পদ্ধতিতে ঝুড়ি তৈরি করতো। পরবর্তীতে এই ঝুড়ির ওপর কাদা মাটি ও লতাপাতার আঁশ মিশ্রিত কর তা রোদে শুকিয়ে নিত আবার কখনও আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত, এই ধরনের মৃৎপাত্রের ভিতর ঝুড়ির নক্সা ফুটে উঠত। আনাসাজিদের মৃৎপাত্রে সাদা-কালো রং এর ব্যবহার দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের সাধারণ পাত্রই তারা তৈরি করত।

Dhaka University Institutional Repository

হোহোকাম (Hohokam) জাতির সময়কাল হচ্ছে খ্রিস্টীয় শতকের প্রথম দিক থেকে ১৪০০ সাল অবধি। এরা বহু মৃৎমূর্তি নির্মাণ করেছিল যার অধিকাংশই ধর্মীয় কারণে নির্মিত। হোহোকামদের মৃৎপাত্রগুলির নক্সা হতো লাল রঙের এবং পশ্চাদভূমি হতো ছাই রঙের। এদের মৃৎপাত্রগুলোতে ছোট ছোট নক্সা করা হতো। আবার কখনও কখনও রেখা টেনেও নক্সা আঁকা হয়েছে। তাছাড়া স্পাইরালের ব্যবহারও বেশ দেখা যায়। পরবর্তীকালে হোকোকামদের উন্নততর জ্যামিতিক নক্সা লক্ষ্য করার মতো।

মোগোলন (Mogollon) জাতি মৃৎশিল্পে নিজস্ব সুন্দর রীতির প্রবর্তন করে যা সম্পূর্ণই ছিল আঞ্চলিক। সাদা পটভূমিতে কারো রং এর নক্সাই ছিল তাদের মূল বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও অবশ্য কালো রং এর বদলে গাঢ় বাদামি রং এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মোগোলন জাতি ১৫ শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এক বিশেষ পদ্ধতির মৃৎশিল্পের প্রচলন করেছিল। মূলত জ্যামিতিক ত্রিভুজ নক্সাই ছিল এই ধরনের মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য। একইসাথে স্পাইরাল নক্সার ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। এরা দুই ধরনের পাত্র তৈরি করত বেশির ভাগ পাত্রই হতো গভীর এবং এগুলির নিচের অংশ বা তলদেশ হতো গোলাকার। আর মুখ হতো চিকন এবং ভিতরের দিকে দোমড়ানো। আর এক ধরনের পাত্রের আকার হতো অনেকটা উপগোলকের মতো ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এগুলির গায়ে মানুষ ও প্রাণীর চিত্র বিশেষ রীতিতে আঁকা হতো।

মধ্য আমেরিকার মৃৎশিল্প পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই প্রাথমিক পর্যায়ে যে সমস্ত মৃৎপাত্র নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল থালা, চওড়া মুখবিশিষ্ট পাত্র, গোলাকার আধার পাত্র এবং উপগোলাকৃতির পাত্র। এই সময় মাটি দিয়ে শুধু মৃৎপাত্রই তৈরি হয়নি বরং ক্ষুদ্রাকৃতির ফিগার বা মূর্তিও নির্মিত হয়েছিল। ধারণা করা হয় হাতে তৈরি এই সমস্ত পুতুলসদৃশ্য মূর্তিগুলি সম্ভবত ধর্মীয় কারণে নির্মিত হয়েছিল।

সাধারণ মৃৎপাত্রগুলির গায়ে মূলত কোন নক্সা বা চিত্রকর্ম আঁকা থাকত না। কোন কোন স্থানে মৃৎপাত্রে সাদা পটভূমির ওপর লাল রঙের জ্যামিতিক নক্সা আঁকা হয়েছে আবার কোথাও সাদা পটভূমিতে কালো রঙের নক্সা করা হয়েছে।

মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল টিউটিহুয়াকানে প্রাপ্ত প্রাচীন মৃৎপাত্রসমূহকে, প্রারম্ভিক যুগের মৃৎপাত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে অর্থাৎ ধ্রুপদী যুগের (Classical) মৃৎপাত্রগুলি ছিল মূলত এক রঙ বিশিষ্ট (monochromic) এবং ফ্ল্যাট তলদেশ ও গোলাকৃতি আকারের। এছাড়া তিনশত বছর আগের ফুলদানির আদলে নির্মিত মৃৎপাত্রগুলোও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল নিচের অংশটি ক্ষুদ্র এবং গলাটি অনেক লম্বা। টিউটিহুয়াকানোস জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো নতুন সৃষ্টি 'ফ্রেস্কো', 'ফ্রেস্কো' (fresco/cloisonne poteric) পদ্ধতিতে দাগ ছাড়া পরিচ্ছন্ন নক্সা পাওয়া যায়। রঙের মধ্যে নীল, সবুজ আর গোলাপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

মায়া (Maya) সভ্যতার ধ্রুপদী যুগ মূলত টিওটিহুয়াকানদের সমসাময়িক, মৃৎপাত্র নির্মাণে তারা বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। ধর্মীয় কাজে তারা যে ধরনের মৃৎপাত্র নির্মাণ করত তা ছিল অনেকটা প্রাথমিক যুগের অনুরূপ। বহু বর্ণের সমাবেশে এই কাজকে বলা হতো 'জাকোল' (Tzakal)। এই ধরনের মূল ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

ছিল গোলাপি অথবা ঘিয়ে রঙের। লাল অথবা কালো রঙ দিয়ে নক্সা করা হতো। এছাড়া 'উসুলুতান টেকনিক' (Usulutan technique) এ মোমের সাহায্যে কাজ করা হতো। এই সমস্ত পাত্রের আকার হতো অর্ধ গোলাকৃতির আর নিম্নাঞ্চল ছিল চ্যাপ্টা।

'মায়া সভ্যতার ধ্রুপদী যুগের দ্বিতীয় ভাগটি হচ্ছে 'টেপেউ যুগ' (Tepeu phase)। এই সময়ের মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চোঙাকৃতির মৃৎপাত্র নির্মাণ। এগুলোর পেট কিছুটা মোটা। কখনো কখনো পাশ হতো সোজা। অধিকাংশ মৃৎপাত্রের তিনটি করে পায়া থাকতো।

জাপোটেক (The Zapotecs) অঞ্চল ছিল মায়া অঞ্চলের পশ্চিমাংশে। প্রাচীন যুগ থেকেই এই সভ্যতার শুরু। এক উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে এখানে। এখানকার মৃৎশিল্পের অধিকাংশই মায়া সভ্যতার অনুরূপ ছিল।

ইউরোপীয় মৃৎশিল্প : ক্লাসিকার ও প্রাচ্যদেশীয় শিল্পকলা ইউরোপের মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় অনুপ্রবেশ করে। একই সাথে ইসলামী শিল্পকলাও ক্রমশ: পাশ্চাত্যমুখি হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। ইসলামী শিল্পকলা 'মুর'দের মাধ্যমে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে নীত হয়। মুসলমানগণ প্রায় ৮০০ বছর স্পেন শাসন করেছিল। স্পেনের আলহামরা প্রাসাদে উজ্জ্বল টালি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমস্ত টালি নক্সধর্মী চিত্র এবং পবিত্র কোরানের বাণীসমূহ লেখা থাকতো।

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে মুরদের বহিষ্কারের পরও স্পেনের মৃৎশিল্প নির্মাণে ইসলামী প্রভাব অব্যাহত থাকে। মেজোরকা বন্দরের উদ্দেশ্যে যেত বলে ইউরোপীয়রা এগুলিকে 'মাইলিকা' ('Mailica or Mesolica) বলতো। ইতালির রাজন্যবর্গ, ধর্মগুরু ও উচ্চবর্ণের মানুষেরা এগুলোর খরিদ্দার ছিলেন। পরবর্তীতে ইতালির মৃৎশিল্পীরা মেজোলিকা নির্মাণে ব্রতী হয়। ইতালিতে ভালো মাটি পাওয়া যেত। প্রথম দিকের মেজোলিকা পাত্র সহজ জ্যামিতিক নক্সার মাধ্যমে চিত্রিত হতো। পরে অন্যান্য নক্সার ব্যবহারও শুরু হয়। শতাব্দীকাল ধরে মুসলিম মৃৎশিল্পীগণ ছিলেন দক্ষ টালি নির্মাতা। প্রখ্যাত স্থপতিগণ তাঁদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর ওপর অনেকখানিই নির্ভর করতেন। ইতালিতে গ্লেজ করা টালি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এগুলো গির্জা ও রাজপ্রাসাদের মেঝে, দেয়ালে ইত্যাদির আচ্ছাদনে ব্যবহৃত হতো। নীল, কমলা, সবুজ এবং গোলাপি রঙের টালিতে মুসলিম শিল্পীরা ফুল ও লতাপাতার নক্সা আঁকতেন।

১৬০০ সালের দিকে নীল ও সাদা পোর্সালেইন ইউরোপে প্রথম রফতানী হতে থাকে। ইউরোপীয় কারিগররা সস্তায় এগুলি বানানার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফলতা আসেনি। স্টেনওয়্যার ও সল্ট-গ্লেজের গোপন পদ্ধতি জার্মানি থেকে ইংল্যান্ডে চলে আসে। ফলে মৃৎশিল্পীরা উচ্চ-তাপে ছিদ্রহীন (non porous) ও এ্যাসিডমুক্ত মৃৎশিল্প সামগ্রী নির্মাণে সক্ষম হন। আর এভাবেই ইউরোপে মৃৎশিল্প বিপ্লব সাধিত হয়।

ব্রিটেনের মৃৎশিল্প : মধ্যযুগে ইউরোপ তথা ব্রিটিশ মৃৎশিল্প ছিল তাদের নিজস্ব কেননা তা ছিল বাইরের প্রভাবমুক্ত। স্থানীয় কারিগররাই মৃৎশিল্প নির্মাণ করত। রঙের ব্যবহার ছিল সীমিত। সাধারনত হলুদ আর

Dhaka University Institutional Repository

লাল রঙই ব্যবহৃত হয়েছে। পোড়ানো ও হতো অনেক অল্প তাপে। অল্প তাপে পোড়ানোর ফলে এই সমস্ত পাত্রের রঙ শেষ পর্যন্ত ছাই থেকে কালো রঙের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। গ্লেজ ও ইনলে নক্সার ক্ষেত্রে জার্মানির পাত্রের সাথে ব্রিটিশ পাত্রের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রথম দিকের ব্রিটিশ মৃৎপাত্রগুলি ছিল গ্লেজবিহীন। পরবর্তীতে তারা গ্লেজের ব্যবহার শিখলে হলুদ ও বাদামির মধ্যবর্তী রঙ-এর গ্লেজ করত। ১৬শ শতক থেকে অক্সাইড ব্যবহার করে এক ধরনের গাঢ় সবুজ রঙের পাত্র তারা তৈরি করত। সমসাময়িক সময়ে সবুজ, ছাই ও বাদামি রঙের গ্লেজ একই সাথে ব্যবহার করত। ১৭ শতকের প্রথম দিকের ইংল্যান্ডে আকর্ষণীয় স্লিপওয়্যার নির্মিত হতে থাকে। নেদারল্যান্ডে টিনের তৈরি এক ধরনের গ্লেজ ব্যবহৃত হতে থাকে। বিশেষ করে ডেলফল্ট (Delftware) এখান নির্মিত মৃৎপাত্রকে "ডেলফ্ট ওয়্যার" (Delftware) বলা হয়।

১৫৩৯ সালের দিকে বার্নাড পালিসি নামক–এক শিল্পী গ্লেজের মৃৎপাত্র নির্মাণে সক্ষম হন। এগুলির রঙ হতো নীল, সবুজ ও ম্যাঙ্গানীজযুক্ত গোলাপি। আর এই সমস্ত পাত্রের পশ্চাদভাগ দানাদার বাদামি, নীল এবং গোলাপি গ্লেজ করা হতো। পালিসি (Pallisy) পরবর্তীকালে ধ্রুপদি ও বাইবেলের কাহিনী চিত্রায়িত করে। ১৫৮৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এটি ফন্টেনব্লু নামক স্থানের "এ্যাভন মৃৎপাত্র" নামে পরিচিতি লাভ করে।

মৃৎশিল্পী পালিসির সমসাময়িক কালে সেন্ট-পোরচেয়ার নামক স্থানে ধাতব পাত্রের অনুসরণে আর এক ধরনের মৃৎপাত্র তৈরি হতো। এই মৃৎপাত্র গুলিকে কখনো অঁরি দঁ (Henry Deaux) আবার কখনো ফেঁয়াস দ' অয়েরঁ (Faience d' Oiron) পাত্র বলা হতো। এগুলোর রঙ হতো হাতির দাঁতের অনুরূপ।

১৬শ শতাব্দীর ফরাসি মৃৎশিল্প প্রধানত ইতালীর মাইওলিকা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সময় ফ্রান্সের রোঁয়া নামক স্থানে অল্প তাপে এক ধরনের মৃৎপাত্র (faience) অস্বচ্ছ রঙিন গ্লেজে নির্মিত হতো। নেভার্স (Nevers) নামক স্থানে এটি শুরু হয় ১৬ শতকের শেষের দিকে।

এদ্‌মে পোতেরাঁ (Edme Poterat) ১৬৪৮ সালে রোঁয়াতে মৃৎকারখানা গড়ে তোলেন। তাঁকে ফ্রান্সের 'নরোম পেস্টযুক্ত পোর্সলেইন"-এর জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। "ফেস্টুন রীতি" ও তার একটি নতুন আবিষ্কার। রোঁয়া মৃৎপাত্র নক্সা ও কারুকার্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

১৮ শ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিশেষ জনপ্রিয় ও মূল্যবান রীতি হিসেবে প্রচলিত ছিল। সাধারণত এক রঙেই নির্মিত হতো, পরবর্তীতে লাল ও সবুজ ব্যবহাত হলো, ফলে রঙে রঞ্জিত মৃৎপাত্র নির্মাণ সম্ভব হলো। সবচেয়ে বিরল মৃৎপাত্র হচ্ছে নীল পটভূমির ওপর লাল রঙের নক্সা করা পাত্র। ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোঁয়ার মৃৎপাত্রগুলি পুরোপুরি প্রাচ্য রীতির মৃৎপাত্রে রূপ নেয়।

জোশিয়ার ওয়েজউড [Joshiah Wedgewood) (১৭৩০-১৭৯৫)] ও তাঁর উত্তরসূরিগণ ১৮ শতকের শেষে ও ১৯ শতকের প্রথম দিকে যথেষ্ট সৃজনশীলতা ও বুৎপত্তি দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ মৃৎশিল্পী জোসিয়ার ওয়েজউড হচ্ছেন ভিনারের মৃৎপাত্রের জনক। তার অবদান ছিল মূলত উন্নত ক্রিমওয়্যার বিখ্যাত

জেমপারওয়্যার এক ধরনের কালো বেসল্ট সিরামিক নির্মাণের ক্ষেত্রে, তিনি মৃৎশিল্পের ইতিহাসে এক অনবদ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে অমর হয়ে আছেন বিখ্যাত কালো 'বেসল্টওয়্যার' (Basaltware) আবিষ্কার করে।

১৯ শতকের প্রথামার্ধে নতুন ধরনের অনেক মৃৎপাত্রের আবিষ্কার করেন জোশিয়ার ওয়েজউড এর পরবর্তী প্রজন্মের মৃৎশিল্পীগণ। নতুন ধরনের মৃৎপাত্রের মধ্যে 'পেরিয়ানওয়্যার ছিল অন্যতম। বাণিজ্যিকভাবে এটি ছিল অত্যন্ত সফল। ১৯ শতকে মৃৎশিল্পে গতিময়তা আসে। মৃৎশিল্পীগণ সিরামিক কারখানাগুলিতে নিয়োগ পেতে থাকে। সাধারণ মানুষের জন্য মৃৎপাত্র হয়ে পড়লো অনেক সস্তা ও সহজলভ্য। পক্ষান্তরে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হয়ে পড়লো কোণঠাসা।

ইসলামী মৃৎশিল্প : প্রাচ্যদেশীয় ইসলামী শিল্পকলায় স্থাপত্যে নক্সাধর্মী টালির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। এগুলি ছিল মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্পের অনুরূপ। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামী জগৎ জুড়ে বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র নির্মিত হয়ে আসছে।

পারস্য অঞ্চলের তথা মৃৎপাত্র নির্মাণের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সামারায়। বাগদাদ ও অন্যান্য নগরীতে মৃৎপাত্র নির্মিত হতে থাকল। পারস্যের মৃৎশিল্পের সাথে সুদূর চীনের মৃৎশিল্পের মিল লক্ষণীয়। আব্বাসীয় যুগে (৮২০ খ্রিস্টাব্দে) মৃৎশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ছিল মধ্য এশিয়ার ট্রানজক্সিয়ানা-র (আধুনিক উজবেকিস্তান, কাজাখিস্তান ও কিরঘিজিস্তান) রঙ করা মৃৎপাত্র। পশ্চিমাঞ্চলে স্থানীয় রীতিতে নানা ধরনের মৃৎপাত্র নির্মিত হতো। এগুলি ইসলামী নক্সাধর্মিতা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র।

"স্গ্রাফিয়াটো" (Sgraffiato) রীতি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। এগুলি ছিল সীসার গ্লেজযুক্ত লাল মৃৎপাত্র। এই পাত্রগুলোতে সাদা ফালি করা জায়গায় লাল নক্সা করা হতো। সামারা ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলি নির্মাণ চীনা স্টোনওয়্যারের অনুসরণে হলেও তার উৎস ছিল মীনা করা ধাতব পাত্র। এছাড়াও এগুলি সামানীয় মৃৎপাত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণত সবুজ রঙের গ্লেজ ব্যবহৃত হতো। কখনো বাইরের বৃত্তাংশটি সবুজ রঙের হতো। ধারণা করা হয় এই ধরনের মৃৎপাত্র নির্মাণকাজ ১০ থেকে ১২ শতাব্দীর মধ্যে ছিল। ১২শ শতকের শেষ চতুর্থাংশে পারস্যের মৃৎশিল্পে এক দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এই সময়ের মৃৎশিল্পের বিশেষত্ব ছিল 'মিনাই' করা কাজ। এছাড়া উজ্জ্বল বর্ণের মৃৎপাত্রে গোলাপি রঙের ফিগারেটিভ কাজ স্থান করে নেয়। সেই সাথে স্কেচ করা এরাবেস্ক ও লতা-পাতা আঁকা হয়েছে এ সময়ের মৃৎপাত্রে। মিশরের আইয়ুবী যুগের (১১৭১-১২৫০) মৃৎপাত্র সমূহ গায়ের রঙ সাদা করে নির্মিত হয়েছে।

পারসিক সামামিদ রাজবংশের রাজধানী ছিল বুখারা সমরকন্দ ছিল এঁদের প্রধান নগরী। সমরকন্দ এলাকাটি মৃৎশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। বাগদাদের রীতি থেকে তাদের নির্মাণশৈলী সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পে অবশ্য প্রথম দিকে গ্লেজের ব্যবহার ছিল না। ইসলামী শিল্পকলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে উমাইয়াদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল বিশেষ করে মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে। ইসলামী জগতে মৃৎশিল্পের উন্নতি হতে থাকে নবম শতাব্দীর পর থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্পের ওপর নক্সার ব্যবহার ছিল সমরকন্দ মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য, মূলত তাঁরা তরল রঙ মৃৎপাত্রের ওপর ঢেলে দিয়ে নক্সা নির্মাণক করত। লাল বা গোলাপি মাটি দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো। এর পর পুরো পাত্রটিই রঙ করা হতো। সাধারণত সাদা রঙ দিয়ে প্রাথমিক 'গ্রাউন্ড' করে তাতে গোলাপি 'টমেটো বর্ণ' বা কালচে রঙ ব্যবহার করেছে। বাদামি রঙ এবং সেই সাথে আকর্ষণীয় হলদেটে সবুজ দিয়েও ওপরের নক্সা আঁকা হয়েছে। আবার কখনও স্বচ্ছ রঙ বা সাদা রঙের ওপর ব্যবহার করা হয়েছে কালচে গোলাপি পাত্রের গায়ে। এই সমস্ত নক্সার গুরুত্ব অনেক বেশি হতো।

প্রাথমিক যুগেই ইসলামী মৃৎপাত্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজগুলি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ইসলামী মৃৎপাত্রে জগ, 'আলবেল্লো' আকারের পাত্র, প্রদীপ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এর অধিকাংশই ছিল বাদামি ও গোলাপি আভায় রঙ করা। পশ্চাদভূমি সাধারণত সাদাই রাখা হতো। পাত্রের গায়ে আঁকা হতো 'কুফিক' রীতির লিপি। এই সমস্ত মৃৎপাত্রের সৌন্দর্য সত্যিই অপূর্ব, এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতাও লক্ষণীয়। ইসলামের মূল উপজীব্যটিকে তারা তাদের নির্মিত এই সমস্ত মৃৎপাত্রের মাধ্যমে।

ইসলামে প্রাণীচিত্র আঁকা নিষিদ্ধ থাকায় মুসলিম মৃৎশিল্পীরা লতাপাতা ও ফুলের নক্সা এবং পবিত্র কোরানের বাণী দ্বারা এই সমস্ত পাত্র চিত্রিত করতেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থাপত্য অলঙ্কৃত করেছেন বর্ণিল সুন্দর সব টালি দ্বারা। ইসলামী শিল্পকলায় মৃৎপাত্র এবং টালি নির্মাণশিল্প বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রখ্যাত কবি ওমর খৈয়ম মৃৎশিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে কবিতা লিখেছেন তার অর্থ হলো–

"যদি কোন মৃৎশিল্পী তাঁর দেহের ধূলা থেকে কোন পাত্র নির্মাণ করেন, তা হলে কেন তা সুরায় পূর্ণ থাকে?"

মুসলিম শিল্পীরা ধাতব চরিত্রের চকচকে দ্যুতিময় মৃৎপাত্র নির্মাণ করেন, যা "লাস্টা" (Lustre) বলে পরিচিত। ধাতব লবণ ব্যবহার করে কম তাপে পুড়িয়ে এগুলি নির্মাণ করা হতো। এই সময়ের মৃৎশিল্পীগণ পাত্রসমূহে বিমূর্ত নক্সার সাথে পাখি, মানুষ ও অন্যান্য ফ্যান্টাসি জগৎ নির্মাণ করতে থাকেন।

ফাতিমি যুগের (৯৬৯-১১৭১) উজ্জ্বল মৃৎপাত্রের বেশিরভাগই পাওয়া গেছে ফোস্তাত্ নামক স্থানে। ধারণা করা হয় মিশর যখন খলিফার শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন হয় তখন এই উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পরীতির জন্ম হয়। এখানকার মৃৎশিল্পীরা বাগদাদের রীতিতে মৃৎপাত্র নির্মাণ শুরু করেন মিশরের মৃৎশিল্প জগতে উজ্জ্বল মৃৎপাত্র এক বিশষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নির্মাণশৈলী ফাতিমি বংশের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১১৭১ সল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

রাই (Rayy) মৃৎপাত্রে শক্ত ও কিছুটা মোটা গ্লেজের আস্তরণ ব্যবহার করা হয়েছে। দেখলে মনে হয় এক ধরনের গোলাপি রঙএর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কারণ যে ধরনের গ্লেজ তারা ব্যবহার করতো তা পুরোপুরি অস্বচ্ছ ছিল না। এক ধরনের নীল রঙের গ্লেজ দ্বারা আবৃত হতো পাত্রের পিছন দিক। আবার কখনও কখনও পুরো পাত্রটিই উজ্জ্বল নীল রঙে রঞ্জিত করা হতো। কখনো বা সাদা ও নীল রঙ দ্বারা পাল্টাপাল্টি ভাবে গ্লেজ দেয়া হতো।

Dhaka University Institutional Repository

রাইতে প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। রাই-এর মৃৎশিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারিখ উল্লেক করতো। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি রাই বোতল রয়েছে যাতে ৫৭৫ হিজরী সনের কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ১১৭৯ সালে এটি নির্মিত।

রাক্কা (Rakka) রীতির বিশেষত্ব ছিল মূলত বড় আকারের মৃৎপাত্র বিশেষ করে জগ, এগুলিতে উচ্চ রিলিফ করা হতো। আবার ফেলজুক এরাবেক প্যাটার্ন ও নির্মিত হতো। রাক্কা মৃৎপাত্র সাদা রঙে রঞ্জিত ছিল। পারসিক মৃৎপাত্র অপেক্ষা নরম এবং টেক্সচারের দিক থেকে কিছুটা পরিমাণ দানদার।

রাক্কার মৃৎপাত্রে এক ধরনের চকোলেট–বাদামি গ্লেজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এদের গ্লেজ ছিল কিছুটা সবুজাভ স্বচ্ছ ও পুরু এবং "নেকশি" রীতিতে ক্যালিওগ্রাফি করা হতো।

কাশান রীতি (The School of Kashan) পারস্যের মৃৎশিল্প বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। কাশানি মৃৎপাত্র "লাকাবি পাত্র" (Laqabe ware) নামে পরিচিত লাভ করে। লাকাবি শব্দের অর্থ "রঙ করা", ১১শ শতকের শুরু থেকে ১৪ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এই রীতির প্রচলন ছিল। দেয়ালে ব্যবহৃত উজ্জ্বল গ্লেজযুক্ত দেয়াল-টালি (wall-tiles) নির্মাণের কারণেই মূলত কাশান রীতি বিখ্যাত হয়ে আছে। এই সমস্ত টালিতে উঁচু করে (রিলীফ) নীল রঙের গ্লেজ আচ্ছাদিত করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই রীতিতে নির্মিত টালির 'মিহরাব' অনেক জায়গায় এখনো টিকে আছে। 'মিহরাব' মসজিদের অভ্যন্তরে অথবা কিবলাহ্‌র নির্দেশ প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই সমস্ত টালির গায়ে 'কাশি' অথবা 'কাশানি' শব্দটি লেখা থাকত। এই রীতি এক ধরনের রক্ষণশীল রীতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। এই কাশানি রীতির সময়কাল নির্ধারণ করা হয় ১২০৫ থেকে ১৩৩৪ পর্যন্ত। (রফিকুল; ২০১৪ : ১০৫)

উপমহাদেশের মৃৎশিল্প : উপমহাদেশীয় মৃৎশিল্প ইতিহাসে দেখতে পাই খ্রিস্টপূর্ব (২০০০-১৮০০) সময়কালের ভারত ও পাকিস্তানের সিন্ধু ও হরপ্পা সভ্যতাকে। পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুর মহেঞ্জদাড়ো-র ধ্বংসাবশেষ বিশাল ভৌগোলিক ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সিন্ধু সভ্যতার প্রাচবীনতম দুটি অঞ্চল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সিন্ধুনদ এবং তার শাখা-প্রশাখা বাহিত সমতলে অবস্থিত। সমগ্র সিন্ধু উপত্যকায় প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ নাগাদ তিনটি পৃথক সংস্কৃতির আবির্ভাবে বেশ লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। এরা প্রত্যেকেই তাদের মৃৎশিল্পে নিজস্ব শৈলীর কারণে বিশিষ্ট এবং সেই নামানুষারেই ওদের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলো চিহ্নিত। এই তিলট সিন্ধু সংস্কৃতির জীবনযাত্রা অভিন্ন ছিল। ভিন্নতা ছিল শুধু মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য। (ইরফান, ২০১৫; ১০–১২) হস্তশিল্প উৎপন্নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃশ্যমান ছিল মৃৎশিল্প। কুমোরের চাকে প্রস্তুত মৃৎশিল্প প্রাচীন তিলট সিন্ধু সংস্কৃতির অত্যন্ত প্রাধান্যবিস্তারী একটি শিল্প। ভোগ্যপণ্য শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং সম্ভবত কৃষির বাইরে সবচেয়ে বেশি কাজের যোগানদার শিল্পটি হলো কুম্ভকারের হস্তশিল্প বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সিন্ধু মৃৎপাত্র কুম্ভকারের চাকে প্রস্তুত, পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট, সরল, লাল করে পেড়ানো এবং নানান উপযোগিতা অনুসারে নানান আকারে গড়া। কেবল অভিজাতদের উপভোগের জন্য নয় বরং সমগ্র সাধারণ জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত এরকম মৃৎশিল্প সিন্ধু সভ্যতা যতদূল পর্যন্ত বিস্তৃত তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বেই। এটাই বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কেবলমাত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই এই মৃৎপাত্রগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সিন্ধু মৃৎপাত্র বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহৃত হতো যেমন– রান্নার বাসন কোসন, থালা এবং ডেকচি, কৌটো, মজুত রাখার বয়াম। পেয়ালা ডেকচি এবং বয়ামগুলি বিভিন্ন আকারের, কয়েকটি ঢাকনা-দেওয়া এবং অন্যগুলি সুস্পষ্ট কানাত বিশিষ্ট। রঞ্জক পাত্রগুলিতে অসংখ্য ছিদ্র; কিন্তু দণ্ডের ওপর স্থাপিত থালা বা ডেকচিগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এগুলির জন্য কুম্ভকারের বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। এদের মধ্যে অনেক মৃৎপাত্র এতই মহার্ঘ ছিল যে একটু ভেঙে যাবার পরও সেগুলো মেরামতের জন্য বা একটু ঠিকঠাক করার জন্য সাবধানে রেখে দেয়া হয়েছিল। এমন সব সূক্ষ্মতর সামগ্রীর মধ্যে লাল পটি লাগানো পেয়ালা কিংবা পাত্র রয়েছে। এছাড়া, কালো রঙে অলঙ্কৃত এবং নানা নকশায় চিত্রিত। এক ধরনের পাত্রও রয়েছে। (ইরফান, ২০০৫ : ৩৬-৩৭)

হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরবর্তী জনবসতি শেরতুঘাই। শোরতুঘাই তার মৃৎশিল্প। ইটের কাঠামো, কেন্দ্রিক নালি সহ চ্যাপ্টা গোলাকার সোনার পুঁতি, কর্নেলিয়ান পুঁতির হার, তামার আয়না আর সজ্ঞ-ঝিনুকের বালা এই সমস্ত নিয়ে পুরোপুরি হরপ্পীয়। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বলতে পোড়ামাটির একটি সম্ভবত উটের মূর্তি। (শিরিণ, ২০০৩ : ৩৩)

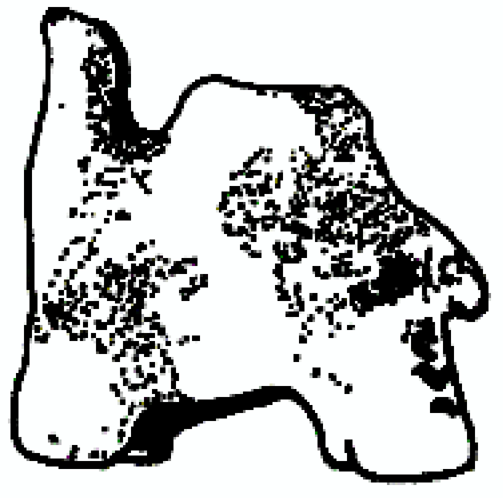

চিত্র–১
মাটির উট, শোরতু ঘাই

মেহেরগড় সহ আরও অনেক স্থানে চাকার সাহায্যে সূক্ষ্ম গড়নের ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরি হতো। এদের গায়ে স্বাভাবিক প্রবণতায় কালো রঙে অলঙ্করণ করা থাকত। জারণ এবং বিজারণ দুটি প্রক্রিয়া ঘটতে পারে এমন একটি উচ্চ তাপমাত্রায় (৯৫০°সে.) সেগুলিকে পোড়ানো হতো। মেহরগড় ছাড়াও মান্ডিগাকে, কোয়েত্তা উপত্যকায়, জোর এবং লোরালাই-এ মধ্য বালুচিস্তানে এগুলি দেখা গেছে। সম্ভবত একাধিক স্থানেই এগুলি তৈরি হতো। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে খুবই সহজ ভাববিনিময়ের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। আর সে কারণেই প্রাগ্রসর সিরামিক করণকৌশল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। 'কোয়েত্তা' মৃৎশিল্পও ছিল এর সঙ্গে। সেগুলি হালকা রঙের, ঈষৎ পীতবর্ণ থেকে লাল, জ্যামিতিক বিন্যাসে চিত্রিত। হরপ্পার খননকার্যে কোট-দিজিয়ান মৃৎপাত্র ও পাওয়া গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খননক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য সামগ্রীর সাথে পোড়ামাটির তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নারী, পুরুষ, পশু, গাড়ি এবং অন্যান্য বস্তু রয়েছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই নিশ্চিতরূপে খেলনা। অন্যগুলি সম্ভবত দেবমূর্তি বা উপ-দেবতা। এগুলি প্রস্তুত করা সহজ এবং অনেকগুলি সম্ভবত ঘরোয়াভাবে তৈরি। ছাঁচ থেকে 'বর্ণনাত্মক' চিত্র সম্বলিত কিছু পোড়ানো কাদামাটির ফলক প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং সম্ভবত সেজন্যেই যথেষ্ঠ সংখ্যায় এদের নকলক করা সম্ভব হয়েছিল। সে যুগের 'বিলাসবহুল' সামগ্রীর মধ্যে একটি হলো 'পাথরনির্মিত' বালা। এগুলি ছাঁচে দেবার পর একটি জটিল প্রক্রিয়ায় অত্যাধিক পোড়ানো যথেষ্ট চকচকে, ছিদ্রবিহীন (non-Porus) কাদামাটিতে তৈরি করা হতো। এদের বর্ণ ধূসর থেকে কালো। মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা, কেবলমাত্র এই প্রধান শহরেই এরা আবিষ্কৃত হয়েছে।

কূপ নির্মাণে সিন্ধু স্থপতিরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিল। সেগুলিকে গোলাকার করার জন্য কীলকাকা ইট ব্যবহৃত হয়েছিল। সিন্ধু ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও অংশত পোড়া ইটের নির্মাণকার্য চোখে পড়ে। পাটাতন এবং নগর বা দুর্গ-শহরের প্রাচীর নির্মাণে পোড়া-ইটের মতো একই আকার আয়তনের রোদ-পোড়া ইট ব্যবহৃত হতো।

এই সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা যায় অসংখ্য মূল্যবান হস্তশিল্প। এরা প্রধানত মহার্য বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে যুক্ত ছিল। এখানে চীনামাটির মনপসন্দ সামগ্রী প্রস্তুত করা হতো। চীনামাটি দিয়ে বিচিত্র সব সামগ্রী যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌটো, পুঁতি, বালা, বোতাম, পিন, কবচ, ছোট ছোট প্রতিমূতি্র সন্ধান পাওয়া গেছে। (শিরিণ, ২০০৩ : ৩৭-৩৯)

গনেশ্বর এবং বোধপুরের মৃৎপাত্র সিন্ধু প্রভাবের চিহ্ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পৃ.৫১ আবার পশ্চিম বেলুচিস্তান যেখানে মিরি কোয়ালাত-এ প্রত্ন এলামাইট মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সেই স্থান পর্যন্ত এই প্রত্ন-এলামাইট সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতার কাছাকাছি সময় আরও দু'টি নতুন সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। এরা হচ্ছে গিরিমাটি রঞ্জিত মৃৎশিল্প সংস্কৃতি এবং বানাস সংস্কৃতি। এদের মধ্যে গিরিমাটি রঞ্জিত মৃৎশিল্পের সংস্কৃতি নিজেরই মৃৎশিল্পের নামানুসারে চিহ্নিত। আর কায়থার মৃৎশিল্পই বানাস মৃৎশিল্প হিসেবে পরিচিত পায়। সেই সময়কার পোড়ামাটির মূর্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, ষাঁড় সংক্রান্ত ধর্মীয় রীতি সেখানে উপস্থিত ছিল। (ইরফান : ২০০৫ : ১০০০)

হরপ্পা ও মহেঞ্জেদাড়ো মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সিন্ধু সভ্যতার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়নি। ঐ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু ফুটে উঠেছিল স্বকীয়তা ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টউত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত গোটা গঙ্গা, যমুনা উপত্যকা ও মধ্য ভারত জুড়ে যে শব্দ, কৃষাণ শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল তা বাংলাদেশের মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর, পশ্চিমবঙ্গের পোখরনা (বাকুড়া জেলা) তমলুকে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, বীলভূম, মুঘল ও সুলতানী আমলে আবিষ্কৃত প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৫ (পৃ. ১০–১২)।

২. প্রগুক্ত পৃ. ৩৬।

৩. প্রগুক্ত পৃ. ৩৭।

৪. শিরিন রত্নার, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, (পৃ.৩৭–৩৯)

৫. প্রগুক্ত (১১৯)।

৬. প্রগুক্ত পৃ. (১২০-১২২)।

৭. ইরফান হাবিব, সিন্ধূ সভ্যতা, এনবিএ পৃ. ৩৭।

৮. প্রগুক্ত পৃ. ৩৮।

৯. প্রগুক্ত পৃ. ৩৯।

১০. ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, এন.বি.এ পৃষ্ঠা ৫২।

১১. প্রগুক্ত পৃষ্ঠা ১০০।

১২. মো. ফজলুল করীম, আমার মৃৎশিল্প, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, এম. এফ. এ. , ১৯৯২, চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃৎশিল্পের ইতিহাস : বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্পের ইতিহাস : বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মৃৎশিল্প : ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গের উঁচু ভূমি ও সাঁওতাল পরগণায় নিউলেথিক যুগের মৃৎসামগ্রীর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। হরপ্পা, মহেঞ্জেদাড়ো সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শন পরবর্তীতে তৈরি বিভিন্ন একরে মৃৎপত্র ও অলঙ্করণ ঐতিহ্য ফুটে ওঠে। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো থেকে উদ্ধারকৃত হাঁড়ি, কলসি, সরা, মটকা, গ্লাস, চেয়ারা, থালা বাটি, ঢাকনা, চামচ ঘট প্রভৃতি মৃৎপাত্রসমূহ যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রাগঐতিহাসিক থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত মৃৎশিল্পের অসংখ্য নিদর্শন বাংলার বিভিন্ন স্থান বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাঙলার প্রচলিত কিছু পুতুলের গঠন প্রকারণে প্রাচীন আন্তর্জাতিক শিল্প শৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট। আমাদের দেশের কুম্ভকারগণ এখনও আঙ্গুলের সাহায্যে টিপে টিপে পুতুল তৈরি করেন। ছাঁচের ব্যবহার কর্মই হয়ে থাকে। হরপ্পা ও মহেঞ্জাদাড়োর “মাদার গঞ্জে” এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের যা পুতুল সে জন্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের এক ধারাবাহিক নিদর্শন। বাংলাদেশের বিভিন্ন খননক্ষেত্রে প্রস্তর যুগ ও তার পরবর্তী যুগের ক্রম বির্বতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। অজয় নদীর তীরে পান্ডুরাজার ঢিবি খনন করে বেশ কিছু মৃৎপাত্র সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন (২৫০০-৩০০০ খ্রি.-পূঃ) বা তার পূর্ববর্তী সময়ের। ওগুলোর মধ্যে কিছু লাল কালো (অভ্যন্তর ভাগ কালো এবং বাইরে লাল) ও চিত্রিত লাল রঙের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। এছাড়া কোশী নদীর তীরে খননের ফলে সেখানে চিত্রিত, খোদিত ও বহু রন্ধ্রযুক্ত মৃৎপাত্রের অংশ পাওয়া গিয়েছে। কমলা রং বা সামান্য হলদে আভাযুক্ত। হরপ্পাতেও এই ধরণের পাত্র ছিল।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় নি বরং এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা প্রভাবিত হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। বাংলাদেশের রাজশাহীর পাহাড়পুর, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও কুমিল্লার ময়নামতি এবং দিনাজপুরের কান্তাজির মন্দিরে সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত পোড়ামাটির কাজের উৎকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে। বাংলাদেশের বিহার স্তুপ ও প্রত্নখনন স্থল থেকে প্রাপ্ত প্রতিকৃতি চিত্র, মূর্তি খোদিত চিত্র, পান্ডু লিপি চিত্র এবং বিভিন্ন চিত্রিত হাঁড়ি-পাতিল, কলস ইত্যাদি থেকে এখানকার মৃৎশিল্প সামগ্রীর ঐতিহ্যগত জনপ্রিয়তা অনুধাবন করা যায়। মসজিদের মেহরাব ও দেয়ালে সুন্দর ও সুনিপুণ নকশা এবং নকশা করা টালি দিয়ে সাজানো দেখে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়।। প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

মৃৎশিল্পে বাংলাদেশের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পসামগ্রী থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, মৃৎশিল্পের গৌরবের ইতিহাস শুধু উপমহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশও এর নিদর্শনসমূহ তারই সাক্ষ্য বহন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ হচ্ছে, বগুড়ার মহাস্থানগড়। কুমিল্লার ময়নামতি, রাজশাহীর পাহাড়পুর, এবং দিনাজপুরের কান্তাজির মন্দির। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কখনও পুকুর খনন, রাস্তা খনন, বাড়ি নির্মাণ আবার কখনও নদী ভাঙনের ফলে মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, কারুকার্য করা নকশাকৃত পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন যুগের পোড়ামাটির শিল্পকর্ম হতে লোকজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকের মহাস্থানগড়, গুপ্ত ও পাল যুগের বিশেষ করে পাহাড়পুর, ময়নামতি এবং চব্বিশপরগনা জেলার চন্দ্রকেতুগড়ের পোড়ামাটির শিল্পকর্ম সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার স্মারক। প্রাচীনকালে মসজিদ, মন্দির ও প্রাসাদ অলঙ্করণের এই লোকজ মাধ্যমটি পরবর্তী সময় ধর্মের সীমাবদ্ধ গণ্ডি অতিক্রম করে লোকজ জীবনকে জানার ঐতিহাসিক উপাদানে পরিণত হয়েছে। (শামসুজ্জামান, ২০১২ : ৭-৮)

মহাস্থানগড় : করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া জেলায় (বাংলাদেশ) পুণ্ড্রবর্ধন যা পরবর্তীতে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত তা ছিল সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এক বৃহৎ নগরী। বেশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থান পরাক্রান্ত মৌর্য, গুপ্ত, পাল এবং অন্যান্য হিন্দু সামন্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।

বর্তমানে বগুড়া শহর থেকে ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। এবং একটি পাকা সড়ক দ্বারা শহরের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত এই প্রাচীন নগরী, দৈর্ঘ্য ছিল ৫০০০ ফুট এবং প্রস্থে ৪৫০০ ফুট। সম্পূর্ণ নগরীটাই ভূমি হতে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু। বাংলাদেশের এত বিস্তীর্ণ শহরতলীযুক্ত আর কোন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের দৃষ্টান্ত এই। (নাজিমুদ্দীন, ১৯৬৬ : ১১)

১৯২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানগড়ে প্রথম খননকার্য শুরু হয়। এই সময়ে পালযুগীয় জটিল প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বিতীয়বারের মত খননকার্য শুরু করেন, মহাস্থানের সময়ানুক্রমিক আরও বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘটনের জন্য। এখানে কমপক্ষে তিন আমলের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মিত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কতকগুলো ভগ্নপ্রাপ্ত দেওয়াল ও একটি মেঝে উল্লেখযোগ্য। এ মেঝের উপর তিনটি বিরাট মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। এছভাড়াও পোড়ামাটি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান ও স্বল্প মূল্যবান প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন আকারের বোতাম ও গুটিকা, কানবালা, লম্বমান কুণ্ডল (Peudent) নাকফুল, পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের সুরমাদণ্ড, আংটি ও বালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কাল নিরূপণের জন্য প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে একটি গোলাকার পোড়ামাটির সীল উল্লেখযোগ্য। এটিতে যুক্তমূল তিনটি গমের শীষের চারদিকে কিনারা ঘেঁষে ২২টি ব্রাহ্মী অক্ষর একটি বৃত্তাকার বেষ্টনীর মধ্যে উৎকীর্ণ আছে। এছাড়াও মনোরম ছাঁচে গড়া মুকুট পরিহিতা একটি নারীর মস্তক বিশেষ আকর্ষণীয়। এ দুইটি জিনিসকেই ওই আমলের বলে মনে হয়।

মহাস্থানগরের অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্বাংশে খননের ফলে খ্রিস্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর চাকচিক্যময় মুসলিমযুগের উজ্জ্বল বর্ণেল মৃৎপাত্র খণ্ড পাওয়া যায়। (নাজিমুদ্দীন, ১৯৬৬ : ২৯) গুপ্ত ও তথাকথিত শুঙ্গ আমলের স্থাপত্য নির্দশন থেকে বোঝা যায় যে, এগুলো টালি ইট দ্বারা বেশ মজবুত রূপেই তৈরি করা হয়েছিল। খননকৃত পাঁচটি স্থানে বিভিন্ন সভ্যতা স্তরে বিভিন্ন পোড়া মাটির জিনিস থেকে শুরু করে সোনার অলঙ্কারাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। ওই দ্রব্যাদির মধ্যে পাল আমলের পোড়ামাটির চিত্রফলক। অলঙ্কৃত ইট, অসংখ্য পোড়ামাটির বল উল্লেখযোগ্য এছাড়াও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে এক বিশিষ্ট শ্রেণির পোড়ামাটির চিত্রফলক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলোর নির্মাণকাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে ধরা হয়।

মহাস্থানগড় যে দুর্গটি রয়েছে তারই দক্ষিণ পূর্বকোণে বলখী সাওয়ারের মাজারসহ কতগুলো কবর। ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের একটি তোরণ অবস্থিত। সমজিদের খিলানের উপরিভাগে পলস্তারা উপর লতাপাতা ও পুষ্প প্রতিকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত। এর শীর্ষদেশ চাকচিক্যময় উজ্জ্বল পোড়ামাটির পাত্রখণ্ড দ্বারা শোভিত। উন্নত অংশের মাঝে মাঝে সমান দূরত্বে একই প্রকার চাকচিক্যময় উজ্জ্বল পোড়ামাটির চূড়া আছে। মসজিদের প্রবেশ পথের উপর লেখা প্রস্তর ফলক হতে জানা যায়, মসজিদটি ১১৩০ হিজরীতে (১৭১৯ খ্রি.) ফারুখ শিয়রের রাজত্বের ৭ম বৎসরে খোদাদিল নামক এক ব্যক্তি নির্মাণ করেছিল। (নাজিমুদ্দীন, ১৯৬৬ : ৩০-৩২)

মহাস্থানে বিভিন্ন আকারের ও নানা রং-এর মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে। এরমধ্যে দু'প্রকার মাটির পাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতকগুলো নানা প্রতিকৃতির নক্সার ছাপ দিয়ে তৈরি করা সুন্দর ধূসর ও লাল রং-এর (খ্রিঃ ১ম–৪র্থ শতাব্দী) আর কতগুলো খুবই উজ্জ্বল কালবর্ণের বিখ্যাত N.B.P মৃৎপাত্র যা উত্তরাপথের বিশেষ করে গঙ্গা অববাহিকার প্রায় সমস্ত প্রাচীন ধ্বংসস্ত্তূপে পাওয়া যায় এবং সব স্থানেই এ মৃৎপাত্র মৌয আমলের সঙ্গে সংযুক্ত। পাত্রগুলোর মধ্যে বাটি, পলবিশিষ্ট পাত্র (Beaker) ও পান পাত্রই বেশি দেখা যায়। পাত্রগুলো খুবই মসৃণ কাদা দিয়ে সুরচিসম্মতভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রস্তুত হত। এর মধ্যে দু'টি খণ্ডিত টুকরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টুকরাগুলোতে ছাঁচের ও চাকার নির্মাণের দু'প্রকার কলা কৌশলেরই প্রয়োগ দেখা যায়। এগুলো ধাতব পাত্রের অনুকরণে সুন্দরভাবে পদ্মের পাপড়ির আকারে তৈরি করা হয়েছে। যদিও এ দু'টি পাত্রখণ্ড তক্ষশীলার ঢেউখেলানো N.B.P পাত্রগুলোর অনুরূপ, কিন্তু এদের আকার ও কারুকার্য -কৌশল তক্ষশীলার চেয়েও অনেক উন্নতমানের।

ময়নামতি : কুমিল্লা জেলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে ময়নামতি পাহাড়ে প্রাক-মধ্যযুগে বৌদ্ধ ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ময়নামতির প্রায় সব পাহাড়ই প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির, বিহার, স্তূপ ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ। ময়নামতি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ঘন জঙ্গল বেষ্টিত অবস্থায় চতুষ্কোণ একটি ইট দ্বারা নির্মিত দুর্গ আছে।

ধারণা করা হয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদেব বংশীয় রাজাদের শাসন আমলে এটি নির্মিত। এর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে এখানে সেখানে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা অসংখ্য পোড়ামাটির চিত্র ফলক পাওয়া গেছে।

এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যস্থলে শালবন বিহারের বিরাট স্থাপত্য আবিষ্কৃত হয়। এর তিন মাইল উত্তরে কৌটিলামুড়ায় অবস্থিত তিনটি স্তুপে বহুবিচিত্র শিল্পসম্ভার আবিষ্কৃত হয় যা খ্রিস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতকে এই জনপদের মানুষের উন্নত শিল্পভাবনার সবচেয়ে মূল্যবান সাক্ষী হয়ে আছে।

যে সমস্ত পোড়ামাটির ফলক ও ভাস্কর্য ময়নামতিতে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে অনন্যসাধারণ রূপের চিত্রায়ন দেকা যায় গন্ধর্ব্য, কিন্নর, সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন এবং অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়সমূহে। এই চিত্রায়ণের গঠনের অন্তর্নিহিত শক্তি-এর আকৃতি অথবা আকারগত কলা নৈপুণ্য, শিল্পের সমস্ত প্রচলিত ভাষার বিপরীত স্রোতে অনুভূতির প্রাবল্যে এর অন্তহীন সৃজন প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্পের উচ্চতম শিখরে আহরণ করিয়েছে ময়নামতিকে। জীবনের এত কাছাকাছি জীবনচর্চার এই সম্পূর্ণতার দৃষ্টান্ত আর কোনও ধর্মসৌধের শিল্পকলায় এমন ব্যাপকভাবে আছে বলে আমার জানা নেই। এর বিচিত্র রূপ, সম্পূর্ণতা এর ভাব বাংলার নিজস্ব। কোন বাইরের প্রভাব নেই কারণ সমস্ত মিশ্রণ অশুদ্ধতা থেকে উঠে আসা এ এক নিজস্ব জগৎ। বাংলার পোড়ামাটির সেই প্রতিভাবান কারিগরদের ঐতিহ্যে ময়নামতি প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলি বেশির ভাগ লাল রংয়ের ও কারুকাজ খচিত। শালবন, বিহার ও বৌদ্ধমঠের ভিতরের কক্ষ থেকে উদ্ধারকৃত পাত্রগুলি আধাপোড়ানো ও নরম। এগুলি সাদা ও বিবর্ণ লাল রংয়ের। ঢাকনাসহ তরকারির পাতিলগুলির নিচের অংশে সামুদ্রিক মৎসখচিত ও আড়াআড়ি রেখার নকশা আঁকা। বিভিন্ন আকারের পানির সরা, গ্লাস, বাসন, বড় আকারের কলসি, কালির দোয়াত ও তেলের প্রদীপ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। লক্ষ্য করা যায় যে, ময়নামতির প্রথম দিকের তৈরি মৃৎপাত্রগুলি আধাপোড়ানো কিন্তু শেষের দিকের নিদর্শনগুলি খুব ভালভাবে পোড়ানো। তবে নকশা প্রথমদিকের তুলনায় অনেক কম আঁকা হয়েছে। (শাহজালাল, ১৯৮৫ : ৪০)

ময়নামতির খননে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকার ও প্রকারের বহু মাটির হাঁড়ি-পাতিল ছাড়াও আবিষ্কৃত নিত্যব্যবহার্য নানা রকম জিনিসপত্রের সংখ্যাও কম নয়। কতগুলো মাটির হাঁড়ি-পাতিলের উপরে খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর অক্ষরের ধরনে কতকগুলো লেখাও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

ময়মামতির মৃৎশিল্পের ধরন ও কাঠামো, মোটকথা ঐতিহ্যে, বর্তমান কুমিল্লা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মৃৎশিল্পের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পাহাড়পুর : রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রাম বগুড়া ও রাজশাহী জেলার সীমান্তবর্তী জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে বাদলগাছি থানায় অবস্থিত। পাহাড়পুর বিহারের আসল নাম সোমপুর বিহার।

দ্বিতীয় পালরাজা ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত এই অসাধারণ কীর্তি অনেক কাল ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ফলে বিহারটি পাহাড়ের মত উঁচু এক বিরাট ঢিবিতে পরিণত হয়। চারপাশের সমতল ভূমির মাঝখানে প্রায় চল্লিশ

একর জমির উপর অবস্থিত এবং প্রায় একশত ফুট উঁচু এই ঢিবিকে স্থানীয় লোকেরা পাহাড়পুর বলে আখ্যায়িত করে।

পর্যায়ক্রমে এগার বৎসর খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত বিশাল সোমপুর বিহারের (পাহাড়পুর) ধ্বংসাবেশের সমস্ত পাক-ভারত উপমহাদেশে আবিষ্কৃত বিহারগুলোর মধ্যে একক বৃহৎ বিহার। এটা উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৯২২ ফুট দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট প্রস্থ। এর চারদিকে ১৭৭টি বাসোপযোগী কক্ষ, বিস্তৃত প্রবেশপথ, অসংখ্য অন্যান্য নির্দশনগুলো কে ছাড়িয়ে রয়েছে স্থাপত্যশৈলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুউচ্চ একটি মন্দির।

পাহাড়পুর মন্দিরের বর্হিদেওয়াল অলঙ্করনের পোড়ামাটির ফলকচত্রিগুলোর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে মন্দির গাত্রে এখনও দুই হাজারেরও বেশি পোড়ামাটির ফল ফলকচিত্র লাগান রয়েছে এবং প্রায় আটশ-র অধিক ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সংগৃহিত হয়েছে। ফলকগুলো খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীতে নির্মিত বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মাটির পাত্রগুলি অধিকাংশই দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কালের তৈরি। এখানকার খননক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সমস্ত মাটির জিনিস খুব ভালভাবে পোড়ানো। নিচের অংশ ছাড়া পাত্রের চারপাশে ও কান্দায় লালা অথবা হালকা সবুজের উপর লাল রংয়ের প্রলেপ দেওয়া। পাত্রের তলদেশ বা ভিত্তি বিস্তৃত ও মাঝখানে স্ফীত। পানি রাখার বড় আকারের পাত্রগুলি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে সরু করে তৈরি। বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির পুতুল, মাটির খেলনা, ফুলদানী, মাটির জালা, দোয়াত, লাটা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুরের এই ঐতিহ্য বর্তমানে রাজশাহীর মৃৎশিল্পীরা বাঁচিয়ে রেখেছে। (নাজিমুদ্দীন, ১৯৬৬ : ৭৪)

উয়ারী বটেশ্বর : বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থান হচ্ছে উয়ারী বটেশ্বর। উয়ারী ও বটেশ্বর পাশাপাশি এই গ্রাম দুটির অবস্থান নরসিংদী জেলার বেলাব থানা সদর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

উয়ারী বটেশ্বর প্রত্নস্থান বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন :

ক) কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র (Black & Red Ware).

খ) উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র (Northern Black Polished Ware).

গ) কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (Black Slipped Ware).

ঘ) রোলেটেড মৃৎপাত্র (Roulletted Ware).

ঙ) গ্লেজড মৃৎপাত্র (Glazed Ware).

Dhaka University Institutional Repository

চ) নবযুক্ত মৃৎপাত্র (Knobbed Ware)

ছ) স্ট্যাম্পড মৃৎপাত্র (Stammed Ware).

জ) ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্র (Perforated Ware).

ঝ) ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র (Dull Red Ware).

ঞ) লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (Red Slipped Ware).

ট) চিত্রিত মৃৎপাত্র (Painted Ware).

ঠ) ধূসর মৃৎপাত্র (Gray Ware).

নিচে উয়ারী বটেশ্বর থেকে পাওয়া মৃৎপাত্রের ধরন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

ক) কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র (Black & Red Ware) : কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলোর ভিতরের এবং বাইরে ওপরের অংশ কালো এবং বাইরের বাকি অংশ লাল।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশেষ ধরনের চুল্লিতে পোড়ানোর ফলে মৃৎপাত্রের রং এরকম হয়েছে। অনেকে অবশ্য দুবার পোড়ানোর কথাও বলেন। ধারণা করা হয় এগুলো চাকার মাধ্যমে তৈরি। তবে ভারতের পান্ডু রাজার ঢিবিতে কিছুসংখ্যক হাতে তৈরি নমুনা পাওয়া গেছে। এই শ্রেণির মৃৎপাত্রের বুনন মাঝারি মানের, তবে আদি ও শেষ পর্যায়ে কিছুসংখ্যক নিম্নমানের কৃষ্ণ-এবং রক্তিম মৃৎপাত্র পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়ে থাকে, পাত্র তৈরির সময় মাটি ভালোভাবে মথিত করা হতো এবং সূক্ষ্ম বালি মিশিয়ে দেয়া হতো। অধিকাংশ মৃৎপাত্রের উভয় প্রলেপ দেওয়া। ঘষামাজার ফলে কিছুসংখ্যক মৃৎপাত্রের খণ্ডাংশ মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়েছে। পোড়ানোর তারতম্যের ফলে কোন কোন মৃৎপাত্রের অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্ণভাবে কালো এবং বর্হিদেশ লাল রংয়ের পাওয়া যায়, আবার কিছুসংখ্যক মৃৎপাত্রের উভয়দিক আংশিক কালো এবং আংশিক লাল রঙের হয়।

বিভিন্ন আকারের কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাঝারি আকারের ভাজন (Vase) এদের মধ্যে টিউলিপ ফুলের মতো ফুলদানিগুলো স্বতন্ত্র ধরনের। অন্যান্য আকার হলো : বাটি, বিশেষ ধরনের নলযুক্ত বাটি, গামলা, সরু গলাযুক্ত পাত্র, থামের উপর বসানো থালা ও ফুলদানির স্ট্যান্ড। সম্প্রতি উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্তাকার প্রান্তসহ গল্প ও কিছু ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে।

খ) উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র (Northern Black Polished Ware) : উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের বুনন সাধারণত সূক্ষ্ম ও পাতলা। এটি তৈরির সময় মাটিকে ভালোভাবে মথিত করা হতো, পান (tempering) উপাদান কম থাকলেও এটি আকর্ষণীয় উজ্জ্বল হত। পাত্রের গাত্র কালো থেকে ধূসর

Dhaka University Institutional Repository

রংয়ের হয়, তবে লালচে রং ও অনুপস্থিত নয়। যদিও ৯০ শতাংশ উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের রং জমকালো এবং বাদামি-কালো, ১০ শতাংশের রং নীল, গোলাপি, সোনালি, রুপালি, বাদামি, চকলেট, বেগুনি ও গাঢ় লাল। প্রায় সবই এক বর্ণিল মৃৎপাত্র, তবে দ্বিবর্ণিল ও পরিলক্ষিত হয়। দুটি রঙের সমাহার ছাড়া দ্বিবর্ণিল মৃৎপাত্রগুলো সঙ্গে একবর্ণিল মৃৎপাত্রের কোন পার্থক্য নেই। যেমন গাঢ় নীল ও গাঢ় লাল, ধূসর ও হালকা লাল, কালো ও গাঢ় বাদামি, কালো ও বাদামি-কালো, ফ্যাকাশে লাল এবং কালো ও ধূসর।

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রগুলো সাধারণত নকশাহীন, তবে কখনো কখনো রঙিন নকশা পরিলক্ষিত হয়। খুবই পরিচিত নকশাগুলো হলো : সরু ও পুরু অনুভূমিক বলয়/বন্ধনী, উল্লম্ব আঁচড়, আনুভূমিক বলয় থেকে বেরিয়ে আসা উল্লম্ব আঁচড়, আড়াআড়ি বলয়, গোলাকৃতি বন্ধনী বা খিলানাকৃতির নকশা। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রে রঙের নকশা ছাড়াও খোদাই করা নকশা এবং গ্রাফিটি দাগও দেখা যায়।

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের আকারগুলো চমকপ্রদ। এগুলোর মধ্যে বিশেষ ধরনের থালা, বাটি ও ঢাকনা উল্লেখযোগ্য। তবে দীর্ঘ গলাযুক্ত পাত্র, পিরিচ, ক্ষুদ্রাকৃতির ভজন, নলযুক্ত পাত্র, সুরাপাত্রের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারী ও বড় বড় পাত্র, যেমন সঞ্চয় আধার প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র পরিবারে অনুপস্থিত। তাই উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রকে বলা হয় ‘ টেবিল ওয়্যার’।

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রগুলো সম্ভবত অভিজাত শ্রেণির জন্য তৈরি এগুলো খুবই মূল্যবান এবং অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। তাই এই মৃৎপাত্রকে অনেক সময় বলা হয় ‘এলিট ওয়্যার’। উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র ভেঙে গেলে তা তামার পাত দিয়ে জোড়া লাগানো হতো এমন নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে মনে করা হয় যে উত্তরাঞ্চলীয় কালো সমৃণ মৃৎপাত্র ভেঙে গেলে তা ফেলে না দিয়ে বরং মেরামত করে পুনরায় ব্যবহার করা হতো। এ কারণে পণ্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র নতুন করে তৈরি করতে যে খরচ পড়ত, তা হয়তো তামার পাত দিয়ে জোড়া লাগানো থেকে বেশি ছিল।

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের প্রাপ্তি স্থানের বিস্কৃতি ভারতবর্ষের অন্য যেকোনো মৃৎপাত্রের প্রাপ্তিস্থানের, এমনকি হরপ্পা মৃৎপাত্র প্রাপ্তিস্থানের থেকেও বিশাল, মৃৎপাত্র তৈরির কৌশল বিবেচনায় উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র কেবল উপমহাদেশে নয়, বরং সমগ্র এশিয়ায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মৃৎপাত্রসমূহের একটি হলো উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র।

কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (Black Slipped Ware)

কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে চকচকে বৈশিষ্ট্য ছাড়া। কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রে একটি প্রলেপ সমভাব দেওয়া হতো। এতে কিছুটা চকচকে ভাব তৈরি হলেও উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের আলোকোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। সর্বভারতীয় কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র

পাওয়া ছাড়াও পাওয়া গেছে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র, কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র এবং উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র।

উয়ারী বটেশ্বর ছাড়াও বানগড়, চন্দ্রকেতু গড়, মহিষাদল ও অন্যান্য প্রত্নস্থানে প্রচুর কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল বাটি। এছাড়া আরও পাওয়া যায় থালা, দীর্ঘ গলাযুক্ত পাত্র, ছোট ও বড় ডজন, নলযুক্ত পাত্র, থামের ওপর থালা, থামের ওপর বাটি ও কালো প্রলেপযুক্ত পাত্র। সাধারণত কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র সূক্ষ্ম থেকে মাঝারি মানের হয়ে থাকে, যা দ্রুতগতিসম্পন্ন চাকায় তৈরি। এই মৃৎপাত্রের রং ধূসর। এ জাতীয় মৃৎপাত্রের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বার্নিশ করা নমুনা পাওয়া যায়।

উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র এবং কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের প্রচুর নলযুক্ত পাত্রের খণ্ডাংশ পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় যে তরল খাদ্যে তখন বেশি গ্রহণ করা হতো।

রোলেটেড মৃৎপাত্র (Rouletted Ware)

রোলেটেড মৃৎপাত্র ভারত, শ্রীলংকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহুসংখ্যক প্রত্নস্থানে পাওয়া আদি ঐতিহাসিক যুগের আরেকটি ধ্রুপদী মৃৎপাত্র।

রোলেটেড মৃৎপাত্রের আবিষ্কার উয়ারী-বটেশ্বর, মহাস্থান, তমলুক ও চন্দ্রকেতু গড়কে এককভাবে এবং বিশেষভাবে বাংলার সঙ্গে আদি-ঐতিহাসিক যুগে দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রমবিকাশমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। রোলেটেড মৃৎপাত্র একটি থালা, যার কান্দা ভারী ও বঙ্কিম, তলায় কোন পা নেই। নিম্নাংশ ও কান্দা সংযুক্ত, মধ্যে কোন জোড়া নেই। রোলেটেড মৃৎপাত্রের তলদেশ মসৃণ ও উজ্জ্বল এটি একাধিক রঙের হয়। অভ্যন্তর ভাগের তলদেশে সমকেন্দ্রে বৃত্তকার নকশায় খাঁজকাটা থাকে। এই রীতির বৈশিষ্ট্য হলো এক থেকে একাধিক সমকেন্দ্রিক বৃত্ত, যেখানে প্রতিটি বলয়ে ৩ থেকে ১০ সারি খাঁজকাটা নকশা থাকে। এগুলো বিন্দু, আঁচড়, কীলক, ত্রিভুজ প্রভৃতি আকৃতির হয়।

রোলেটেড মৃৎপাত্রগুলো সাধারণত উন্নতমানের, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নমানের রোলেটেড মৃৎপাত্র দেখা যায়। মৃৎপাত্রের সম-আকৃতি প্রমাণ করে যে এগুলো চাকে তৈরি। রোলেটেড নামটি এসেছে তার বিশেষ ধরনের নকশার কারণে। চাকার মধ্যে যখন মৃৎপাত্রটি থাকে তখন রোলেটেডের সাহায্যে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ খাঁজ কেটে নকশা করা হয়।

গ্লেজড মৃৎপাত্র (Glazed Ware)

উয়ারী বটেশ্বর খননক্ষেত্র থেকে গ্লেজড মৃৎপাত্রের খণ্ডাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাস্থানগড়ে পাওয়া প্রায় অনুরূপ একটি নীল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের খণ্ডাংশকে আদি ঐতিহাসিক যুগের বলে অনুমান করা হয়, যা হয়তো সেই সময়ে পারস্য উপসাগর এলাকা থেকে এসেছে। পরবর্তী সময়ে পশ্চিম এশিয়া ও চীন থেকে বাংলায় অনেক প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র এসেছিল। এগুলো ইসলামী গ্লেজড ওয়ার বলে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

নবযুক্ত মৃৎপাত্র (Knobbed Ware)

নবযুক্ত মৃৎপাত্র বাংলাদেশ, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদি-ঐতিহাসিক সময়ের প্রত্নস্থানে পাওয়া যায়। এ ধরনের পাত্রের বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যেবর্তী একটি নবের চারদিকে বৃত্তাকারে সাধরণত ৭-১০টি খাঁজকাটা দাগ থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের একমাত্র উয়ারী বটেশ্বর অঞ্চলে নবযুক্ত মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই নবযুক্ত মৃৎপাত্রের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার কী ছিল, তা জানা যায়নি, তবে অনুমান করা হয় যে, দৈনন্দিন রান্না, খাবার সরবরাহ বা শোপিস হিসেবে নবযুক্ত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হয়নি। ধারণা করা হয় যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নবযুক্ত পাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। নবযুক্ত পাত্র বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত।

স্ট্যাম্পড মৃৎপাত্র (Stammped Ware)

সাম্প্রতিক কালে উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে আকর্ষণীয় নকশাযুক্ত স্ট্যাম্পড মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়ায যায়। উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে পাওয়া একটি স্ট্যাম্পড অলঙ্ককরণ, যা পাত্রের তলদেশের সমতল অংশের অভ্যন্তরে প্রথমে একটি বৃত্ত এবং ওই বৃত্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত সমদূরত্বে অবস্থিত ছয়টি ভরাট বৃত্ত এবং কেন্দ্রে আরও একটি ভরাট বৃত্ত দ্বারা শোভিত। ওই অলঙ্করণের নান্দনিক বা ধর্মীয় কোন তাৎপর্য থাকতে পারে।

আদি-ঐতিহাসিক যুগে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি অথবা ফুল-লতাপাতা ইত্যাদি নকশাসমৃদ্ধ স্ট্যাম্পড মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়, বানগড় ও মহাস্থানগড়ে স্ট্যাম্পড মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

ছিদ্রযুক্ত পাত্র (Perforated Ware)

ছিদ্রযুক্ত পাত্রের তলদেশ উত্তল আকৃতির গ্রীবা ছোট এবং প্রান্তদেশ ওপরের দিকে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত। এর গলার কাছে এক ধরনের Carination থাকে। এই পাত্রের কান্দা ছাড়া বাকি অংশ ছিদ্রযুক্ত। এই ছিদ্রযুক্ত পাত্র ছাঁকনি হিসেবে অথবা শুকনো খাবার থেকে বালুকণা নিঃসৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পায় ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। উয়ারী বটেশ্বর ও মহাস্থানগড় উৎখননে ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র (Dull Red Ware)

উয়ারী-বটেশ্বর উৎখননে পাওয়া মৃৎপাত্রের নমুনাসমূহের মধ্যে বেশ কিছু মৃৎপাত্রের নমুনাকে ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে বাটি, গামলা, থালা, হাঁড়ি, পুষ্পাধার, কলম, বয়াম। সাধারণত ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্রসমূহের মধ্যে প্রচুর হাঁড়ি পাওয়া যায়।

ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্রকে আবার তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ

১. অমসৃণ ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র,

২. অনুজ্জ্বল ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র,

৩. মোটা অমসৃণ ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র।

অধিকাংশ পাত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হস্তনির্মিত দেহের সঙ্গে ঘূর্ণায়মান চক্রে নির্মিত দৃঢ় বৃত্তাকার প্রান্ত সংযুক্ত। এই শ্রেণির পাত্রের দেহ পুরু ও অমসৃণ এবং সাধারণত দেহের ওপরের অংশে অতি পাতলা প্রলেপযুক্ত গাত্রদেহ প্রায়শই অমসৃণ হওয়ায় তা অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। ফ্যাকাশে লাল মৃৎপাত্র সব যুগে প্রচলিত ছিল। এসব ফ্যাকাসে লাল মৃৎপাত্র দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হতো বলে ধারণা করা হয়।

লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (Red Slipped Ware)

উয়ারী বটেশ্বর প্রত্নখনন ক্ষেত্র থেকে পাওয়া মৃৎপাত্রের নমুনাসমূহের মধ্য থেকে বেশ কিছু নমুনাকে লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র হিসেবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই শ্রেণির পাত্রগুলো হস্তনির্মিত এবং চাকায় তৈরি। এই ধরনের পাত্রে উজ্জ্বল প্রলেপ দেওয়া হতো এবং মসৃণ উজ্জ্বলতার জন্য বাইরের দিকে Burnished করা হতো। এই পাত্রের বহিরাভাগ সাধারণত লাল। লাচে হলুদ, হালকা লাল বা হালকা বাদামি রঙের প্রলেপযুক্ত।

উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে পাওয়া লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র শ্রেণিতে বিভিন্ন আকৃতির পাত্র যেমন বাটি, গামলা, থালা, বয়াম/দীর্ঘ গলাযুক্ত পাত্র, হাঁড়ি, কলম, বীয়কযুক্ত পাত্র উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যায়।

প্রসঙ্গেত উল্লেখ, লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রসমূহের মধ্যে হাঁড়ি/বাটি দৈনন্দিন কাজে, বিশেষত হাঁড়িগুলো রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। এবং এগুলো কমবেশি সব যুগে প্রচলিত ছিল।

চিত্রিত মৃৎপাত্র (Painted Ware)

উয়ারী বটেশ্বর একটি তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রিত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ, যেমনঃ হরপ্পা, মাহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতি স্থানে নানা আকারের সুচিত্রিত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে চিত্রিত মাটির পাত্র সর্বপ্রথম এ অঞ্চলেই তৈরি করা হতো। মৃৎপাত্র তৈরি করে আগুনে পোড়ানোর পর পাত্রের বাইরের দিক চিত্রিত করণ হতো। পাণ্ডু রাজার ঢিবির কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্রে প্রাচীন বাংলার অন্যতম চিত্রশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল মৃৎপাত্রের মাধ্যমে। চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তু ছিল মাছ, পাখি, চেভরন নকশা, রেখাচিত্র প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

ধূসর মৃৎপাত্র (Gray Ware) : উয়ারী বটেশ্বর উৎখননে বেশ কিছু ধূসর মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। পাত্রগুলোর ধূসর রং পোড়ানোর কারণে অথবা কাদায় Carleonaccous বস্তুর উপস্থিতির কারণে হতে পারে। এই পাত্রগুলি দুর্বল প্রকৃতির এবং এর বুনন মোটা থেকে মাঝারি মানের। এগুলো হাতে অথবা চাকায় তৈরি করা হতো। এই শ্রেণির মৃৎপাত্রের সাধারণ আকার হচ্ছে হাঁড়ি, বাটি ও থালা, যদিও এগুলো হতো গামলা আকৃতির। বয়াম আকৃতির। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধূসর মৃৎপাত্র সব যুগে প্রচলিত ছিল।

মৃৎশিল্পের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যে কেবল আমাদের সংস্কৃতির রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে তা নয়, এটা আমাদের সমগ্র জাতির ইতিহাস। এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ভিতরে লুকিয়ে আছে প্রাচীন মানুষের চিন্তাধারা, জীবন-যাত্রার পদ্ধতি, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সংস্কার। (মোস্তাফিজুর, ২০১২: ১১৭)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে মৃৎশিল্প। এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় মৃৎশিল্প-সামগ্রী তৈরি হয়ে থাকে। মৃৎশিল্পের প্রাচুর্য বিভিন্ন কারণে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরির উপযোগী মাটির সহজলভ্যতা এবং দ্বিতীয়ত কৃষিপ্রধান দেশ হওয়াতে মৃৎপাত্র ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহার্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।

আপামর জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী অতি সাধারণ সামগ্রী অতীতে গ্রামেই উৎপন্ন হতো এবং বর্তমানেও হচ্ছে। হাঁড়ি-পাতিল, ফুলদানী, ছোট ছোট পুতুল, খেলনা ইত্যাদি উৎপাদনে এই শিল্প সীমাবদ্ধ থাকতো। শিল্পমান বিচারে এসব সামগ্রীর শিল্পমূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। কালের আবর্তমান ধারায় এবং পাশ্চত্যের চাকচিক্যের জোয়ারে দেশীয় মৃৎশিল্পে ও আধুনিকতার ছোঁয়া চোখে পড়ে। আনুষ্ঠানিক ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মে আপন মননশীলতা দিয়ে মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে। আজকাল শহরের উপহার হিসেবে, হস্তশিল্প বিপণীর এক বিশাল অংশে তথা শহরবাসীর গৃহসজ্জা সামগ্রী হিসেবে আধুনিক মৃৎশিল্প তার জায়গা করে নিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এই মৃৎশিল্পের শিল্পীরা। এরমধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছু কিছু স্থান মৃৎশিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। যেমন–

- ঢাকা মহানগরীর রায়ের বাজারের মৃৎশিল্প।
- ঢাকার অদূরে সাভারের শিমুলিয়া, চৌহাটি, নায়ারহাট মৃৎশিল্প।
- ধামরাইয়ের কাগজীপাড়া, কাকরান, হাজীপুর মৃৎশিল্প।
- কুমিল্লার বিজয়পুরের মৃৎশিল্প।
- পটুয়াখালীর বাউফলের মৃৎশিল্প।
- শরীয়তপুরের মৃৎশিল্প।
- রাজশাহীর বসন্তপুরের মৃৎশিল্প।
- মানিকগঞ্জের পালরার পাল সম্প্রদায়।
- গাজীপুরের সিন্দুরী।

ঢাকার রায়েরবাজারের মৃৎশিল্পের ইতিহাস প্রায় দুইশত বৎসরের পুরনো। আনুমানিক ৭৫০টি মৃৎশিল্প কারিগর পরিবারের বাস ছিল এখানে। যদিও কালের আর্বতে মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত রায়ের বাজারের সেই জৌলুস আর নেই। অতীতের স্মৃতি হিসেবে দু'একটি কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে এখনও ঐতিহ্যবাহী রীতিতে তরকারি, দই ও মিষ্টির পাতিল তৈরি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে রায়ের বাজারে সবচেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে মাটির তন্দুর চুলা। এছাড়াও বিবিন্ন ধরনের মাটির খেলনা, পুতুল, ফুলের টব, ওয়াল প্লেট, সৌখিন মৃৎপাত্র, রঙিন ফুলদানী ইত্যাদি। রায়ের বাজারের মৃৎশিল্পীদের সুখ্যাতি স্মরণ করিয়ে দেয় যে সকল মৃৎশিল্পীগণ ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক ধারার সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে রায়ের বাজারের মৃৎশিল্পী মরণচাঁদ পাল অন্যতম। এছাড়াও আছেন লালচান পাল, চিত্তরঞ্জন পাল, গোবিন্দ্র চন্দ্র পাল, নেপাল চন্দ্র পাল, সুভাষ চন্দ্র পাল, বিপদ হরিপাল, সুবল পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মরণচাঁদ পালের মা শিশুর পুতুল, হাতি, ঘোড়া সাইকেল ও সাইকেল-চালক, হাতি, মোমদানি, বগুড়ার ঘোড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। মৃৎশিল্পের পথিকৃৎ এই শিল্পী ৬ মার্চ, ২০১৩ সালে পরলোক গমন করেন।

সাভারের শিমুলিয়া, নৈহাট, নায়ারহাটও মৃৎশিল্পের জন্য বিশেষ পরিচিতি লাব করেছে। শিমুলিয়ার মৃৎশিল্পীরা পাল বংশের আলীম্মান গোত্র উদ্ভূত। এখানকার শিল্পীরা সবাই সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। শিমুলিয়ায় মূলত মৃৎশিল্পের প্রতিমা শিল্পীদেরই বসবাস।

প্রতিমা শিল্পীরা মূলত বছরে দুই বার স্বরস্বতী ও দুর্গা পূজার সময় প্রতিমা নির্মাণের কাজ করে থাকেন। এই সময় তারা দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রতিমা তৈরির জন্য বায়না পেয়ে থাকেন। প্রতিমার আকার অনুযায়ী বায়নার টাকা নির্ধারণ হয়ে থাকে। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রতিমাও তৈরি করে থাকেন। প্রতিমা শিল্পের কাজ ছাড়াও স্বল্প পরিসরে মৃৎ তৈজসপত্র তৈরির কাজও করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আকারের সরা, দইয়ের পাত্র বা টোপা বিভিন্ন আকারের টব, ফুলদানী উল্লেখযোগ্য। যদিও পূর্বে হাঁড়ি, পাতিল, হাঁতা, কাঁদা, কলস, ঝাঁঝড়, জল ঢাকনা আরও অনেক জিনিসই তৈরি হত, সময়ের বিবর্তনে যা অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। সাধারণত হুইল বা চাক এবং ছাঁচের সাহায্যে মৃৎসামগ্রী তৈরি হয় থাকে। তবে আধুনিক প্যাডেল হুইলের ব্যবহারও অনেক শিল্পী পরিবারে পরিলক্ষিত হয়।

ধামরাইয়ের কাগুজিপাড়া কুমার পল্লীটি ধামরাই বাজার থেকে উত্তর পূর্ব দিকে এবং কিলোমিটর দূরে বংশাই নদীর তীরে অবস্থিত। হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত এই পাল পাড়ায় প্রায় ৯৫ ভাগ পাল পরিবারই যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প ধারাকে লালন করে আসছে। ৬০/৭০টি পরিবার আছে যারা ২০০ বছর ধরে বংশানুক্রমে এই শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন। বংশপরম্পরার এই মৃৎশিল্পীরা অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত নারী ও পুরুষ।

কাগুজিপাড়া 'টব' তৈরির জন্য বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। এখানকার কুমার সম্প্রদায় বর্তমানে সবচেয়ে বেশি তৈরি করছেন 'টব'। টব দুই ধরনের হয়ে থাকে 'বাংলা টব' ও 'ইংরেজি টব'। কখনও কখনও বাংলা টবকে 'কলসি টব' এবং ইংরেজি 'টব'কে শুধু 'টব' নামেও আখ্যায়িত করে থাকেন। টবের ব্যবহার এক হলেও এদের আকার ও ডিজাইনে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। টব ছাড়াও ছোট বড় নানা রকম দইয়ের পাত্র বা হাঁড়ি বা টোপা, ফুলদানী, এ্যাসট্রে, হাঁড়ি, কলস, পাতিল, চাড়ি বা মটকা ইত্যাদি তৈরি হতো।

কাগুজিপাড়ার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পী হলেন মৃৎশিল্পী বসন্ত পাল, মৃৎশিল্পী সুমন্ত পাল, মৃৎশিল্পী গোবিন্দ চন্দ্র পাল, মৃৎশিল্পী রবিপাল, মৃৎশিল্পী রতন পাল, মৃৎশিল্পী শ্রী গণেশ তন্দ্র পাল, মৃৎশিল্পী সুভাষ পাল প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

ধামরাইয়ের হাজীপুরও মৃৎশিল্পের জন্য সুপরিচিত। পূর্বে ১৫০-২০০ পরিবার এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের সাথে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে এর সংখ্যা ৫০-৬০টি। এখানকার পালরা সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী।

হাজীপুরের পালপাড়ায় মূলত দইয়ের হাঁড়ি, বাটি বা দইয়ের টেপি তৈরি হয়ে থাকে। এছাড়া দইয়ের পাত্রের পাশাপাশি পাখির বাসা, পাখির খাবারের থালা, ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ব্যাংক, ছোট কলসী, মাছের পাতিল ইত্যাদিও তৈরি করে থাকেন এখানকার কুম্ভকাররা।

ধামরাইয়ের আর একটি প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্প পল্লী ‘কাকরান’, কাকরানে মূলত দইয়ের পাত্রই তৈরি হয়ে থাকে। ঢাকার বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ফরমাইশ অনুযায়ী দইয়ের পাত্র তৈরির পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। কাকরানের মৃৎশিল্পী তরুণী পাল অবশ্য বড় ফুলদানী ও বিভিন্ন আকৃতির টব তৈরির কাজ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. শামসুজ্জামান খান, ‘ঐতিহ্য ও আধুনিকতার নিরিখে লোকশিল্প অবলোকন; শিল্প ও শিল্পী, ঢাকা আবুল খায়ের, দ্বিতীয় বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ৭-৮

২. ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমেদ, মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর পৃ. ২৯

৩. প্রাগুক্ত (৩০–৩২)

৪. মোহাম্মদ শাহজালাল, বাংলাদেশের মৃৎশিল্প, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ: ৪০

৫. ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমেদ, মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ১৯৬৬, পৃ: ৬৭

৬. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে, প্রথমা প্রকাশক ২০১২, পৃ: ১০৮–১১৩।

৭. প্রগুক্ত – পৃ: ১১৫।

৮. প্রগুক্ত – পৃ: ১১৬।

৯. প্রগুক্ত – পৃ: ১১৬, ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন মৃৎশিল্পের চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –২
প্রস্তর যুগের মৃৎশিল্প

চিত্র –৩
প্রস্তর যুগের মৃৎশিল্প

চিত্র –৪
প্রস্তর যুগের মৃৎপাত্র

চিত্র –৫
প্রস্তর যুগের মৃৎপাত্র

চিত্র –৬
প্রাথমিক মাইনোয়ান মৃৎপাত্র

চিত্র –৭
প্রাথমিক মাইনোয়ান মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৮
মধ্য মাইনোয়ান মৃৎপাত্র

চিত্র –৯
মধ্য মাইনোয়ান মৃৎপাত্র

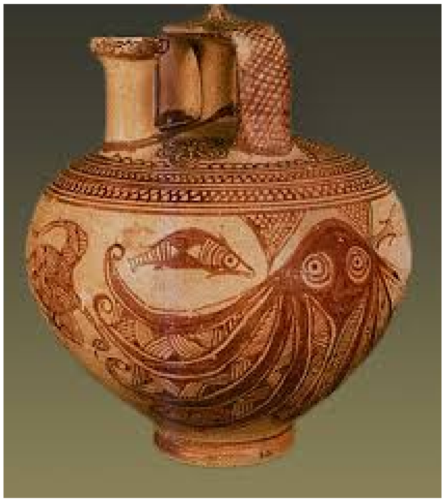

চিত্র –১০
উচ্চ মাইনোয়ান

চিত্র –১১
উচ্চ মাইনোয়ান

চিত্র –১২
নিওলিথিক মৃৎপাত্র

চিত্র –১৩
নিওলিথিক মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –১৪
মেসোপটেমিয়ান মৃৎপাত্র

চিত্র –১৫
মেসোপটেমিয়ান মৃৎপাত্র

চিত্র –১৬
ব্যাবিলনের মৃৎপাত্র

চিত্র –১৭
ব্যাবিলনের মৃৎপাত্র

চিত্র –১৮
গ্রিক এ্যাম্ফোরা-র মৃৎপাত্র

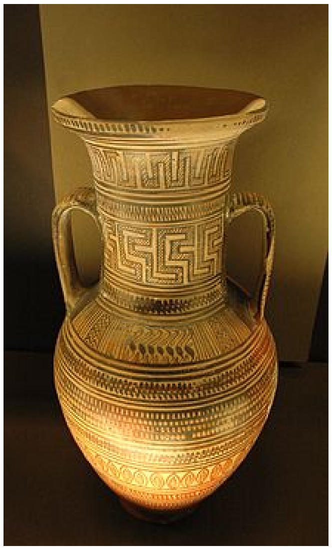

চিত্র –১৯
গ্রিক এ্যাম্ফোরা-র মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –২০
গ্রিক ক্রেটার মৃৎপাত্র

চিত্র –২১
গ্রিক ক্রেটার মৃৎপাত্র

চিত্র –২২
প্রাচীন মিশরের মৃৎপাত্র

চিত্র –২৩
প্রাচীন মিশরের মৃৎপাত্র

চিত্র –২৪
হরপ্পা-র মৃৎপাত্র

চিত্র –২৫
প্রাচীন মিশরের মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –২৬
হরপ্পা-র মৃৎপাত্র

চিত্র –২৭
হরপ্পায় প্রাপ্ত মাটির খেলনা

চিত্র –২৮
হরপ্পার প্রাপ্ত মাটির খেলনা

চিত্র –২৯
হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল

চিত্র –৩০
হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল

চিত্র –৩১
হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৩২
হরপ্পায় প্রাপ্ত সীল

চিত্র –৩৩
মহোঞ্জেদারো-র মৃৎপত্র

চিত্র –৩৪
মহোঞ্জেদারো-র মৃৎপত্র

চিত্র –৩৫
মহোঞ্জেদারোর খেলনা

চিত্র –৩৬
মহোঞ্জেদারো-র খেলনা

চিত্র –৩৭
প্রাচীন চীনের মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৩৮
প্রাচীন চীনের মৃৎপাত্র

চিত্র –৩৯
প্রাচীন ইরান এর মৃৎপাত্র

চিত্র –৪০
প্রাচীন ইরান এর মৃৎপাত্র

চিত্র –৪১
প্রাচীন কোরিয়ান মৃৎপাত্র

চিত্র –৪২
প্রাচীন কোরিয়ান মৃৎপাত্র

চিত্র –৪৩
শাং মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৪৪
শাং মৃৎপাত্র

চিত্র –৪৫
মিং মৃৎপাত্র

চিত্র –৪৬
মিং মৃৎশিল্প

চিত্র –৪৭
ট্যাঙ্গ মৃৎপাত্র

চিত্র –৪৮
ট্যাঙ্গ মৃৎপাত্র

চিত্র –৪৯
গানশু মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

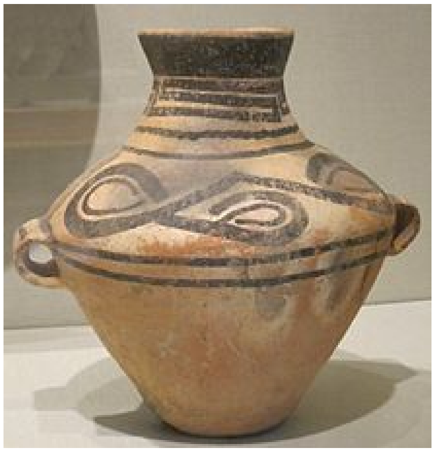

চিত্র –৫০
গানশু-র মৃৎপাত্র

চিত্র –৫১
কোয়েটা মৃৎপাত্র

চিত্র –৫২
কোয়েটা মৃৎপাত্র

চিত্র –৫৩
মহাস্থানগড়

চিত্র –৫৪
মহাস্থানগড় মৃৎফলক

চিত্র –৫৫
ময়নামতি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৫৬
ময়নামতির মৃৎফলক

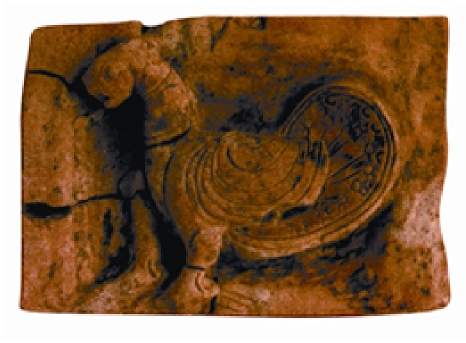

চিত্র –৫৭
ময়নামতির মৃৎফলক

চিত্র –৫৮
ময়নামতির মৃৎফলক

চিত্র –৫৯
পাহাড়পুর

চিত্র –৬০
পাহাড়পুর

চিত্র –৬১
পাহাড়পুর মৃৎফলক

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৬২
পাহাড়পুরের মৃৎফলক

চিত্র –৬৩
পাহাড়পুরের মৃৎফলক

চিত্র –৬৪
কান্তজীর মন্দির

চিত্র –৬৫
কান্তজীর মন্দির মৃৎফলক

চিত্র –৬৬
কান্তজীর মন্দির মৃৎফলক

চিত্র –৬৭
কান্তজীর মন্দির মৃৎফলক

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৬৮
উয়ারী বটেশ্বর

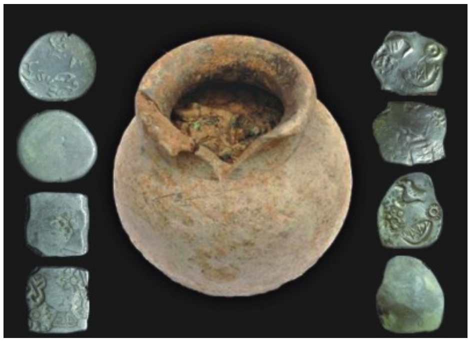

চিত্র –৬৯
উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

চিত্র –৭০
উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

চিত্র –৭১
উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র –৭২
উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

চিত্র –৭৩
উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

চিত্র –৭৪
উয়ারী বটেশ্বরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মৃৎশিল্প

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্প

"মৃৎশিল্প" (Ceramic) শব্দটি বিশ্লেষণ করে আমরা "মৃৎ" এবং "শিল্প" শব্দ দুটি পাই। "মৃৎ" শব্দের অর্থ মৃত্তিকা বা মাটি আর শিল্প বলতে বুঝি সুন্দর ও নান্দনিক বস্তু। তাই, মৃৎশিল্প বলতে এককথায় মাটি দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মকেই বুঝে থাকি।

ব্যাপক অর্থে মৃৎশিল্প (Pottery) বলতে কাদামাটি দিয়ে তৈরি এবং পরবর্তীতে আগুনে পোড়ানো যাবতীয় উপকরণকে বুঝায়। মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ হলো কাদামাটি–যার দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত এটা আঠালো, যার জন্য একে বিভিন্ন আকার দেয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, আগুনে পোড়ালে শক্ত হয়ে যায়।

বহির্বিশ্বে কাদামাটি দিয়ে তৈরি এবং আগুনে পোড়ানো যাবতীয় উপকরণকে সাধারণভাবে সিরামিক (Ceramic) নামে আখ্যায়িত করা হয়। সিরামিক শব্দটি প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'Kerams' থেকে নেয়া হয়েছে। শব্দটির অর্থ হচ্ছে, মৃৎশিল্পের মাটি বা Potter's earth। (শাহজালাল, ১৯৮৫ : ১১)

মাটি মানুষের শৈল্পিক প্রকাশের প্রাথমিক একটি উপাদান। নরম থাকতে মাটি যে কোন গড়ন ধারন করতে পারে। হাতের সামান্যতম স্পর্শ মাটিতে প্রস্ফুটিত হয়। আবার পোড়ালে পরে মাটি প্রায় অবিনশ্বর। ধাতু বা অন্যান্য বস্তুর মত এটা মাটিতে মিশে যায় না। (লালারুখ, ২০০৭ : ৪৮৮)

প্রফেসর এস. কে. সরস্বতী বলেছেন "মাটি বা কাদামাটিকে কেবল তার সহজপ্রাপ্যতার জন্যেই নয়, বরং তার সহজ নিয়ন্ত্রণযোগ্যতার জন্য সুপ্রাচীন রূপগ্রাহী উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ মাধ্যমটি নান্দনিক অভিব্যক্তির ন্যায় প্রাত্যহিক ঘরোয়া চাহিদাগুলি পূরণের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের সৃজনশীল তাড়নাকে সন্তুষ্ট করে।"

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্প নির্মাণে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্প নির্মাণে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

মাটির শিল্প দিয়ে আমরা অতীতের সাথে বর্তমানের বাস্তব জীবন প্রবাহের শিল্পের সম্পর্ক খুঁজে পাই। মাটির এমন কিছু সামগ্রী রয়েছে যা প্রায় অপরিবর্তিত রূপেই বাংলার সংস্কৃতিতে অবস্থান করছে। তার মধ্যে মূর্তি, পুতুল ও মৃৎপাত্রই বাংলার আদিতম আবিষ্কৃত শিল্প উপাদান।

মৃৎপাত্র তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই নব্যপ্রস্তর পর্যায়ের সময়ও। মাটি দিয়ে শিল্প তৈরির কৃৎকৌশল তাই প্রায় দশ হাজার বছরের পুরনো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই কৌশলের রকমফের বা তারতম্যে দেখা গেলেও বিষয় হিসাবে এটি মানুষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক পর্যায়ের। খ্রিস্টপূর্ব ও খ্রিস্টাব্দকালে অনিন্দ্যসুন্দর মৃৎপাত্রের তৈরির কৌশল ও তার কারিগর মানুষদের প্রতি আমরা আগ্রহ অনুভব করি। (দীপঙ্কর, ২০০২ : ৩৩)

বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুম্ভকার বা কুমার সম্প্রদায়রা তাদের অপরিসীম মেধা, অক্লান্ত শ্রম আর বংশ পরম্পরায় বয়ে আসা সুনিপুণ দক্ষতার আলোকে নির্মাণ করেন শিল্পের এই সকল অসামান্য প্রতিরূপকে, যা বাংলার মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যের ইতিহাসকে করে রেখেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সমুজ্জ্বল। এসকল ঐতিহ্যের শিল্পরূপগুলো নিমার্ণে তাঁরা নিজেদের মন, মনন, চিন্তা চেতনা আর নিখাঁদ পরিশ্রমের সাথে সাথে এমন কতগুলো উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন যেগুলোর কথা হয়তো আমরা অনেকেই মনে রাখিনা বা মনে রাখারও প্রয়োজন মনে করি না, এসকল উপকরণগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমেই একজন কারিগর একদলা মাটিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করতে পারে অসম্ভব সুন্দর সৃষ্টিশীল শিল্পের কোন প্রতিরূপ হিসেবে। আর ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প সৃষ্টিতে যে সকল উপকরণ বহুল ব্যবহৃত হয় সেগুলি হচ্ছে –

১. মৃৎশিল্প তৈরির প্রধান উপকরণ অর্থাৎ মাটি

২. মাটি প্রক্রিয়াকরণের সময়কার প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি :

    ক. লোহার কড়াইয়ের কাটা অংশ

    খ. ছাই

৩. মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি :

    ক. চাক বা হুইল

    খ. চাক লাঠি

    গ. বাঁশের চাঁচ বা কাইম বা চাঁইক্যা

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. হেক্সো

ঙ. চেইচ বা চ্যাম কাঠি

চ. গুণা বা একতারার চিকন তার

ছ. পানির পাত্র

জ. হাঁড়ি সদৃশ পাত্র

ঝ. পারা

ঞ. আইট

ট. বিড়া

ঠ. পিটনা

ড. বৈলা

ণ. ফর্মা বা ফ্রেম

ত. ছোট টোয়ারি

থ. তান্না

দ. পাইপ

ধ. মৈলক্যা

ন. ফুলা

প. কেরাকি

৪. নক্সা অলঙ্কৃত মাটির টালি তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি :

ক. প্লাস্টার প্যারিস

খ. কাঠের কাটুনী

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রতিমা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি :

ক. মাটি

খ. শুকনো খড়

গ. কামকাঠি

ঘ. ডাইস (খাঁচ)

ঙ. চক পাউডার

চ. রঙ, তুলি ইত্যাদি।

মৃৎশিল্প তৈরির উপকরণ অর্থাৎ মাটি

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীরা সাধারণত নিজস্ব এলাকা থেকেই মাটি সংগ্রহ করে থাকেন। তবে কজের উপযোগী মাটি সহজলভ্য না হলে মাটি বহু দূর থেকেও সংগ্রহ করতে হয়। সেজন্যই যে সমস্ত এলাকার মাটি সহজলভ্য সেখানেই মৃৎশিল্পীদের বসতি গড়ে উঠেছে।

মৃৎশিল্প তৈরির শুরুর কাজই হচ্ছে মাটি সংগ্রহ করা। বাংলাদেশে মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরির উপযোগী মাটির মধ্যে প্রধান হলো এঁটেল মাটি অবশ্য এর সঙ্গে বেলে মাটিরও প্রয়োজন হয়। এদেশের সর্বত্রই নদীগর্ভের জলাভূমিতে অথবা সমতলভূমিতে এঁটেল মাটি পাওয়া যায়। যদিও স্থানভেদে মাটির নামকরণের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। যেমন–

- ঢাকার রায়ের বাজারে এঁটেল মাটিকে ‘রাগমাটি’ বলে, এছাড়া
- কুমিল্লা জেলার বিজয়পুরে ‘ইটেল মাটি’,
- জামালপুর জেলার বজরাপুরে ‘বালি মাটি’,
- চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে ‘আট্যাইল মাটি,
- নোয়াখালীতে ‘মইলা মাটি’ এবং
- রাজশাহী জেলার হরগ্রামে ‘নাইটাল মাটি’ বলে অভিহিত করা হয়।

এঁটেল মাটি আঁঠালো, শক্ত ও বালুমিশ্রিত, রং কালো। অতিরিক্ত আঁঠালো উপাদান থাকায় পোড়ানার সময় পাত্র ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এঁটেল মাটির সাথে সমান পরিমাণ বেলে মাটি মিশিয়ে নেন মৃৎ কারিগররা। মাটির নামকরণের ক্ষেত্রে বেলে মাটিও স্থানভেদে বিভিন্ন হতে পারে। যেমন রায়ের বাজার ও রাজশাহীতে এটাকে ‘আবল মাটি; আবার বজরাপুরে ‘বাইরামাটি’ বলা হয়। বেলে মাটি এঁটেল মাটির চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বেশ নরম শুরু থাকে। এই মাটি লাল রংয়ের এবং এতে বালুর পরিমাণ কম থাকে। এইভাবে এঁটেল ও বেলে মাটির সংমিশ্রণে যে দোঁয়াশ মাটি তৈরি হয় মৃৎপাত্র তৈরির উপযোগী হয়ে থাকে।

যদিও কুমাররা জানেন না মাটিতে কি ধরনের রাসায়নিক উপাদান আছে কিন্তু তাঁরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মাটিকে জেনেছেন, এবং বংশপরম্পরায় এই মাটি ব্যবহার করে আসছেন। উল্লেখ্য যে, সাধারণত মৃৎশিল্পের উপযোগী মাটিতে তিন চতুর্থাংশের বেশি সিলিকন ও এ্যালুমিনিয়ামের উপাদান থাকে। সাধারণ কাদামাটিতে অল্প পরিমাণে পানি, বালু (সিলিকা), সোডা পটাশ, চুন ও লৌহ উপাদান থাকে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের কুমররা মাটি তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন যেমন−

বজরাপুরের কুমাররা জামালপুর থেকে পান্দিনা পর্যন্ত নদীগর্ভের দশহাত নিচু থেকে মাটি সংগ্রহ করেন।

চট্টগ্রামের রুমখা পালংয়ের মুসলমান মৃৎশিল্পীরা মাটি সংগ্রহ করেন যে জমিতে ধান কম হয় সে জমির নিচের মাটি।

বিজয়পুরের কুমারদের মাটি সংগ্রহের পদ্ধতিকে আবার ভিন্নতা রয়েছে। এখানকার কুমররা মনে করে কোন জলাভূমি বা সমতলভূমি রৌদ্রের তাপে শুকিয়ে যাবার পর যখন ফেটে যায়, তখন সেখানে (বিজয়পুরের মৃৎশিল্পীদের মতে) এঁটেল মাটি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ধামরাই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা তাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি পূর্বে নদীগর্ভ হতে সংগ্রহ করতেন। বর্তমানে বিভিন্ন কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্যে দূষিত হয়ে নদীগর্ভের মাটি তার পূর্বের গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে। ফলে এই মাটি তার মৃৎশিল্প তৈরির কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সেই সাথে সহজলভ্য মাটি এখন দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। ধামরাই এর শিল্পীরা বোরো, ইরি ক্ষেত থেকে মাটি সংগ্রহ করেন তাদের কাজের জন্য।

মাটি সংরক্ষণ/প্রক্রিয়াকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় উপকরণ

মাটি সংগ্রহ করার পর তা সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণ/প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি স্থানভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন−

বিজয়পুরের কুমররা সংগৃহীত মাটিকে বাঁশ অথবা কাঠ দিয়ে পিটিয়ে নরম ও সমান করে। পরে বড় বড় গোলাকার খণ্ড তৈরি করে এবং আগে থেকে করে রাখা পাঁচ, ছয়, ফুট গভীর গর্তে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখে। গর্তের মুখ কচুরিপানা দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে রাখে যাতে রোদ-বৃষ্টি প্রবেশ করতে না পারে। কচুরিপানা যাতে শুকিয়ে না যায় সেজন্য মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ধামরাই অঞ্চলের কুমররা তাদের কাজের জন্য সংগৃহীত এঁটেল ও বেলে মাটিকে প্রথমে তাদের বাড়িতে উঁচু ঢিবি করে কচুরিপানা আর খড়ের সাহায্যে ঢেকে রাখেন। এরপর সেগুলো প্রয়োজনমত পানি দিয়ে নরম করে কাজের উপযোগী করে তোলেন।

বজরাপুরের কুমররা মাটির গর্তে এঁটেল এবং বেলে মাটি স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখেন তাদের কাজের উপযোগী হওয়ার জন্য।

রায়ের বাজারের কুমররাও গর্তে মাটি সংরক্ষণ করে থাকেন। যেখানে মাটি রাখা হয় সেই স্থানকে 'মাটি খোলা' বলা হয়।

চট্টগ্রামের রুমখা পাংলয়ের কুমররা তাদের সংগৃহীত মাটি তক্তার উপর স্তূপীকৃত করে রাখেন। সংগৃহীত মাটি এভাবে দীর্ঘদিন, কমপক্ষে ছয়মাস সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে সংরক্ষিত মাটির রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটির গুনগত মান বৃদ্ধি পায় এবং পাত্র তৈরির উপযোগিতাও এতে বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণের এই প্রক্রিয়াকে 'জাগ' দেয়া বলা হয়। চট্টগ্রামে একে বলা হয় 'মজানো'।

ক. লোহার কড়াইয়ের কাটা অংশ : মাটি উপযোগী করার প্রক্রিয়ায় প্রথমে স্ভুপীকৃত মাটি থেকে কোদালের সাহায্যে প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ মতো কেটে ঘরের বা উঠানের এক জায়গায় রাখা হয়। রায়ের বাজারে এই জায়গাটি বলা হয় 'মাইঠাল'।

একটি লোহার কড়াই হতে কিছু অংশ কেটে নিয়ে মাটি প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহৃত এই উপকরণটি তৈরি করা হয়ে থাকে। এর একপাশ উত্তল এবং অপর পাশটি অবতল অর্থাৎ দেখতে অনেকটা নৌকার মত আকৃতির হয়ে থাকে। বিজয়পুরে এটাকে 'কাঁচি' বলে এবং রায়ের বাজার ও রাজশাহীতে এর নাম 'ল্যেক'। (শাহজালাল, ১৯৮৫ : ৫২)

স্ভুপকৃত মাটিকে পা দিয়ে মাড়ানো হয়। মাড়ানোর সময় বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে টিপে মাটি থেকে অপ্রয়োজনীয় পাথর, কাঁকর, কাঠের টুকরা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর স্ভুপকরা মাটিকে চিকন ফালি করে কেটে নিতে এই লোহার কড়াইয়ের অংশ দ্বারা তৈরিকৃত বস্তুটি ব্যবহার হয়ে থাকে। কুমররা এই যন্ত্রটির সাহায্যে অত্যন্ত দ্রুত মাটিকে ফালি ফালি করে কেটে নিতে পারেন।

খ. ছাই বা বালি : কুমররা মাটি প্রক্রিয়াকরণের পর্যায়ে এই ছাই বা বালি ব্যবহার করে থাকেন। এতে করে যে স্থানে মাটি মাড়ানোর কাজ করা হয়, সেখান থেকে সহজে তুলে ফেলা যায়। 'লোহার কড়াই' যন্ত্রটি দিয়ে মাটি ফালি ফালি করে কাটার সময়ও তাতে ছাই বা বালি লাগিয়ে নেয়া হয়ে থাকে ফলে যন্ত্রের সাথে বেশি মাটি লেগে থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি

কুমররা মাটি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে নানা ধরনের উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। নিচে কিছু বহুল ব্যবহৃত ও পরিচিত উপকরণের বর্ণনা দেয়া হলো–

ক. চাক বা হুইল

মৃৎশিল্পীদের কাছে মৃৎ সামগ্রী তৈরির জন্য চাক বা হুইল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপকরণ। এর সাহায্যে যে কোন গোলাকার পাত্রের আদল খুব সহজেই দেয়া যায়। খুব দ্রুত এবং সহজভাবে গোলাকৃতি পাত্রের প্রচুর সংখ্যক উৎপাদন করা যায় এই চাক বা হুইলের সাহায্যে।

কুম্ভকারের এই ‘চাক’ হল মূলত দেড় থেকে দুই হাত ব্যাসার্ধের একটি গোলাকার চাকা। যা তৈরির প্রক্রিয়াটি অনেকটা এরকম প্রথমে বাঁশ কেটে তিনটি গোলাকার রিং তৈরি করা হয়। এই রিংগুলো আকারে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এতগুলোকে একটির পর একটি করে পর্যায়ক্রমে সাজানো যায়। এরপর পর্যায়ক্রমে সাজানো বাঁশের এই রিং তিনটিকে ভালভাবে আংটার সাহায্যে আটকিয়ে গোলাকার একটি চাকার রূপ দেয়া হয়। পরে নারকেলের ছোবড়া, চুন, আঁশ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বাঁশের তৈরি গোলাকার চাকার চারপাশে পুরু প্রলেপ দিয়ে পনেরো থেকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত অল্প রৌদ্রে শুকানো হয়। এরপর চাকাটির ভেতর দিক থেকে চারটি কাঠের পাট তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। এই চাকপাটি গুলো তৈরিতে সাধারণত গজারী কাঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরপর এই চাকপাটি ও চাকার মাঝখানে অপর একটি মাঝারি আকারের তীক্ষ্ণ কাঠের টুকরা লাগিয়ে দেয়া হয়। বজরাপুরে একে ‘চাকের আল’, চট্টগ্রামে ‘আইল’ বলে এটি তেতুল কাঠের তৈরি। অপর একটি কাঠের টুকরার মাধ্যাংশে ছিদ্র করে তাতে একটি দুর্মূল্য পাথর বসানো হয়, এবং কাঠটির চার ভাগের তিনভাগ মাটি খুঁজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। যাতে এটি শক্তভাবে মাটিতে আটকে থাকতে পারে। এবং এই মাটিতে বসানো কাঠের খণ্ডটির মধ্যাংশের পাথরের উপরে বাঁশের চাকাটি বসিয়ে দেয়া হয়, এবং এতে করে চাকাটি সহজেই পাথরের উপর ঘুরতে পারে। অবশ্য বর্তমানে দুর্মূল্যের পাথরের পরিবর্তে লোহার বেয়ারিং ব্যবহৃত হচ্ছে।

সময়ের পরিবর্তনে আর প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের এই ‘চাক’ এর ব্যবহার এখন হারিয়েই গেছে বলা যায়। এর স্থান দখল করেছে আধুনিক “প্যাডেল হুইল” বা “কিক হুইল” গুলো।

খ. চাক লাঠি : চাক লাঠি চাক ঘুরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। চাক লাঠি হলো শক্ত বাঁশের আগা থেকে তৈরি করা লাঠি বিশেষ। এর মাপ হয় সাধারণত তিন হাতের মতো। চাক লাঠি দিয়ে ‘চাক’কে ঘুরানোর জন্য ‘চাক’ এর মধ্যবর্তী চাকপাটি অংশটির একদিকের কাঠের টুকরার মাঝে চাকলাঠির পরিমাণমত ছোট একটি গর্ত তৈরি করে নেয়া হয়। এই গর্তের মাঝেই চাক লাঠি রেখে ঘুরানো হয় মৃৎসামগ্রী তৈরির ‘চাক’ টিকে।

গ. বাঁশের চাঁচ বা কাইস বা চাঁইক্যা : চাকে বা হুইলে মৃৎসামগ্রী তৈরিতে কুমারদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র বাঁশের চাঁচ বা কাইস বা চাঁইক্যা এটি, যা মূলত শক্ত বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। এটি দেখতে লম্বাকৃতির

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধ গোলাকার সিলিন্ডারের মতন। এর মাপ লম্বায় সাধারণত ৬ ইঞ্চির মত হয়ে থাকে। চাক বা হুইলে মৃৎসামগ্রী তৈরিতে মাটিকে সমান করে উপরের দিকে তুলতে এই কাইম বা চাঁইক্যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘ. হেক্সো : সাধারণ কাঠ বা লোহা কাটার এই যন্ত্রটি কুমাররা মৃৎশিল্পে নির্মাণের ক্ষেত্রে এখন ব্যবহার করে থাকেন। চাকে বা হুইলে মৃৎসামগ্রী নির্মাণের সময় তা ফিনিশিং বা টার্নিং করার ক্ষেত্রে কুমররা এই হেক্সোর ব্যবহার করেন। বাজারে যে পরিমাণ লম্বা হেক্সো পাওয়া যায় তাকে ভেঙে প্রয়োজন মত ছোট করে নিয়ে মৃৎশিল্পীরা তাঁদের কাজে এটি ব্যবহার করেন।

ঙ. চেইচ বা চ্যাম কাঠি : চেইম হচ্ছে শক্ত বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি চাকু সদৃশ একটি মৃৎশিল্পী নির্মাণের যন্ত্রাংশ। যা চাকা বা হুইলে মৃৎসামগ্রী তৈরির শেষে এর নিচের অংশ কাটার জন্য কুমররা ব্যবহার করে থাকেন।

চ. গুণা বা একতারে ব্যবহৃত চিকন তার : কুমররা চাক বা হুইল থেকে তৈরিকৃত মৃৎসামগ্রীকে আলাদা করতে চেইম বা চ্যামকাঠি ব্যবহার করে থাকেন। তাকে অনেকেই আবার মৃৎসামগ্রীকে সূক্ষ্ম করে কাটার জন্য একতারায় ব্যবহৃত তারের মত চিকন তার ব্যবহার করে থাকেন। আবার সহজলভ্য গুণতারও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ছ. পানির পাত্র : চাক বা হুইলে কাজ করার সময় কুম্ভকারদের হাতকে মাঝে মাঝেই পানিতে ভেজানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে মাটি দ্বারা মৃৎপাত্র তৈরি করা হয়, তা ভিজিয়ে নরম করে নিতে কখনও কখনও তাতে পানি দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এজন্যই, চাক বা হুইলে কাজ করার ক্ষেত্রে কুমররা পানির পাত্র সাথে রাখেন। আর তাইতো পানির পাত্র হুইল বা চাকে কাজ করার সময় কুম্ভকারদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জ. হাঁড়ি সদৃশ পাত্র : কুম্ভকাররা মৃৎসামগ্রী তৈরির সময় যখন ছাঁচের মধ্যে ফেলে পেটান তখন অনেক সময় মাটি অতিরিক্ত ভেজা থাকায় তা ছাঁচের সাথে লেগে যেতে পারে। এ কারণে কাজের সময় ছাঁচেরমধ্যে মাটি রেখে পেটানোর আগে ছাঁচের উপর কিছুটা 'ছাই' ছিটিয়ে নেয়া হয়। আর এজন্যই ছাই রাখার একটি হাঁড়ি সদৃশ্য পাত্র সব সময়ই কুম্ভকারদের কাজের সময় হাতের নাগালে রাখতে হয়।

ঝ. পারা : পারাকে মূলত মৃৎসামগ্রীর তৈরির ছাঁচ বলা হয়। মৃৎসামগ্রীর মাপের উপর ভিত্তি করে এটি বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। এটা খুব ভারী হয়। 'পারা' বিভিন্ন আকারের হতে পারে, চ্যাপ্টা, গোল, গভীর ইত্যাদি। আর এটা তৈরিতেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কেননা পারার ভিতরের পৃষ্ঠ যতটা মসৃণ করে তৈরি করা হবে, এর দ্বারা উৎপন্ন মৃৎসামগ্রীও হবে ঠিক ততটাই মসৃণ ও সুন্দর। পারা তৈরি করার পর এটি ভালভাবে পুড়িয়ে নিয়ে তারপর ব্যবহার করা হয়।

ঞ. আইট : ছাঁচে তৈরি মৃৎপাত্র তৈরির ক্ষেত্রে এটি খুব জরুরি একটি উপকরণ। সাধারণত পারা বা মৃৎসামগ্রী তৈরির ছাঁচে মাটির ফলককে রেখে তা ভেতর থেকে ঘষে ঘষে সমান করার কাজে এই যন্ত্রটি

কুম্ভকাররা ব্যবহার করে থাকেন। এটি সাধারণত মাটি দিয়ে তৈরি করে পুড়িয়ে নিতে হয়। এবং এর মাপ হয় তিন থেকে চার ইঞ্চির মত। এর উপরিভাগ গোলাকার, মসৃণ এবং নিচের দিকে গর্ত করা থাকে। এতে করে কাজের সময় গর্তের ভিতর আঙুলের কিছু অংশ প্রবেশ করিয়ে তা ধরতে সুবিধা হয়।

ট. বিড়া : মাটির ছাঁচ বা পারার সাহায্যে মৃৎপাত্র তৈরির সময় পারাটি যেন এক জায়গাতে স্থির থাকে সরে না যায়–এ উদ্দেশ্যেই মূলত বিড়ার ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি হল খড়, পাটের দড়ি এবং কাপড় দিয়ে গোল করে তৈরি করা একটি চাকা সদৃশ উপকরণ। এর উপর মাটির ছাঁচ বা পারাকে স্থির করে বসিয়ে মৃৎসামগ্রী তৈরি করা হয়।

ঠ. পিটনা : পিটনা সাধারণত মাটির ও শক্ত কাঠের কখনও বা পাথরের হয়ে থাকে। 'পিটনা' কে বিজয়পুরে 'দলা', চট্টগ্রামে 'পিটনী' আবার রায়েরবাজারে 'পিতনা' বলে থাকে। পিটনার উপরের বা সামনের অংশটি চ্যাপ্টাকৃতির এবং নিচের বা পেছনের অংশটি সরু। এই সরু অংশটি হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব বলা যায় পিটনা হচ্ছে সরু হাতলবিশিষ্ট চ্যাপ্টাকৃতির একটি কাঠের যন্ত্র যা কিনা মৃৎসামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পিটনা সাধারণত ৮-১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১.৫ ইঞ্চির মত পুরু হয়ে থাকে। অনেক সময় একটি মাটি দিয়ে তৈরি করে পুড়িয়ে নেয়া হয়।

ড. বৈলা : মৃৎসামগ্রী তৈরিতে বৈলা পৃষ্ঠযুক্ত ফলক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়; যে ফলকগুলো বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে ফুলদানী, মূর্তিসহ নানারকম মৃৎসামগ্রী নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও এটি মাটির হাঁড়ি, পাতিলকে বড় আকার দিতে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে, এক হাত দিয়ে বৈলাটি হাঁড়ি বা পাতিলে প্রবেশ করিয়ে অন্য হাতে বাইরে থেকে পিটনা দিয়ে সে বরাবর পিটিয়ে পিটিয়ে হাঁড়ি বা পাতিলের বা পাতিলের আকারকে বড় করা হয়। এটির উপরের দিকে হাত দিয়ে ধরার মত ছোট একটি অংশ রয়েছে এবং নিচের দিকটি গোলাকর চ্যাপ্টা আকৃতিতে তৈরি করা। সাধারণত মাটি দিয়ে তৈরি করে পুড়িয়ে নেয়া হয়।

ঢ. নাতা : একটি সুতি কাপড়ের অংশ বিশেষ যা কয়েকটি ভাঁজে ভাঁজ করে কাদা পানিতে ভিজিয়ে নেয়া হয়। এটাকেই নাতা বলে। আর এটি ব্যবহৃত হয় মূলত মৃৎসামগ্রীর ভিতর এবং মৃৎপাত্রের কান্দা মসৃণ করার কাজে।

ণ. ফর্মা বা ফ্রেম : চাড়ি, কুয়ার চাক, ডাবর তৈরি করার জন্য ফ্রেম ব্যবহার করা হয়। চাড়ির জন্য চাড়ির আকৃতি ফ্রেম আর কুয়ার চাকের জন্য চাক আকৃতির ফ্রেম ব্যবহৃত হয়। ফর্মা সাধারণত মাটির কাঠের বা লোহার হয়ে থাকে।

ত. ছোট টোয়ারি : এটি দেখতে অনেকট জর্দ্দার কৌটার মতো। এটি কাঠের তৈরি। শিল্পবস্তু তৈরির সময় যখন অল্প পরিমাণ পানি লাগে তখন এ টোয়ারির মাধ্যমে ঢালা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

থ. 'তান্না' : এটি ক্ষুদ্রাকৃতির হাতুড়ির অনুরূপ একটি হাতিয়ার। যা কাঠ অথবা মাটির সাহায্যে তৈরি করা হয়। তান্নার ওপরে বিভিন্ন প্রকার নক্সা থাকে। এর সাহায্যে পাত্রের কান্দার নিচের অংশে বাড়ি মেরে নকশা করা হয়।

দ. পাইপ : ছাঁচে তৈরি মৃৎপাত্রকে নিচের দিক বরাবর ছিদ্র করতে বা যন্ত্রটির ব্যবহার করা হয় যেটি হল পাইপ, যা মূলত প্লাস্টিকের তৈরি; সিলিন্ডার আকৃতির। লম্বায় এটি আনুমানিক ৪ ইঞ্চির মত এবং ব্যাস নিচের দিকে মোটামুটি ১ ইঞ্চি এবং উপরের দিকে (যেদিক দিয়ে ধরা হয়) মোটামুটি ১.৫ ইঞ্চির মত হয়ে থাকে। সাধরণত ছাঁচে যে সব টব তৈরি করা হয় সেগুলোতে ফুটো করার কাজে এই পাইপ যন্ত্রটি কুম্ভকাররা ব্যবহার করে থাকেন।

ধ. মৈলক্যা : এটি দেখতে অনেকটা ছোট চ্যাপ্টা বাটির মত। সাধারণত হাঁড়ি, কলসি অথবা বড় মটকা তৈরির শেষে এগুলোর মাঝামাঝি বরাবর স্থানকে সমান করার কাজে মৈলক্যা ব্যবহৃত হয়। আর এটিও মাটি দিয়ে তৈরি করে পুড়িয়ে নেয়া হয়। চাকের ব্যবহারের সাথে সাথে এটিও এখন অনেকটাই বিলুপ্তির পথে।

ন. ফুলা : হাঁড়ি, কলসি ও অন্যান্য মৃৎপাত্রে নক্সা করার কাজে ফুলা ব্যবহার করা হয়। এটি দেখতে অনেকটা হাতুড়ির মত। এ দুই দিকে নকশা খোদিত থাকে। যা মাটির দিয়ে তৈরি করে শুকিয়ে, পুড়িয়ে নেয়া হয়। মৃৎপাত্র তৈরিতে প্রাথমিক পর্যায়ে মাটি যখন গরম থাকে, সেসময় মৃৎপাত্রের গায়ে নির্দিষ্ট স্থানে চেপে ধরে রেখে তাতে নকশা করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। তবে এটির ব্যবহার এখন তেমন একটা হয় না বললেই চলে।

প. কেরকি : এটিও মূলত নকশা করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এটি দেখতে অনেকটা ঢাকের মত। এর চারদিকে নকশা খোদিত থাকে। মৃৎসামগ্রীর উপর এটি ঘুরিয়ে নকশা করা হয়। এটিও মাটি দিয়ে তৈরি করে শুকিয়ে পরে পুড়িয়ে নেয়া হয়। আর মৈলক্যা এবং ফুলার মত এটিও তেমনভাবে আর ব্যবহার করা হয় না বাংলার মৃৎপল্লীগুলোতে।

নক্সা অলঙ্কৃত মাটির টালি তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বা যন্ত্রপাতি

আমাদের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নকশা অলঙ্কৃত মাটির টালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এগুলো দেখতে নান্দনিক, বাড়ি ঘরের দেয়ালে শোভাবর্ধনের কাজেও ঠিক একইভাবে ঘোষণা করে সুন্দরের আভিজাত্যের। মৃৎশিল্প নির্মাণের এ সকল নক্সাদার টালি তৈরিতে কুম্ভকাররা যে সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন সেগুলো হল–

ক. প্লাস্টার প্যারিস : নকশা অলঙ্কৃত মাটির টালি তৈরিতে অল্প সময়ে অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদনের লক্ষ্যে এখনকার কুম্ভকাররা প্লাস্টারের ছাঁচের প্রতিই ঝুঁকছেন বেশি। এর জন্য প্রথমে মাটি দিয়ে ভালভাবে একটি ডিজাইনের টালি তৈরি করে নেয়া হয়। এই ডিজাইনের টালির উপর প্লাস্টার দিয়ে ছাঁচ তৈরি করা হয়। ছাঁচটিকে ভালভাবে শুকিয়ে তা থেকে মাটির স্লাব-এর মাধ্যমে অল্প সময়ে অনেক টালি অতি সহজেই বের করা হয়। একই ছাঁচ থেকে একাধিক মৃৎসামগ্রী তৈরিতে প্লাস্টার প্যারিস এখন বহুল ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

খ. কাঠের কাটুনী : ছাঁচ থেকে মাটির টালি তৈরির প্রক্রিয়ায় মাটিকে ছাঁচের মধ্যে বসিয়ে, ছাঁচের মাপ থেকে বাড়তি মাটির অংশকে কেটে ফেলতে এই যন্ত্রটির ব্যবহার করা হয়। এটি তৈরিতে এক টুকরো কাঠের সাথে গজাল বা বড় আকারের একটি পেরেক আটকিয়ে নেয়া হয়।

প্রতিমা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

বিভিন্ন পালা পার্বণে সনাতন ধর্মের পূজার কাজে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানেই তৈরি হয়ে থাকে। প্রতিমা তৈরিতে মৃৎশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। যুগ যুগ ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে আসছে।

প্রতিমা শিল্পীদের সবাই পুরুষ। আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত প্রতিমা শিল্পীরা দুর্গা, লক্ষ্মী প্রতিমা এবং লক্ষ্মী সরা, কার্তিক মাসে কালী এবং কার্তিক মূর্তি, মাঘ ফাল্গুন মাসে সরস্বতী এবং শ্রাবণ মাসে মনসা প্রতিমা ও মনসার সরা তৈরি করে থাকেন।[৯]

শিল্পীরা তাদের নান্দনিক প্রতিমা তৈরিতে মাটি ছাড়া আর যে সকল উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে –

মাটি, লাকড়ি, শুকনো খড়, কাজ কাঠি, ডাইস (খাঁচ) চক পাউডার, রঙ, তুলি ইত্যাদি।

ক. মাটি : প্রতিমা তৈরির জন্য মাটির প্রস্তুত প্রণালীতে ভিন্নতা রয়েছে। ডাইস বা খাঁচ দিয়ে প্রতিমা তৈরির জন্য প্রয়োজন আঠালো মাটি যা কুমাইয়া মাটি নামে পরিচিত। প্রথমে মাটিকে পানি দিয়ে কাদা করে পা দিয়ে মেশানো হয়। তারপর ডাইস বা খাঁচের সাহায্যে প্রতি তৈরি করা হয়।

দুর্গা প্রতিমার মাঝারি পুরো সেট বানাতে চার মন মাটি লাগে, এর মধ্যে দেড় মন এঁটেল মাটি, আড়াই মন বালি মাটি। অনেকে এঁটেল ও দোঁআশ মাটিও ব্যবহার করে। দুর্গা প্রতিমার বড় পুরো সেট বানাতে দুই মন এঁটেল মাটি, তিন মন দোঁআশ মাটি লাগে।

খ. শুকনো খড় : ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের প্রতিমা শিল্পীদের প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে মাটির পরেই প্রধান উপকরণটি হচ্ছে শুকনো খড়। বড় মূর্তিতে তিন মণ খড় এবং ছোট মূর্তিতে দশ সের খড় প্রয়োজন হয়। মাটির প্রতিমা তৈরির পূর্বেই শুকনো খড় দিয়ে তারা প্রতিমার মডেল তৈরি করে থাকেন। পরবর্তীতে এর উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় সনাতন ধর্মের পুজার জন্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর নান্দনিক মূর্তি।

প্রতিমার মূল গড়ন তৈরি করতে পাটের রশি দিয়ে ধানের খড় গড়ন অনুযায়ী শক্তভাবে বাঁধা হয়। এ পর্বকে বলা হয় বেনা পাকানো। বেনা পাকানোর পর তার উপর এঁটেল মাটির স্তর দেয়া হয় হাতে চেপে। একে বলা একমেটে বা একমাইট্যা এই স্তরেই ধানের খড় ছোট ছোট টুকরা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়।

গ. কাজকাঠি : কাজকাঠি বা কামকাঠি সাধারণত শক্ত পাঁকা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। মূলত মূর্তি বা প্রতিমা এবং পুতুল গড়ার কাজে বিভিন্ন অলঙ্কার আর এসবের নান্দনিক রূপ দিতেই এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পে কর্মরত হাজার হাজার কুম্ভকার তথা মৃৎশিল্পীদের কর্মচাঞ্চল্যের প্রধান হাতিয়ার এই সকল নানা উপকরণ এবং যন্ত্রপাতিগুলো এখন অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। আমাদের নিজ ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সংরক্ষণকল্পে মৃৎশিল্পের এই হারানো ঐতিহ্যগুলোকে ধরে না রাখলে এগুলো আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে আমাদের সমৃদ্ধ এক ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্পের করণকৌশল, অলঙ্করণ, রংকরণ এবং মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর কৌশল

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্পের করণকৌশল, অলঙ্করণ, রংকরণ এবং মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর কৌশল

মৃৎশিল্পের করণকৌশল

নব্যপ্রস্তর সময়েও মৃৎপাত্র তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই অনুমান করা যায় মাটি দিয়ে তৈরির কৃৎকৌশল প্রায় দশ হাজার বছরের পুরোনো। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নির্মাণ কৌশলের পার্থক্যে দেখা গেলেও বিষয় হিসেবে এটি মানুষের প্রাচীন এক সাংস্কৃতিক পর্যায়।

মৃৎশিল্প সামগ্রী নির্মাণে মৃৎশিল্পীরা সাধারণত ২টি পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন। এগুলো হলো –

ক. চাক বা হুইলের মাধ্যমে,

খ. প্যাডেল বা কিক হুইলের মাধ্যমে,

গ. আথাইলের মাধ্যম,

ঘ. শুধু হাত ব্যবহার করে,

ঙ. ছাঁচ বা মোল্ডের সাহায্যে,

চ. রিলিফ পদ্ধতিতে।

ক. চাক বা হুইলের মাধ্যমে : কুমররা সংগৃহীত মাটিকে ভালোভাবে প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের পর তা কাজের উপযোগী করে চাক বা হুইলের সাহায্যে মৃৎপাত্র তৈরি শুরু করে। এজন্য চাকের মধ্যবর্তী জায়গায় প্রয়োজনের চেয়ে কিছুটা বেশি মাটি নিয়ে লাঠির সাহায়ে চাক ঘুরানো শুরু করেন। এরপর চাকটি যখন মাটিসহ সজোরে ঘুরতে থাকে তখনই মৃৎশিল্পীরা সেই মাটি হতে মৃৎপাত্র তৈরির মূল প্রতিক্রিয়া শুরু করেন। এক্ষেত্রে তারা চাকের উপর ঘূর্ণনরত মাটিকে চাকের কেন্দ্রে ভালভাবে স্থাপন করেন। ইংরেজিতে আমরা একে "Centering" করা বলি। এরপর কেন্দ্রীভূত মাটির উপরের অংশ হতে একটির পর একটি মৃৎপাত্র নির্মাণ শুরু করেন। একাজের ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হিসেবে কাইম বা বাঁশের চাঁচ বা চাঁইক্যা ব্যবহার করেন। কাইম মূলত মৃৎপাত্র নির্মাণ ক্ষেত্রে চাকে কেন্দ্রীয়ভূত মাটিকে ধীরে ধীর সমান করে উপরের দিকে প্রয়োজনীয় আকার অনুযায়ী বড় করতে সাহায্য করে।

একটি মৃৎপাত্র তৈরি শেষ হলে তা চেইন বা চ্যাম কঠির সাহায্যে প্রয়োজনে অনুযায়ী কেটে তারের সাহায্যে নিচের মাটি থেকে আলাদা করা হয় এবং একই সাথে তা হাতের সাহায্যে উঠিয়ে আলাদা একটি জায়গায় রাখা হয়। কিছুটা শুকানোর জন্য। আর চাকের উপর যে মাটি থেতে যায়। তা দিয়ে পুনরায় একটির পর

একটি মৃৎপাত্র একইভাবে তৈরি করেন এবং একই সাথে কিছুটা শুকানোর জন্য প্রথম তৈরিকৃত মৃৎপাত্রের সাথে একই স্থানে রেখে দেন।

এভাবে সব মৃৎপাত্র তৈরির প্রথম ধাপ শেষ হলে সেগুলো কিছুটা শুকিয়ে আসলে দ্বিতীয় ধাপে তা ফিনিশিং করে পুনরায় সেগুলিকে ভালভাবে শুকানোর জন্য রোদের মধ্যে রাখা হয়।

খ. প্যাডেল বা কিক হুইল : ঐতিহ্যবাহী চাকের জায়গা অনেকটাই দখল করেছে পা চালিত আধুনিক প্যাডেল হুইল। পা চালিত এই প্যাডেল বা কিক হুইলে মৃৎসামগ্রী তৈরির প্রক্রিয়া অনেকটা চাকের মত তবে, চাকে কাজ করতে হয় বসে আর প্যাডেল হুইলে তা করতে হয় দাঁড়িয়ে। চাকে কাজ করার সময় চাক ঘুরাতে চাকলাঠি প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্যাডেল হুইলে কাজ করার সময় এরকম লাঠির প্রয়োজন হয় না। প্যাডেল হুইলে, হুইলটি প্রথমে হাত দিয়ে কিছুটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিচে যে হুইল চালানোর জন্য পা দিয়ে কিক দেয়ার জায়গাটি আছে তাতে এক পা দিয়ে ধাক্কা দিতে থাকলে হুইলটি পুরোদমে ঘোরা শুরু করে। এরপর মৃৎসামগ্রী তৈরির বাকি প্রক্রিয়া পুরোটাই প্রায় চাকের মত।

প্যাডেল হুইলে কুমারদের মৃৎসামগ্রী তৈরিতে যে পরিমাণ যে মাটি প্রয়োজন হয় তা আলাদা আলাদা করে গোল করে একসঙ্গে পাশে নিয়ে কুমররা একটি পর একটি মৃৎসামগ্রী তৈরির কাজ প্যাডেল হুইলে করে থাকেন।

গ. আতাইলের মধ্যমে : আথাল কাঠের তৈরি এবং গোলাকার চাকতির মতো। এই নিচের অংশটা সমতল এবং উপরের অংশটা গর্তের মতো। আথালে সাধারণত গোলাকৃতির জিনিস তৈরি হয় যেমন হাঁড়ি, কলস, খাবলা। আথালে প্রথমে মাটি গুটিকে রেখে তার উপর হাত দিয়ে পাত্রের আকৃতি দেওয়া হয়। আথাইলে মাটি বসিয়ে হিলের পাথর (শিলের পাথর) দিয়ে ঠেঁসে ছাঁচের সাথে মিশিয়ে নিয়ে এবং মাটির তৈরি বৌলা দিয়ে ফিনিশিং বা মসৃণ করা হয়। আথাইলের উপর মাটির গুটি বসানোর পূর্বে অবশ্যই বালি দিয়ে নিতে হবে যাতে তৈরিকৃত পাত্র সহজেই সরিয়ে নেয়া যায়।

ঘ. হাতে তৈরি সামগ্রী : হাতে তৈরি মৃৎসামগ্রীর জন্য প্রয়োজনমতো মাটি নিয়ে পুনরায় উপযোগী করে নিতে হয়। প্রয়োজনে পানিও মেশাতে হয়। এরপর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি হাতে টিপে টিপে তৈরি করা হয়। সাধারণত পুতুল এভাবে তৈরি হয়ে থাকে। কখনও কখনও বিশেষ কিছু মৃৎপাত্রও এভাবে তৈরি হয়ে থাকে। আবার সরা, মালসা ইত্যাদি হাতে হয়ে থাকে।

পোড়ামাটির হাতি ও ঘোড়ার ফাঁপা দেহখণ্ড ও পা চাকে তৈরি হলেও লেজ, কান ইত্যাদি তৈরি ও অলঙ্করণে হাতের কাজের প্রয়োজন। শুধুমাত্র হাতি, ঘোড়া বা পুতুলই নয়, মৃৎশিল্পের বহু সামগ্রীর চূড়ান্ত রূপদানের ক্ষেত্রে চাকের ব্যবহারের সাথে সাথে মৃৎশিল্পীর হতের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

ঙ. ছাঁচ বা মোল্ডের সাহায্যে : ছাঁচ শব্দের অর্থ ফর্মা বা কাঠামো। একই আকৃতির কোন বস্তুকে অধিক সংখ্যায় উৎপাদন করার জন্য ছাঁচ ব্যবহার করা হয়। ছাঁচ সাধারণত লোহা, পিতল, সিমেন্ট, কাট দ্বারা তৈরি হয়।

মৃৎসামগ্রী তৈরির প্রক্রিয়ায় এই ছাঁচ বা মোল্ডটি সাধারণত মাটির তৈরি হয়ে থাকে। যা তৈরি করার পর সাধারণত শুকিয়ে নিয়ে তারপর আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহার করা হয়। তবে, ইদানিং মৃৎশিল্পীরা এ কাজে অনেক ক্ষেত্রেই প্লাস্টার আর প্যারিস ওর মোল্ড ব্যবহার করা শুরু করেছেন। মৃৎশিল্পীদের কাছে ছাঁচ বা মোল্ডের সাহায্যে মৃৎপাত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি সহজলভ্য এবং সময় সাশ্রয়ী।

ছাঁচের সাহায্যে মৃৎপাত্র তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে মৃৎপাত্রের আকার অনুযায়ী কিছুটা বড় করে সমতল স্লাব তৈরি করে নেয়া হয়। এরপর ব্যবহার্য ছাঁচ বা মোল্ডটির মধ্যে কিছুটা ছাই বা বালি ছিটিয়ে দিয়ে তার উপর সমতল স্লাবটি বিছিয়ে দেয়া হয়। এরপর সেই স্লাবটিকে আইট দিয়ে ঘষে ঘষে ছাঁচ বা মোল্ডের আকার অনুযায়ী, মৃৎসামগ্রীর আকার দেয়া হয়। এই ছাঁচের ভেতরের অংশটি যত বেশি মসৃণ হবে এ থেকে তৈরি মৃৎপাত্রটিও তত বেশি মসৃণ ও সুন্দর হবে। এভাবে তৈরি মৃৎসামগ্রী ছায়ায় কিছুটা শুকিয়ে নিয়ে পুরোপুরি শুকানোর জন্য রোদে দেয়া হয়। ছাঁচে সাধারণত নানা আকার বা আকৃতির হাঁড়ি, পাতিল, কলস, টব, দৈ এর টোপা, সরা, ঢাকনা ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে।

আবার কুমাররা প্লাস্টার মোল্ড বা ছাঁচের সাহায্যে নানা রকম ডিজাইনের ফুলদানি, টালি, ছোট ছোট মূর্তি, খেলনা ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন। ছাঁচ দিয়ে মৃৎসামগ্রী তৈরিতে পুরুষদের পাশাপাশি ঘরের মহিলারাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করেন।

চ. ‘রিলিফ’ পদ্ধতিতে : বাংলার মসজিদ ও মন্দিরের গায়ে যে পোড়ামাটির ফলকগুলি দেখতে পাওয়া যায়, তা রিলিফ পদ্ধতিতেই করা। সাধারণত পাঁচ প্রকার রিলিফ ফলকের ব্যবহারই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে–

১। All-relievo বা High-Relief অবয়বগুলি ফলক থেকে বাইরে দিকে বেরিয়ে আসে।

২। Basso-Relievo বা Bas-Relief খোদাই কাজ ফলকের ভিতর দিকে উচ্চ ভাবে করা।

৩। Mezzo-Relievo প্রথমে দুই প্রকার Relief মিলিয়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়।

৪। Relievo- Sticcioto এ সামান্য আঁচড় দিয়ে Relief-এর কাজ করা হয়।

৫। Cavo-Relievo তে সন্দেশের ছাঁচের মতো নকশা উল্টোভাবে করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রোদে শুকানোর সময় ও পরে চুল্লিতে পোড়ানোর সময় ফেটে যাওয়া রোধ করতে পোড়ামাটির ফলকগুলি সবসময় উৎকৃষ্ট কাদা মাটি দিয়ে বানানো হতো। এখানকার মাটি সাধারণত দোঁআশ বা শক্ত এঁটেল মাটি। সাধারণত এই মাটিই মৃৎশিল্পীরা ব্যবহার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্করণ ও রং করণ

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরির পর ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে ফেলার আগে কিছুটা নরম থাকতেই অলঙ্করণের কাজ করা হয়ে থাকে। সব মৃৎসামগ্রীই অলঙ্করণ করা হয় তা নয়। অঞ্চলভেদে হাঁড়ি, কলস, ঘটকে অনেকক্ষেত্রে অলঙ্করণ করা হয় আবার কখনও রং ও নক্সায় বৈচিত্র্য আনা হয়।

মৃৎপাত্রের গায়ে অলঙ্করণের জন্য ফুলা ও কেরকি যন্ত্রের সাহায্যে নেয়া হয়। আবার ঝাঁঝরি হাঁড়িতে লোহার শলাকা দিয়ে নরম মাটির ওপর দাগ বা আঁচড় কেটে নক্সা করা হয়। অনেক সময় ঝিনুকের সাহায্যেও অলঙ্করণ করা হয়। তবে এগুলো ছাড়াও শক্ত পাকা বাঁশের তৈরি কামকাঠি দিয়েও টিপে টিপে মৃৎসামগ্রীর নকশা করা হয়ে থাকে। এভাবে অলঙ্করণের পর ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নেয়া হয়।

কখনও রোদে শুকানোর পরে রং করে পোড়ানো হয় আবার কখনও বা পোড়ানোর পরে রং করা হয়। রোদে শুকানোর পর পাত্রগুলি যখন সাদা রং ধারন করে তখন সেগুলোকে রোদ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং রং করা হয়।

মৃৎপাত্রের গায়ে যে স্থায়ী রং করা হয় সেই রং কুমররা নিজেরাই ঐতিহ্যেগত পদ্ধতিতে নিজেরাই তৈরি করে থাকেন। রং তৈরির উপকরণ সর্বত্রই একই। এতে প্রয়োজন হয় খয়ের, কাপড় কাচার সোডা এবং লালমাটি, এছাড়া অনেক জায়গায় গাছের ছালও ব্যবহৃত হয়।

রং তৈরির নিয়ম : প্রথমে দু'সের পানিতে আধাপোয়া খয়ের ভিজিয়ে জ্বাল দেয়া হয় এবং পানি ফুটে উঠলে জ্বাল বন্ধ করে খয়ের পানিতে সোডা মেশানো হয়।

মৃৎপাত্রের গায়ে যে স্থায়ী রং দেওয়া হয় সেই রংকে বলা হয় 'কষ'। এই কষ মাটি থেকেই তৈরি হয়। কুমররা রং করার উদ্দেশ্যেই বিশেষ ধরনের লালমাটি সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত লালমাটি রৌদ্রে ভালভাবে শুকিয়ে মাটিকে পিটিয়ে গুঁড়া পাউডারে পরিণত করা হয়। এই লালমাটির পাউডারে সোডা ও খয়ের গোলা পানি দিয়ে রুটির আটার মত করে হাতে মাখতে হয়। মাখার পর শক্ত হয়ে আসলে কাঠের হাতুরি দিয়ে কমপক্ষে এক ঘণ্টা পিটাতে হয়। এরপর এই মাটি দশ-বারো সের পানিতে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিয়ে ঠান্ডা করে রেখে দিলে নিচে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পড়ে থাকে এবং উপরে কাঙ্ক্ষিত রংটি পাওয়া যায়, এই রং ন্যাকড়ার সাহায্যে পাত্রের গায়ে লাগানো হয় আবার কখনও ছোট পাত্র হলে চুবিয়েও রং করা হয়।

রাজশাহী জেলার হরগ্রামে লালমাটি (আঞ্চলিক নাম রাঙ্গমাটি) পাওয়া যায়। এখানকার কুমররা পুকুরের পরিষ্কার পানিতে একটা বড় পাত্র ভিজিয়ে রাখেন। একদিন এভাবে রাখার ফলে বালি, ময়লা ইত্যাদি নিচে জমা হয়। এরপর পানি অন্য পাত্রে ঢেলে রৌদ্রে আরও দুই-চার দিন রাখেন। এতে করে রং ঘন হয়। পরে ন্যাকড়ার সাহায্যে পাত্রের গায়ে লাগানো হয়।

ভারতে একটি মাটির পাত্রে পাউডার রং এবং তেতুল বিচির আঁঠা মিশিয়ে নেয়া হয। অবশ্য প্রথমে তেতুল বিচির আঁঠাকে একদিন ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয় পরে বিচির খোসা ছাড়িয়ে পানিতে ফোটানো হয়। পরবর্তীতে এই আঠা রংয়ের সাথে মেশানো হয়। পাত্রে উজ্জ্বল চকচকে ভাব আনার জন্য বার্ণিশের সঙ্গে অল্প কেরোসিন মিশিয়ে নেয়া হয়। রং তৈরি হয়ে গেলে পাত্রে রং করার ঘোড়ার ঘাড়ের চুলের ব্রাশের সাহায্যে পাত্রে লাগানো হয়ে থাকে।

শ্রীলংকাতে মৃৎপাত্রে রং করার লালমাটি (Orche) সংগ্রহ করা হয় নদীগর্ভ থেকে। এবং তৈরি রং পাত্রে লাগানোর জন্য মানুষের চুলের ব্রাশ ব্যবহার করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর কৌশল

মৃৎশিল্প একটি পারিবারিক শিল্প। আর প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারেই মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর চুলা থাকে। আবার অনেক কুমার পল্লীতে বড় আকারের চুলা তৈরি করা হয়–যাতে করে একসাথে প্রচুর পরিমাণে মৃৎসামগ্রী পোড়ানো যায়। সারা বাংলাদেশের পাল সম্প্রদায় প্রায় একই পদ্ধতিতে তাদের উপকরণ/তৈরি দ্রব্যাদি পুড়িয়ে থাকেন।

মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর কৌশলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

ক) চুল্লি নির্মাণ প্রক্রিয়া

খ) মৃৎসামগ্রী পোড়ানো পদ্ধতি।

ক) চুল্লি নির্মাণ প্রক্রিয়া : বাংলাদেশের প্রত্যেকটি কুমার পরিবার মৃৎশিল্পের দ্রব্যসামগ্রী পোড়ানোর জন্য 'পুইন' বা 'পইন' তৈরি করে থাকেন। পইন নানা আকৃতির হয়ে থাকে। পইন তৈরির উপকরণ ও পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। আবার কখনও কখনও একই পইন একাধিক পাল পরিবার ব্যবহার করে থাকে। কুমররা সাধারণত তাদের বসতবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে চুল্লি তৈরি করেন। এই চুল্লি ঘরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উপর চাড়া বা মেটে টিন দিয়ে চালা দেওয়া হলেও ঘরের কোন দিকেই কোন বেড়া দেয়া থাকে না।

মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর চুল্লিতে কয়েকটি অংশ থাকে। এটি তৈরিতে বেশ কিছু ধাপে কাজ সম্পন্ন করা হয়। একটিই ১৬ ফুট বাই ১৬ ফুট চুল্লি তৈরির জন্য প্রথমেই 'মোড়খাল' নির্মাণ করতে হবে। মোড়াখাল হচ্ছে একটি চুল্লির প্রধান অংশ, এর উপর থাকে পুন এবং পুনের উপর যাতা স্থাপন করা হয়। 'মোড়াখালে' সাধারণত ৪ ফুট প্রশস্ত প্রস্থ এবং ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ বা দরজা থাকে। এই দরজা দিয়েই চুল্লিতে অগ্নিসংযোগ দেয়া হয়।

মোড়াখাল বৃত্তাকারে তৈরি করার পর (মধ্যবর্তী যাতার জায়গা ফাঁকা রেখে) তার উপরে প্রায় ১ ফুট পরিমাণ মাটির আবরণে তৈরি করা হয় পুন। এটি ভূমি হতে ৩ থেকে ৪ ফুটের মত উঁচু হয়ে থাকে। পুনের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গার উপর তৈরি হয় যাতা। যাতা পুন থেকে মোটামুটি ৩ ফুট উঁচু হয়ে থাকে এবং দেখতে ১২টি হাতল যুক্ত একটি ছোট মাটির ঢিবির মত মনে হয়। যাতার ১২টি হাতলের মধ্যে ২.৫ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা রাখা হয়। যেগুলো দিয়ে চুল্লির আগুন পুনের উপর সাজানো মৃৎসামগ্রীকে পুড়িয়ে থাকে।

মোড়াখাল মূলত বাঁশ, মাটি, ইট ও লোহার রড দিয়ে নির্মাণ করা হয়। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন বাঁশ বা রড বেশি উপরে উঠে না থাকে অর্থাৎ পুনের মাটি ভেদ কের আগুনের স্পর্শ না পায়। যাতার নিচের ফাঁকা অংশে লাকড়ি জ্বেলে আগুন দেয়া হয় এতে করে যাতার হাতলের ফাঁক গলে পুনের উপর সাজানো মৃৎসামগ্রী পোড়াতে পারে।

খ) মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর পদ্ধতি : মৃৎসামগ্রী তৈরির পর ভালভাবে রোদে শুকানো হলে শুরু হয় চুল্লিতে পোড়ানোর প্রক্রিয়া। প্রথমে একসারি মৃৎপাত্র সোজা করে একটির পর একটি যাতার পাশে বৃত্তাকারে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়। এরপর এই সারির উপরে দ্বিতীয় সারির পাত্রগুলো উপুর করে বসিয়ে বসিয়ে সাজাতে হবে। পরবর্তী সবগুলো সারিই দ্বিতীয় সারির মত সাজাতে হবে। পাত্রের ফাঁকে ফাঁকে খড়-কুটা ও গাছের ডাল ইত্যাদি রাখা হয়। সাজানো পাত্রের চারদিকে আবার নিম্নমানের কিছু হাঁড়ি-পাতিল দিয়ে ঠেকা দেয়া হয় যেন শুকনো পাত্রগুলি আগুনের তাপে ফেটে না যায়। এলাকা বিশেষে পাত্রগুলির চারপাশে খড়, কচুরিপানা আখের অথবা গাছের পাতা এবং পাঠখড়ি বা সোলা দিয়ে উচালে তৈরি করা হয়। সবশেষে পাত্রগুলো মাটির পুরু প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। তবে মাটির প্রলেপের চারদিকে ছিদ্র করা হয়ে থাকে যাতে ধোঁয়া বের হতে পারে।

পাল সম্প্রদায় চুলায় আগুন দেবার পূর্বে কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যেমন বিজয়পুরের কুমাররা চুলায় আগুন দেবার আগে চুলার চারদিকে ধূপ দেয়। আবার অনেকে একটি পানির পাত্রে সোনা-রূপা রেখে সেই পানি পইনের উপর ছিটিয়ে দেয়। অশুভ দৃষ্টি থেকে পইন রক্ষার জন্য কেউ কেউ চুলার এক কোণে ঝাড়ুর পিছা, কুল বড়ুইয়ের ডাল, বেতের কাটা রেখে দেয়।

মাঙ্গলিকের পরে পইনে অগ্নি সংযোগ করা হয়। অঞ্চলভেদে পইনে ব্যবহৃত জ্বালানিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পইনে সাধারণত বাঁশের মাথা, ধানের খড়, এবং কাঠের ঘুন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পইনের জ্বালের মাত্রায় হেরফের ঘটাতে হয়। প্রথমে কিছু শুকনো গোবর অথবা লাকড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে আগুন জ্বালানো শুরু হয়। কমপক্ষে দুই ঘণ্টা মন্থর গতিতে জ্বাল দেয়ার পর উপরের সারিবদ্ধ পাত্রগুলি গরম হয়ে যায় এবং এরপর আরও জোরালোভাবে জ্বাল দেয়া শুরু হয়। সমগ্র পাইনে আগুন ধরে গেলে নিচে থেকে জ্বাল দেয়া বন্ধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, পাল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনেক সময় লোকের কু-নজরে জ্বালানির তেজ কমে যায়। এ জন্য তারা বনে কাটা গুরুর শরণাপন্ন হয়। গুরু নতুন পাতিলে জল এনে তিনবার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয় এবং সেই জল পইনে ছিটিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস ওতে অশুভ বাণ কেটে যায়, পইনের আগুনে তেজ বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে গুরু যে বাণটি ব্যবহার করে তা এরূপ–

করাত করাত করাত

ব্রক্ষ করাত,

আসতে কাটে,

যাতে কাটে,

উজানি কাটি,

ভাট্যালি কাটি,

Dhaka University Institutional Repository

দেব-দেবতার কালাফি কাটে।

বান-কুজ্জান কাটি,

বিশ– বাসুলি কাটি,

মানুষের কালাফি কাটি,

অমুরেক দোষ কাটি,

দোহাই কামাক্ষ্যা গুরু

গোসাইয়ের চরণের দোহাই। (কালীনাথ, ১৯০৮ : ৩৩)

যখন পাত্রের চারিদিকে মাটির প্রলেপের ভিতরে দেয়া খড়কুটা সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায় তখন 'পুনের' রং লাল হয়। ধোঁয়ার রং দেখে আগুনের মান নির্ণয় হয়। যেমন নিচের দিকের লাকড়ি ভালভাবে জ্বললে সাদা রংয়ের ধোঁয়া হয়।

অনেক সময় স্থায়ী কালো রংয়ের পাত্র তৈরির জন্য কুমাররা চুলার মাটির প্রলেপের ছিদ্র বন্ধ করে দেন। এতে করে ধোঁয়া বের হয়ে আসতে পারে না। ফলে পাত্র গাঢ় কালো রং ধারণ করে। এ ধরনের রং করার জন্য অনেক জায়গায় কয়লা দিয়েও জ্বাল দেওয়া হয়।

এভাবে পোড়ানো প্রক্রিয়া শেষ হলে পইন ঠান্ডা হবার পর মাটির প্রলেপ ভেঙে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত স্তরে স্তরে পাত্রগুলি নামানো হয়। সাধারণত পোড়ানো পাত্র ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। আর ঘরে জায়গা না থাকলে উঠানে ছাউনির নিচেও রাখা হয়। বিজয়পুরের এটাকে 'ঘোনা' দেয়া বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্প সামগ্রী বিপণন ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্প সামগ্রী বিপণন ব্যবস্থা

মৃৎশিল্পকে জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বললে অতিরঞ্জিত করা হয় না। একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক সমাজ কল্যাণ মূলক উন্নয়ন তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে। আর এই সামাজিক উন্নয়নকে শিল্প সংস্কৃতি থেকে আলাদা করা যায় না। আমাদের শিল্প সংস্কৃতির একটি বড় জায়গা দখল করে আছে মৃৎশিল্প। স্বল্প পরিসরে হলেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মৃৎশিল্পের অবদান অত্যাবশ্যকীয়। এ শিল্পের সঠিক উন্নয়ন বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

যে কোন শিল্প ব্যবস্থাতেই শিল্প পণ্যের বিপণন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিল্পের ভবিষ্যৎ উৎপাদন নিশ্চয়তা তৈরি হয়। উৎপাদনকারী পণ্যে বিপণনের মাধ্যমে যদি প্রকৃত অর্থে সন্তোষজনক মুনাফা অর্জন করে। তখন তার পক্ষে সেই পণ্যের ভবিষ্যত উৎপাদন প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থে সহজতর হয় এমনি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পরিমাণ বাড়াতে পারে।

শিল্পরূপ পণ্য হিসেবেই মৃৎশিল্প কে গণ্য করা হয়। কেননা এই পণ্য ব্যবহারিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভোক্তা/ক্রেতার শিল্পীমনের নান্দনিক চাহিদাও পূরণ করে থাকে। তাই এই শিল্পপণ্যটির বাজারজাতকরণ বা বিপণন ব্যবস্থা যেন আরও গুরুত্ববহ রূপ অর্জন করে।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে সমাজের অত্যন্ত দরিদ্রপীড়িত একশ্রেণীর মানুষের জীবন সংগ্রামের নীরব ইতিকথা। এই কাজই তাদের বংশ পরম্পরায় সাংসারিক খরচ মিটিয়ে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার হাতিয়ার। এর মাধ্যমেই চলছে তাদের জীবন ঘুরছে তাদের জীবিকার চাকা। আর তাই মৃৎশিল্পের উৎপাদনের সাথে সাথে এর বাজারজাত ও বিপণনও তাদের কাছে সমান গুরুত্ব রাখে।

মৃৎপণ্যসামগ্রীর বিপণন বিভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে, যেমন তৈরি শিল্পে পণ্য কখনও এনজিও'র বা কোন প্রতিষ্ঠান তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিয়ে থাকেন আবার কখনও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্ডারের ভিত্তিতে তৈরি হয়ে থাকে। অনেক সময় শিল্পী তাঁর নিজের পছন্দ অনুযায়ী সামগ্রী তৈরি করে নির্দিষ্ট কিন্তু স্থানে পৌঁছে দেন। এরকম কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে –

১. সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন পর্যটন বাজার,
২. ঢাকার রায়ের বাজারের বিভিন্ন দোকান,
৩. ঢাকার হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ,
৪. ঢাকার শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণ,
৫. ধানমন্ডির বিভিন্ন স্থান,
৬. বিভিন্ন বিভাগীয় শহর।

ঢাকার বড়-বড় হোটেল, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ, নার্সারীতে প্রয়োজনীয় ফুলের টব, বিভিন্ন মিষ্টির দোকানের জন্য দৈ এর হাঁড়ি বা টোপা প্রভৃতি মৃৎসামগ্রী অর্ডারের পরিমাণ অনুযায়ী মৃৎশিল্পীরা সরবরাহ করে থাকেন।

আপামর জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী অতি সাধারণ সামগ্রী গ্রামেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। হাড়ি, পাতিল, কলস, ফুলদানী, ছোট ছোট পুতুল, খেলনা ইত্যাদি উৎপাদনের মধ্যেই এই শিল্প সীমাবদ্ধ রয়েছে বহুদিন থেকে। কেননা শিল্প মান বিচারে এইসব সামগ্রীর শিল্পমূল্য অত্যন্ত তুচ্ছ ছিল। কালের আর্বতে এবং পাশ্চাত্যের চাকচিক্যের জোয়ারে বর্তমানে দেশীয় মৃৎশিল্পেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে আনুষ্ঠানিক ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনের শিল্পের আপন মননশীলতা যা মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক মৃৎশিল্প শহরের নানা ধরনের উপহার বিতান এবং হস্তশিল্প বিপণীর বিশাল এক অংশ জুড়ে আছে। সারা বাংলাদেশে জুড়েই আছে মৃৎশিল্প। নিচে বাংলাদেশের কিছু উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্প নির্মাণ স্থানের নাম দেয়া হলো–

ক) ঢাকা মহানগরীর রায়ের বাজারের মৃৎশিল্প;

খ) ঢাকার অদূরে সাভারের শিমুলিয়া, নৈহাটি, পায়ারহাট মৃৎশিল্প।

গ) ধামরাইনের কাগজীপাড়া, কাকরণ মৃৎশিল্প।

ঘ) কুমিল্লার বিজয়পুরের মৃৎশিল্প

ঙ) পটুয়াখালীর বাউফলের মৃৎশিল্প।

চ) শরিয়তপুরের মৃৎশিল্প।

ছ) মানিকগঞ্জের পালরায় পাল স্মপ্রদায়।

চ) গাজীপুরের সিন্দুরী।

Dhaka University Institutional Repository

বিপণন প্রক্রিয়া

সৃজনশীল কর্মে, ঐতিহ্য ও রুচিতে মৃৎশিল্প বরাবরই তার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আসছে। আর সম্ভবত সেজন্যই বিভিন্ন এন.জি.ও ও বেসরকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকরা মৃৎশিল্পে সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। এই শিল্প আর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ ভূমিকা রাখবে তা বুঝতে পেরেই তারা মৃৎশিল্প সংরক্ষণ ও নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন এবং মৃৎশিল্প উৎপাদনের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য কর্মীদেরকে প্রেরণা দিচ্ছেন। নিয়োগকৃত কর্মীদের অর্ধেক অভিজ্ঞ ও অর্ধেক অনাভিজ্ঞ। তবে মহিলাদের এ কাজে বেশ সম্পৃক্ততা আছে, বিশেষ করে প্রাথমিক কাজে। গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি মহিলারা বেশ দক্ষতার সাথে মৃৎসামগ্রী তৈরির কাজে সাহায্য করে। বর্তমানে মৃৎশিল্পীরা প্যাডেল হুইল বা পা দ্বারা চালিত চাক ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। বিসিক সর্বপ্রথম এই প্যাডেল হুইলের প্রচলন করে।

বিসিক এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রথাগত মৃৎশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পীগণ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আবার কখনও ব্যক্তিগত উদ্যেকে মৃৎসামগ্রী নির্মাণ কাজে নিয়োজিত আছেন। বিগত বেশ কিছুবছর ধরে আমাদের দেশের মৃৎশিল্প সামগ্রী ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশে রপ্তানী কেন্দ্রের মাধ্যমে রপ্তানী করে আসছে। প্রধান রপ্তানী কেন্দ্রগুলো ঢাকাতেই অবস্থিত। নিচে কয়েকটি রপ্তানী কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা হলো।–

ক) জুট ওয়ার্কস (Corr Jute Works)

খ) ইনফ্যাণ্টস ডু মনগগ– ১/১৬ ইকবাল রোড, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা

গ) লুটাস, মতিঝিল, ঢাকা।

ঘ) হীড হ্যান্ডিক্রাফসট

ঙ) কনেক্সনো, ৩৬ ডি, আইটি বর্ধিত সড়ক।

চ) BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee)

উল্লিখিত রপ্তানী কেন্দ্রের আওতায় বাংলাদেশের নয়টি মৃৎশিল্প সামগ্রী নির্মাণ প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী করে থাকে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হল। প্রসঙ্গত : উল্লেখ্য যে এই নয়টি প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য বিসিক থেকে সংগৃহীত।

ক) মৃত্তিকা : এটি ঢাকার রায়ের বাজারে অবস্থিত। উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল দুই ধরনের মৃৎসামগ্রীই এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করে থাকে। এটি ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এদের বার্ষিক উৎপাদন আয় প্রায়– তিন লক্ষ টাকা। এখানকার প্রায় সবধরণের সামগ্রীই রপ্তানীযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

খ) মৃৎরাজ : মৃৎরাজ ও ঢাকায় অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল দুই ধরনের মৃৎসামগ্রী উৎপন্ন কর থাকে। এরা মৃৎরাজে তৈরি হয় ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল। এদের বার্ষিক উৎপাদন আয় দুই লক্ষ টাকা।

গ) ধামরাই থানার কাকরান গ্রামের নেপাল পাল ও তার সহকারী বৃন্দ অনুজ্জ্বল মৃৎসামগ্রী তৈরি ও সরবরাহ করে থাকে। এদের বার্ষিক উৎপাদন আয় প্রায় আট থেকে দশ লক্ষ টাকা।

ঘ) তরুণী পাল ও সহকারীবৃন্দ একই ধরণের অনুজ্জ্বল দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে থাকে। এদের বার্ষিক উৎপাদন আয় দশ লক্ষ টাকা।

ঙ) রামপ্রসাদ পাল ও তার সহকারী বৃন্দ একই ধরণের অনুজ্জ্বল মৃৎসামগ্রী তৈরি করে এবং তাদের বার্ষিক উৎপাদন আয় দুই লক্ষ টাকা।

চ) রঞ্জিত পালও তার সহকারী বৃন্দ অনুজ্জ্বল মৃৎসামগ্রী তৈরি করে। তাদের বার্ষিক উৎপাদন আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

ছ) বিজয়পুর রুদ্র পাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি : কুমিল্লা জেলার বিজয়পুর গ্রামে অবস্থিত একটি সমবায় সমিতি এবং এর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন মিঃ রতন পাল। বর্তমানে এদের বার্ষিক উৎপাদন আয় আট লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের উৎপাদিত সামগ্রী গ্যাসে পুড়িয়ে থাকেন এতে করে তাদের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে বিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

জ) পটুয়াখালী জেলার বাউফল এলাকার বিশ্বেশর পাল অমসৃণ মৃৎসামগ্রী তৈরি করে। তার বার্ষিক উৎপাদন আয় চার লক্ষ টাকা প্রায়।

ঝ) সৈয়দপুর জেলার করেকপুর গ্রামের জহরলাল পাল ও সমীর পাল উভয়ই অমসৃণ মৃৎসামগ্রী তৈরি করে। জহরলাল পালের বার্ষিক উৎপাদন আয় আকাশচুম্বী। ২০–২৫ লক্ষ টাকা।

যে নয়টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হলো এগুলো কোন কোম্পানি নয়। এই নির্মাতাগণ ছোট পরিসরে ব্যবসা করে। এরা জোটভুক্ত হননি কিংবা কোন সংগঠন বা সমিতি করেননি আবার জোটভুক্ত হননি। নির্মাতাগণদের মত রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানগুলোও ছোট পরিসরে রয়েছে। এদের নেই যেমন কোন নির্দিষ্ট ও লিখিত রপ্তানী নীতি তেমনি কোন রপ্তানী কোটা। আর তাই ব্যবসায়িক দিক থেকেও লাভজনক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। (সায়মা, ২০০৫ : ১৭)

মৃৎশিল্প নির্মাতাগণ ব্যাংক থেকে ঋণের তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা পান না। এর জন্য তেমন কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি। ঐতিহ্যগত কারণে কুমার সম্প্রদায় বাংলা নববর্ষের বৈশাখ মাসে কর্মবিরতি পালন করে। এ মাসে তারা কর্মবিরতি পালন করে, ফলে তারা একটু অর্থনৈতিক দৈন্যতায়

Dhaka University Institutional Repository

ভুগে থাকে। এই মাসটিতে তারা পুরো বৎসরের কাজের প্রস্তুতি হিসেবে সকল প্রকার কাঁচামাল সংগ্রহ করে থাকে।

বংশপরম্পরা তথা প্রথাগত মৃৎশিল্পীদের পূর্বে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলেও বর্তমান এদের একমাত্র প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করে থাকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)। কিন্তু প্রথাগত উপকরণের সাহায্যে কাজ করার ফলে তৈরি সামগ্রী গুণগত মান উৎকর্ষ শিল্পমূল্যের নিরিখে তুচ্ছ। বর্তমানে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ওরা বিসিকের মাধ্যমে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং ব্যবস্থা এখনো চালু আছে। প্রশিক্ষণ হওয়ায় উৎপাদিত মৃৎশিল্পের মান উন্নয়ন হয়েছে। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত মৃৎশিল্প সামগ্রী জার্মানী, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইতালী, জাপান, সুইডেন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের ৫৫ থেকে ৬০ টির মত দেশে রপ্তানী হচ্ছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

আধুনিক কারখানাতে রপ্তানির জন্য তৈরি হয় বিজাতীয় রীতির টব ও ফুলদানি। রপ্তানিকারক সংস্থারা তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর রঙিন ছবি দেয় যেগুলোর চাহিদা আছে হয়ত ইউরোপ, আমেরিকায়। মৃৎশিল্পী এই রপ্তানির কাজ করতে গিয়ে নতুন ধারণার সাথে পরিচিত হয়। এবং তা দিয়ে আবার নগরীর বাজারের জন্য সামগ্রী তৈরি করে। (Glassic, ২০০০ : ২০৮–২১০) একে সংকরায়নের ধারা বা সমন্বয়ের ফলাফল বলা যায়।

বাংলাদেশের প্রায় বেশির ভাগ অঞ্চলেই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প চর্চারত কুমারদের বসতি রয়েছে। যাঁরা নিজেদের শিল্পকে, বংশগত পেশাকে টিকিয়ে রাখতে আজও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। তাঁদের এই সংগ্রামই বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে আজও আমাদের মাঝে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের বংশপরম্পরার শিল্পীরা দিনের পর দিন পরিশ্রম করে মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। দুঃখজনক যে এই শিল্পীরা তাদের বিনিয়োগ ও শ্রম অনুযায়ী লাভ পান না। যেহেতু তাদের অধিকাংশই সরাসরি বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত নন, তাই লাভের একটা বড় অংশ পাইকারদের কাছে চলে যায়। ফলে মৃৎশিল্পীরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। অনেক সময় এমনও হয়, কুমাররা বিপদে-আপদে পাইকারদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে থাকেন, আর্থিক অনটনের জন্য টাকাটা পরিশোধ করতে পারেন না। ফলে তৈরি মৃৎসামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পাইকারদের দিতে বাধ্য হন। মধ্যস্বত্বভোগী পাইকারদের দৌরাত্মে মৃৎশিল্পীর প্রাপ্য পাওনা থেকে বরাবরই বঞ্চিত হন। তবে মেলার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এ ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। মেলায় শিল্পীরা নিজের তৈরি মৃৎশিল্প সামগ্রী, তৈজসপত্র, গৃহসজ্জাসামগ্রী নিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশের গ্রামে ও শহরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট-বড় অসংখ্য মেলা বসে। মেলায় অংশগ্রণের মধ্য দিয়ে শিল্পীদের সাথে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ হয়। এতে করে এই মৃৎশিল্পীরা আর্থিকভাবে যেমন লাভবান হন তেমনি ক্রেতার পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কেও জানতে পারেন। মেলা বৈশাখ থেকে চৈত্র এই বারো মাসই বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে চলতে থাকে। নববর্ষ, ঈদ, মহররম, ওরস, পূজা, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে চন্দ্র-সূর্যের উত্তরণ ও সংক্রমণকাল এবং তিথি নক্ষত্রের হিসাব

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী মেলার সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তাই এক বছরের সাথে আর এক বছরের মেলার সময় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মেলায় যেহেতু মৃৎশিল্প পণ্য বিপণনে মৃৎশিল্পীদের একটা বড় অংশ অংশগ্রহণ করে থাকেন তাই এখানে মোকারম হোসেন এর লেখা বাংলাদেশের মেলা বইটি থেকে মেলার তালিকা, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের সংকলন ও সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের লোকশিল্প' বইটির মেলার তালিকা এবং আমার নিজস্ব সংগৃহিত তথ্য একত্রিত করে মাস অনুযায়ী মেলার তালিকা উপস্থাপন করা হলো। যদিও এটিকে পূর্ণাঙ্গ তালিকা বলা যাবে না। তবে এখান থেকে মৃৎপণ্য সামগ্রী বিপণনের একটা বড় উৎস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে–

বৈশাখ

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	মোনাইতলা	মনোহরদী, ঢাকা	বৈশাখী	১ দিন	মাটির খেলনা, তৈজসপত্র, মৌসুমী ফল-মূল, মিষ্টি, শিশুদের রঙিন খেলানা ধাতব ও প্লাস্টিক সামগ্রী
২.	নয়ারহাট মেলা	নয়ারহাট ধামরাই ঢাকা,	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন	মাটির রঙিন পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল কলসি ও বিভিন্ন আকৃতির কেলনা পুতুল-এর বিরাট সমারোহ।
৩.	পূজা ও মেলা	পিজির কালি, ঢাকা	বৈশাখী	১ দিন	মৃৎশিল্পসামগ্রী, খেলনা, খাবার খৈ, মুড়ি, মুড়কি, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী
৪.	অষ্টমী মেলা	ঢাকা	পূজা	বৈশাখ ১ দিন	ঐ
৫.	বৈশাখী মেলা	ঘরপাড়া, ঢাকা	বৈশাখী	২ দিন	খৈ, মুড়ি, মুড়কি, কাঠের আসবাবপত্র, প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী, মাটির পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল নকশী কাঁথা, পাখা
৬.	বৈশাখী মেলা	রায়পুর, ঢাকা	বৈশাখী	২ দিন	ঐ
৭.	বৈশাখী মেলা	শীবগঞ্জ, ঢাকা	বৈশাখী	২ দিন	ঐ

৮.	কোলা মেলা	কোলা, ঢাকা	বৈশাখী	১ দিন	আউল-বাউলদের সমবেশ। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার, এ মধ্যে লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৯.	মহিজের মেলা	মহিজপাড়া, ঢাকা	বৈশাখী	২ দিন	কাঠের আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন শিল্পের সমাহার। এছাড়া মৌসুমী ফলমূল ও শিশুদের খেলনা সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।
১০.	বৈশাখী মেলা	ধোলাই খাল, ঢাকা	বৈখাশী	১ দিন	কাঠের আসবাবপত্র, প্লাস্টিক সামগ্রী, মেয়েদের প্রসাধন ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১১.	বৈশাখী মেলা	ধূপখোলার মাঠ, ঢাকা	বৈশাখী	১ দিন	ঐ
১২.	গোষ্ঠের মেলা	নয়ারহাট, ঢাকা	পূজা	১ বৈখাশ থেকে ৩ দিন	এ মেলায় পূজার যাবতীয় উপকরণ, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল পুতুল, পালকি, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৩.	শুভাড্যা মেলা	শুভাড্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	নববর্ষ	১ দিন	নববর্ষের বিভিন্ন রকমের উপহার সামগ্রী, কাঠোর আসবাবপাত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৪.	হাটখোলার মেলা	হাটখোলা ঢাকা সদর	মহানাম কীর্তন	১৮ বৈশাখ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ বেঞ্চের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, শোলা শিল্প, শিশুতোষ খেলনা।
১৫.	কোমরবাগ মেলা	কোমরবাগ, ঢাকা	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও ব্রেত শিল্প, লৌহ শিল্প। শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচাকেনা হয়।

১৬.	নাগেরহাটা জেলা	নাগেরহাট, ঢাকা	নববর্ষ	১ বৈখাশ থেকে ৭ দিন	বাঁশ ও বেতের তৈরি থেকে উপকরণ, কাঠের আসবাব ৭ দিন পত্র, মটির পুতুল। সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের উপকরণ।
১৭.	চিন মেলা	গলাটামারা, ঢাকা	বৈশাখী	১ বৈশাখ	বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী তার মধ্যে মাটির হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র বেচা-কেনা হয়।
১৮.	গোলারটেক মেলা	গোলারটেক, ঢাকা	বৈশাখী	১ বৈশাখ	বাঁশ-বেতের সামগ্রী, লৌহ, কাঠের মাটির কাজ ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়।
১৯.	দিঘাঁও মেলা	দিঘাঁও কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	বৈশাখী	১ বৈশাখ	ঐ
২০.	কারিদ মেলা	কারিদ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	বৈশাখী	১ বৈশাখ	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহশিল্প, শিশুদের খেলনা জাতয়ি দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয।
২১.	সাবহাটা মেলা	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	বার্ষিক	১ বৈশাখ	ঐ
২২.	মিরপুর মেলা	মিরপুর, ঢাকা	বৈশাখী	১ বৈশাখ	বাঁশ-বেতের সামগ্রী, লৌহ, কাঠের, মাটির কাজ ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়।
২৩.	গোষ্ঠের মেলা	কয়লা উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ।	পূজা	১ বৈশাখ ১ দিন।	পাটি, কাঠের আসবাবপত্র, মাটির সামগ্রী, খেলনা পুতুল, প্লাস্টিকের সামগ্রী ইত্যাদি বেচা কেনা হয়।
২৪.	গোষ্ঠের মেলা	হাটিকুমরুল উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ ।	পূজা	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
২৫.	শুভাজা মেলা	শুভাজা কেরানীগঞ্জ।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	খেলনা পুতুল, আয়না, চিরুনি ও কাঠের আসবাবপত্র এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৬.	চাঁদপুর মেলা	চাঁদপুর পুরানবাজার চাঁদপুর সদর।	বার্ষিক	১ বৈশাখ ১ দিন।	চাঁদপুরের শীতল পাটি, মৌসুমী ফল-মূল, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
২৭.	কালীবাড়িমেলা	কালীবাড়ি চাঁদপুর চাঁদপুর বাজার।	বার্ষিক	১ বৈশাখ হতে ২ দিন।	এ মেলার প্রধান আকর্ষণ পুতুল নাচ, নাগরদোলা, শিশুদের রঙিন খেলনা, প্লাস্টিক সামগ্রী।
২৮.	মহিসার মেলা	মহিসার ভেদরগঞ্জ শরীয়তপুর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	মাটির পুতুল, নকল ধাতব গহনা, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, খেলনা সামগ্রী, শীতল পাটি, প্লাস্টিক সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৯.	মোস্তফাপুর মেলা	মোস্তাফাপুর মাদারীপুর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
৩০.	ভুজেশ্বর মেলা	ভুজেশ্বরবাজার ভুজেশ্বর নড়িয়া শরীয়তপুর।	হালখাতা	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	কুটির শিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প এবং বিবিধ শিল্প সামগ্রী বেচা-কেনা হয় সেই সঙ্গে লোকসংগীতের আসর।
৩১.	তিতুরকান্দি মেলা	তিতুরকান্দি আলফাডাঙ্গা ফরিদপুর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	ঐ
৩২.	বিলাস খান মেলা	বিলাস খান পালং শরীয়তপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	মাটির খেলনা, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেত শিল্প ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৩৩.	কালীগাছতলা মেলা	শাহপুর শ্যামগ্রাম নবীনগর বি-বাড়িয়া	পূজা	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেত, শিল্প, মাটির পুতুল, পূজার সামগ্রী, চিত্র বিনোদনের পুতুল নাচ।
৩৪.	বিপিন চাঁদ ঠাকুরের মেলা	কেশুয়া ভাঙ্গা বরিশাল।	বিপিন চাঁদের জন্মোৎসব	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মাটির পুতুর, প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি বেচা-কেনা হয় সেই সঙ্গে ভক্ত নারী-পুরুষের সমাবেশ।

৩৫.	সিদ্ধেশ্বরী মেলা	পিরিজকান্দি সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ।	সিদ্ধেশ্বরী পূজা	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	ঐ
৩৬.	বাঁকাল সিদ্ধপীঠ মেলা	বাঁকালসিদ্ধ পীঠ মন্দির বরিশাল।	সিদ্ধপীঠ পূজা	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	কাঠের তৈরির আসবাবপত্র, মৃৎ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প। এছাড়াও মিষ্টি জাতীয় খাবার-দাবার বেচা-কেনা হয়, সেই সঙ্গে ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ।
৩৭.	ভুবনমঙ্গল উৎসব ও মেলা	আনন্দময়ী কালী বাড়ি বি-বাড়িয়া	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের তৈরি দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়। সেই সঙ্গে পুতুল নাচ, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
৩৮.	কীর্তন মহোৎসব	ফুলঝুড়িগ্রাম পাইকবাড়ী বরগুনা।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৯.	বিজু উৎসব	উপজাতীয়দের বার্ষিক উৎসব পার্বত্য চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	উপজাতীয় নর-নারী ও কিশোর-কিশোরীর সমাবেশ, আনন্দ উৎসব ও মেলার যাবতীয় কারুপণ্যের সমাহার।
৪০.	বুড়াশিব ঠাকুরের মেলা	তিতুরকান্দি আলফাডাঙ্গা ফরিদপুর।	বুড়াশিব ঠাকুরের পূজা	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মাটির পুতুল, কাঠের আসবাবপত্র। খাবার সামগ্রীর মধ্যে খৈ, খেলনা, মণ্ডা-মিঠাই ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৪১.	মানসিক নিবেদনের মেলা	ভরতকালী রংপুর।	কালী মন্দিরের পূজা	বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার দিন।	বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪২.	বদরপিরের ওরস ও মেলা	আন্দর কিল্লা চট্টগ্রাম।	পিরের ওরস	১ বৈশাখ হতে ৩ দিন।	ভক্তদের সমাবেশ এবং খেলনা সামগ্রী ও মৌসুমী ফলমূল বেচা-কেনা হয়।

৪৩.	পোড়াবাড়িয়া, মেলা	পোড়াবাড়িয়া পাঠুয়াভাঙ্গা পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	বিভিন্ন প্রকার সজ-মসলা ও কাঠের আসবাবপত্র, খৈ, মুড়ি-মুড়কি, খেলনা, প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী, মাটির পুতুল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪৪.	চিলাইমেলা	কুদালিয়া পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ।	চিলাই মেলা	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	বিভিন্ন প্রকার সজ-মসলা ও কাঠের আসবাবপত্র। এছাড়াও খাবার উপকরণের মধ্যে খৈ, মুড়ি, মুড়কি, প্লাস্টিকের খেলনা, মাটির খেলনা, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৪৫.	চিলাইমেলা	চিলাকারা পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ।	চিলাই মেলা	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৬.	চিলপূজার মেলা	মাতিয়া কিশোরগঞ্জ।	চিলপূজা	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	শিশুদের খেলনা সামগ্রী মণ্ডা-মিঠাই খৈ কেনা-বেচা হয়।
৪৭.	মনিপুর ঘাট বান্নি	মনিপুর ঘাট কিশোরগঞ্জ।	বৈশাখী বান্নি	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	ঐ
৪৮.	বৈশাখী মেলা	গলাকাটাবাজার গফরগাঁও ময়মনসিংহ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের শিল্প, লৌহ শিল্প, শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪৯.	বৈশাখী মেলা	বটতলার বাজার গফরগাঁও ময়মনসিংহ।	বৈখাশী মেলা	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫০.	বৈশাখী মেলা	বটতলার বাজারগফরগাঁও ময়মনসিংহ।	বৈশাখী মেলা	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	মাটির হাঁড়ি-পাতিল, লৌহ শিল্প,বাঁশ ও বেত শিল্প এবং ছেলে-মেয়েদের খেলনা জাতীয় দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৫১.	বৈশাখী মেলা	কান্দিপাড়া বাজার গফরগাঁও ময়মনসিংহ।	বৈশাখী মেলা	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৫২.	বৈখাশী মেলা	বাংলা একাডেমী।	বৈশাখী মেলা	১ বৈশাখ থেকে ১৫ দিন।	১ বৈশাখের সকালে নববর্ষ আহবান, লোকনৃত্য, লোক গাথার অনুষ্ঠান, লাঠিখেলা শিশুদের নৃত্য ও রকমারী পণ্যসামগ্রীর বিপণনে একাডেমী প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে উৎসব মুখর।
৫৩.	বৈশাখী মেলা	লোকশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণ সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ১ মাস।	কবি, জারিসারি, বাউল ও লৌকিক খেলাধুলা ও কারূপণ্য সামগ্রীর বিরাট সমাবেশ। সেই সঙ্গে থাকে নানারকম খাদ্য দ্রব্য।
৫৪.	বৈশাখী মেলা	বিসিক ধানমন্ডি ৮ নং মাঠ ঢাকা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ১৫ দিন।	দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কারূপণ্যের বিরাট সমাবেশ। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন।
৫৫.	রূপসামেলা	রূপসা ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	মাটির আসবাবপত্র, পুতুল, খেলনা জাতীয় সামগ্রী, মৌসুমী ফলমূল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
৫৬.	চরমুগিয়া মেলা	চরমুগিয়া ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	ঐ
৫৭.	ঘাঠিয়ারা মেলা	ঘাটিয়াবাজার ঘাটিয়ারা বি-বাড়িয়া।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প, শিশুদের খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৫৮.	মটতলা মেলা	মণিঅন্দ কসবা বি-বাড়িয়া।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫৯.	ভিডঘর মেলা	ভিডঘর বাজার নবীনগর, বি-বাড়িয়া।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬০.	আটলা মেলা	আটলা মাছিহাতা বি-বাড়িয়া।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন	ঐ
৬১.	সুলতানপুর মেলা	সুলতানপুর বাজার হরষপুর, বি-বাড়িয়া	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৬২.	নবীপুর মেলা	নবীপুর মুরাদনগর কুমিল্লা।	বার্ষিক	১ বৈশাখ	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প, দেশী ফলমূল। এছাড়াও শিশুদের খেলনা সামাগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৩.	মংলার গাছতলার মেলা	মংলার গাঁও বৈদ্যের বাজার নারায়ণগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র, হস্ত শিল্প এবং মৌসুমী ফলমূল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬৪.	সিরাজ দিঘা মেলা	সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন শিল্পের সমাহার। এ ছাড়াও মৌসুমী ফলমূল ও শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৫.	কাউরাইদ মেলা	কাউরাইদ গাজীপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বাঁশ ও বেতের তৈরি উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প মণ্ডা মিঠাইসহ শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৬.	বাসুদেবাড়ি মেলা	বাসুদেববাড়ি বিয়ানীবাজার মৌলভীবাজার।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	শিশুদের যাবতীয় খেলনা সামগ্রী, মৌসুমী ফলমূলসহ বিভিন্ন শিল্পের সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৭.	চন্দ্রপুর মেলা	চন্দ্রপুর রাজশাহী।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	ঐ
৬৮.	শিবগঞ্জ মেলা	শিবগঞ্জ বগুড়া।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	ঐ
৬৯.	রায়পুর মেলা	রায়পুর দরগাপুর চরভাদ্র দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি, মাটির তৈরি পুতুল, কাঠের আসবাবপত্র, মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭০.	সীডহাস্তাবাড়ী মেলা	সীডহাস্তাবাড়ী কতোয়ালী ফরিদপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৭১.	বুড়ী মেলা	লাকসীমিকুলা গোয়ালন্দঘাট রাজবাড়ী।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প, শিশুদের খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৭২.	বাঙ্গালপাড়া মেলা	বাঙ্গালপাড়া অষ্ট্রগ্রাম	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা সামগ্রী, খৈ, মিষ্টিজাতীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৭৩.	পীরগঞ্জ কলেজ মেলা	পীরগঞ্জ কলেজ প্রাঙ্গণ দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	শিশুদের যাবতীয় খেলনা সামগ্রী, মৌসুমী ফল-মূল বিক্রি ও বিভিন্ন খেলাধুলা হয়ে থাকে।
৭৪.	তাশাই হাইস্কুল মেলা	তাশাই হাইস্কুল পার্বতীপুর দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী, লৌহ শিল্প ও দেশী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৭৫.	পার্বতীপুর কলেজ মেলা	পার্বতীপুর কলেজ দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৭৬.	দেওইল মেলা	দেওইল পার্বতীপুর দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
৭৭.	হাবিবপুর মেলা	হাবিবপুর চরভাদ্র কুড়িগ্রাম।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেতের তৈরি শিল্প ও শিশুদের খেলনা জাতীয় দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৭৮.	পাইকণ ফুলপুর মেলা	পাইকণ ফুলপুর চরভাদ্র কুড়িগ্রাম।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
৭৯.	কুতুবডাঙ্গা মেলা	কুতুবডাঙ্গা কালীবাড়ি চরভাদ্র কুড়িগ্রাম।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের নানা রকম আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল, খৈ, মুড়ি, মৌসুমী ফলমূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮০.	পুলপুর	পুলপুর চরভাদ্র কুড়িগ্রাম।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৮১.	পশ্চিম সীতারা মেলা	পশ্চিম সীতারা চরভাদ্র কুড়িগ্রাম।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
৮২.	কমলদীঘি মেলা	কমলা দিঘি চরভাদ্র কুড়িগ্রাম।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	মেলাটি অতি প্রাচীন
৮৩.	পাকচরাগতি মেলা	পাকচরগাতি কোতোয়ালী দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	এ মেলার মধ্যে কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী, শিশুদের খেলনা, মৌসুমী ফলমূল বেচা-কেনা হয়।
৮৪.	বেলবাড়ি মেলা	রাশিগঞ্জ (বেলবাড়ি) কোতায়ালী দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মাটির পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৮৫.	ভোলাকালীর মেলা	ভোলাকালী কতোয়ালী দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
৮৬.	গোষ্ঠ মেলা	কোতয়ালী দিনাজপুর।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৮৭.	বারুণী মেলা	কামারগাঁ পুটিয়া রাজশাহী	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	এ মেলার প্রধান আকর্ষণ, বিভিন্ন শিল্পের সমাহার, তার মধ্যে বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের শিল্প, লৌহ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৮৮.	মির্জাপুর মেলা	মির্জাপুর রাজশাহী।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ১৫ দিন।	বাঁশ ও বেতের তৈরি আসবাবপত্র, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, পুতুল নাচ, সার্কাস শিশুদের যাবতীয় খেলনা জাতীয় দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয়।

৮৯.	নবগ্রামকালীর মেলা	নবগ্রাম চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	পূজা	১ বৈশাখ	মাটির তৈরি সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের উপকরণ, খাবারের মধ্যে খৈ, মুড়ি-মণ্ডা, মিঠাই ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হ।
৯০.	হাওয়ামুড়ি মেলা	হাওয়ামুড়ি মুরাদনগর কুমিল্লা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র তার মধ্যে কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী, শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৯১.	ভোলাচং মেলা	ভোলাচং নবীনগর বি-বাড়িয়া	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ বেতের তৈরি সামগ্রী, শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচাকেনা হয়।
৯২.	বাকাইল মেলা	বাকাইল বি-বাড়িয়া।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ১৪ বৈশাখ।	ঐ
৯৩.	প্রেমতলী মেলা	প্রেমতলী নিয়ামতপুর নওগাঁ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৯৪.	বহিরয়া মেলা	বহরিয়া চাঁদপুর।	বার্ষিক	১ বৈশাখ	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের শিল্প, লৌহা শিল্প, এ ছাড়াও শিশুদের খেলনা সামগ্রী ও মেয়েদের প্রসাধনী সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৯৫.	কালীবাড়ি মেলা	কালীবাড়ি বি-বাড়িয়া।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	নববর্ষের বিভিন্ন রকমের খাবার-দাবার, এছাড়াও খেলনা সামগ্রী ও মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
৯৬.	ফুলঝুড়ী মেলা	ফুলঝুড়ী পাইকবাড়ী বরিশাল।	নববর্ষ	১ বৈশাখ	ঐ
৯৭.	বাঁকাল সিদ্ধিপীঠ মেলা	বাঁকাল সিদ্ধিশ্বরী মন্দির বরিশাল।	সিদ্ধিপীঠ স্মরণোৎসব	১ বৈশাখ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৯৮.	জন্মোৎসব মেলা	গাজিয়া বরিশাল।	জন্মোৎসব	১ বৈশাখ	ঐ
৯৯.	কনকসার মেলা	কনসকার তারাপাশা সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেতের তৈরি উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের উপকরণ।
১০০.	গাওদিয়া মেলা	তারা পাশা গাওদিয়া সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১০১.	ইচ্ছাপুর মেলা	সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১০২.	বড়াইখালী মেলা	শ্রীনগর তারপাশা সিরাজ দিঘা মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র, তার মধ্যে লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র ও শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১০৩.	ভাগ্যকুল মেলা	ভাগ্যকুল কাদিরপুর মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	ঐ
১০৪.	শ্যামসিদ্ধি মেলা	শ্যামসিদ্ধি কাদিরপুর স্টীমারঘাট মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	ঐ
১০৫.	তালতলা মেলা	তালতলা রেকাবীবাজার মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	কাঠের তৈরি সামগ্রী, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঁসা শিল্প, লৌহ, শিল্প ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১০৬.	শ্রীনগর মেলা	শ্রীনগর মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী তার মধ্যে মাটির হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা, সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০৭.	চিন মেলা	ঘোড়াশাল নরসিংদী।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বাঁশ-বেতের সামগ্রী, লৌহ, কাঠের; মাটির কাজ ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়।
১০৮.	বান্নী আনন্দ মেলা	নতুনবাজার চুনারুঘাট হবিগঞ্জ।	মেলা	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১০৯.	দুরমুট ওরস মেলা	দুরমুট জামালপুর।	ওরস উপলক্ষে	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, বিভিন্ন শিল্পের উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় মেলার আকর্ষণ।
১১০.	বৈশাখী মেলা	তিনআনী বাজার শেরপুর	বৈশাখী	১ বৈশাখ	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী, শিশুদের খেলনা জাতীয় দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১১১.	গাড়িদাহ মেলা	গাড়িদাহ শেরপুর।	রাধা অষ্টমী স্নান	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	ঐ
১১২.	আমতলী মেলা	আমতলী চিরির বন্দর দিনাজপুর।	গরু-মহিষ বিক্রয়	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	সার্কাস, পুতুলনাচ; এছাড়াও কাঠের আসবাবপত্র, মণ্ডা-মিঠাই ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়ে থাকে।
১১৩.	কালীবাড়ি মেলা	নরসিংদী সদর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	বাঁশ ও বেতের দ্রব্য সামগ্রী ছাড়াও মৃৎশিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, শিশুদের খেলনা উপকরণ ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১১৪.	তালতলা মেলা	ঘোড়াশাল নরসিংদী।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মাটির তৈরি পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল, এং শিশুদের খেলনা জাতীয় দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১১৫.	সিরাজদিখান মেলা	সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	ঐ
১১৬.	তালতলি মেলা	তালতলী সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ

১১৭.	ফুলপুরের বান্নী	ফুলপুরের বান্নী চিরিরবন্দর দিনাজপুর।	হিন্দুদের বউমেলা	১ বৈশাখ থেকে ১ মাস।	এই উপলক্ষে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রীর বিরাট সমাবেশ হয় সেই সঙ্গে যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ, নাগরদোলা।
১১৮.	বৈশাখী মেলা	পাচ্চর বাজার শিবচর মাদারীপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র, তার মধ্যে কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১১৯.	বৈশাখী মেলা	বাবুবাড়ি শিবচর মাদারীপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	ঐ
১২০.	বৈশাখী মেলা	গোলার বাজার শিবচর মাদারীপুর।	বৈখাশী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১২১.	দরগাতলা মেলা	পাংগাশী রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ বেতের দ্রব্য সামগ্রী, লৌহ শিল্প, হস্ত শিল্প, শিশুদের খেলনা জাতীয় উপকরণ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১২২.	লিরাটঘাটি মেলা	চান্দাইকোনা রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১২৩.	সিদ্ধেশ্বরী মেলা	গুরকা তাড়াশ পাবনা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	মাটির তৈরি পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১২৪.	কর্মা মেলা	কর্মা দিনগ্রাম তাড়াশ পাবনা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১২৫.	আংগড়া মেলা	আংগড়া উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য মণ্ডা-মিঠাই, শীতল পাটি বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২৬.	তাওয়াইল মেলা	তাওয়াইল উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ	বৈশাখী	১ বৈশাখ	ঐ
১২৭.	বৈশাখী মেলা	বরালিদহা রাধানগর শ্রীনগর মাগুরা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ	বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী এবং বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, কাঁসা শিল্প খাবার-দাবার বেচা-কেনা
১২৮.	নিশীনাথ তলার মেলা	রূপগঞ্জ বাজার নড়াইল।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩০ বৈশাখ প্রতি শনি এবং মঙ্গলবার।	কাঠের আসবাবপত্র, শোলার তৈরি খেলনা, মণ্ডা-মিঠাই, এছাড়াও সার্কাস, পুতুল নাচ ইত্যাদির আয়োজন।
১২৯.	তিতুরাকন্দি মেলা	তিতুরকান্দি আলফাডাঙ্গা ফরিদপুর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ	নববর্ষের উপকরণ, এছাড়া বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প ও শিশুদের খেলনা, পুতুল, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৩০.	বৈশাখী মেলা	নওয়াব বাড়ি ধনবাড়ি মধুপুর টাঙ্গাইল।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মুৎশিল্প কাঠর তৈরি নানা রকমের আসবাবপত্র, খৈ-মুড়ি, মণ্ডা-মিঠাই ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৩১.	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ বাজার সুনামগঞ্জ।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন প্রকার বাঁশ-বেতের তৈরি সামগ্রী, লোহার উপকরণ, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৩২.	শ্যামপুর মেলা	শ্যামপুর ইটাখোলা মাধবপুর হবিগঞ্জ।	বৈশাখ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন	ঐ
১৩৩.	মাধাবপুর মেলা	মাধবপুর বাজার হবিগঞ্জ।	বেকপূজা উপলক্ষে	১ বৈশাখ ১ দিন।	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা জাতীয় সামগ্রী ও মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।

১৩৪.	বৈশাখী মেলা	রাউজান চট্টগ্রাম।	বর্ষবরণ	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প, শামুকের তৈরি মালা, কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৩৫.	বৈশাখী মেলা	সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম।	বর্ষবরণ	১ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	ঐ
১৩৬.	চিতামাই মেলা	পটিয়া চট্টগ্রাম।	বর্ষবরণ	১ বৈশাখ থেকে ৩০ দিন।	বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহামিলন ক্ষেত্র ও উৎসব, বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ছাড়াও কাঠের তৈরি আসবাবপত্র বেচা-কেনা হয়।
১৩৭.	কালীবাড়ির মেলা	দক্ষিণ আন্দার মানিক ছাগলনাইয়া ফেনী।	বৈশাখ	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেতের তৈরি আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প ও শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৩৮.	দোলবাড়ির মেলা	বাসুরা ফুলগাজী ফেনী।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, শিশুতোষ খেলনা বেচা-কেনা হয়।
১৩৯.	চৈত্র-সংক্রান্তি মেলা	সংসারবাজ কালীতলা লক্ষ্মীপুর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ	মৃৎশিল্প, কাঁসা শিল্প, নববর্ষের উপহার সামগ্রী, ছেলেমেয়েদের খেলনার উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৪০.	কালীর হাটমেলা	কালীরহাট লক্ষ্মীপুর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৪১.	ঘোড়াপিরের আস্তানা মেলা	বেতিকাপড়া ভেড়ামারা কুষ্টিয়া।	বার্ষিক ওরস	১ বৈশাখ থেকে ১ মাস।	আউল-বাউলের সমাবেশ, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি দ্রব্য সামগ্রী, মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা মিঠাই ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৪২.	লোহাগড়া মেলা	লোহাগড়া সোনাতলা শেরপুর বগুড়া।	স্নান উপলক্ষে	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	মাটির তৈরি পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

১৪৩.	গাংনগরের মেলা	গাংনগর সৈয়দপুর শিবগঞ্জ বগুড়া।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ১ মাস।	ঐ। সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
১৪৪.	ওটরা মেলা	ওটরা উজিরপুর বরিশাল।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মেলার সামগ্রী ও চিত্তবিনোদনের পুতুল নাচ, সার্কাস, এছাড়াও শিশুদের খেলনার উপকরণ বেচা-কেনা হয়।
১৪৫.	বৈশাখী মেলা	চাঁদশী গৌড়নদী বরিশাল।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৪৬.	দাড়িয়াপুর দরগাহ মেলা	দাড়িয়াপুর গাইবান্ধা।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৩০ বৈশাখ।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প এবং শিশুদের খেলনা উপকরণ, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
১৪৭.	ভরতখালী মেলা	ভরতখালী কালীবাড়ী গাইবান্ধা।	বৈশাখী	বৈশাখীর প্রতি শনি ও রবিবার	ঐ
১৪৮.	নলডাঙ্গা কলেজ মেলা	নলডাঙ্গা সাদুল্লাপুর গাইবান্ধা।	বৈশাখী মেলা	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৪৯.	মনুহরপুর মেলা	পলাশবাড়ী গাইবান্ধা।	বৈশাখী মেলা	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৫০.	রাজবিরাট মেলা	গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধা।	বৈশাখী	বৈশাখের প্রতি রবিবার।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার; তার মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৫১.	বৈশাখী মেলা	গহরপার্ক কুড়িগ্রাম।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১৫২.	সিন্দুরমতি মেলা	সিন্দুরমতি বাজার রংপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ১ মাস।	ঐ

১৫৩.	দে-পাড়া মেলা	দে-পাড়া ধোপাখালী কচুয়া খুলনা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৬ দিন।	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, কাঠের সামগ্রী, লৌহার বিভিন্ন উপকরণ, শিশুদের নানা রকম খেলনা ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৫৪.	খাসেরহাট চরবানারী মেলা	খাসেরহাট কচুয়া খুলনা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৬ দিন।	ঐ
১৫৫.	আন্দারমানিক মেলা	আন্দারমানিক কচুয়া খুলনা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	চিত্তবিনোদনের সমাহার, তার মধ্যে পুতুল নাচ, সার্কাস এবং বিভিন্ন খেলাধুলা। এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৫৬.	শান্তি খাসের মেলা	তারের পুকুর খুলনা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৪ দিন।	ঐ
১৫৭.	বড়ুয়া মেলা	বড়ুয়া বাজার কুমিল্লা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঁসা শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, এছাড়াও শিশুদের খেলনার উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৫৮.	কেমতলীকালী বাড়ির মেলা	কেমতলী কালীবাড়ি লাকসাম কুমিল্লা।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	ঐ
১৫৯.	গাজি সাহেবের মেলা	গাজির দরগাহ লাকসাম সদর কুমিল্লা।	১ বৈশাখ	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	আউল-বাউলের সমাবেশ। তার সাথে মেলার যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৬০.	বৈশাখী মেলা	কালইয়া বন্দর পটুয়াখালী।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	নববর্ষের উপহার সামগ্রী। এ ছাড়াও লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।

১৬১.	বৈশাখী মেলা	কামারগাঁও ভাগ্যকুল শ্রীনগর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	এই মেলায় চিত্তবিনোদনের সমাহার; তার মধ্যে পুতুল নাচ, নাগরদোলা, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৬২.	বৈশাখী মেলা	কনকদিয়া কালীবাড়ি পটুয়াখালী।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৬৩.	চন্দখালী মেলা মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।	মির্জাগঞ্জ পটুয়াখালী।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন জাতের আসবাবপত্র; তার মধ্যে কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং শিশুদের খেলনা উপকরণ ক্রয় বিক্রয় হয়।
১৬৪.	বৈশাখী মেলা	সাবুপুর বাউফল পটুয়াখালী।	বৈশাখ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার; তার মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৬৫.	বৈশাখী মেলা	কালিয়াপুর পটুয়াখালী।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৬৬.	ক্ষেড়ের গাহার মেলা	নন্দিনা বিয়ারা কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ।	বার্ষিক	বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, পাটি, মাদুর এবং শিশুদের খেলনা ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৬৭.	বগাদিয়া মেলা	বিন্নগাঁও প্রাইমারি স্কুল মাঠ মারিয়া কিশোরগঞ্জ।	বার্ষিক	বৈশাখের ১ম শনিবার	এ মেলার প্রধান আকর্ষণ প্রতিযোগিতামূলক ঘুড়ি উড়ানো। এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী এবং বিভিন্ন খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৮.	শাহ সুলতান সাহেবের ওরস	মহাস্থানগড় বগুড়া।	ওরস	বৈশাখ মাসের ১ম বৃহস্পতি ও শুক্র এবং শেষ বৃহস্পতিবার।	আউল-বাউল, সাধুসন্তের সমাবেশ, এছাড়াও পুতুল নচা, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, বাদ্যযন্ত্র, খাবার সামগ্রীর মধ্যে মুরলী, বাতাসা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৬৯.	রায়পুর মেলা	রায়পুর দরগাপুর চরভাদ্র দিনাজপুর।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১৭০.	কালীবাড়ি মেলা	কালীবাড়ি চানপুর টাউন চানপুর।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৭১.	নয়ারহাট মেলা	নয়ারহাট, ঢাকা।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	নববর্ষ অফুরন্ত আনন্দ উৎসব, চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, সার্কাস, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, শিশুদের মাটির খেলনা বেচা-কেনা হয়।
১৭২.	গোষ্ঠের মেলা	বয়লা উল্লাপাড়া পাবনা।	পূজা	বৈশাখ মাসে ১ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের দ্রব্য সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, শিশুদের খেলনা জাতীয় উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৭৩.	তাশাইল হাইস্কুল মেলা	তাশাইল হাইস্কুল প্রাঙ্গণ পার্বতীপুর দিনাজপুর।	স্কুল উন্নয়ন কল্পে	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	এই মেলায় চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, সার্কাস, এছাড়াও মাটির তৈরি সামগ্রী, লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১৭৪.	ওরস ও মেলা	চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	অসংখ্য লোকের সমাবেশ, এছাড়াও বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, বিভিন্ন খেলনা ও মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।

১৭৫.	উৎসব ও মেলা	তারণ দিয়া ময়মনসিংহ।	বার্ষিক	১ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, খেলনা, পালকি, বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৭৬.	বারুণী মেলা	কোনাবাড়ি শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, এছাড়াও শিশুদের খেলনা উপকরণ বেচা-কেনা হয়।
১৭৭.	নেকমরদের মেলা	নেকমদের রাণী শংকাইল ঠাকুরগাঁও।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	বিভিন্ন জাতের মৌসুমী ফল-মূল ও কাঁসা শিল্প, খেলনা জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী, মৃৎশিল্প ও মেয়েদের প্রসাধান ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৭৮.	মোরগাছা মেলা	চান্দিয়া-কোনা রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	বৈশাখী	১ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৭৯.	বৈশাখী মেলা	শ্রীমতি (শ্রীমদি) হোমনা কুমিল্লা।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৮ দিন।	নববর্ষের উপহার সামগ্রী, বাঁশ ও বেতের উপকরণ ও শিশুদের খেলনা জাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা হয়।
১৮০.	বৈশাখী মেলা	কামারগাঁও ভাগ্যকুল শ্রীনগর মুন্সীগঞ্জ।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ১৪ দিন।	নাগরদোলা, মোড় দৌড় যাত্রা, কীর্তন; পুঁতিরমালা, বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন, মাটি, কাঠের আসবাব, খেলনা পুতুলও পাওয়া যায়। এছাড়াও বাঁশ বেতের সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৮১.	চৈতার বাড়ি মেলা	ভাঙ্গারহাট কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।	গঙ্গাপূজা	বৈশাখের প্রথম শুক্রবার।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র বাঁশ-বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

১৮২.	বৈশাখী মেলা	আশটা পশ্চিম গুষ্টি ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর।	নববর্ষ	১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	সার্কাস, নাগরদোলা, যাদুবিদ্যা, মাটির হাঁড়ি-পাতিল ও পুতুল, এছাড়াও বাঁশ ও বেতের উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৮৩.	কুণ্ডের মেলা	হরষপুর বি-বাড়িয়া।	বৈশাখ	বৈশাখের অমাবস্যা তিথি থেকে ৫ দিন।	এ মেলার চিত্তবিনোদনের সমাহার, তার মধ্যে পুতুল নাচ, সার্কাস, এছাড়াও লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৮৪.	শ্রীচৈতন্য মেলা	ঢাকা দক্ষিণ গোলাপগঞ্জ সিলেট।	বৈশাখী	২ বৈশাখ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
১৮৫.	ঠাণ্ডাকালীর মেলা	ঠাণ্ডাকালীর বাজার চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	বৈশাখী	২ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৮৬.	ব্রহ্মনাথ মেলা	মেড্ডা বি-বাড়িয়া।	কীর্তন	২ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং পূজার উপকরণ ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১৮৭.	রাজনগর মেলা	রাজনগর তারাপাশা সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	২ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	লোক শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, এছাড়াও মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১৮৮.	গোলাইয়া মেলা	কুকুতিয়া তারাপাশা সিরাজ-দিয়া মুন্সীগঞ্জ।	বৈশাখী	২ বৈশাখ থেকে ৬ দিন।	ঐ

১৮৯.	সাহারদ বাজার মেলা	সাহারদ বাজার লাকসাম কুমিল্লা।	বৈশাখী	২ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, মাটির পুতুল এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৯০.	ভাটজোর মেলা	ভাটজোর গৌরনদী বরিশাল।	বৈশাখী	২ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, শিশুদের খেলনা উপকরণ এবং মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১৯১.	উজিরপুর মেলা	উজিরপুর বরিশাল।	বৈশাখী	২ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, শিশুদের খেলনা উপকরণ এবং মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১৯২.	বৈশাখী মেলা	পাঁচজোড়া বাজার ঝিনাইগাতি শেরপুর।	বৈশাখী	২ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ-বেতের উপকরণ, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, বিভিন্ন দেশী খেলনা এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৯৩.	শ্রীমৎ ক্ষ্যাপা জীবনানন্দ-পরমংসের তিরোধান উৎসব	ধুনট বগুড়া।	বৈশাখী	২ বৈশাখ	পূজা সামগ্রী, ভক্ত নার-নারীর সমাবেশ, সেই সেঙ্গ মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, বাঁশ-বেতের উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৯৪.	মহোৎসব ও মেলা	গঙ্গাচন্না মোল্লারহাট তেরখাদা খুলনা।	মহোৎসব	৩ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ভক্তদের সমবেশ এবং কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা উপকরণ বেচা-কেনা হয়।

১৯৫	মোল্লারহাট মেলা	মোল্লাহাট গঙ্গাচন্না খুলনা।	স্মৃতি উৎসব	৩ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বাঁশ-বেতের উপকরণ,কাঠের আসবাবপত্র ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী শিশুদের খেলনা ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৯৬.	মাদাইখাল মেলা	মাদাই খাল কালীগঞ্জ, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম।	স্নান মেলা	৩ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৯৭.	ডেকতার মেলা	ডেকতা নাগরপুর টাংগাইল	বৈশাখী	৪ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৯৮.	হরিপাগলের মেলা	গুহসী নাগরপুর টাংগাইল।	বৈশাখী	৪ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৯৯.	চিলার মেলা	চিলা পিরোজপুর।	পূজা	৫ বৈশাখ	ঐ
২০০.	ওরস মেলা	শাফিয়া শরিফ রাজৈর মাদারীপুর।	ওরস	৫ বৈশাখ থেকে ৪ দিন।	ভক্তবৃন্দের সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার সব ধরনের সামগ্রী, চিত্তবিনোদনের বিচারগান, জারি গান।
২০১.	শীতলী মেলা	করপা স্বরূপকাঠি বরিশাল।	শীতলী পূজা	৫ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	মানতের দ্রব্য, মৃৎশিল্প, বাঁশ, বেত শিল্পের বিরাট সমারোহ।
২০২.	জন্মোৎসবের মেলা	বিপিনচাঁদ ঠাকুরের আশ্রম চিলাগ্রাম পিরোজপুর।	জন্মোৎসব	৫ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ
২০৩.	সরাইল বাজারের মেলা	সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	বৈশাখী	৭ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মাটির খেলনা-পুতুল, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মিষ্টিজাত খাবার-দাবার, চিত্তবিনোদনের পুতুল নাচ।
২০৪.	শীতলী মেলা	বাঁকাই কলেজ সংলগ্ন বরিশাল।	শীতলী পূজা	৭ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মানতের দ্রব্য, মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেত শিল্পের বিরাট সমাবেশ।
২০৫.	দেবীদাসকাঠি মেলা	দেবীদাসকাঠি বরিশাল।	বার্ষিক	৭ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	শিশুদের খেলনা সামগ্রী, মেয়েদের প্রসাধনের দ্রব্য, প্লাস্টিকের জিনিসপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

২০৬.	বাতিসার মেলা	বাতিসা চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	বৈশাখী	৮ বৈশাখ	ঐ
২০৭.	নবগ্রাম কালীর মেলা	নবগ্রাম চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	পূজা	৮ বৈশাখ	ঐ
২০৮.	শীতলী পূজা উৎসব	ভগীরত বাড়ি গৌরনদী বরিশাল।	ঐ	৯ বৈশাখ থেকে ৪ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, শিশুতোষ খেলনা, মৃৎশিল্প, চিত্তবিনোদনের সমাবেশ।
২০৯.	শীতলী মেলা	চাদসী গৌরনদী বরিশাল।	পূজা	৯ বৈশাখ থেকে ৪ দিন।	ঐ
২১০.	শীতলী মেলা	করপা সচ্চিদানন্দ আশ্রয়ম বরিশাল।	পূজা	৮ বৈশাখ থেকে ৪ দিন।	ঐ
২১১.	শীতলা মেলা	হাজীপুর নরসিংদী	পূজা	১০ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ভক্তসমাবেশ, মানতের দ্রব্য সামগ্রী, শিশুতোষ খেলনা, মৃৎশিল্পের সমাবেশ।
২১২.	জব্বারের বলি খেলার মেলা	লালদিঘির পাড় চট্টগ্রাম।	বর্ষবরণ	১২ বৈশাখ থেকে ১০ দিন।	বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁসা শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয় প্রধান আকর্ষণ বলি খেলা।
২১৩.	নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান	লক্ষ্মীপুর আনন্দময়ী কালীবাড়ি লক্ষ্মীপুর।	ধর্মীয়	১২ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	কাঠের তৈরি সমাগ্রী, বাঁশবেতের তৈরি উপকরণ, চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, এছাড়াও মাটির পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২১৪.	ফকিরতক্কার মেলা	ফকিরতক্কা কালার মাজার সরাইল বি-বাড়িয়া।	গাজীকালুর স্মৃতি উৎসব	১৩ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	মানতের দ্রব্য দরগায় দেওয়া এবং বিভিন্ন দেশীয় ফল-মূল ও খাদ্য সামগ্রী এবং খেলনার পুতুল ক্রয়-বিক্রয় হয়।

২১৫.	ভাদুঘর মেলা	ভাদুঘর বি-বাড়িয়া।	বৈশাখী	১৪ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বাঁশ-বেতের উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র ও লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ এবং দেশীয় ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
২১৬.	মহোৎসব	মহাপ্রকাশ মঠ হাটখোলা ঢাকা শহর।	কীর্তন মহোৎসব	১৪ বৈশাখ	পূজার দ্রব্য সামগ্রী, এছাড়াও লৌহ শিল্প, শোলা শিল্প, বাঁশ ও বেতের তৈরি শিল্প এবং ছেলেমেয়েদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২১৭.	ওরস ও মেলা	মাইজভাণ্ডার ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।	ওরস	১৪ বৈশাখ	ভক্ত ও আউল-বাউলের সমাবেশ এবং বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ-বেতের উপকরণ ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
২১৮.	কামালপুর মেলা	কামালপুর বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	বিরোধান উৎসব	১৪ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারী সমাবেশ, কাঠের আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, মেয়েদের প্রসাধন বেচা-কেনা হয়।
২১৯.	বার্ষিক ওরস	আমীরভাণ্ডার মঞ্জিল চট্টগ্রাম।	বার্ষিক ওরস	১৫ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল এবং বিভিন্ন শিল্প, তার মধ্যে কাঁসা শিল্প, মৃৎশিল্প, মাটির পুতুল, খেলনা সামগ্রী, তাছাড়াও বড় আকর্ষণ ভক্তদের সমাবেশ।
২২০.	বোল্লা মেলা	বোল্লা চান্দুয়া বি-বাড়িয়া	বৈশাখ	১৫ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বাঁশ-বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, খেলনা পুতুল এবং ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২২১.	মাইডের মেলা	মোরাাকটি উজিরপুর বরিশাল।	বৈশাখ	১৫ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ বেত শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২২২.	মেটেলের মেলা	পচাকাতলী রামেশ্বরপুর গাবতলী বগুড়া।	বার্ষিক	১৫ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	বিভিন্ন জাতের পণ্য দ্রব্য, মাটির পুতুল হাঁড়ি-পাতিল এবং দেশী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
২২৩.	পিরকাশীমপুর ওরস মেলা	পিরকাশীমপুর মুরাদনগর কুমিল্লা।	ওরস	১৯ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	আউল-বাউলের সমাবেশ। গান-বাজনা, বিভিন্ন জাতীয় খেলনা সামগ্রী এবং মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২২৪.	বিরল কলেজ মেলা	বিরল দিনাজপুর।	কলেজ উন্নয়নের জন্য	২০ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, সার্কাস, বিভিন্ন খেলা-ধুলা, মৃৎশিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেতের শিল্প এবং কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
২২৫.	কাঞ্চনপুর শ্মশান মেলা	কেশবপুর যশোর।	উৎসব	২২ বৈশাখ	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের তৈরি শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২২৬.	গাছবাড়িয়া মেলা	গাছবাড়িয়া রাধামাধবভবন চট্টগ্রামা।	আবির্ভাব	২২ বৈশাখা থেকে ২ দিন।	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মৌসুমী ফল-মূল এবং মেয়েদের প্রসাধন ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২২৭.	আমবাড়ির মেলা	আমবাড়ি চিরিরবন্দর দিনাজপুর।	স্কুল উন্নয়ন	২২ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	ঐ
২২৮.	বাইশারী মেলা	বাইশার জিঁউর বরিশাল।	বৈশাখী	২৩ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
২২৯.	বুধন্তী চণ্ডির মেলা	বুধন্ত চণ্ডিগাছতলা কুমিল্লা	পূজাৎসব	২৩ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

২৩০.	বার্ষিক ওরসে মেলা	মাইজভাণ্ডার দরগা ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।	ওরস	২৪ বৈশাখ	ভক্তদের সমাবেশ এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৩১.	করপা মেলা	করপা শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম বরিশাল।	আশ্রম উৎসব	২৪ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	পূজার সামগ্রী ও শিল্পের সমাহার।
২৩২.	উৎসব ও মেলা	বাহুরিয়া সর্বধর্ম ও সমাজ চাঁদপুর সদর।	বার্ষিক	২৫ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	দেশীয় পণ্য সামগ্রীর সমাবেশ। তারমধ্যে বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঁসা শিল্প, লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
২৩৩.	কীর্তন উৎসব	ফুলকুড়ি বরিশাল।	কীর্তন উৎসব	২৬ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	মৌসুমী ফল-মূল, এছাড়াও বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, এবং শিশুদের খেলনা ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৩৪.	কীর্তন মহোৎসব	তুষখালী বরিশাল।	কীর্তন, উৎসব	২৬ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	পূজার যাবতীয় উপকরণ ও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার এবং মেয়েদের প্রসাধান সামগ্রী।
২৩৫.	উৎসব ও মেলা	রঘুনাথপুর গোপালগঞ্জ।	উৎসব	২৬ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, সার্কাস এবং বিভিন্ন খেলাধুলা, এছাড়াও বাঁশ-বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র ও শিশুদের খেলনা উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৩৬.	উৎসব ও মেলা	শিবপুর ঢাকা।	কীর্তন	২৬ বৈশাখ থেকে ৭ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ। এ উপলক্ষে কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ বেতের সামগ্রী, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল নাচ, সার্কাস এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৩৭.	বাকচর মেলা	বাকচার ফরিদপুর।	জন্মোৎসব	২৬ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	ঐ
২৩৮.	উৎসব মেলা	আউড়া কাঁঠালিয়া বরিশাল।	উৎসব	২৭ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে আসবাবপত্র, বাঁশ, বেতের সামগ্রী ও শিশুদের খেলনা উপকরণ বেচা-কেনা হয়।
২৩৯.	ভুলু দেওয়ানের মেলা	বোগাদি যাত্রাপুর কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ।	বৈশাখী	২৮ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প এবং কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৪০.	উৎসব ও মেলা	নরসিংদী।	ধর্মীয়	২৮ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	লৌহ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, শিশুদের মাটির খেলনা, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৪১.	শিবপূজা ও মেলা	সাদুল্লারপুর পাবনা।	কীর্তন	২৮ বৈশাখ থেকে ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, তাঁত শিল্পের সামগ্রী এবং মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২৪২.	কালী বাড়ির মেলা	অস্করকালী বাড়ি বরিশাল।	কালীপূজা	২৯ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	বিভিন্ন প্রকার মৌসুমী ফল-মূল এবং মণ্ডা-মিঠাই, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৪৩.	ছাগলদাহ মেলা	ছাগলদাহ তেরখাদা খুলনা।	বৈশাখী	৩০ বৈশাখ থেকে ১ দিন।	কাঠ ও বাঁশের তৈরি আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, চিনির খেলনা, মণ্ডা-মিঠাই, দেশী ফলমূল পাওয়া যায়।
২৪৪.	হামছাদি পাগলা মেলা	হামছাদী বৈদ্যের বাজার নারায়ণগঞ্জ।	ঐ	৩০ বৈশাখ	বাঁশ বেত ও কাঠের তৈরি দ্রব্যাদি, মাটির তৈরি খেলনা পুতুল, আউল বাউলের সমাবেশ ও লোহার তৈরি দ্রব্য সামগ্রী কেন-বেচা হয়।

২৪৫.	লেরাইগাতি মেলা	লেরাইগাতি চান্দাইকোনা রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	বৈশাখী	৩০ বৈশাখ	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প এবং মৌসুমী ফল-মূল ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৪৬.	মোরাগাছা মেলা	মোরাগাছা চান্দাইকোনা রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	বৈশাখী	৩০ বৈশাখ	ঐ
২৪৭.	ধামশ্রেণী মেলা	ধামশ্রেণী উলীপুর কুড়িগ্রাম।	বৈশাখী	৩০ বৈশাখ	মৌসুমী ফল-মূল, শিশুদের খেলনা সামগ্রী, বাঁশ বেতের তৈরি পণ্য ও মেয়েদের প্রসাধন বিক্রয় হয়।
২৪৮.	আঠারখাদা মেলা	সিদ্ধেশ্বরী মঠ আঠারখাদা।	বার্ষিক	৩০ বৈশাখ	ঐ
২৪৯.	রাধাচক্কর মেলা	বল্লাপালপাড়া বল্লাবাজার টাঙ্গাইল	বৈশাখী	৩০ বৈশাখ থেকে ৫ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল লৌহ শিল্প ্বং চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুলনাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি।
২৫০.	কালীবাড়ি মেলা	বরাঙ্গাইল মানিকগঞ্জ।	কালীপূজা	৩১ বৈশাখ	নর-নারীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার মৌসুমী ফল, মূল। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার।
২৫১.	উৎসব ও মেলা	গড়পাড়া মানিকগঞ্জ।	বার্ষিক	৩১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মৃৎশিল্প, শিশুদের খেলনা এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জ্যৈষ্ঠ

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	দলুয়াগুরী মেলা	মোল্লারহাট বাগেরহাট।	বিশ্ববন্ধু বাগেরহাট।	১ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, শিশুদের খেলনা উপকরণ এবং মেয়েদের প্রসাধন ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২.	জন্মোৎসবের মেলা	শ্রীধাম ফরিদপুর।	জন্মোৎসব	২ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৭ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার সামগ্রিক সমাহার।
৩.	কালীবাড়ির উৎসব	দক্ষিণ রাজাপুর ফরিদপুর।	বার্ষিক	৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল পালকি, এছাড়াও বাঁশ-বেতের সামগ্রী, লোহার উপকরণ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪.	রাজাপুর মেলা	দক্ষিণ রাজাপুর কালিবাড়ি ফরিদপুর।	বার্ষিক	৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫.	পির কাসিমপুর ওরস মেলা	পির কাসিমপুর মুরাদনগর কুমিল্লা।	ওরস উপলক্ষে	৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	আউল-বাউলের সমাবেশ। ভক্ত নারূ পুরুষের সমাগম, এছাড়াও মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬.	মুহররমের মেলা	দৌলতপুর কুষ্টিয়া।	মুহররম	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৭ দিন।	মৃৎশিল্পের যাবতীয় সরঞ্জাম, শিশুতোষ খেলনা, প্লাস্টিক সামগ্রী, জারি গান ও কারবালার মার্শিয়া, শোক মিছিল।

৭.	কারবালার মেলা	গওনগর জাহানিবাদ মোহনপুর রাজশাহী।	মুহররম	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৭ দিন।	ঐ
৮.	পরিজনপাড়ার মেলা	পরিজনপাড়া খোপাখাটা মোহনপুর রাজশাহী।	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	ঐ	ঐ
৯.	মুহররমের মেলা	আজিমপুর ঢাকা।	মুহররম	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৫ দিন।	ঐ
১০.	মিঠাপুকুর বাজার মেলা	মিঠাপুকুর রংপুর।	মুহররম	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৭ দিন।	ঐ
১১.	জয়নগরহাট মেলা	জয়নগরহাট মিঠাপুকুর রংপুর।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৭ দিন।	ঐ
১২.	বড় দরগাহ মেলা	বড় দরগাহ পিরগঞ্জ রংপুর।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৩.	সঠিবাড়ি হাট মেলা	দুর্গাপুর মিঠাপুকুর রংপুর।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	ঐ
১৪.	মহেশ কোচার মেলা	আদিতমারী লালমিনর হাট।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	ঐ
১৫.	শাপটিবাড়ির মেলা	শাপটিবাড়ি আদিতমারী লালমনিরহাট।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	ঐ
১৬.	মুহররমের মেলা	হোসনি দালান ঢাকা।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৪ দিন।	ঐ
১৭.	মুহররমের মেলা	কামারগাঁ ভাতশালা বি-বাড়িয়া	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩৫ দিন।	ঐ
১৮.	মুহররমের মেলা	গড়পাড়া মানিকগঞ্জ।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ঐ

১৯.	মুহররমের মেলা	বাটাইমুড়ী রামদিয়ানাগী ঘিওর মানিকগঞ্জ।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ঐ
২০.	ছড়ারহাট মেলা	ছড়ারহাট বড়বালা মিঠাপুকুর রংপুর।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	ঐ
২১.	মুহররম মেলা	অষ্টগ্রাম কিশোরগঞ্জ।	ঐ	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	ঐ
২২.	হযরত শেখ সরফুদ্দিন গাজী বোয়ালীর পবিত্র ওরস	মুরাদপুর পাবলাইশ চট্টগ্রাম।	বার্ষিক ওরস	৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৪ দিন।	যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হয়।
২৩.	গজনীর মেলা	হিজলতলা কোতোয়ালী বরিশাল।	বাতিশা ফকিরের মেলা	৬ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	বহু আউল-বাউলের সমাবেশ, বিভিন্ন রকমের শিল্পজাত দ্রব্যের সমাহার এবং দেশীয় ফল-মূল ইত্রাদি বেচা-কেনা হয়।
২৪.	আউটপাড়া মেলা	আউটপাড়া নারায়ণ আশ্রম ময়মনসিংহ।	বার্ষিক	৭ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, এছাড়াও লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প এবং চিত্তবিনোদনের সমাহার।
২৫.	বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম মেলা	বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম নরসিংদী।	গৌরামহা প্রভুর স্মরণ উৎসব	৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	পূজার সামগ্রী ও পণ্য দ্রব্য বিক্রয় হয়।
২৬.	চণ্ডীগাছতলার মেলা	বুদন্তী কুমিল্লা।	বার্ষিক	৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার, তার মধ্যে বাঁশ, কাঁসা শিল্প, এছাড়াও দেশীয় ফল-মূল ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৭.	রাধামাধব মেলা	বাইশারী বরিশাল।	বার্ষিক	৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ঐ
২৮.	ফুলদোলার মেলা	কাঠামারী বাগেরহাট।	ফুলদোল	৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ঐ
২৯.	কালীবাড়ির মেলা	রাজাপুর ফরিদপুর।	বার্ষিক	৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	পূজার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩০.	কালীমন্দির মেলা	চিনিশপুর সাধক রামপ্রসাদ কালীমন্দির নরসিংদী।	কালী মন্দির উৎসব	৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	পূজার যাবতীয় সামগ্রী ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার এবং দেশীয় ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
৩১.	কালীপূজার মেলা	মানিকগঞ্জ।	পূজা উপলক্ষে	১১ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৩২.	কীর্তন ও মহোৎসবের মেলা	শতদশকাঠি আশ্রম ঝালকাঠি।	তিরোধান উপলক্ষে	জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় সোমবার	কীর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন গান, বাজনা এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩৩.	ডেমাজানি মেলা	কলমা মালঞ্চা কাহালু বগুড়া।	নিশানের মেলা	১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৫ দিন।	মেলার সমগ্র পণ্য সামগ্রী ক্রয়, বিক্রয় হয়। এছাড়াও চিত্তবিনোদনের বিপুল আয়োজন।
৩৪.	নিশানের মেলা	পুলিশ লাইন বহুড়া।	ডেমাজানি	১৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৫ দিন।	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, এছাড়াও বিভিন্ন রকমের দেশী ফলমূল, যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা হয়।
৩৫.	কেল্লাকুশি জামাই আদরের মেলা	কেল্লাকুশি বগুড়া।	জামাই আদরের মেলা	১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৫ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৩৬.	পিরমঞ্জিল মেলা	পিরমঞ্জিল হোসেনপুর বরিশাল।	বার্ষিক	১৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ। এছাড়াও বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা হয়।
৩৭.	বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম মেলা	বিষ্ণুপ্রিয়া আশ্রম নরসিংদী।	বার্ষিক	১৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ বেতের সামগ্রী, বিভিন্ন শিল্প ছাড়াও শিশুদের খেলনা উপকরণ বেচা-কেনা হয়।
৩৮.	জংলীপিরের ওরস ও মেলা	জোয়ারা পটিয়া চট্টগ্রাম।	ওরস	১৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত সমাবেশ এবং বিভিন্ন শিল্পের সমাহার শিশুদের মাটির তৈরি খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩৯.	ভগবত আশ্রম মেলা	ভগবত আশ্রম নরসিংদি।	বার্ষিক	১৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন রকমের দেশী ফল-মূল ও বাঁশ বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র এবং মেয়েদের প্রসাধন বেচা-কেনা হয়।
৪০.	শ্রীশির মন্দিরের মেলা	মত্তপটন।	বার্ষিক	১৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৪১.	আশ্রম মেলা	পানসিপাড়া গোসাই ফকির চাঁদের আশ্রম রাজশাহী।	স্নান উপলক্ষে	১৭ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	পূজার সামগ্রী, বিভিন্ন শিল্পের সমাহার, এছাড়াও শিশুদের খেলনা বেচা-কেনা হয়।
৪২.	ঝালকাঠি মেলা	ঝালকাঠি।	বার্ষিক	১৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, মৃৎশিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৩.	বাখরকাটি মেলা	বাখরকাটি বরিশাল।	বার্ষিক	১৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৪.	কলসকাটি মেলা	কলসকাটি বরিশাল।	বার্ষিক	১৮ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪৫.	বারদী আশ্রম মেলা	বারদী আশ্রম নারায়ণগঞ্জ।	বার্ষিক	১৯ জ্যৈষ্ঠ	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, চিত্তবিনোদনের সমাহার এবং দেশী ফল-মূল ইত্যাদি বিক্রয় হয়।
৪৬.	ওরস ও মেলা	নূরীশাহদরবার ফরিদপুর।	ওরস	১৯ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	আউল-বাউলের সমাবেশ। বিচার গান ও মেলার সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়।
৪৭.	লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মেলা	বৈদ্যের বাজার ঢাকা।	বর্ষিক	১৯ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৮.	কাঁঠালতলী মেলা	কাঁঠালতলী কালিয়াকৈর গাজীপুর।	পূজা ২ দিন	ঐ	ঐ
৪৯.	সাধুর বটতলীর মেলা	ফকিরহাট, বাগেরহাট।	কালীপূজা ৩ দিন।	অমাবস্যা তিথি	ঐ
৫০.	খুদির গাছ তলার মেলা	ঐ	কালীপূজা ৪ দিন।	ঐ	ঐ
৫১.	আম-কাঁঠালের ভোগ মেলা	কাঁঠালতলী কালিয়াকৈর গাজীপুর।	পূজোৎসব ২ দিন।	মাসের শেষ শনিবার	ঐ
৫২.	শকুরের হাট মেলা	শুকুরের হাট ময়েমপুর মিঠাপুকুর রংপুর।	মহরম	৪ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ দিন।	ঐ
৫৩.	মুহররম মেলা	মানিকগঞ্জ স্টেডিয়াম মাঠ মানিকগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ভক্ত সমাবেশ
৫৪.	শ্যামপুর মেলা	শ্যামপুর ঢাকা।	বার্ষিক	২২ জ্যৈষ্ঠ	মেলার যাবতীয় সামগ্রী এবং শিশুদের খেলনা উপকরণ।

৫৫.	কালী মন্দিরের উৎসব ও মেলা	চিনিশপুর নরসিংদী।	বার্ষিক পূজা	২২ জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩ দিন।	পূজার উপকরণ, বিভিন্ন প্রকার পুতুল, মিষ্টি জাতীয় খাবার-দাবার, মণ্ডা-মিঠাই ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৫৬.	বোলপুরের মেলা	বোলপুর বরিশাল।	বার্ষিক	২২ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	বাঁশ বেতের উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহশিল্প, কাঁসা শিল্প, চিত্তবিনোদনের সমাহার।
৫৭.	শৈলবুনিয়াধাম মেলা	শৈলবুনিয়াধাম বরিশাল।	রূপচাঁদ ঠাকুরের উৎসব	২২ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	ঐ
৫৮.	তাঁতিবাজারের মেলা	তাঁতিবাজার জগন্নাথ মন্দির ঢাকা।	স্নান যাত্রা	২২ জ্যৈষ্ঠ	ঐ
৫৯.	মহাস্থানের মেলা	মহাস্থান শিবগঞ্জ বগুড়া।	স্নান উপলক্ষে	২৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে ২ দিন।	পূজার সামগ্রী ছাড়াও মেলার যাবতীয় উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬০.	কালিয়াকৈর মেলা	কালিয়াকৈর গাজীপুর।	বার্ষিক	২৮ জ্যৈষ্ঠ	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং বিভিন্ন শিল্পের সমাহার ছাড়াও শিশুদের খেলনা উপকরণ বেচা-কেনা হয়।
৬১.	বামৈ অমৃত মেলা	বামৈ অমৃতমনির আশ্রম সিলেট।	সরস্বতী আবির্ভাব উৎসব	২৯ জ্যৈষ্ঠ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, শীতল পাটি ছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬২.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	পূর্ববড়কোঠা বরিশাল।	তিরোধান উৎসব	৩০ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১ দিন।	উক্ত উৎসবের জন্য বহুলোকের সমাবেশ ও সমাগম ছাড়াও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৩.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	ফতেপুর ময়মনসিংহ।	তিরোধান উৎসব	৩০ জ্যৈষ্ঠ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৬৪.	শনি আশ্রমের মেলা	দনিয়ার ডেমরা।	বার্ষিক উৎসব	৩১ জ্যৈষ্ঠ	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, শিশুদের খেলনা ও উপকরণ ইত্যাদি।
৬৫.	আশ্রম মেলা	পানসিপাড়া ফকির চাঁদের আশ্রম (গোসাই) রাজশহী।	স্নান উপলক্ষে	৩১ জ্যৈষ্ঠ	ভক্ত সমাবেশ ও সমাগম এবং মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৬.	নিশানের মেলা	জামুন্না আড়িয়া সদর বগুড়া।	নিশানের মেলা	জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ম শুক্রবার।	মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬৭.	বুড়শীব মেলা	নবাবগঞ্জ	হিন্দুদের বউমেলা	জ্যৈষ্ঠ মাসের বৌদ্ধপূর্ণিমা থেকে ১৫ দিন	ঐ
৬৮.	কালুডাংগার মেলা	নওয়াপাড়া খানগ্রাম বাঘারপাড়া যশোর।	হাজা-ঠাকুরের পূজা	জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ মঙ্গল ও শনিবার।	শিশুতোষ খেলনাসহ মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬৯.	লাঙ্গলবন্দ মেলা	লাঙ্গলবন্দ নারায়ণগঞ্জ।	স্নান	অষ্টমী তিথির স্নানের তারিখ অনুযায়ী ৩ দিন	ভক্ত সমবেশসহ মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭০.	গোয়ালঘাট মেলা	লক্ষ্মীপুর ঢাকা	স্নান	ঐ	ঐ
৭১.	গোষ্ঠের মেলা	সাতিয়ানতলী সিরাজগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ
৭২.	বারুণী স্নানের মেলা	আরিচাঘাট শিবালয় মানিকগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

আষাঢ়

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	গঙ্গারামপুর মেলা	গঙ্গারামপুর শালিখা মাগুরা।	গঙ্গা স্নান	২ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল ছাড়াও দেশীয় ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
২.	জগন্নাথের স্নান যাত্রার মেলা	তাঁতিবাজার ঢাকা।	জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা	৫ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	মাটির খেলনা পুতুল প্লাস্টিক সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই।
৩.	ওরস মেলা	কালুশাহ দরবার পটুয়াখালী।	বার্ষিক	৫ আষাঢ়	ভক্ত সমাবেশ।
৪.	কীর্তন মেলা	আবদুল্লাপুর ঢাকা।	স্নান যাত্রা	৫ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মহিলাদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি কেনা-বেচা হয়।
৫.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	খলিলপুর দেবীদ্বার কুমিল্লা।	বিরোধান উৎসব	৬ আষাঢ়	পূজার সামগ্রী ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬.	তিরোধান উৎসব মেলা	বৈরাটী গৌরী আশ্রম নেত্রকোনা।	তিরোধান উৎসব	৭ আষাঢ়	পূজার সামগ্রী ছাড়াও বিভিন্ন মৃৎ, বাঁশ ও বেত শিল্প ও শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭.	তিরোধান ও নামযজ্ঞ মহোৎসবের মেলা	কলসকাঠি ঝালকাঠি বরিশাল।	তিরোভাব ও নামযজ্ঞ	৭ আষাঢ়	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৮.	গড়াইটিপির মেলা	গড়াইটিপির হাট ডিংগেদা, কুষ্টিয়া।	বার্ষিক	৭ থেকে ১৩ আষাঢ় পর্যন্ত।	ঐ
৯.	আমবাতি মেলা	তেমরী মেটেরী, খেজুরতলা, ঝিনাইদহ।	আমবাতি	৮ থেকে ১৩ আষাঢ় পর্যন্ত।	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
১০.	তাহেরপুর মেলা	তাহেরপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	বার্ষিক	৯ আষাঢ়	মেলার যাবতীয় সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।
১১.	কুড়াল মেলা	গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	বার্ষিক	৯ আষাঢ়	ঐ
১২.	লালুর মেলা	লালুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	বার্ষিক	৯ আষাঢ়	ঐ
১৩.	আবির্ভাব উৎসব ও মেলা	বামৈ, অমৃতমনির আশ্রম, সিলেট।	আবির্ভাব উৎসব	১১ আষাঢ়	পূজার উপকরণ এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৪.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	কাঁঠালতলী, কালিয়াকৈর।	তিরোধান উৎসব	১৮ আষাঢ় ও জ্যৈষ্ঠের শেষ শনিবার	ঐ
১৫.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	বড়শিংগা, বরিশাল।	তিরোধান উৎসব	২০ আষাঢ়	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের উপকরণ ও পূজার সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৬.	বড় শিংগার মেলা	বড়শিংগা বরিশাল।	বার্ষিক	২০ আষাঢ়	ঐ
১৭.	রথযাত্রার মেলা	তাঁতিবাজার, ঢাকা।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ় থেকে ২ থেকে দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, মৌসুমী ফল-মূল-বেচা-কেনা হয়।

১৮.	রথযাত্রার মেলা	রাঁধাগোবিন্দ মন্দির, ঢাকা।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৯.	রথযাত্রার মেলা	সাচারগ্রাম দাউদকান্দি কুমিল্লা।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ় থেকে ৫ দিন।	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, মৃৎশিল্প, মৌসুমী ফল-মূল এবং মেয়েদের প্রসাধন বেচা-কেনা হয়।
২০.	রথযাত্রার মেলা	কুমিল্লা সদর।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
২১.	রথযাত্রার মেলা	জাহাপুর মুরাদনগর কুমিল্লা।	রথযাক্রা	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
২২.	রথযাত্রার মেলা	বানিয়াডাঙ্গা।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
২৩.	রথযাত্রার মেলা	যোগ বেতাল কটিয়াদি কিশোরগঞ্জ।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
২৪.	রথযাত্রার মেলা	বারৈখালী যশোর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
২৫.	রথযাত্রার মেলা	রথখলা কিশোরগঞ্জ।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা মিঠাই, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২৬.	কাতরা রথ যাত্রার মেলা	কাতরা ভাঙ্গা ফরিদপুর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
২৭.	মুকসেদপুর, রথ যাত্রার মেলা	মুকসেদপুর গোপালগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
২৮.	রথযাত্রার মেলা	কালাচাঁদ পাড়া শাহাজাদপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
২৯.	রথযাত্রার মেলা	কালচাঁদ পাড়া শাহাজাদপুর।	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৩০.	রথযাত্রার মেলা	নাালিয়াবাজার বেড়া সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৩১.	বাগানবাড়ি রথযাত্রার মেলা	বাগানবাড়ি গোয়াইঘাট সিলেট।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা মিঠাই, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
৩২.	জয়দেবপুর রথ যাত্রার মেলা	জয়দেবপুর গাজীপুর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৩৩.	বিথঙ্গল রথ যাত্রার মেলা	বিথঙ্গল বানিয়াচং হবিগঞ্জ।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৩৪.	রথযাত্রার মেলা	রাজশাহী সদর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৫.	রথযাত্রার মেলা	মানিকগঞ্জ সদর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৬.	ঐ	রামপাল বাগেরহাট।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৭.	ঐ	শ্রীনগর মুন্সিগঞ্জ।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৮.	ঐ	ধামরাই ঢাকা।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ১১ দিন।	এ মেলায় চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুলনাচ, সার্কাস-যাত্রা ছাড়াও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩৯.	রথযাত্রার মেলা	রোহিপুর কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	ঐ	২১ আষাঢ়	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা মিঠাই, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
৪০.	ঐ	কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ

৪১.	ঐ	রিকাবীবাজার সিলেট।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৪২.	লামাপাড়া রথ যাত্রার মেলা	লামাপাড়া জৈন্তাপুর সিলেট।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৪৩.	রথযাত্রার মেলা	ঠাকুরবাড়ি ঢাকা দক্ষিণ গোলাপগঞ্জ সিলেট।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৪.	ঐ	বাসুদেববাড়ি সুপাতলা বিয়ানীবাজার সিলেট।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৪৫.	ঐ	কাউয়ামারা সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতের উপকরণ, কাঠের আসবাব, কাঁসা শিল্প, লৌহ শিল্প, মণ্ডা মিঠাই ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৪৬.	কালীবাড়ি রথ যাত্রার মেলা	কালীবাড়ি গাইবান্ধা	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৫ দিন।	ঐ
৪৭.	রথযাত্রার মেলা	ভবানীগঞ্জ কুলিচড়া রংপুর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৪৮.	ঐ	ট্রাঙ্করোড ফেনী।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৯.	ঐ	ফুলগাজী বাজার ফেনী।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৫০.	ঐ	জমিদারহাট বেগমগঞ্জ নোয়াখালী।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৫১.	ঐ	কুলাউড়া মৌলভীবাজার।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৫২.	ঐ	লক্ষীপাশা লৌহাগড়া নড়াইল	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	বাঁশ ও বেতের উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, মণ্ডা মিঠাই ছাড়াও মৌসুমী ফল-মূল ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৫৩.	ঐ	চকবস্তা বৈদ্যবাড়ি বরাঙ্গাইল মানিকগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৫৪.	ঐ	যাত্রাপুর বাগেরহাট।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫৫.	ঐ	পুটিয়া রাজশাহী।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫৬.	ঐ	ডাকমণ্ড সিংড়া নাটোর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৫৭.	ঐ	গৌরবাজার নবাবগঞ্জ নাটোর সদর।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫৮.	ঐ	কুমারপাড়া স্টিমারঘাট রাজশাহী।	ঐ	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার। তার মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী এবং শিশুদের খেলনা ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৫৯.	ঐ	কালীতলা নওগাঁ।	ঐ	ঐ, ৪ দিন।	ঐ
৬০.	ঐ	লোহাগড়া যশোহর।	ঐ	ঐ, ৪ দিন।	ঐ
৬১.	ঐ	সাতদোয়ার মাগুরা।	ঐ	ঐ, ৩ দিন।	ঐ
৬২.	'জগন্নাথবাড়ি রথযাত্রার মেলা	জগন্নাথাবড়ি লাকসাম সদর কুমিল্লা।	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৬৩.	রথযাত্রার মেলা	বোয়ালমারী ফরিদপুর।	ঐ	ঐ, ৩ দিন।	ঐ
৬৪.	ঐ	রাধানগর মোড় পাবনা	ঐ	ঐ, ৩ দিন।	ঐ
৬৫.	রথাযাত্রার মেলা	কুষ্টিয়া সদর।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	মৃৎশিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মাটির তৈরি পুতুল, হাঁড়ি-পাতিল এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬৬.	ঐ	নলিতাবাড়ি শেরপুর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৬৭.	ঐ	নয়ানিবাজার শেরপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৬৮.	ঐ	গফরগাঁও বাজার ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	ঐ
৬৯.	ঐ	গৌরীপুর	ঐ	ঐ	ঐ
৭০.	ঐ	কেন্দুয়া নেত্রকোনা।	ঐ	ঐ	ঐ
৭১.	ঐ	তাড়াইল কিশোরগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৭২.	ঐ	ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ, ২দিন।	ঐ
৭৩.	ঐ	ইটনা বাজার কিশোরগঞ্জ।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ়	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, কাঠের আসবাবপত্র, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭৪.	ঐ	পাকুন্দিয়া বাজার কিশোরগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ

৭৫.	ঐ	মোহনগঞ্জ বাজার নেত্রকোনা	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৭৬.	ঐ	মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৭৭.	ঐ	বড়বাজার ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৭৮.	ঐ	বাউশি নেত্রকোনা।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯.	মুখি রথযাত্রার মেলা	মুখি গফরগাঁও ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৮০.	রথযাত্রার মেলা	কালিয়া নড়াইল।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৮১.	রথযাত্রার মেলা	রূপগঞ্জ নড়াইল।	রথযাত্রা	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুলনাচ, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, মাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৮২.	ঐ	ছোটবাজার ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	ঐ
৮৩.	ঐ	রাজবাড়ি।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৮৪.	ঐ	কচুয়া, চাঁদপুর	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৮৫.	ঐ	গাজীপুর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৮৬.	ঐ	বেতিলা, মানিকগঞ্জ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৮৭.	ঐ	বানিয়াঝুড়ি, মানিকগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৮৮.	ঐ	কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
৮৯.	ঐ	রথযাত্রার মেলা	বড়দিয়া বাজার বড়দিয়া, কালিয়া, যশোহর।	২১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	পূজার সামগ্রী, এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার ও মৌসুমী ফলমূল ক্রয়-বিক্রয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯০.	ঐ	আবির্ভাব উৎসব ও মেলা	বৈরাটি গৌরী আশ্রম, নেত্রকোনা	২৭ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৯১.	উল্টোরথ মেলা	তাঁতি বাজার, ঢাকা।	রথযাত্রা	২৯ আষাঢ়	ঐ
৯২.	উল্টোরথ মেল	রাধাগোবিন্দ মন্দির, ঢাকা।	ঐ	২৯ আষাঢ়	ঐ
৯৩.	ঐ	সাচারগ্রাম, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ৩ দিন	ঐ
৯৪.	ঐ	কুমিল্লা সদর	ঐ	২৯ আষাঢ়	ঐ
৯৫.	উল্টোরথ মেলা	জাহাপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা	রথযাত্রা	২৯ আষাঢ়	মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ বেত শিল্প, কাঁসা শিল্প ছাড়াও মৌসুমী ফলমূল বেচা-কেনা হয়।
৯৬.	ঐ	বালিয়াডাঙ্গা যশোর।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৯৭.	ঐ	বোগবেতাল, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ।	ঐ	২৯ আষাঢ়	ঐ
৯৮.	ঐ	বারৈখালী যশোহর	রথযাত্রা	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
৯৯.	ঐ	কিশোরগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১০০.	ঐ	কাতরা, ভাংগা, ফরিদপুর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১০১.	উল্টোরথ মেলা	মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।	রথযাত্রা	২৯ আষাঢ় থেকে ৩ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, মৌসুমী ফলমূল বেচা-কেনা হয়।
১০২.	ঐ	নকলা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ

১০৩.	ঐ	কালাচাঁদপাড়া, শাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১০৪.	ঐ	নাকালিবাজার, বেড়া, সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৫.	ঐ	বাগানবাড়ি, গোয়াইনঘাট, সিলেট।	ঐ	ঐ, ২দিন।	ঐ
১০৬.	ঐ	জয়দেবপুর, গাজীপুর	ঐ,	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১০৭.	ঐ	বিথঙ্গল, বানিয়াচং। হবিগঞ্জ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১০৮.	উল্টোরথ মেলা	রাজশাহী সদর।	ঐ	২৯ আষাঢ়	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, মৌসুমী ফলমূল বেচা-কেনা হয়।
১০৯.	ঐ	মানিকগঞ্জ সদর।	ঐ	ঐ	ঐ
১১০.	ঐ	রামপাল বাগেরহাট।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১১১.	ঐ	শ্রীনগর মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১১২.	ঐ	ধামরাই ঢাকা।	ঐ	প্রথম রথ থেকে মোট ১১ দিন।	ঐ
১১৩.	ঐ	রোহিতপুর কেরানীগঞ্জ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১১৪.	ঐ	কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১১৫.	ঐ	রিকাবীবাজার সিলেট।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১১৬.	উল্টোরথ মেলা	লামাপাড়া জৈন্তাপুর সিলেট।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
১১৭.	ঐ	ঠাকুরবাড়ি ঢাকা দক্ষিণ গোপালগঞ্জ সিলেট।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১১৮.	ঐ	বাসুদেববাড়ি সুপাতলা বিরয়ানীবাজার সিলেট।	ঐ	ঐ, ৩ দিন।	ঐ
১১৯.	ঐ	কাউয়ামারা সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	ঐ, ৩ দিন।	ঐ
১২০.	ঐ	কালীবাড়ি গাইবান্ধা।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১২১.	ঐ	ভবানীগঞ্জ কুলিয়ারচর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১২২.	ঐ	ট্রাঙ্করোড ফেনী।	ঐ	ঐ	ঐ
১২৩.	উল্টোরথ মেলা	ফুলগাজী বাজার ফেনী।	রথযাত্রা	ঐ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, পূজার উপকরণ এবং শিশুদের খেলনা ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১২৪.	ঐ	কুলউড়া মৌলভীবাজার	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
১২৫.	ঐ	লক্ষ্মীপাশা লোহাগড়া নড়াইল।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১২৬.	ঐ	চকবস্তা বৈদ্যবাড়ী বরাঙ্গাইল মানিকগঞ্জ।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
১২৭.	ঐ	যাত্রাপুর বাগেরহাট।	।ে	ঐ, ৩ দিন।	ঐ
১২৮.	ঐ	পুটিয়াহাট রাজশাহী।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১২৯.	উল্টোরথ মেলা	ডকিমণ্ড সিংড়া নাটোর।	ঐ	ঐ, ৩ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার। তার মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঠের আসবাবপত্র, প্লাস্টিকের পুতুল, মৃৎশিল্প এবং মৌসুমী ফল-মূল ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৩০.	ঐ	পৌরবাজার।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩১.	ঐ	কুমারপাড়া স্টিমারঘাট নাটোরসদর রাজশাহী।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৩২.	ঐ	কালীতলা নওগাঁ।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৩৩.	ঐ	লোহাগড়া যশোর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৪.	ঐ	সাতদোয়ার মাগুরা।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৩৫.	ঐ	জগন্নাথবাড়ি লাকসাম সদর কুমিল্লা।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী এবং শিশুদের খেলনার উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
১৩৬.	ঐ	বোয়ালমারী ফরিদপুর।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৩৭.	ঐ	রাধানগর মোড় পাবনা।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৮.	ঐ	কুষ্টিয়া সদর	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৩৯.	ঐ	নলিতাবাড়ি শেরপুর	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৪০.	ঐ	নয়ানিবাজার শেরপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪১.	ঐ	গফরগাঁও বাজার ময়মনসিংহ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪২.	ঐ	গৌরীপুর বাজার ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৩.	উল্টোরথ মেলা	কেন্দুয়া নেত্রকোনা।	রথযাত্রা	২০ আষাঢ়	মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ছাড়াও চিত্তবিনোদনের সমাহার।
১৪৪.	ঐ	তাড়াইল কিশোরগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৫.	ঐ	ইটনা বাজার কিশোরগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৬.	ঐ	পাকুন্দিয়া বাজার, কিশোরগঞ্জ।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
১৪৭.	ঐ	মোহনগঞ্জ বাজার।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৮.	ঐ	মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৯.	ঐ	বড়বাজার ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫০.	ঐ	বাউশি নেত্রকোনা।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
১৫১.	ঐ	মুখি গফরগাঁও ময়মনসিংহ।	ঐ	২৯ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

১৫২.	ঐ	কালিয়া নড়াইল।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৩.	ঐ	রূপগঞ্জ নড়াইল।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৫৪.	ঐ	ছোটবাজার ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৫.	ঐ	রাজবাড়ী।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৫৬.	ঐ	কচুয়া চাঁদপুর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৫৭.	ঐ	গাজীপুর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৫৮.	ঐ	বোথলা মানিকগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৯.	ঐ	বানিয়াঝুড়ি মানিকগঞ্জ।	রথযাত্রা	২৯ আষাঢ়	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার। তার মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৬০.	ঐ	কালিয়াকৈর গাজীপুর।	ঐ	ঐ, ২ দিন।	ঐ
১৬১.	পূজা ও মেলা	কামারপাড়া রংপুর।	বার্ষিক	পূর্ণিমা তিথি থেকে ৯ দিন।	ঐ
১৬২.	খানজাহান মেলা	পাংশা রাজবাড়ী।	ঐ	আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের ২য় দিন।	ঐ
১৬৩.	কোকদণ্ডী মেলা	কোকদণ্ডী বাঁশখালী চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	৩১শে আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ
১৬৪.	কদুরখিল মেলা	কদুরখিল বোয়ালখালী চট্টগ্রাম	তিরোধান উৎসব	৩১ আষাঢ় থেকে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

শ্রাবণ

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	কুজাইল মেলা	কুজাইল রাজশাহী।	বার্ষিক	১ শ্রাবণ থেকে ৩ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শি, কাঁসা শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২.	ওরস ও মেলা	পাইকপাড়া নারায়ণগঞ্জ।	ওরস	২ শ্রাবণ	ভক্ত সমাবেশে ও মেলার যাবতীয় উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩.	গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে মেলা	কালীবাড়ি রোড বরিশাল।	আবির্ভাব	৪ শ্রাবণ	ভক্ত সমাবেশ। পূজার উপকরণ এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪.	নিলখী মেলা	নিলখী নবীনগর বি-বাড়িয়া।	গোস্বামীর তিরোধান	৬ শ্রাবণ	ঐ
৫.	তিরোধান উপলক্ষে মেলা	শ্যামগ্রাম নবীনগর বি-বাড়িয়া	তিরোধান দিবস	৬ শ্রাবণ	ঐ
৬.	মজিদপুরের মেলা	মজিদপুর পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ।	বার্ষিক	৭ শ্রাবণ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার, তার মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প ছাড়াও শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭.	ঝুলন মেলা	পানিসাইল উত্তরবাগ রাজনগর মৌলভী বাজার।	ঝুলন যাত্রা	১০ শ্রাবণ থেকে ৭ দিন।	ঐ
৮.	তিরোভাব উৎসব ও মেলা	শ্রীধাম তালখড়ি মাগুরা।	তিরোভাব তিথি	১১ শ্রাবণ থেকে ২ দিন।	ভক্ত সমাবেশ ও পূজার সামগ্রী এবং মেলার সামগ্রিক উপকরণ বেচা-কেনা হয়।
৯.	ব্রাহ্মচারীর জন্মোৎসব ও মেলা	জগদ্দল কিশোরগঞ্জ।	জন্মোৎসব	১২ শ্রাবণ	ঐ
১০.	কালাইকুমার পাড়ার মেলা	কালাইকুমার পাড়া কাহালু বগুড়া।	বার্ষিক তিরোধান	১২ শ্রাবণ থেকে ২ দিন।	ঐ
১১.	চরখালীর মেলা	চরখালী নারায়ণ মন্দির বরিশাল।	কীর্তনোৎসব	১৩ শ্রাবণ থেকে ৫ দিন।	ভক্ত সমাবেশে, সেই সঙ্গে মেলা। মেলায় কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, মেয়েদের প্রসাধন ও শিশুদের খেলনা বেচা-কেনা হয়।
১২.	আখড়ার কীর্তন মেলা	হবিগঞ্জ।	কীর্তনোৎসব	১৩ শ্রাবণ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৩.	জগন্নাথ মিত্রের মেলা	ঢাকা দক্ষিণ জগন্নাথমিত্রের বাড়ি সিলেট।	বার্ষিক	১৩ শ্রাবণ থেকে ৪ দিন।	ঐ
১৪.	বুড়শিব মেলা	বুড়শিববাড়ি ঢাকা সদর।	ঝুলন	১৩ শ্রাবণ থেকে ৩ দিন।	ঐ

১৫.	ভোগবেতালের মেলা	ভোগবেতাল কিশোরগঞ্জ।	ঝুলন	১৩ শ্রাবণ থেকে ৫ দিন।	ভক্ত সমাবেশে, সেই সঙ্গে মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, কাগজ শিল্প ছাড়াও দেশী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
১৬.	কুতুবপুরের মেলা	কুতুবপুর মেহেরপুর।	বার্ষিক	১৩ শ্রাবণ	ঐ
১৭.	ঝুলন যাত্রা	কিশোরগঞ্জ সদর।	ঝুলন উপলক্ষে	১৪ শ্রাবণ থেকে ৫ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলায় যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৮.	পরমহংস দেবের প্রকাশ ও উৎসব মেলা	কুশিহারা বেদান্ত আশ্রম নারায়ণগঞ্জ।	উৎসব	১৭ শ্রাবণ	পূজার উপকরণ এবং মৌসুমী ফল-মূল ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৯.	কুশিহারা মেলা	কুশিহারা বেদান্ত আশ্রম নারায়ণগঞ্জ।	পরম হংসদেবের প্রকাশ উৎসব।	১৯ শ্রাবণ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঁসা শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২০.	তিরোধান উৎসবের মেলা	মজিদপুর পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ।	তিরোধান	২২ শ্রাবণ	ঐ
২১.	রায় দৌলতপুর মেলা	রায়দৌলতপুর কুষ্টিয়া।	গঙ্গাঞ্জলি উৎসব	২৬ শ্রাবণ থেকে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

২২.	কুতুবপুর মেলা	মেহেরপুর।	বার্ষিক	২৬ শ্রাবণ	ঐ
২৩.	খড়মপুর ওরস মেলা	খড়মপুর আখাউড়া বি-বাড়িয়া	বার্ষিক	২৬ শ্রাবণ থেকে ৭ দিন।	ভক্ত নর-নারী ও আউল-বাউরে সমাবেশ এবং মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।
২৪.	উৎসব ও মেলা	ঢাকা দক্ষিণ গোপালগঞ্জ সিলেট।	উৎসব	২৯ শ্রাবণ থেকে ৫ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলায় কাঠের আসবাবপত্র, শীতল পাটি ও শিশুতোষ খেলনা সামগ্রী পাওয়া যায়।
২৫.	উৎসব ও মেলা	ভাণ্ডারখোলা খুলনা।	ঝুলন	২৯ শ্রাবণ থেকে ৫ দিন।	ঐ
২৬.	উৎসব ও মেলা	ভোগবেতাল কিশোরগঞ্জ।	ঝুলন	২৯ শ্রাবণ থেকে ৫ দিন।	ঐ
২৭.	কীর্তন মহোসব এর মেলা	মহাপ্রভুর আখড়া হবিগঞ্জ।	কীর্তন	২৯ শ্রাবণ থেকে ৩ দিন।	ঐ
২৮.	উৎসব ও মেলা	বুড়াশিববাড়ি ঢাকা।	ঝুলন	২৯ শ্রাবণ থেকে ৩ দিন।	ঐ
২৯.	জন্মোৎসব ও মেলা	পশ্চিম দেওভোগ নারায়ণগঞ্জ।	জন্মোৎসব	২৯ শ্রাবণ থেকে ২ দিন।	ভক্ত আউল-বাউলের সমাবেশ। মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ও শিশুতোষ খেলনা।
৩০.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	মীরকুণ্ডী নারায়ণগঞ্জ।	উৎসব	৩০ শ্রাবণ।	ভক্ত সমাবেশ ও মেলায় মৃৎশিল্প, লোহা শিল্প, বাঁশ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী পাওয়া যায়।

৩১.	চরাইখোলা মেলা	চরাইখোলা নওগাঁ।	নৌকা বাইচ	৩০ শ্রাবণ থেকে ১ দিন।	আনন্দ উৎসব ও সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।
৩২.	ওরস ও মেলা	গড়পাড়া মানিকগঞ্জ।	ওরস	৩১ শ্রাবণ	ভক্ত সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।
৩৩.	উৎসব ও মেলা	ভাঙ্গারখোলা খুলনা।	ঝুলন	৩১ শ্রাবণ থেকে ৫ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী পাওয়া যায়।
৩৪.	ঝুলন যাত্রা	দালার বাজার।	ঝুলন	শ্রাবণ মাসে ঝুলন যাত্রার থেকে ৫ দিন।	ঐ
৩৫.	ভাণ্ডারকোলার মেলা	ভাণ্ডারকোলা খুলনা।	ঝুলন	ঝুলনের সময় থেকে ৫ দিন।	ঐ
৩৬.	ঝুলন মেলা	রাজনগর মৌলবীবাজার।	ঝুলন যাত্রা	ঝুলনের সময় থেকে ৫ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী পাওয়া যায়।
৩৭.	কালু ডাঙ্গার মেলা	নওয়াপাড়া বাঘারপাড়া যশোহর।	হাজা ঠাকুরের মেলা	মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার।	ভক্তদের সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ভাদ্র

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	ঝুলন মেলা	লৌহজং ঢাকা।	ঝুলন মেলা	১ লা ভাদ্র থেকে ৫ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পুতুল ও নানা জাতের খাবার-দাবার বেচা-কেনা হয়।
২.	হামিদপুর মেলা	হামিদপুর রানীনগর নওগাঁ।	নৌকা বাইচ	১ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	নৌকা প্রতিযোগিতাসহ বাঁশ ও মেলার যাবতীয় সামগ্রী পাওয়া যায়।
৩.	সুরেশ্বর মেলা	সুরেশ্বর ফরিদপুর।	বার্ষিক	৪ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	আউল-বাউলের সমাবেশ মুর্শিদাগান, জারিগানের আসর, ছাড়া কাঠের আসবাপত্র, মাটির রঙিন পুতুল ও মুরলী মিঠাই বেচা-কেনা হয়।
৪.	ওরস ও মেলা	দিঘি মানিকগঞ্জ।	বার্ষিক	৪ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	ঐ
৫.	খাটোয়ারা মেলা	খাটোয়ারা গোপালগঞ্জ।	বার্ষিক	৫ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	ঐ
৬.	চৈতার মেলা	চৈতারবাড়ি ভাঙ্গারহাট।	বার্ষিক	৫ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	মতুয়া সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭.	মহাশয়ের জন্ম উৎসবের মেলা	দেওভোগ নারায়ণগঞ্জ।	জন্মোৎসব	৭ ভাদ্র থেকে ১ দিন।	পূজোর উপকরণ এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

৮.	কীর্তন ও মেলা	ধর্মরক্ষিণী সভা বরিশাল।	কীর্তন	৮ ভাদ্র থেকে দেড় মাস।	ভক্ত সমাবেশ। মেলার সামগ্রী চিত্তবিনোদনের যাবতীয় উপকরণ পাওয়া যায়।
৯.	উৎসব ও মেলা	নতুনবাজার জামালপুর।	বার্ষিক	৮ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং মেয়েদের প্রসাধন বেচা-কেনা হয়।
১০.	জোবারপার মেলা	জোবারপার বরিশাল।	সোনাই পাগলের উৎসব	৯ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	ভক্ত সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।
১১.	মাছকান্দি মেলা	মাছকান্দি গোপালগঞ্জ।	বার্ষিক	৯ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন জাতের কাঠের পণ্য, মৃৎশিল্পের দ্রব্যসামগ্রী এবং সেই সঙ্গে খাবার ও ফল-মূল পাওয়া যায়।
১২.	মালীমতা মেলা	মালীমতা গোপালগঞ্জ।	বার্ষিক	৯ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	ঐ
১৩.	মালিনী চিত্র দমের মেলা	মালিনী চিত্রদম ময়মনসিংহ।	বার্ষিক	৯ ভাদ্র থেকে ১ দিন।	ঐ
১৪.	কুসুমদিয়া মেলা	কুসুমদিয়া ফকির বাড়ী ফরিদপুর।	খিজির পাঠ উপলক্ষে	১৩ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	আউল বাউরের সমাবেশ, মুর্শিদি গান ও সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।
১৫.	নিকলী মেলা	নিকলী কিশোরগঞ্জ।	নৌকা বাইচ	১৪ ভাদ্র	নৌকা প্রতিযোগিতা ও মেলার যাবতীয় সামগ্রী পাওয়া যায়।
১৬.	বাঘাডাঙ্গা মেলা	বাঘাডাঙ্গা সুন্দরপুর নবাবগঞ্জ।	স্কুল উন্নয়ন	২১ ভাদ্র থেকে ৬ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পুতুল ও নানা প্রকার খাবার-দাবার যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে।

১৭.	ওড়াকান্দি মেলা	ওড়াকান্দি কাশিয়ানী গোপালগঞ্জ।	বার্ষিক	২৪ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	মতুয়া সম্প্রদায়ের নর-নারীর বিরাট সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় সামগ্রী পাওয়া যায়।
১৮.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	মালনী চিত্রধাম ময়মনসিংহ।	তিরোধান	২৪ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	পূজার সামগ্রী ও মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।
১৯.	উৎসব ও মেলা	জোবার বরিশাল।	সোনাই পাগলের উৎসব	২৪ ভাদ্র থেকে ২ দিন।	ভক্ত সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২০.	উৎসব ও মেলা	হোমনা কুমিল্লা।	বার্ষিক	২৫ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র, পুতুল এবং মুরলী, মণ্ডা-মিঠাই পাওয়া যায়।
২১.	ভেলা ভাসান উৎসব মেলা	দোহার ঢাকা।	বার্ষিক	২৫ ভাদ্র থেকে ২ দিন	ভক্তদের সমাবেশ এবং ভেলাভাসান উৎসব।
২২.	উৎসব ও মেলা	ঘাটয়ারা গোপালগঞ্জ।	তিরোভাব	২৬ ভাদ্র থেকে ১ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২৩.	জলযাত্রা উৎসবের মেলা	কালিকা যশোহর্	জলযাত্রা	২৭ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	ভক্তদের সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী।
২৪.	খিতাবচর মেলা	খিতাবচর বোয়ালখালী চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	২৯ ভাদ্র ২ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২৫.	মৈনট মেলা	মৈনট দোহার ঢাকা।	ওরস	৩০ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	ভক্ত আউল-বাউল ও নারী-পুরুষের সমাবেশ এবং মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

২৬.	ওরস ও মেলা	অষ্টগ্রাম কিশোরগঞ্জ।	ওরস	৩০ ভাদ্র থেকে ৩ দিন।	ঐ
২৭.	কানসাট মেলা	কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নৌকা বাইচ	৩১ ভাদ্র থেকে ৭ দিন।	মেলার সামগ্রীসহ নৌকাবাইচ, দৌড়, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন থাকে।
২৮.	কাঁঠালতলী মেলা	কাঁঠালতীল কালিয়াকৈর গাজীপুর।	বিশ্বকর্ম পূজা	৩১ ভাদ্র ১ দিন।	ভক্ত সমাবেশ। সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী পাওয়া যায়।
২৯.	আম মেলা	শাকিয়া শরিফ ফরিদপুর।	ঈদুজ্জোহা	ঈদুজ্জোহা থেকে ৭ দিন।	মুরিদানের সমাবেশ ও মেলা। কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩০.	কসবা মেলা	কসবা নতুন বাজার বি-বাড়িয়া	ভাদ্র মাসের অমাবশ্যা তিথি	অমাবশ্যার দিন থেকে ১৫ দিন।	মেলার যাবতীয় সামগ্রী যাত্রা, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি হয়।
৩১.	শ্রী অনুকূর ঠাকুরের মেলা	হেমায়েতপুর পাবনা।	বার্ষিক	ভাদ্র মাসে ৩ দিন।	ঐ
৩২.	গুড়পুকুরের মেলা	সাতক্ষীরা শহর।	ভাদ্র সংক্রান্তি	মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে ১৫ দিন।	নাগরদেলা, সার্কাস , যাদু, পুতুল নাচ, গছের চারা, কাঠের আসবাবপত্র, শিশুর কেলনা এবং ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৩৩.	পানি শাইলের নৌকা দৌড় মেলা	পানি শাইলের খার রাজেন্দ্রপুর নারায়ণগঞ্জ।	মনস্ পূজা	ভাদ্র মাসের মনসা পূজার পর দিন।	নৌকা বাইচ, প্রতিযোগিতা। নৌকার উপর মেলার সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্বিন

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	ওরস ও মেলা	চট্টগ্রাম সদর।	ওরস	২ আশ্বিন থেকে ৩ দিন।	বাউল বৈষ্ণব সমাবেশ ও বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য এবং হরেক জাতীয় খাবারের সমাবেশ ঘটে।
২.	ওরস ও মেলা	গড়পাড়া ইমামবাড়ি আলী নগর মানিকগঞ্জ।	ওরস	৪ আশ্বিন	ঐ
৩.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	বালাবাড়ি পটুয়াখালী।	তিরোধান	৬ আশ্বিন	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ বেতের উপকরণ, লৌহ শিল্প এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪.	উৎসব ও মেলা	শ্রীধাম ওড়াকান্দি ফরিদপুর।	আবির্ভাব উৎসব	৭ আশ্বিন	ঐ
৫.	উৎসব ও মেলা	নয়ানিবাগ রংপুর।	নরগঙ্গা গ্রামে	৭ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	ঐ
৬.	তেলজুড়িমেলা	বোয়ালমারি ফরিদপুর।	অমাবস্যা পর্যন্ত বার্ষিক	৯ আশ্বিন থেকে ৬ দিন।	ঐ
৭.	উৎসব ও মেলা	শ্রীপাট নীমতা ঢাকা।	তিরোধান উৎসব	১০ আশ্বিন ১ দিন।	পূজার উপকরণ ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৮.	আশ্বিনী পূর্ণিমার মেলা	বিইজুরি রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম।	বৌদ্ধদেব পূজা	১৫ আশ্বিন থেকে ৩ দিন।	ঐ
৯.	উৎসব ও মেলা	শ্রীপাট ঢাকা।	তিরোধান উৎসব	১৬ আশ্বিন	ঐ
১০.	প্রেমতলী মেলা	গোদাগাড়ি রাজশাহী।	চৈতন্য গৌরের পরিদর্শন	২০ আশ্বিন থেকে ৩ দিন।	বৈষ্ণব সমাবেশ। বিভিন্ন আসবাবপত্র ও খাবার-দাবার পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১১.	দুর্গাপূজা	ঢাকেশ্বরী মন্দির ঢাকা।	পূজা	২১ আশ্বিন থেকে ৬ দিন।	বিভিন্ন আসবাবপত্র, মৃৎশিল্প, মাটির পুতুল, খেলনা ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১২.	উৎসব ও মেলা	পাহাড়তলী চট্টগ্রাম।	দুর্গাপূজা	২১ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	ঐ
১৩.	মেলা	কালী মন্দির বানিয়াচং।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৭ দিন ।	ঐ
১৪.	মেলা	তুষখালী বরিশাল।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	ঐ
১৫.	দুর্গাপূজা বজ্রগঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	ঐ		২১ আশ্বিন থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৬.	ঐ	রায়পুর সিরাজগঞ্জ।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
১৭.	ঐ	পাকবাড়ি সিরাজগঞ্জ।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ও শিশুদের খেলনা বেচা-কেনা হয়।
১৮.	ঐ	কালীবাড়ি সিরাজগঞ্জ	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
১৯.	ঐ	রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
২০.	ঐ	টেকেরহাট উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
২১.	ঐ	চৈত্রহাটি উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ

২২.	দুর্গাপূজা	ঘামগাতি উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	মাটির তৈরি আসবাবপত্র, প্লাস্টিকের তৈরি পুতুল, কাঠের আসবাবপত্র, পাটি ও নানা জাতের খাবার, মৌসুমী ফল-ফুল কেনা-বেচা হয়।
২৩.	ঐ	ঝিকড়া উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
২৪.	ঐ	রামকান্তপুর উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
২৫.	ঐ	কাপালীপাড়া বেলকুচি সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
২৬.	ঐ	কাচারীপাড়া শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
২৭.	ঐ	মৌগাছি পবা রাজশাহী	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ২ দিন।	ঐ
২৮.	ঐ	নকলা বাজার শেরপুর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
২৯.	ঐ	শিবপুর আলফাডাঙ্গা ফরিদপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৩০.	ঐ	হোসেনপুর কিশোরগঞ্জ।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৭ দিন।	ঐ
৩১.	কেতুর মেলা	কেতুর গোদাগাড়ী রাজশাহী।	ঐ	ঐ	ঐ
৩২.	মুক্তাগাছা মেলা	মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ	ঐ	ঐ	ঐ

৩৩.	বড়বাজার মেলা	বড় বাজার কোতোয়ালী ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	পূজোর উপকরণ, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন বেড়া-কেনা হয়।
৩৪.	চাপাজোরা মেলা	নালিতাবাড়ি শেলপুর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৫.	বিষ্ণুপুর মেলা	নালিতাবাড়ি শেরপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬.	গোপালপুর মেলা	শেরপুর লাটাপুর নাটোর।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭.	বধুপাড়া মেলা	লালপুর নাটোর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৭ দিন।	ঐ
৩৮.	কৈবল্যধাম মেলা	পাহাড়তলী চট্টগ্রাম।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	ঐ
৩৯.	দুর্গাপূজার মেলা	রামচন্দ্রপুর মুরাদনগর কুমিল্লা	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৭ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেত, মৃৎশিল্প এবং মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৪০.	ঐ	মাদারীপুর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	ঐ
৪১.	নাড়ুয়া মেলা	গাবতলী বগুড়া।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
৪২.	দুর্গাপূজা	পাটগ্রামহাট রংপুর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
৪৩.	ঐ	হলদিবাড়ি হাতিবান্ধা লালমনিরহাট।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৪.	ঐ	হাতিবান্ধা লালমনিরহাট।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫.	ঐ	তুষভাণ্ডার কালীগঞ্জ।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪৬.	ঐ	চামুরীরহাট আদিতমারী লালমনিরহাট।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ২ দিন।	মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং প্লাস্টিকের খেলনা ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪৭.	রথের পার মেলা	কলুমাতি ক্ষুদ্রন্দপুর আদিতমারি লালমনিরহাট।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮.	বুড়ির মেলা	মহেন্দ্রনগর লালমনিরহাট।	আশ্বিন সংক্রান্তি	১ মাসব্যাপী।	ঐ
৪৯.	মিঠাপুকুর মেলা	দুর্গাপুর রাজশাহী।	দুর্গাপূজা	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
৫০.	নাগেশ্বরী মেলা	নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম।	ঐ	ঐ	ঐ
৫১.	দুর্গাপূজা	মানিকগঞ্জ।	দুর্গপূজা	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	মেলার যাবতীয় পণ্যসামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫২.	বুড়াবুড়ি মেলা	উলিপুর কুড়িগ্রাম।	ঐ	ঐ	ঐ
৫৩.	দুর্গাপূজা	আরিচা ঘাট মানিকগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৫৪.	ঐ	নরসিংদী।	ঐ	ঐ	ঐ
৫৫.	ঐ	কমলাঘাট মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৫৬.	এ	রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকা।	ঐ	ঐ	ঐ
৫৭.	ঐ	ধামরাই ঢাকা।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৫৮.	ঐ	তালতলা মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	ঐ	মৌসুমী ফল-মূল, এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার এবং শিশুদের প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৫৯.	ঐ	দশ্যামপুর বাজার ঢাকা।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
৬০.	ঐ	বল্লাবাজার কালীহাতি টাঙ্গাইল।	ঐ	ঐ	ঐ
৬১.	ঐ	সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৬ দিন।	ঐ
৬২.	মহালয়া মেলা	কালীবাড়ি মন্দির হাজারী লেন চট্টগ্রাম।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৩ দিন।	ঐ
৬৩.	শারদীয়া পূজা	লক্ষ্মীপুর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, নাগরদোলা এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬৪.	তিশিখালী মেলা	সিংড়া নাটোর।	ঐ	ঐ	ঐ
৬৫.	গোনা ভাঙ্গা হাট মেলা	ভোলাহাট নবাবগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৬৬.	মানিকগঞ্জ হাট মেলা	বজ্রাটেক ভোলাহাট নবাবগঞ্জ।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ২ দিন।	ঐ
৬৭.	দুর্গাপূজা	শুক্রগ্রাম কালিয়া নড়াইল।	ঐ	সপ্তমী তৃতীয় একাদশী থেকে ২ দিন।	ঐ
৬৮.	ঐ	কালিয়াবাজার নড়াইল।	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৬৯.	ঐ	হিজলা নড়াইল।	ঐ	সপ্তমী তৃতীয় একাদশী থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার। তার মধ্যে লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠ শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭০.	ঐ	কালুঘিলি কালিয়া নড়াইল।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	ঐ
৭১.	বাশুয়াড়ি মেলা	বাশুয়ারি যশোহর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৫ দিন।	ঐ
৭২.	কাকড়ী মেলা	কাকড়ী বাঘার-পাড়া যশোহর।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ২ দিন।	ঐ
৭৩.	.বোয়ালমারী মেলা	বোয়ালমারী ফরিদপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪.	দুর্গাপূজার মেলা	সাঁথিয়া পাবনা।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৫.	দুর্গাপূজা	বেরাকাছড়া পাবনা।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৪ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, নাগরদোলা এবং দেশীয় ফল-মূল বেচা-কেনা হয়। সেই সঙ্গে মেয়েদের প্রসাধন সমগ্রী।
৭৬.	ঐ	রাধানগর পাবনা।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭,	ঐ	দাড়িয়াল	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮.	ঐ	দৌলতপুর কুষ্টিয়া।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯.	ঐ	পাকুরিয়া জামালপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৮০.	ঐ	গোয়াল পট্টি শেরপুর	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ৯ দিন।	ঐ
৮১.	ঐ	গোপালগঞ্জ।	ঐ	২১ আশ্বিন থেকে ১০ দিন।	ঐ

৮২.	বোয়ালমারী মেলা	বোয়ালমারী ফরিদপুর	দশমী	২৪ আশ্বিন থেকে ২ দিন	মৃৎশিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, ফল-মূল ইত্যাদি পাওয়া যায়।
৮৩.	উৎসব ও মেলা	কমলাপুর কুষ্টিয়া।	বার্ষিক	২৫ আশ্চিন থেকে ২ দিন।	ঐ
৮৫.	ওরস ও মেলা	পটিয়া চট্টগ্রাম।	বাষিক	২৯ আশ্বিন	বাউল-বৈষ্ণব সমাবেশ ও বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য এবং খাবার পাওয়া যায়।
৮৬.	ওরস ও মেলা	মাইজভাণ্ডার ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	৩০ আশ্বিন	ঐ
৮৭.	উৎসব ও মেলা	শ্রীপট কৃষ্ণপুর ঢাকা।	তিরোধান উৎসব	ঐ	ভক্তদের সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী।
৮৮.	দলুয়াগুণী মেলা	দলুয়াগুণী মোল্লারহাট	বার্ষিক	৩১ আশ্বিন	ঐ

কার্তিক

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	লালন মেলা	ছেঁউরিয়া আখড়া কুষ্টিয়া সদর।	দোল পূর্ণিমা	১ কার্তিক ২৭ কার্তিক থেকে ৩ দিন।	লালন ভক্তদের সমাবেশ, বাউল গান, লালনের গানের আসর। এছাড়াও বিভিন্ন খেলনা সামগ্রী এবং দেশীয় ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২.	বাউল মেলা	কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর।	বাউল মেলা	১ কার্তিক থেকে ২ দিন।	বাউলদের সমাবেশ, সেই সঙ্গে বাউল গান, জারি এবং মেলার যাবতীয় পণ সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩.	বাউল মেলা	বাউলপাড়া নরসিংদী।	ঐ	১ কার্তিক থেকে ২ দিন।	বাউল ভক্তদের সমাবেশ, তার সথে বাউল গান, জারি গান এবং মেলার বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪.	কীর্তন ও মেলা	শ্রীধাম ফরিদপুর।	কীর্তন	২ কার্তিক থেকে ১ দিন।	পূজার উপকরণ এবং মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫.	উৎসব ও মেলা	খেতুরীধাম রাজশাহী।	তিরোধান	৩ কার্তিক থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬.	মুরাদপুর মেলা	মুরাদপুর পাঁচশাইল চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	১১ কার্তিক	ঐ

৭.	সোনামুখী মেলা	সোনামুখী শাহজাহানপুর সিরাজগঞ্জ।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক থেকে ১৫ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৮.	কালীবাড়ি মেলা	বিষ্ণুপুর কুটিরহাট নোয়াখালী।	ঐ	১৩ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৯.	খাগসানা মেলা	খাগসানা বোয়ালিয়া পাংশা রাজবাড়ি।	ঐ	১৩ কার্তিক থেকে ৩ দিন।	ঐ
১০.	কালীপূজা ও মেলা	ক্ষ্যাপা শ্যামানন্দ মাতৃযোগাসনে মানিকগঞ্জ।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প এবং শিশুদের প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১১.	রুকিন্দিপুর মেলা	রুকিন্দিপুর আদমদিঘি বগুড়া।	ঐ	১৩ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
১২.	কেনালকুশী মেলা	কেনালকুশী শেরপুর।	ঐ	১৩ কার্তিক থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৩.	দেবীগঞ্জ মেলা	দেবীগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	১৩ কার্তিক থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৪.	খোকসা মেলা	জানিপুর বাজার খোকসা কুষ্টিয়া।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক থেকে ১৫ দিন।	ভক্ত নারী-পুরুষের উপস্থিতি ও বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্রের সমাহার। এছাড়াও মৌসুমী ফল-মূল ক্রয়-বিক্রয় হয়। সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের আয়োজন থাকে।

১৫.	পানিঘাটের মেলা	পানিঘাট বাগেরহাট।	ঐ	১৩ কার্তিক থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৬.	মানিকগঞ্জ মেলা	মানিকগঞ্জ বাগেরহাট।	ঐ	১৩ কার্তিক, মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার।	ঐ
১৭.	ভোলানাথপুর মেলা	ভোলানাথপুর দিনাজপুর।	ঐ	১৩ কার্তিক ১ দিন।	ঐ
১৮.	পৈল মেলা,	পৈল সিলেট।	ঐ	১৩ কার্তিক ১ দিন।	ঐ
১৯.	শ্যামাপূজার মেলা	কাড়াপাড়া পশ্চিমপাড়া বাগেরহাট	শ্যামাপূজা	১৩ কার্তিক ১ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২০.	কালীবাড়ির মেলা	পতেঙ্গা কালীবাড়ি চট্টগ্রাম বন্দর।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক থেকে ৩ দিন।	ঐ
২১.	ডেমডেমির কালীর মেলা	বীরগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	১৩ কার্তিক থেকে ১৫ দিন।	ঐ
২২.	কালীপূজা ও মেলা	কালীবাড়ি মন্দির হাজারী লেন চট্টগ্রাম।	ঐ	১৩ কার্তিক	ঐ
২৩.	চাকের মেলা	হালিখালী বাগমারা রাজশাহী।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক	ভক্ত নার-নারীল উপস্থিতি, এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ও মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২৪.	বাহাদুরগঞ্জ হাট মেলা	বাহাদুরগঞ্জ ভোলাহাট নবাবগঞ্জ।	ঐ	১৩ কার্তিক	ঐ
২৫.	কালীপূজার মেলা	ইতনা লোহাগড়া নড়াইল।	ঐ	১৩ কার্তিক	ঐ

২৬.	উৎসব ও মেলা	দক্ষিণ নগর দাউদকান্দি কুমিল্লা।	বার্ষিক	১৩ কার্তিক	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২৭.	কালীপূজার মেলা	দিঘলিয়া লোহাগড়া নড়াইল।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের তৈরি শিল্প এবং মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২৮.	উৎসব ও মেলা	ভাণ্ডারিয়া পিরোজপুর।	ঐ	১৩ কার্তিক	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, শিশুদের প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৯.	উৎসব ও মেলা	বন্দর থানা চট্টগ্রাম।	শ্মশানকালী পূজা	১৩ কার্তিক	ঐ
৩০.	দীপান্বিত মেলা	বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	দীপান্বিতা	১৩ কার্তিক	ঐ
৩১.	কালীপূজার মেলা	লক্ষ্মীপাশা নড়াইল	কালীপূজা	১৩ কার্তিক	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের সমাহার এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩২.	উৎসব ও মেলা	বৈরাটী গৌরী আশ্রম নেত্রকোনা।	আবির্ভাব উৎসব	১৩ কার্তিক	ঐ
৩৩.	কালীপূজা ও মেলা	শিবশ্রেম রংপুর।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক	ঐ
৩৪.	কালীপূজা ও মেলা	শ্যামপুর শ্মশান ঢাকা।	কালীপূজা	১৩ কার্তিক	ঐ

৩৫.	উৎসব ও মেলা	লক্ষ্মীকালী খুলনা।	পূজাও উৎসব	১৩ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৬.	মাতৃপূজা ও মেলা	পটিয়া চট্টগ্রাম।	পূজা	১৩ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৭.	দীপদান ও মেলা	বালকব্রহ্মচারী শ্মশান বরিশাল।	দীপদান ও কীর্তন	১৩ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, এছাড়া মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩৮.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	কাশিয়াখালী ঢাকা।	তিরোধান উৎসব	১৩ কার্তিক	ঐ
৩৯.	মহোৎসবের মেলা	খাটরা (গাসাইল রোড) গোপালগঞ্জ।	মহোৎসব	১৩ কার্তিক থেকে ১০ দিন।	বৈষ্ণব ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ। সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪০.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	নিতাইগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ।	তিরোধান	১৫ কার্তিক	মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪১.	মহোৎসব ও মেলা	দৌলতপুর পাবনা।	পূজা	১৫ কার্তিক	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, এছাড়াও মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪২.	শ্রীপাঠ মেলা	খেতুরীধাম রাজশাহী।	মহানাম ও কীর্তন	১৯ কার্তিক থেকে ৫ দিন।	পূজার উপকরণ ্বং বিভিন্ন শিল্পের সমাহার ও মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়। সেই সঙ্গে আউল-বাউলের সমাবেশ।
৪৩.	জোয়ারার মেলা	জোয়ারা পটিয়া চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	২০ কার্তিক ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি ও আউল-বাউলের সমাবেশ এবং যাবতীয় মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

৪৪.	বার্ষিক ওরস ও মেলা	মুসলিম ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	২০ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৫.	পূজা ও মেলা	লালমনিরহাট রংপুর।	গবাং পূজা	২২ কার্তিক থেকে ৭ দিন।	বাঁশ, বেতের দ্রব্য, শিশুদের খেলনা সামগ্রী, লৌহ শিল্প ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৪৬.	তিরোধান উৎসবের মেলা	দুলালী বৈষ্ণব দেবালয় সিলেট।	তিরোধান	২৪ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ভক্ত বৈষ্ণবের সমাবেশ ও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৭.	কৃষ্ণলীলার মেলা	আবদুল্লাপুর গিরিধারী আখরা ঢাকা।	রথযাত্রা	২৫ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি ও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৮.	পূর্ণিমার মেলা	ঝলমলিয়া রামপাল বাগেরহাট।	রাস পূর্ণিমা	কার্তিকের পূর্ণিমা থেকে ৩ দিন।	মৃৎশিল্প, কাঠ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্পের গৃহ সামগ্রী, পুতুল, প্লাস্টিকের খেলনা, চুড়ি, মণ্ডাসহ নানা রকমের খাবার দাবার বেচা-কেনা হয়।
৪৯.	পূর্ণিমার মেলা	করবী ফকির-হাট বাগেরহাট।	ঐ	ঐ	ঐ
৫০.	দুলবারচটি মেলা	দুলবারচটি পাইকগাছা খুলনা।	রাস পূর্ণিমা	২৭ কার্তিকের পূর্ণিমা থেকে ৭ দিন।	মৃৎশিল্প, কাঠ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্পের গৃহ সামগ্রী, পুতুল, নানা রকমের খাবার দাবার, যাত্রা সার্কাস ইত্যাদির আয়োজন থাকে।
৫১.	রাস পূর্ণিমার মেলা	খানপুর বাগেরহাট।	রাস পূণিমা	ঐ	ঐ
৫২.	ঐ	হলদিরচর সুন্দরবন এলাকা খুলনা।	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৫৩.	মানিকগঞ্জ বেতিলা মেলা	মানিকগঞ্জ বেতিলা ঢাকা।	রাস যাত্রা	ঐ-৭ দিন।	ঐ
৫৪.	কাশিয়াখালী মেলা	কাশিয়াখালী ঢাকা।	বার্ষিক	২৭ কার্তিক	ঐ
৫৫.	রাস উৎসব ও মেলা	ওড়াকান্দি ফরিদপুর।	রাস পূর্ণিমা	২৭ কার্তিক	ঐ
৫৬.	উৎসব ও মেলা	কান্তনগর দিনাজপুর।	রাস উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ৫ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী, শিশদের খেলনা। চিত্তবিনোদনের জন্য যাত্রা, সার্কস, পুতুলনাচ, ইত্যাদি থাকে।
৫৭.	উৎসব ও মেলা	ভানুগাছ সিলেট।	উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৫৮.	জন্মোৎসব ও মেলা	সাখারীকাঠি দেবাশ্রম বরিশাল।	জন্মোৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৫৯.	উৎসব ও মেলা	শ্রীধাম বাঁসুরিয়া ফরিদপুর।	উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৬০.	রাস উৎসব ও মেলা	পারুয়া চট্টগ্রাম।	রাস উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৬১.	রাস উৎসব ও মেলা	পূর্ণানন্দ।	রাস উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৬২.	স্নান ও মেলা	করকটিতলাধাম চট্টগ্রাম।	স্নান	২৭ কার্তিক ১ দিন।	ঐ
৬৩.	রাম উৎসবের মেলা	গোশিঙ্গা হরিবাসর বরিশাল।	রাস উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৬৪.	মহোৎসব ও মেলা	খেপুপাড়া বন্দর পটুয়াখালী।	মহোৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫.	রাস উৎসব ও মেলা	সরস্বতীস্থ লামুয়া সিলেট, লামাবাজার।	রাস উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ। মণিপুরী সম্প্রদায়ের রাসোৎসব ২ দিন।
৬৬.	রাস পূর্ণিমা	শিবচর মাদারীপুর	রাস উৎসব	২৭ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ঐ
৬৭.	আলীনগর মেলা	গড়পাড়া ইমামবাড়ি আলীনগর ঢাকা।	ওরস	২৮ কার্তিক থেকে ২ দিন।	ভক্ত আউল-বাউলের সমাবেশ এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৮.	উরুল্লাপুর মেলা	উরুল্লাপুর ঢাকা।	বার্ষিক	২৮ কার্তিক থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মিষ্টি, খাবার, পুতুল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৬৯.	রায়দৌলতপুরমেলা	রায়দৌলতপুর পাবনা।	গোবর্দ্ধন পূজা	২৮ কার্তিক থেকে ৩ দিন।	ঐ
৭০.	জন্মোৎসব ও মেলা	মালিবাতা রঘুনাথপুর গোপালগঞ্জ।	জন্মোৎসব	২৯ কার্তিক	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি ও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭১.	উৎসব ও মেলা	উরুল্লাপুর ঢাকা।	উৎসব	৩০ কার্তিক ১ দিন।	ঐ
৭২.	কার্তিক পূজা ও মেলা	কালিয়কৈর গাজীপুর।	পূজা	৩০ কার্তিক	পূজার উপকরণ এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়।
৭৩.	পুষারথ মেলা	নুনুয়ার আখড়া বড়লেখা সিলেট।	পূষারথ	শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ১ দিন।	উল্টোরথ হিসেবে মেলায় সব রকমের দ্রব্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৭৪.	মধুপুর গোষ্ঠের মেলা	মধুপুর ঘাটাইল টাঙ্গাইল।	কার্তিক র্বণ	কার্তিক মাসের শেষ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭৫.	কৃষ্ণপুর মেলা	কৃষ্ণপুর জোড়মণ্ডপ মাধবপুর কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার।	রাস পার্বণ	কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন থেকে ৩ দিন।	ঐ। মণিপুরী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত রাসলীলা অনুষ্ঠান।
৭৬.	আদমপুর মেলা	আদমপুর রানীগাঁও কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার।	ঐ	ঐ,২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রহায়ণ

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	ওরস ও মেলা	সুরেশ্বর ফরিদপুর।	ওরস	১ অগ্রহায়ণ	ভক্ত-আইল-বাউলের সমাবেশ ও মুর্শিদীগান। এছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠ শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২.	নেকমবাদ মেলা	রানী শংকাইল ঠাকুরগাঁও।	গো-মহিষ বিক্রয়	১ অগ্রহায়ণ থেকে ৩০ অগ্রহায়ণ	পিরের মালার এবং বিখ্যাত প্রাচীন মেলা। এক সময় এ মেলায় সারা ভারত বর্ষের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাতি, উট, গরুসহ বিভিন্ন জাতের পশু-পাখি কেন-বেচা হতো। বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র এবং শিশুদের খেলনা উপকরণ ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩.	বোল্লারহাট মেলা	চকরামপুর কোতোয়ালী দিনাজপুর।	হিন্দুদের বেউমেলা	২ অগ্রহায়ণ থেকে ৮ অগ্রহায়ণ।	হিন্দুদের পূজার উপকরণ এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪.	কুশিহারা মেলা	কুশিহারা নারায়ণগঞ্জ।	সংকীর্তন	৩ অগ্রহায়ণ থেকে ৫ অগ্রহায়ণ।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৫.	জন্মোৎসব মেলা	মনোহর বরিশাল।	জন্মোৎসব	৩ অগ্রহায়ণ	ভক্ত নর-নারীদের উপস্থিতি, এছাড়াও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬.	আবির্ভাব উৎসবের মেলা	চট্টেশ্বরী ধাম চট্টগ্রাম।	আবির্ভাব উৎসব	৩ অগ্রহায়ণ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী এবং লৌহ শিল্প, এছাড়াও মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
৭.	তিরোধান উৎসবের মেলা	নবাবগঞ্জ আশুল্যা আশ্রম ঢাকা।	তিরোধান উৎসব	৪ অগ্রহায়ণ	ঐ
৮.	নামকীর্তন ও মেলা	কুশিহারা বেদান্ত আশ্রম নারায়ণগঞ্জ।	সংকীর্তন	৪ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৯.	ওরস ও মেলা	বাঞ্ছারামপুর বি-বাড়িয়া।	ওরস	৬ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	আউল-বাউলের সমাবেশ এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১০.	রওজা শরিফে জিকির ও মেলা	পির কাশীমপুর কুমিল্লা।	জিকির	৭ অগ্রহায়ন থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি ও আউল-বাউলের সমাবেশ এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১১.	মহোৎসবের মেলা	কমলাপুর রাজৈর গোপালগঞ্জ।	মহোৎসব	৭ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প ও মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
১২.	উৎসব ও মেলা	কাঁঠালিয়া নবীনগর বি-বাড়িয়া।	বার্ষিক উৎসব	১৩ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	রায়পুর দুর্গাপুর মেলা	রায়পুর চিরিরবন্দর দিনাজপুর।	গো-মহিষ বিক্রয়	১৩ অগ্রহায়ণ থেকে ৩০ অগ্রহায়ণ।	গো-মহিষ বিক্রয়ের জন্য বিরাট হাট, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
১৪.	মনোহরদি মেলা	মনোহরদি নরসিংদী।	গোস্বামীর তিরোধান	১৪ অগ্রহায়ণ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, এছাড়াও মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
১৫.	সাগলাদী মেলা	সাগলাদী নগরকান্দা ফরিদপুর।	বার্ষিক	১৪ অগ্রহায়ণ থেকে ৮ দিন।	ঐ। চিত্তবিনোদনের সার্কাস, যাত্রা. পুতুল নাচ ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয়।
১৬.	পূর্ণানন্দ মেলা	পূর্ণানন্দ যোগাশ্রম পাবনা।	ঐ	১৪ অগ্রহায়ণ	ঐ
১৭.	হাওড়া মেলা	হাওড়া চট্টগ্রাম।	ঐ	১৪ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
১৮.	নসরতপুর পল্লী উন্নয়নের মেলা	চিরিরবন্দর দিনাজপুর।	গো-মহিষ বিক্রয়	১৪ ও ১৫ অগ্রহায়ণ।	গো-মহিষের বিক্রয়ের জন্য বিরাট হাট, এছাড়াও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৯.	ছওয়াব মাহফিল ও মেলা	সর্ষিনা শরিফ বরিশাল।	মাহফিল	১৪ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২০.	উৎসব ও মেলা	শ্রীপাঠ জয়পুর যশোহর।	উৎসব	১৪ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, এছাড়াও মৌসুমী ফল-মূল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২১.	কালীপূজা ও মেলা	ভোলানাথপুর দিনাজপুর।	কালীপূজা	১৪ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

২২.	কাউখালী মেলা	কাউখালী পিরোজপুর বরিশাল।	দুর্গাপ্রসন্ন পূজা	১৫ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, কাঠের আসবাবপত্র, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল এবং মেয়েদের প্রসাধন বেচা-কেনা হয়।
২৩.	রুহিয়া আজাদ মেলা	রুহিয়া ঠাকুরগাঁও।	কলেজ উন্নয়ন	১৫ অগ্রহায়ণ থেকে ১ মাস।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষার খেলা, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা, এছাড়াও মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২৪.	উৎসব ও মেলা	পানসিপাড়া লালপুর রাজশাহী।	নবান্ন উৎসব	১৬ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
২৫.	শাঁখারীকাটি মেলা	শাঁখারীকাটি দেবাশ্রম বরিশাল।	বার্ষিক	১৬ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
২৬.	সর্ষিণা ওরস ও মেলা	সর্ষিনা শরিফ বরিশাল।	ইছালে ছওয়াচ	১৬ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, এছাড়াও মেলার যাবতীয় পণ্য সমগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২৭.	শামুখশাহ জিন্দাপিরের মেলা	বীরগঞ্জ দিনাজপুর।	মাজার উপলক্ষে	১৯ অগ্রহায়ণ থেকে ১ মাস।	মেলার যাবতীয় উপকরণ, যাত্রা, সার্কাস, নাগরদোলা, পুতুলনাচ, সেই সঙ্গে পশু-পাখি বেচা-কেনা হয়।
২৮.	রাজপুর মেলা	দক্ষিণরাজপুর খুলনা।	বার্ষিক	১৯ অগ্রহায়ণ থেকে ৫ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প এবং শিশুদের প্লাস্টিকের সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৯.	উৎসব ও মেলা	সত্য সেবাশ্রম সিরাজগঞ্জ।	বিধান উৎসব	১৯ অগ্রহায়ণ থেকে ১ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩০.	উৎসব ও মেলা	পৈলগ্রাম সিলেট।	কালীপূজা	১৯ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩১.	মহোৎসব ও মেলা	কৃশীমাড়গ বেদান্ত নারায়ণগঞ্জ।	তিরোধান	১৯ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
৩২.	উৎসব ও মেলা	দক্ষিণ রাজাপুর ধাম খুলনা।	ঐ	১৯ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৩.	উৎসব ও মেলা	হাসানাবাদ নবাবগঞ্জ ঢাকা।	ঐ	২০ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৪.	উৎসব ও মেলা	ভাটাপাড়া ঢাকা।	তিরোধান	২৩ অগ্রহায়ণ থেকে ৫ দিন।	ঐ
৩৫.	বাড়ৈখালী মেলা	বাড়ৈখালী খুলনা।	কালাচান্দ ঠাকুরের তিরোধান	২৫ অগ্রহায়ণ থেকে২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩৬.	খাগড়িয়া মেলা	খাগড়িয়া সরিষাবাড়ি ময়মনসিংহ।	বার্ষিক	২৫ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩৭.	উৎসব ও মেলা	সরোয়াতলী পঞ্চানন সেবাশ্রম চট্টগ্রাম।	উৎসব	২৬ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৮.	উৎসব ও মেলা	উরশীউড়া বি-বাড়িয়া।	উৎসব	২৮ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি সেই সাথে মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

৩৯.	চিত্রকুট মেলা	চিত্রকুট চিত্রকুটধাম ঢাকা।	বার্ষিক	২৮ অগ্রহায়ণ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, মৌসুমী ফল-মূল এবং শিশুদের খেলনা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪০.	উৎসব ও মেলা	পানিসাইল মঠ সিলেট।	আবির্ভাব তিথি	২৮ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নার-নারীর উপস্থিতি, এছাড়াও মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪১.	উৎসব ও মেলা	স্বর্ণমতি শিবাশ্রম রংপুর।	তিরোধান	২৮ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৪২.	উৎসব ও মেলা	ভাজনভাঙ্গা কালীবাড়ি ফরিদপুর।	উৎসব	২৮ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৩.	পিরিজকান্দি মেলা	পিরিজকান্দি ঢাকা।	বার্ষিক	৩০ অগ্রহায়ণ	বাঁশ ও বেত শিল্প, লৌহ শিল্প, কাঠের শিল্প, চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুলনাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি হয়ে থাকে।
৪৪.	উৎসব ও মেলা	চিত্রকুটধাম ঢাকা।	বার্ষিক	৩০ অগ্রহায়ণ থেকে ১ দিন।	ঐ
৪৫.	ওরস ও মেলা	গাংডুরী ঘিওর মানিকগঞ্জ।	ওরস	৩০ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন	নার-নারী উপস্থিতি, এছাড়াও মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৬.	উৎসব ও মেলা	সত্য সেবাশ্রম সিরাজগঞ্জ।	দুর্গাপূজা	৩০ অগ্রহায়ণ থেকে ২ দিন।	নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার সামগ্রী কেনা-বেচা।
৪৭.	উৎসব ও মেলা	পৈলগ্রাম সিলেট।	কালীপূজা	৩০ অগ্রহায়ণ থেকে ৩ দিন।	পূজার উপকরণ, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি শিল্প এবং মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮.	ওরস ও মেলা	এনায়েতপুর বেলকুচি পাবনা।	ওরস	অগ্রহায়ণ মাসে ৫ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, সেই সাথে আউল-বাউলের সমাবেশ এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

পৌষ

ক্রমিক সংখ্যা	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/ স্থায়িত্বকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	জলনগর মেলা	জলনগর বালিয়াকান্দি ফরিদপুর।	বার্ষিক	১ পৌষ	মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, বাঁশ, বেত শিল্প, প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী ও মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২.	রঘুনাথ মেলা	রঘুনাথপুর গোপালগঞ্জ।	বার্ষিক	১ পৌষ	ঐ
৩.	মাধবপুর মেলা	মাধবপুর বাজার কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার।	ঐ	১ পৌষ থেকে ৩ দিন।	মণিপুরী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা। মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪.	পূর্ণটা মেলা	পূর্ণটা ক্ষেতলাল বগুড়া।	ঐ	১ পৌষ	মৃৎশিল্প, রঙিন পুতুল, প্লাস্টিক সামগ্রী, সেই সঙ্গে মেয়েদের প্রসাধন কেনা-বেচা হয়।
৫.	বারুণী মেলা	কমলাঘাট মুন্সীগঞ্জ।	বারুণী	১ পৌষ থেকে ৬ দিন।	প্রধান আকর্ষণ মৃৎশিল্পের পশরা। কাঠের আসবাবপত্র, নাগরদোলা, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রীও বেচা-কেনা হয়।

৬.	মালিবাগ মেলা	মালিবাগ মতিঝিল ঢাকা্	বারুণী	১ পৌষ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁসা শিল্প, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭.	পানসিপাড়া মেলা	পানসিপাড়া লালপুর নাটোর।	নবান্ন	১ পৌষ ২ দিন।	বৈষ্ণব ধর্মীয় উৎসব, সেই সঙ্গে মেলা।
৮.	গোপালপুর, চৌধুরীর মেলা	ঘোড়াঘাট দিনাজপুর।	গো-মহিষ বিক্রি	১ পৌষ থেকে ২৯ দিন।	গো-মহিষ বিক্রির জন্য বিরাট হাট। সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৯.	ফতেহ কাজী মেলা	শাহজিবাজার হবিগঞ্জ।	বার্ষিক	১ পৌষ থেকে ৫ দিন।	মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়। সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের আয়োজন থাকে।
১০.	নলদিয়ার মেলা	নলদিয়া ছাগলনাইয়া ফেনী।	ফকির দরবেশ	১ পৌষ থেকে ৫ দিন।	ভক্ত মুরিদানের সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১১.	রামনাথ ব্রহ্মচারীর উৎসব ও মেলা	রামগঞ্জ বৈদ্যেরবাজার নারায়ণগঞ্জ।	তিরোধান	২ পৌষ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১২.	জগচন্দ্রের উৎসব ও মেলা	দেবীদাসকাঠি বরিশাল।	ঐ	২ পৌষ	ঐ

১৩.	ঘোড় দৌড়ের মেলা	ভাবনাবাহার	ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা	২৮ পৌষ	দৌড়ের ঘোড়ার সমাবেশ এবং দৌড় প্রতিযোগিতা, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৪.	ধর্মপুর মেলা	ধর্মপুর তালতলা কসবা কুমিল্লা।	বার্ষিক	২ পৌষ	বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠের তৈরি শিল্প, সেই সঙ্গে মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৫.	ব্যাস পূজা ও মেলা	গৌড়ীয়ষতিমঠ খুলনা।	তিরোধান	৩ পৌষ	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৬.	উৎসব ও মেলা	গোবিন্দপুর আশ্রম আমিনপুর নারায়ণগঞ্জ।	ঐ	৪ পৌষ	ঐ
১৭.	উৎসব ও মেলা	ভোলাচাগ্রাম নবীনগর বি-বাড়িয়া।	বার্ষিক	৫ পৌষ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
১৮.	সুতাং মেলা	সুতাং হবিগঞ্জ।	বার্ষিক	৬ পৌষ	ঐ
১৯.	উৎসব ও মেলা	পূর্ণানন্দযোগাশ্রপ াবনা।	তিরোধান	৯ পৌষ	কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-

Dhaka University Institutional Repository

					কেনা হয়।
২০.	পির আমানত খান ওরস ও মেলা	চট্টগ্রাম সদর।	ওরস	১০ পৌষ থেকে ২ দিন।	আউল-বাউল ও ভক্ত সমাবেশ। সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২১.	রক্ষাকালী পূজাও মেলা	শাঁখারীবাজার ঢাকা।	পূজা	১০ পৌষ	ভক্ত নার-নারীর উপস্থিতি, সেই সাথে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২২.	গ্রজিশহর প্রেমতলী মেলা	রামবাড়ি তানোর রাজশাহী।	পৌষ সংক্রান্তি	১০ পৌষ থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেতের উপকরণ, কাঠের আসবাবপত্র, লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প এবং মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
২৩.	উৎসব মেলা	আদমপুর সোনারগাঁ ঢাকা।	তিরোধান	১১ পৌষ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলা। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ শিল্প, কাঁসা শিল্প, কাঠের তৈরি শিল্প, এছাড়া মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২৪.	পণ্ডিশার মেলা	পণ্ডিশার ফরিদপুর।	ওরস	১১ পৌষ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ। মুর্শিদি গানের আসর, সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
২৫.	সারোয়াতলীর মেলা	সারোয়াতলী পঞ্চানন সেবা	বার্ষিক	১২ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত সমাবেশ ও মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী

		আশ্রম চট্টগ্রাম।			ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৬.	মহোৎসবের মেলা	খলিলপুর দেবীদ্বার কুমিল্লা।	আবির্ভাব	১২ পৌষ ১ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, সেই সঙ্গে কীর্তন। মেলায় যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৭.	মানিক মিয়ার মেলা	ফাতেমানগর কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	বার্ষিক	১২ পৌষ থেকে ১ দিন।	মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
২৮.	সরস্বতী ও মেলা	কক্সবাজার।	ঐ	১২ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী।
২৯.	কীর্তন ও মেলা	শাঁখারী বাজার ঢাকা।	সংকর্তীন	১৩ পৌষ ৫৬ প্রহরব্যাপী।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি সেই সঙ্গে শিশুতোষ খেলনা, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।
৩০.	খোচনা হাইস্কুলের মেলা	খোচনাবন্দর চিরির বন্দর দিনাজপুর।	গো-মহিষ বিক্রি	১৩ পৌষ থেকে ১০ দিন।	গো-মহিষ বিক্রির জন্য বিরাট মেলা। তার সাথে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩১.	মদনমোহন জিউর উৎসব ও মেলা	তালখন্দ রাজশাহী।	বার্ষিক	১৪ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং সেই সঙ্গে লৌহ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র এবং দেশী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
৩২.	মহাশ্মশানের মেলা	মহাশ্মশান।	ঐ	১৪ পৌষ থেকে ২ দিন।	ঐ

৩৩.	নগর মেলা	নগর কুমিল্লা।	বর্ষিক	১৪ পৌষ থেকে ২ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, নাগরদোলা এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ, কাঠের বাঁশ ও বেত শিল্প, এছাড়াও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩৪.	জন্মোৎসব ও মেলা	রহিমপুর অযাকে আশ্রম মুরাদনগর কুমিল্লা	জন্মোৎসব	১৪ পৌষ	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি এবং মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩৫.	কামারগাঁ	কামারগাঁ তানোর রাজশাহী।	বারুণী গঙ্গা স্নান	১৫ ও ১৬ পৌষ	হিন্দু ধর্মীয় উৎসব, ভক্ত নর-নারীর সমাগম। সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩৬.	গোবিন্দপুর মেলা	গোবিন্দপুর নবাবগঞ্জ।	কালীপূজা	১৫ পৌষ	ঐ
৩৭.	সুলতান মীর মেলা	হবিগঞ্জ।	বার্ষিক	১৫ পৌষ থেকে ৪ দিন।	পিরের স্মরণ উপলক্ষে ভক্ত নর-নারীর বিপুল সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৩৮.	রানী শংকাইল কলেজ মেলা	রানী শংকাইল দিনাজপুর।	কলেজ উন্নয়ন	১৫ পৌষ থেকে ৪ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুলনাচ, সার্কাস, নাগরদোলা, এবং মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩৯.	কাতলা হাইস্কুল	হাকিমপুর	স্কুল উন্নয়ন	১৫ পৌষ থেকে	ঐ

	মেলা	দিনাজপুর।		১০ দিন।	
৪০.	জন্মোৎসব ও মেলা	সীতারামপুর ফরিদপুর।	জন্মোৎসব	১৬ পৌষ	ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪১.	কদুরখিল মেলা	কদুরখিল বোয়ালখালি চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	১৬ পৌষ থেকে ২ দিন।	ধর্মীয় উপলক্ষে উদযাপিত এ মেলায় বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে মৃৎশিল্প, লৌহ শিল্প, কাঠের তৈরি শিল্প, বাঁশ-বেত শিল্প ছাড়াও মৌসুমী ফল-মূল ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৪২.	মহোৎসব ও মেলা	আড়ানী চারঘাট রাজশাহী।	তিরোধান উৎসব	১৭ পৌষ থেকে ২ দিন।	সাধু সন্তের তিরোধান উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতি, সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৩.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	কালীবাড়ি বানিয়াচং হবিগঞ্জ।	তিরোধান	১৭ পৌষ	ঐ
৪৪.	জসীমপল্লীর মেলা	অম্বিকাপুর ফরিদপুর।	বার্ষিক	১৭ পৌষ	পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন স্মরণোৎসব মেলা। মেলার প্রধান আকর্ষণ পল্লীগীতি, বিচার গান। সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৫.	পীরগঞ্জ মেলা	চিরিরবন্দর দিনাজপুর।	হিন্দুদের বেউমেলা	১৯ পৌষ থেকে ৬ দিন।	সংস্কারমূলক মেলার প্রধান আকর্ষণ নানা রকমের আসবাবপত্র এবং শিশুদের পুতুল, প্লাস্টিকের খেলনা সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬.	কেদরপুরের মেলা	কেদারপুর ফরিদপুর।	ওরস	১৯ পৌষ থেকে ২ দিন।	পুতুলনাচ, নাগরদোলা সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৭.	উৎসব ও মেলা	শ্রীপাঠ নিমতা মানিকগঞ্জ।	তিরোধান	১৯ পৌষ	পূজার উপকরণ, সেই সঙ্গে মৃৎশিল্প, কাঁসা শিল্প, শোলা শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৪৮.	জামগ্রাম মেলা	জামগ্রাম আত্রাই নওগা।	পৌষ সংক্রান্তি	২০ পৌষ থেকে ৪ দিন।	বিভিন্ন জাতের শিল্প, তার মধ্যে লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ছাড়াও শিশুদের প্লাস্টিকের পুতুল বেচা-কেনা হয়।
৪৯.	গণেশ পাগলের মেলা	পাড়কুনা কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ।	বার্ষিক	২১ পৌষ ৭ দিন।	চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুলনাচ, সার্কাস, নাগরদোলা, এছাড়াও বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী যেমন–লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫০.	বিল্লিমেলা	বিল্লারহাট নাচোল নবাবগঞ্জ।	পৌষ সংক্রান্তি	২১ পৌষ সারা পৌষ	ঐ

৫১.	উৎসব ও মেলা	কোটালীপাড়া পাড়কোনা গোপলগঞ্জ।	মহোৎসব	২১ পৌষ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা। মেলায় কাঠের আসবাবপত্র, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫২.	সুরাবাড়ী মেলা	সুরাবাড়ী হবিগঞ্জ।	বার্ষিক	২২ পৌষ থেকে ৮ দিন।	ধর্মীয় মেলা। এ মেলায় চিত্তবিনোদনের মধ্যে পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা এবং বিভিন্ন দেশী খেলাধুলা ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫৩.	চৌবাড়িয়ার মেলা	চৌবাড়ি মালশিয়া তানোর রাজশাহী	হাট উন্নয়ন	১২ পৌষ থেকে ৭ দিন।	বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষার খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
৫৪.	কালীপূজা ও মেলা	গোবিন্দপুর, নবাবগঞ্জ ঢাকা।	বর্ষিক	২৩ পৌষ থকে ২ দিন।	হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ও মেলা। মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫৫.	পাঁচবাড়ী মেলা	পাঁচবাড়ী কোতোয়ালী দিনাজপুর।	যুব উন্নয়ন	২৩ পৌষ থেকে ১০ দিন	চিত্তাবিনোদনের মধ্যে নাগরদোলা, সার্কাস, পুতুল নাচ, ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প এবং শিশুদের প্লিস্টিকের খেলনা

Dhaka University Institutional Repository

					বেচা-কেনা হয়।
৫৬.	ইছামতি কলেজ মেলা।	চিরিরবন্দর দিনাজপুর।	কলেজ উন্নয়ন	২৩ পৌষ থেকে ২১ দিন।	ঐ
৫৭.	ওরস ও মেলা	গোড়াইল মানিকগঞ্জ।	ওরস	২৬ পৌষ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ। এছাড়াও মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫৮.	গুলগফুরা মেলা	বালিয়াঘাট্ গোদাগাড়ি রাজশাহী।	স্কুল উন্নয়ন	২৬ পৌষ	এ মেলার প্রধান আকর্ষণ চিত্তবিনোদন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য যেমন– লৌহ শিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, শীতল পাটি এবং দেশী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
৫৯.	মাদারতলী মেলা	হরিসপুর রানীনগর রাজশাহী।	পৌষ সংক্রান্তি	২৬ পৌষ থেকে ৩ দিন।	চিত্তবিনোদন, সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬০.	আড়ানী মেলা	আড়ানী চারঘাট রাজশাহী।	বার্ষিক	২৬ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৬১.	কামালপুর মেলা	কামালপুর বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	বার্ষিক	২৭ পৌষ থেকে ২ দিন।	বিভিন্ন শিল্পের সমাহার, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী এবং মৌসুমী ফল-মূল-ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬২.	সাগর স্নানের মেলা	কেশুয়াভাঙ্গা বরিশাল।	স্নান যাত্রা	২৭ পৌষ থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ সঙ্গে মেলায় যাবতীয় পণ্য সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৬৩.	চৌরানব্বই মাদল মেলা	পৈলগ্রাম তাহেরপুর সুনামগঞ্জ।	চুরানব্বই মাদল উৎসব	২৭ পৌষ থেকে ৩ দিন।	বৈষ্ণব উৎসব, ভক্ত সমাবেশ। সেই সঙ্গে মেলায় যাবতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৬৪.	কালীবাড়ির মেলা ও উৎসব	ভাজনডাঙ্গা ফরিদপুর।	পূজা	২৭ পৌষ থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৫.	জন্মোৎসবের মেলা	মাশাইল মানিকগঞ্জ।	জন্মোৎসব	২৭ পৌষ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৬.	পূর্ণিমা তিথি ও মেলা	সান্দীগ্রাম কাউনিয়া রংপুর।	পূর্ণিমা তিথি	২৭ পৌষ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার যাবতীয় সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৭.	উৎসব মেলা	কদুরখিল বোয়ালখালী চট্টগ্রাম।	আবির্ভাব	২৭ পৌষ ২ দিন।	ঐ
৬৮.	মহোৎসব ও মেলা	চাঁদপুর পুরান বাজার চাঁদপুর।	জন্মতিথি নামযজ্ঞ উৎসব	২৮ পৌষ থেকে ১ দিন।	বৈষ্ণব ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৯.	জন্মোৎসব ও মেলা	পূর্ব বড়কোটা বরিশাল।	জন্মোৎসব	২৮ পৌষ থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭০.	দশকাহনিয়া মেলা	মৌলভীবাজার।	উৎসব ও মেলা	২৮ পৌষ থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ। উৎসব ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা

Dhaka University Institutional Repository

					হয়।
৭১.	মদনহাল মেলা	মদনহাল মৌলভীবাজার।	বার্ষিক	২৮ পৌষ ২ দিন।	উৎসব ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭২.	উত্তররণ সংক্রান্তির উৎসব ও মেলা	আলমপুর নবীগঞ্জে হবিগঞ্জ	উত্তরায়ণ সংক্রান্তির উৎসব ও মেলা।	২৯ পৌষ থেকে ২ দিন।	হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ও মেলা মেলার প্রধান আকর্ষণ বাঁশ ও বতের সামগ্রী , শিশুতোষ খেলনা ও প্রসাধন।
৭৩.	উত্তরায়ণ সংক্রান্তির উৎসব ও মেলা	সূচিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম।	ঐ	২৯ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৭৪.	উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলা	ইচাখালী চট্টগ্রাম।	ঐ	২৯ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৭৪.	উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলা	ইচাখালী চট্টগ্রাম।	ঐ	২৯ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৭৫.	দেওয়াইর মেলা	দেওয়াইর কলিয়াকৈর গাজীপুর।	কেশবনাথের পাগলের মেলা	২৯ পৌষ ১ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ সে উপলক্ষে মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হং
৭৬.	তিরোধান উৎসব ও মেলা	মেহের কালীবাড়ি কুমিল্লা।	তিরোধান	২৯ ও ৩০ পৌষ	ঐ
৭৭.	বৈষ্ণব উৎসবও ও ও মেলা	নবগ্রাম কুমিল্লা	বৈষ্ণব উৎসব	২৮ ও ৩০ পৌষ	বৈষ্ণব ভক্ত নার-নারীর সমাবেশ ঘটে ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৭৮.	গোলাকান্দাইল হিবালী বাড়ির উৎসব	গোলাকান্দাইল রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ।	পূজা	২৯ পৌষ থেকে ১০ দিন।	পূজা সে উপলক্ষে মেলার যাবতীয় সামগ্রীর সমাবেশ ঘটে ও মেলার সামগ্রী বেচা কেনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯.	গৌরী গৌরাঙ্গ আশ্রম মেলা	গৌরী গৌরাঙ্গ আশ্রম দিনাজপুর।	জন্মোৎসব	২৯ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী বেচা কেনা হয়।
৮০.	আনন্দময়ীর উৎসব ও মেলা	আনন্দময়ী কালীবাড়ি গোপালপুর টাঙ্গাইল।	ধর্মীয় উৎসব	২৯ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৮১.	শুকদেব ব্রহ্মচারীর উৎসব ও মেলা	মন্ধ্যা রাধাগঞ্জ কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।	ঐ	২৯ পৌষ থেকে ৭ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৮২.	নবান্ন মহোৎসব ও মেলা	লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির চরখালী বরিশাল।	ঐ	২৯ পৌষ থেকে ২ দিন।	ঐ
৮৩.	পৌষ পার্বণ ও মেলা	সমসখালী নাটোর।	ঐ	২৯ পৌষ থেকে ২ দিন।	ঐ
৮৪.	দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্তন (আদিবাসী সম্প্রদায়)	রামেশ্বরপাড়া এনায়েতপুর কবসদী পুকুর ভাগবতীপুর মিঠাপুকুর রংপুর।	আদিবাসীদের ধর্মীয়	২৯ পৌষ থেকে ৪ দিন।	দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে চারটি গ্রামেই মেলা ও উৎসব।
৮৫.	মনকাশাইর মেলা	মনকাশাইর তালতলা কসবা কুমিল্লা।	বার্ষিক	পৌষ সংক্রান্তি থেকে ৩ দিন।	স্থানীয় আনন্দ উৎসব ও মেলা।
৮৬.	খোলা মুড়া মেলা	খোলামুড়া কেরানীগঞ্জ।	বার্ষিক	পৌষ সংক্রান্তি থেকে ২ দিন।	ঐ
৮৭.	বড়ভিটার মেলা	নাজিরপুর কলাতিয়া কেরানীগঞ্জ।	বার্ষিক	ঐ	ঐ

৮৮.	পৌষ সংক্রান্তির মেলা	আকছাইল কলাতিয়া কেরানীগঞ্জ।	বার্ষিক	পৌষ সংক্রান্তি থেকে ৩ দিন।	ঐ
৮৯.	মানিক মিয়ার মেলা	ফাতেমানগর কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
৯০.	শাক্তা মেলা	শাক্তা কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	বার্ষিক	পৌষ সংক্রান্তি থেকে ৩ দিন।	ঐ
৯১.	পৌষ সংক্রান্তির মেলা	রহিতপুর কেরানীগঞ্জ ঢাকা	ঐ	ঐ	ঐ
৯২.	বাগিরপাড় পৌষ মেলা	বাগিরপাড় দাসের বাজার বড়লেখা মৌলভীবাজা।	বারুণী	পৌষ সংক্রান্তি থেকে ২ দিন।	হিন্দু ধর্মীয় পার্বণ। নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৯৩.	আমুরিয়া মেলা	আমুরিয়া মাগুরা।	বার্ষিক	পৌষ সংক্রান্তি ২৯ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতা ও মেলা।
৯৪.	আকরার রায় মেলা	শেখহাটী নড়াইল।	বার্ষিক	ঐ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৯৫.	পৌষ সংক্রান্তির মেলা	কনুয়া কামারিয়ার চর জামালপুর।	ঐ	ঐ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৯৬.	রাজপুণ্যা মেলা	বান্দরবান রাজবাড়ির মাঠ।	প্রজাদের ভূমিদান ও কর আদায় হাট-বাজার পত্তন	পৌষ সংক্রান্তি থেকে ২ দিন।	উপজাতীয়দের দীর্ঘ দিনের প্রথা। এ উপলক্ষে বিভিন্ন জাতির নর-নারীর সমাবেশ। আচার অনুষ্ঠান ও মেলা উৎসব।
৯৭.	পৌষ সংক্রান্তির মেলা	বজরাঘাট জামালপুর।	পৌষ পার্বণ	ঐ	আনন্দ উৎসব ও মেলা। শিশুদের খেলনা ও মৃৎশিল্পের সামগ্রীই প্রধান।

৯৮.	ঘোড়াদিয়া মেলা	ঘোড়াদিয়া সিংপুর নিকলী কিশোরগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৯৯.	সেনাদিয়া মেলা	সেনাদিয়া কালিয়া নড়াইল।	ঐ	ঐ	ঐ
১০০.	সেনাদিয়া মেলা	সেনদিয়া খালিয়া রাজৈর মাদারীপুর।	ঐ	২৩ পৌষ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১০১.	পোনরা মেলা	পোনরা দেবিদ্বার কুমিল্লা।	পৌষ সংক্রান্তি	১৯ ও ৩০ পৌষ	পৌষ সংক্রান্তির আনন্দ উৎসব ও আনন্দ মেলা।
১০২.	বরদেশ্বরী মেলা	বরদেশ্বরী নবীনগর বি-বাড়িয়া	ঐ	ঐ	ঐ
১০৩.	শ্যামপুর মেলা	শ্যামপুর দরগাবড়ি রামগঞ্জ লক্ষ্মীপুর।	ওরস	ঐ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ। মানত বিতরণ ও মেলা।
১০৪.	বুড়া-বুড়ির মেলা	করুণাসাগর রামগতি লক্ষ্মীপুর।	পৌষ সংক্রান্তি	ঐ	পৌষ সংক্রান্তির আনন্দ উৎসব ও মেলা।
১০৫.	হিজল ডাঙ্গার মেলা	সীতারামপুর নড়াইল।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৬.	সুখনপুকুর মেলা	সুখনপুকুর জয়পুরহাট।	বার্ষিক	৩০ পৌষ থেকে ২ দিন।	ঐ
১০৭.	দেওয়ান শাহের দরগার মেলা	দেওয়ান শাহের দরগা শরীফ চন্দ্রগঞ্জ লক্ষ্মীপুর।	শ্রদ্ধানিবেদন	৩০ পৌষ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।

Dhaka University Institutional Repository

মাঘ

ক্রমিক নং	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/স্থায়িতকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	লক্ষ্মীপুর ও মেলা	সায়ংকালে প্রতি হিন্দুগৃহ ও দেবালয়ে।	পূজা	১ মাঘ	দেবালয় প্রাঙ্গণে পূজা ও মেলা।
২.	ধর্মীয় মেলা	ভোগবেতলে কটিয়াদী কিশোরগঞ্জ।	কীর্তন	১ মাঘ থেকে ৫ দিন	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলার আকর্ষণ শিশুতোষ খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী।
৩.	জন্মোৎসব ও মেলা	কাটিপাড়া পাইকগাছা খুলনা।	জন্মোৎসব	১ মাঘ	ভক্ত সমাবেশ ও মেলা।
৪.	ওরস ও মেলা	গোবিন্দখিল সীতারামপুর ফরিদপুর।	ওরস	১ মাঘ	পিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ও মেলা।
৫.	মহোৎসব ও মেলা	শানকিভাঙা মঠবাড়িয়া বরিশাল।	মহোৎসব	১ মাঘ	কীর্তন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ।
৬.	পলাশবাড়ির মেলা	বিরল দিনাজপুর।	ওরস	১ মাঘ থেকে ১৫ দিন।	ওরস উপলক্ষে মেলা। মেলার যাবতীয় সামগ্রীসহ চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস,

					পুতুল নাচ, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
৭.	মোরারবন্দ মেলা	চন্দ্রহরী চুনারুঘাট হবিগঞ্জ।	বার্ষিক	১ মাঘ থেকে ৪ দিন।	পিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে ভক্ত নর-নারীর সামবেশে ও মেলা।
৮.	নলদিয়া দেওয়ানের মেলা	সেনবাগ নোয়াখালী।	ঐ	১ মাঘ থেকে ৩ তিন।	মেলার যাবতীয় সামগ্রী প্রধান আকর্ষণ শীতল পাটি, চিরুনি।
৯.	ওরস ও মেলা	হযরত শাহ মোস্তফার মাজার মৌলভীবাজার।	ওরস	১ মাঘ	ভক্ত মুরিদানের সমাবেশ ও মেলা।
১০.	তারীপুর মেলা	তারীপুর শিবগঞ্জ রাজশাহী।	বার্ষিক	১ মাঘ	মেলার সামগ্রী ও আনন্দ উৎসব
১১.	বারুণী মেলা	কামারগাঁ মোহনপুর রাজশাহী।	বার্ষিক	১ মাঘ	মেলার যাবতীয় সামগ্রীসহ চিত্তবিনোদনের আয়োজন।
১২.	কেতুর মেলা	কেতুর প্রেমতলী গোদাগাড়ী রাজশাহী।	বার্ষিক	১ মাঘ থেকে ৩ দিন।	পণ্য সামগ্রীর মেলা।
১৩.	কাকন মেলা	কাকনহাট গোদাবাগী রাজশাহী।	ঐ	১ মাঘ থেকে ৩ দিন।	পণ্য সামগ্রীর বিরাট মেলা।
১৪.	সুলতানগঞ্জ মেলা	সুলতানগঞ্জ।	ঐ	১ মাঘ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৫.	লতিসিকদারের মেলা ও ওরস	লতিসিকদার চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	মৌলানা জমির উদ্দিনের স্মরণে	২ মাঘ	ভক্ত মুরিদানের সমাবেশ ও মেলা।

১৬.	ওরস ও মেলা	নিরঞ্জ হাককানী মসজিদ প্রাঙ্গণে (কালিগঞ্জ ঢাকা সদরঘাটের দক্ষিণ তীরে) ঢাকা।	হাককানী আঞ্জুমান	২ মাঘ মাসের ১ম শুক্রবার থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১৭.	ওরস ও মেলা	বাঠইমুড়ী ঘিওর মানিকগঞ্জ।	বার্ষিক	২ মাঘ	ঐ
১৮.	মহোৎসব ও মেলা	মুলচর মুন্সীগঞ্জ।	মহোৎসব	৩ মাঘ থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১৯.	উৎসব ও মেলা	সীতারামপুর চণ্ডীমণ্ডপে ফরিদপুর।	উৎসব	৩ মাঘ থেকে ৫ দিন।	পূজা উপলক্ষে পূজা ও আনন্দ উৎসব এবং মেলা।
২০.	মাসাইল মেলা	মাশাইল মানিকগঞ্জ।	কীর্তন (বার্ষিক)	৩ ও ৪ মাঘ ২ দিন	কীর্তন উৎসব ও মেলা।
২১.	মূলচর মেলা	মূলচর বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ।	বার্ষিক	৩ ও ৪ মাঘ ২ দিন।	মৃৎশিল্প ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রীর কেনা-বেচা ও আনন্দ উৎসব।
২২.	চৌদ্দমাদলের মেলা	বাঙ্গালপাড়া অষ্ট্রগ্রাম কিশোরগঞ্জ।	চৌদ্দমাদল উৎসব	৪ মাঘ থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা।
২৩.	আমতলীর মেলা	মীরগঞ্জ সেনবাগ নোয়াখালী।	মোঘল চৌধুরীর ঐতিহ্য।	৪ মাঘ থেকে ২ দিন।	উৎসব ও মেলা।
২৪.	গনিসার মেলা	তুল্লাকান্দি নবীনগর বি-বাড়িয়া।	বার্ষিক	৫ মাঘ থেকে ৩ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

২৫.	শাহগাজীর মেলা	গাজীপুর চুনারুঘাট হবিগঞ্জ।	ঐ	৫ মাঘ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সবামেশ। সেই সঙ্গে হস্তশিল্প সামগ্রীর বিরাট মেলা।
২৬.	ফুলবাড়িয়া কলেজ মেলা	ফুলবাড়িয়া দিনাজপুর।	কলেজ উন্নয়ন	৫ মাঘ থেকে ২৫ দিন।	আনন্দ উৎসব ও মেলা, চিত্তবিনোদনমূলক খেলাধুলার আয়োজন, যাত্রা, সার্কাস।
২৭.	আগমনী মেলা	রহিমপুর কুমিল্লা।	বার্ষিক	৬ মাঘ থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মেলা।
২৮.	আঘচক আশ্রম মেলা	মুরাদনগর কুমিল্লা	ঐ	৬, ৮ মাঘ ২ দিন।	ঐ
২৯.	নবান্নের মেলা	মৌলভীবাজার।	নবান্ন উৎসব	৬, ৭ মাঘ ২ দিন।	উৎসব ও মেলা
৩০.	জন্মোৎসব ও মেলা	রহিমপুর অমাচক আশ্রম কুমিল্লা।	জন্মোৎসব	৬ মাঘ থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৩১.	মাহফিল ও মেলা	তালগাছিয়া খান শরিফ বরিশাল।	মাহফিল	৬ মাঘ	ইসলাম ধর্মীয় সম্মেলন ও মেলা।
৩২.	বাঁকাই মেলা	চৈতন্যমঠ বাঁকাই গৌরনদী বরিশাল।	বার্ষিক	৭ মাঘ থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মেলা।
৩৩.	বাসুদেববাড়ির মেলা	চুনারুঘাট হবিগঞ্জ।	ধর্মীয় মেলা	৭ মাঘ থেকে ২ দিন।	ঐ
৩৪.	উৎসব ও মেলা	কার্তিকপুর ফরিদপুর।	উৎসব	৮ মাঘ	ঐ

৩৫.	সাতমোড়ার মেলা	সাতমোড়া নবীনগর বি-বাড়িয়া।	মনোমোহন স্মরণোৎসব	৯ ও ১০ মাঘ ২দিন।	মনোমোহন স্বরণোৎসব উপলক্ষে ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৩৬.	মাইজভাণ্ডার মেলা	মাইজভাণ্ডার পটিয়া চট্টগ্রাম।	বার্ষিক ওরস	১০ মাঘ	মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৩৭.	ললিতনগরের মেলা	ললিতনগর গোদাগাড়ী রাজশাহী।	ললিতনগর বিদ্যালয় উন্নয়ন	১০ মাঘ থেকে ১৭ দিন।	হিন্দু পার্বণ উপলক্ষে বিরাট মেলা। হস্তশিল্পের সামগ্রী ছাড়াও চিত্তবিনোদনের বিশাল সমাবেশ।
৩৮.	ধর্মীয় মেলা	হাতুয়অ চুনারুঘাট বাজার ঢাকা-সিলেট রাস্তার পার্শ্বে।	ধর্মীয়	১০ মাঘ থেকে ৪ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৩৯.	ওরস ও মেলা	গড়পাড়া গ্রাম বাড়ি আলীনগর মানিকগঞ্জ।	ওরস	১০ মাঘ	ঐ
৪০.	মহোৎসব ও মেলা	জাঠিয়া কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।	মহোৎসব	১২ মাঘ	ঐ
৪১.	জারিয়ার মেলা	কালীবাড়ি জারিয়া কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।	কালীপূজা	১২ মাঘ থেকে ২ দিন	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪২.	মধুমেলা	সাগরদাড়ি কেশবপুর যশোর।	মধুকবি স্মরণোৎসব	১২ মাঘ থেকে ৩ দিন	মধু কবি স্মরণোৎসব আলোচনা সভা ও মেলা।
৪৩.	খোকসার মেলা	গড়াই নদীর তীর কুষ্টিয়া।	কালীপূজা	১৩ মাঘ থেকে ১৫ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও বিরাট মেলা। চিত্তবিনোদনের সমারোহ।
৪৪.	উৎসব ও মেলা	তালন্দ রাজশাহী।	জিউর	১৩ মাঘ	হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৪৫.	মহোৎসব ও মেলা	কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ।	মহোৎসব	১৩ মাঘ	ঐ
৪৬.	ওরস ও মেলা	বাঠইমুড়ী ঘিওর মানিকগঞ্জ।	ওরস	১৪ মাঘ	ভক্ত সমাবেশ ও মেলা।
৪৭.	পূজা ও বিরাট মেলা	শ্রীকাইল মুরাদনগর কুমিল্লা।	পূজা ও মেলা	১৪ মাঘ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পূজা ও মেলা।
৪৮.	উৎসব ও মেলা	খেজুর আশ্রমে বরিশাল।	বাগেল চাঁদে	১৪ মাঘ	ঐ
৪৯.	নিরাশীর মেলা	অটোয়ারী পঞ্চগড়।	পশু-পাখি বিক্রয়	১৫ মাঘ থেকে ৩০ দিন।	পশু-পাখি বিক্রয় ও আঞ্চলিক বিখ্যাত মেলা। মেলার চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
৫০.	যদুরানীর মেলা	যদুরানীরঘাট দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৫১.	কাটলা মেলা	চরখাই নবাগঞ্জ।	ঐ	ঐ	আঞ্চলিক উৎসব

					ও মেলা।
৫২.	চেরাভাংগী মেলা	কোতোয়ালী দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	বিখ্যাত আঞ্চলিক মেলা।
৫৩.	কাতিহার মেলা	রানীশংকাইল ঠাকুরগাঁও।	মাঘী পূর্ণিমা	১৫ মাঘ থেকে ১৫ দিন।	কৃষিজাত পণ্য ও আঞ্চলিক কুটির শিল্পের সামগ্রী কেনা-বেচার বিরাট মেলা। চিত্তবিনোদনের বিপুল সমাবেশ।
৫৪.	বন্দিগাই মেলা	বন্দিগা শিমুলিয়া কটিয়াদি কিশোরগঞ্জ।	ওরস	১৫ মাঘ থেকে ৭ দিন।	দরগার ওরস মেলা, মেলার সামগ্রী, বিশেষ করে কাঠ ও মৃৎশিল্পের প্রচুর কেনা-বেচা
৫৫.	সেতাবগঞ্জ কলেজ মেলা	বোচাগঞ্জ দিনাজপুর।	কলেজ উন্নয়ন	১৫ মাঘ থেকে ১৫ দিন।	ঐ
৫৬.	আজিপুর মেলা	আজিপুর কসবা কুমিল্লা।	বার্ষিক	১৫ মাঘ থেকে ১ দিন।	শিশুতোষ খেলনা ও প্রসাধন সামগ্রীর কেনা-বেচা।
৫৭.	ঈদুল ফিতরের মেলা	বাঘা রাজশাহী।	ঈদ	ঈদ-উল-ফিতরের দিন থেকে ৫ দিন।	ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশে একমাত্র প্রাচীন মেলা।
৫৮.	গণেশ মেলা	বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি পল্লীতে	গণেশ পূজা	১৭ মাঘ ১ দিন।	গণেশ ঠাকুরের পূজা ও এলাকায় এলাকায় মেলা।
৫৯.	রানীনগর মেলা	রানীনগর শিকগঞ্জ রাজশাহী।	হাট উন্নয়ন	১৭ মাঘ থেকে ৫ দিন।	আঞ্চলিক কুটির শিল্পের বিরাট

Dhaka University Institutional Repository

					সমাবেশ।
৬০.	সরস্বতী মেলা	আনোয়ারা চট্টগ্রাম।	পূজা	১৮ মাঘ থেকে ৫ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা ও মেলা।
৬১.	সরস্বতী মেলা	কালিগঞ্জ রংপুর সদর।	ঐ	১৮ মাঘ থেকে ৫ দিন।	ঐ
৬২.	উৎসব ও মেলা	স্বগ্রাম মেঘলায় চট্টগ্রাম	আবির্ভাব	১৮ মাঘ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৬৩.	দিঘির মেলা	দিঘি মানিকগঞ্জ।	ওরস	১৮ মাঘ	পিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। মুরিদান নারী-পুরুষের সমাগম ও মেলা।
৬৪.	মহোৎসব ও মেলা	হাতিয়া নোয়াখালী।	মহোৎসব	১৯ মাঘ	হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৬৫.	কীর্তন ও মেলা	বাড়দেশ্বরী মন্দির নবীনগর, বি-বাড়িয়া।	মাঘী সপ্তমী	২০ মাঘ থেকে ৮ দিন।	হিন্দু ধর্মীয় উৎসব, কীর্তন ও মেলা।
৬৬.	কালীতলার মেলা	কাবাপুর বানারীপাড়া বরিশাল।	সূর্য পূজা	২০ মাঘ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৬৭.	সূর্যমনীর মেলা	কাবাপুর বানরীপাড়া বরিশাল।	সূর্য পূজা	২০ মাঘ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৬৮.	স্নান ও মেলা	কালীবাড়ি সুজাফরবাদ চট্টগ্রাম।	মাঘী সপ্তমী	২০ মাঘ থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৬৯.	বলরাম রথ মেলা	সোজানগর মুন্সীগঞ্জ।	রথ	২০ মাঘ থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও কীর্তন।

Dhaka University Institutional Repository

৭০.	নামযর মেলা	চর ডাক্তার রামগতি লক্ষ্মীপুর।	কীর্তন	২০ মাঘ থেকে ৩ দিন।	কীর্তন উৎসব ও মেলা।
৭১.	সূর্য মেলা	জ্যেষ্ঠপুরা ফাতেহাবাদ চট্টগ্রাম।	সূর্যব্রত	২০ মাঘ থেকে ১৫ দিন।	চট্টগ্রামের প্রাচীন মেলার মধ্যে জ্যৈষ্ঠপুরার সূর্যব্রত মেলাটি একটি। লোকশ্রুতি রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশে এটিই প্রথম সূর্যব্রত। এ স্থানে একটি প্রাচীন সূর্যমন্দির রয়েছে। ব্রত বা পূজার সময়ে প্রচুর জনসমাগম ও মেলা যাবতীয় সামগ্রীতে পূর্ণ থাকে।
৭২.	রাধামোহন জিউর উৎসব ও মেলা	দত্তপাড়া গঙ্গানন্দপুর যশোহর।	বার্ষিক	২০ মাঘ থেকে ৩ দিন।	হিন্দু ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৭৩.	কালীগঞ্জ মেলা	জকিগঞ্জ সিলেট।	বার্ষিক	২০ মাঘ থেকে ২ দিন।	ঐ
৭৪.	করখড়ি মেলাা	কানাইঘাট সিলেট	ঐ	ঐ	মহোৎসব মেলা।
৭৫.	রায়গড় মেলা	রায়গড় কানাইঘাট সিলেট।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৬.	নয়াখানার মেলা	নয়াখানা কানাইঘাট সিলেট।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৭.	মহোৎসব ও মেলা	কাটিহালি ময়মনসিংহ।	মহোৎসব	২১ মাঘ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৭৮.	কীর্তন ও মেলা	ওজানচর বাঞ্ছারামপুর বি-বাড়িয়া	মহোৎসব	২২ মাঘ	ঐ

৭৯.	মহাযজ্ঞ ও মেলা	কোতোয়ালী রোডস্থ তাঁতিবাজার ঢাকা।	মহাযজ্ঞ	২২ মাঘ	ঐ
৮০.	নামযজ্ঞ ও মেলা উৎসব	মধ্র আদিতমারি রংপুর।	নামযজ্ঞ	২৩ মাঘ	ঐ
৮১.	জন্মোৎসব ও মেলা	চন্দ্রনাথধামে সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম।	জন্মোৎসব	২৩ মাঘ	হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট উৎসব ও মেলা।
৮২.	ওড়াকান্দি মেলা	ওড়াকান্দি কাসিয়ানী গোপালগঞ্জ।	জন্মোৎসব	২৫ মাঘ থেকে ৩ দিন।	মতুয়া সম্প্রদায়ের বিরাট সমাবেশ ও উৎসব।
৮৩.	উৎসব ও মেলা	সাতমোড়া আনন্দ আশ্রম নবীনগর বি-বাড়িয়া।	আবির্ভাব	২৫ মাঘ	মনোমোহনদত্তের আবির্ভাব উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ও মেলা।
৮৪.	উৎসব ও মেলা	বিপিন চাঁদ মাঠ চিলতলা বরিশাল।	তিরোধান	২৫ মাঘ	ঐ
৮৫.	উৎসব ও মেলা	সোনাদণ্ডী যোগাশ্রম চট্টগ্রাম।	আবির্ভাব	২৬ মাঘ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৮৬.	উৎসব ও মেলা	সিধামাঙ্গন ফরিদপুর।	পদার্পণ উৎসব	২৬ মাঘ	ঐ
৮৭.	উৎসব ও মেলা	দত্তপাড়া গঙ্গানন্দপুর যশোহর।	উৎসব	২৬ মাঘ থেকে ৩ দিন।	ঐ
৮৮.	নলতা মেলা	নলতা সাতক্ষীরা।	ওরস	২৬ মাঘ থেকে ৩ দিন।	দরবার শরিফে ভক্ত নর-নারীর উৎসব ও মেলা।
৮৯.	উৎসব ও মেলা	যোগানন্দ আশ্রম	আবির্ভাব	২৭ মাঘ	হিন্দু সম্প্রদায়ের

		দশরা নারায়ণগঞ্জ।			ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৯০.	পলিয়ারা স্নান	পরিয়ারা করবার ফরিদপুর।	স্নান	২৮ মাঘ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৯১.	মাঘী পূর্ণিমার মেলা	বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ।	মাঘী পূর্ণিমা	২৮ মাঘ থেকে ৩ দিন	কিংবদন্তিপূর্ণ হিন্দু উৎসব ও মেলা।
৯২.	শাহলাল শাহের ওরস	নরুল্লাপুর দোহার ঢাকা।	ওরস	২৬ মাঘ থেকে ২ দিন।	লৌকিক ও পির ও মুর্শিদিগণের রচয়িতা, বিখ্যাত সাধক-এর ওরস উপলক্ষে মুরিদানের সমাবেশ ও মেলা।
৯৩.	হরিচাঁদ ঠাকুর	বাহুথর কাশিয়ানী গোপালগঞ্জ	কীর্তন	২৮ মাঘ ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নার-নারীর সমাবেশ ও মেলা
৯৪.	মাঘী পূর্ণিমার মেলা	বড়বাহিরবাগ কাশিয়ানী গোপালগঞ্জ।	মাঘী পূর্ণিমা	২৮ মাঘ থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা
৯৫.	মধুমতির মেলা	তাড়াইল ফরিদপুর।	বার্ষিক	২৮ মাঘ থেকে ৫ দিন।	জনসমাবেশ ও মেলা।
৯৬.	রবিদাস মেলা	রবিদাসপাড়া ওয়ারী ঢাকা।	সন্তরবিদাস উৎসব	২৮ মাঘ	অচ্ছ্যু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু সন্ত রবিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে ধর্মীয় উৎসব।
৯৭.	খেতুর মেলা	খেতুর রাজশাহী।	উৎসব	২৮ মাঘ থেকে ৩ দিন।	আনন্দ উৎসব ও মেলা। বৈষ্ণব

					বৈষ্ণবীর সমাবেশ। লোকগীতি কীর্তন উৎসব।
৯৮.	ধামাইল মেলা	মইনট দোহার ঢাকা।	ধামাইল উৎসব	২৮ মাঘ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৯৯.	কুসুমদিয়া মেলা	কুসুমদিয়া ফরিদপুর।	উৎসব	২৮ মাঘ থেকে ৩ দিন।	ঐ
১০০.	ঠেগরমুনি মেলা	বৌদ্ধবিহার পটিয়া চট্টগ্রাম।	বৌদ্ধপূর্ণিমা	২৮ মাঘ থেকে ১৫ দিন।	বৌদ্ধ নর-নারীর ধর্মীয় সমাবেশ ও মেলা।
১০১.	রাজারবাগ মেলা	রাজারবাগ পুকুরপাড় ঢাকা।	স্নান	২৮ মাঘ থেকে ২ দিন।	পূজা উপলক্ষে মেলা। মেলার আকর্ষণ মৃৎশিল্প, শিশুতোষ খেলনা, প্লাস্টিক সামগ্রী ও মেয়েদের প্রসাধনী।
১০২.	শাহরানীর মেলা	কসবা মনোহরদি নরসিংদী।	ওরস	২৮ মাঘ থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১০৩.	ডিঙ্গামানিক মেলা	ডিঙ্গামানিক ফরিদপুর।	জন্মাবার্ষিকী	২৮ মাঘ থেকে ২ দিন।	মাজারের মেলা। কাঠের সামগ্রী, বাঁশ ও বেত শিল্পের সমারোহ।
১০৪.	বাউলের মেলা	বাউলবাজার কায়েতপাড়া ডেমরা।	বার্ষিক	২৯ মাঘ থেকে ২ দিন।	বাউল সম্প্রদায়ের জনৈক সিদ্ধপুরুষের স্মৃতি উৎসব, ভক্ত নর-নারীর

					সমাবেশ ও মেলা।
১০৫.	শ্রীকাইল মেলা	শ্রীকাইল মুরাদনগর কুমিল্লা।	পূজা	২৯ মাঘ	পূজা ও মেলা। হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নারী-পুরুষের সমাগম। সেই সঙ্গে পণ্য সামগ্রীর কেনা-বেচা।
১০৬.	গোবিন্দপুর মেলা	আদমদিঘি বগুড়া।	বার্ষিক	৩০ মাঘ	মেলার যাবতীয় সামগ্রীসহ চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস, নাগরদোলা ও ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
১০৭.	সুলতানগঞ্জ মেলা	গোদাগাড়ী রাজশাহী।	বার্ষিক	১ ও ২ মাঘ ২ দিন।	আঞ্চলিক কুঠির শিল্পের সমাহার, প্লাস্টিক দ্রব্যসামগ্রী, মেয়েদের প্রসাধনী।
১০৮.	কাকনের মেলা	কাকনহাট গোদাগাড়ি রাজশাহী।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৯.	কারনী মেলা	কামারগাঁও মোহনপুর রাজশাহী।	বার্ষিক	১ ও ২ মাঘ ২ দিন।	ঐ
১১০.	তারীপুর মেলা	তারীপুর শিবগঞ্জ নবাবগঞ্জ।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
১১১.	লতিশিকদারের মেলা	চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	ওরস	২ ও ৩ মাঘ	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ।

					নিয়াজ-নজরের মিষ্টিজাত সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।
১১২.	পঞ্চমী মেলা	কাচিপাড়া পটুয়াখালী।	পূজা	মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি থেকে ২ দিন।	গ্রামীণ হস্তশিল্পের সামগ্রীসহ প্লাস্টিক ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।
১১৩.	সরস্বতী মেলা	কনকদিয়া পালপাড়া পটুয়াখালী।	পূজা	মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পূজা উপলক্ষে নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১১৪.	দয়ামুখী মেলা	সুতাবাড়িয়া পটুয়াখালী।	মাঘ সংক্রান্তি	মাঘ সংক্রান্তির সপ্তমী থেকে ৩ দিন।	পূজা উপলক্ষে বিরাট মেলা। কাঠ, বাঁশ ও বেত শিল্পের কেনা-বেচা হয়।
১১৫.	দুর্গাসাগর মেলা	মাধবপাশা বাবুগঞ্জ বরিশাল	সরস্বতী পূজা	মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী থেকে ৩ দিন।	ঐ
১১৬.	দেওইল মেলা	পাবর্তীপুর দিনাজপুর।	পূজা	ঐ	ঐ
১১৭.	হাব্বিপুর মেলা	চরভদ্রা পাবর্তীপুর দিনাজপুর।	পূজা	মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী থেকে ৩ দিন।	বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে খেলনা, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী থেকে ঘর-গেরস্থালিতে ব্যবহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কেনা-

Dhaka University Institutional Repository

					বেচা হয়।
১১৮.	কেতুরের মেলা প্রেমতলী)	গোদাগাড়ি রাজশাহী।	নরোত্তম ঠাকুরের উৎসব।	মাঘ মাসের শেষ ৭ দিন।	বৈষ্ণব সন্তের স্মরণোৎসব উপলক্ষে ভক্ত বৈষ্ণ-বৈষ্ণবী ও সাধারণ নর-নারীর উপস্থিতি ও মেলা।
১১৯.	মাগী পূর্ণিমার মেলা	চিৎমরং পটিয়া চট্টগ্রাম।	বৌদ্ধ পার্বণ	মাঘী পূর্ণিমা থেকে ৭ দিন।	বৌদ্ধ পার্বণ উপলক্ষে বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাগম সেই সঙ্গে বিরাট মেলা।
১২০.	শাঁখারী বাজার মেলা	শাখারী বাজার ঢাকা শহর।	মাঘী সপ্তমী	মাঘী সপ্তমী থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ। শিশুতোষ খেলনা ও প্রসাধন সামগ্রী, মেলার প্রদান আকর্ষণ।
১২১.	দত্তকেন্দোয়ার মেলা	মাদারীপুর।	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী ২ দিন।	পঞ্চমী পূজা উপলক্ষে মেলা। কাঠ, বাঁশ ও বেত শিল্পের সমাহার, সেই সঙ্গে শিশুতোষ খেলনা, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।
১২২.	শেরপুর মেলা	শেরপুর বগুড়া।	পূজা	ঐ	ঐ
১২৩.	মাঘী পূর্ণিমা	কমলাপুর মন্দির	পূজা	মাঘী পূর্ণিমা থেকে	বৌদ্ধ নর-নারীর

		ঢাকা শহর।		২ দিন।	ধর্মীয় পার্বণ উপলক্ষে মেলা।
১২৪.	শুটকিরটেকের	নিশানবাড়ি কলাতিয়া কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	বার্ষিক	ঐ	হিন্দু সম্প্রদায়ের পার্বণ উপলক্ষে মেলার বিপুল আয়োজন।
১২৫.	পঞ্চমীর মেলা	রাজারঘাট কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	বার্ষিক	মাঘী পূর্ণিমা থেকে ২ দিন।	মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে আনন্দ উৎসব ও মেলা। শিশুতোষ খেলনা ও মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রীর বিরাট সমাবেশ।
১২৬.	মাঘী পূর্ণিমার মেলা	ছাতিয়ানী বাজার ডুমুরিয়া খুলনা।	মাঘী পূর্ণিমা	পূর্ণিমা থেকে ৩ দিন।	ঐ
১২৭.	রামপালের মেলা	রামপাল বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	পূর্ণিমা থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা ও মেলা। মেলায় মাটির তৈরি খেলনা, পুতুল, গৃহের তৈজস, বাঁশ, বেত সামগ্রীর সমাহার।
১২৮.	জগদীশ গোসাই মেলা	কেলুয়া নেত্রকোনা।	মাঘী পূর্ণিমা	পূর্ণিমার দিন থেকে ৪ দিন।	ভক্ত নার-নারীর সমাবেশ ও মেলা। কীর্তন।
১২৯.	বুড়াসন্ন্যাস মেলা	ঠাকুরপাড়া গাবতলী।	সন্ন্যাস পূজা	মাঘ মাসের শেষ বুধবার থেকে ৮ দিন।	সাধু সন্তের স্মরণোৎসব এর মেলা। মাটির তৈরি শিশুতোষ খেলনা, গৃহসামগ্রী, বাঁশ, বেত শিল্প, প্লাস্টিকের

					তৈজসসহ চিত্তবিনোদনের আয়োজন।
১৩০.	কাশীপুর মেলা	ভাগাঁও বেগমগঞ্জ নোয়াখালী।	বার্ষিক কৃষি প্রদর্শনী	মাঘ মাসের ১৫ থেকে ৩০ দিন।	মেলার যাবতীয় সামগ্রীসহ চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস, নাগরদোলা, পুতুল নাচ, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
১৩১.	কবিরহাট মেলা	আলাইয়াপুর বেগমগঞ্জ নোয়াখালী	ঐ	ঐ	ঐ
১৩২.	বড়ইয়া মেলা	লাকসাম কুমিল্লা।	বৌদ্ধ পূর্ণিমা	পূর্ণিমার দিন থেকে ৭ দিন।	বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নর-নারীর পার্বণ উপলক্ষে সমাগম ও মেলা।
১৩৩.	পাংশা শ্মশান মেলা	পাংশা ফরিদপুর।	মাঘী পূর্ণিমা	পূর্ণিমার দিন থেকে ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১৩৪.	গুরই মেলা	গুরই বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	বার্ষিক	মাঘ মাসের প্রথম বুধবার থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৩৫.	হিলচিয়া মেলা	হিলচিয়া নিকলী কিশোরগঞ্জ।	বার্ষিক	মাঘের শেষ শুক্রবার থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৩৬.	কুড়িঘাই মেলা	কুড়িঘাই কটিয়াদী কিশোরগঞ্জ।	ওরস	মাঘ মাসের শেষ মঙ্গলবার থেকে ৭ দিন।	ওরস মেলা। ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার যাবতীয় পণ্য সামগ্রীসহ

Dhaka University Institutional Repository

					কাঠের আসবাব-পত্রের বিরাট সমাবেশ।
১৩৭.	কামালপুর মেলা	কামালপুর বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	ওরস	মাঘ মাসের শেষ ৭ দিন।	ঐ
১৩৮.	মাইজভাণ্ডার মেলা	মাইজভাণ্ডার ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৯.	রামপাল দিঘির মেলা	মুন্সীগঞ্জ ঢাকা।	মাঘী সপ্তমী	মাঘী সপ্তমীর দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ বারুণী পূজা ও বিরাট লোক সমাবেশ এবং মেলা।
১৪০.	পাংশা শ্মশান ঘাট মেলা	পাংশা শ্মশান ঘাট পাংশা ফরিদপুর।	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৪১.	নলিয়া মেলা	নলিয়াহারি ঠাকুরের বাড়ি নলিয়া জামালপুর।	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘী পূর্ণিমার গঙ্গা স্নানের দিন থেকে ৫ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ বারুণী স্নান উপলক্ষে নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১৪২.	সতৈর মেলা	সতৈর বোয়ালমারী ফরিদপুর।	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে ২ দিন।	ঐ
১৪৩.	দিঘিনালা বৌদ্ধ মেলা	বোয়ালখালী বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণ রাঙ্গামাটি।	ঐ	ঐ, ৩ দিন।	বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ। বৌদ্ধ নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১৪৪.	মাঘী পূর্ণিমার মেলা	রাঙ্গামাটির আনন্দ বিহার	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘী পূর্ণিমার দিন।	ঐ
১৪৫.	জগন্নাথবাড়ির মেলা	জগন্নাথবাড়ি লাকসাম সদর	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘী পূর্ণিমার তৃতীয় তিন থেকে	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পূজা-

		কুমিল্লা।		৭ দিন।	পার্বণ। ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
১৪৬.	দৌলযাত্রা মাঘী পূর্ণিমা	শৈলকুপা সদর শৈলকুপা যশোর।	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৪৭.	মাঘী পূর্ণিমা মেলা	গুনটিয়া মির্জাপুর টাঙ্গাইল।	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে ২ দিন।	ঐ
১৪৮.	হরিঠাকুরের মেলা	হরিঠাকুর বালিয়াকান্দি ফরিদপুর।	মাঘী পূর্ণিমা	মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষের পঞ্চম থেকে ১ দিন।	মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্মরণোৎসব, অসংখ্য নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।

Dhaka University Institutional Repository

ফাল্গুন

ক্রমিক নং	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/স্থায়িতকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	জংলী পিরের ওরস মেলা	জোয়ারা পটিয়া চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	১ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
২.	মজমপুর মেলা	মজমপুর ঢাকা।	ঐ	১ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	আনন্দোৎসব ও মেলা, মেলায় হস্তশিল্প সামগ্রীসহ মেয়েদের প্রসাধনী কেনা-বেচা হয়।
৩.	সুরেশ্বর মেলা	সুরেশ্বর নড়িয়া শরীয়তপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৪.	মাদারগঞ্জ পাবলিক মেলা	ঠাকুরগাঁ দিনাজপুর।	গো-মহিষ বিক্রয়	১ ফাল্গুন থেকে ৩০ চৈত্র।	দেশের উত্তরাঞ্চলের পশু কেনা-বেচার বিরাট হাট। সে উপলক্ষে মেলার সামগ্রী ও চিত্তবিনোদনের আয়োজন।
৫.	লীলার মেলা	লীলা আতরাই দিনাজপুর।	বার্ষিক	২ ফাল্গুন	আনন্দ ও উৎসব মেলা।
৬.	নেকমর্দন মেলা	নেকমর্দন কাহারোল দিনাজপুর।	ঐ	২ ফাল্গুন থেকে ১৫ দিন।	পশু-পাখি বেচা- কেনার উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মেলা। এছাড়াও মেলার সামগ্রী, উপরন্তু

					চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস।
৭	গোরখাই মেলা	গোরখাইল রানিশংকাইল দিনাাজপুর।	শিবরাত্রি	২ ফাল্গুন থেকে ১৫ দিন।	পূজা ও উৎসব উপলক্ষে পশু-পাখি বেচা-কেনা। এছাড়া মেলার সামগ্রী তো আছেই, উপরন্তু চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
৮.	কান্তনগর মেলা		কান্তনগর কাহারোল দিনাজপুর।	পূজা ৫ দিন।	কান্তনগর বিখ্যাত হস্ত শিল্পের বিরাট সমাবেশ ও হিন্দু নর-নারীর সমাগম।
৯.	চরণতলী মেলা	চরণতলা মায়মনসিংহ।	দোলযাত্রা	ফাল্গুনী পূর্ণিমা ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা
১০.	সরজুমের মেলা	সরজুম নবাবগঞ্জ।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
১১.	মহোৎসব ও মেলা	বড় আখড়ায় চোরমর্দন ঢাকা।	কীর্তন	২ ফাল্গুন থেকে ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
১২.	মহোৎসব ও মেলা	হরির আশ্রম ভাটিমভোগ বিক্রমপুর।	নামকীর্তন	২ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
১৩.	উৎসব ও মেলা	কোকদণ্ডী যোগশ্রম চট্টগ্রাম।	আবির্ভাব	২ ফাল্গুন	ঐ
১৪.	উৎসব ও মেলা	শ্রীধাম অঙ্গনে ফরিদপুর।	পদার্পণ	২ ফাল্গুন	ঐ

১৫.	উৎসব ও মেলা	দত্তপাড়া গঙ্গানন্দপুর যশোর।	রাধামদন মোহন জিউর উৎসব	২ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৬.	ব্যাসপূজা ও মেলা	গৌড়ীয়যতিমঠ খুলনা।	ব্যাসপূজা	৩ ফাল্গুন	ঐ
১৭.	রানীগঞ্জ, চেলবাড়ি মেলা	উত্তর কোতোয়ালী দিনাজপুর।	গো-মহিষ বিক্রয়	৩ ফাল্গুন থেকে ৩০ দিন।	পশু কেনা-বেচার বিরাট হাট। সে উপলক্ষে মৃৎশিল্প, বাঁশ, বেত শিল্প, শিশুতোষ খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী ও চিত্তনিবোদনের বিপুল সমাবেশ।
১৮.	বকচরের মেলা	বেড়বাড়ি ধুনট বগুড়া।	বার্ষিক	ফাল্গুনের প্রথম বুধবার	শিশুতোষ খেলনা সামগ্রী, প্রসাধন ও মৌসুমী ফল-মূলের সমাবেশ।
১৯.	বুকশুন্যার বান্নি	দুলগ্রাম কালিগঞ্জ।	বান্নি	ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথির ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
২০.	শাহরানীর মেলা	মনোহরদি নরসিংদী।	বার্ষিক	ফাল্গুন পূর্ণিমা	মাজারের মেলা। ভক্ত নর-নারীরা সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী।
২১.	জ্যামিতি,	মনোহরদি নরসিংদী	ঐ	ফাল্গুনের শেষ	হিন্দু ভক্ত

	পাগলের মেলা			মঙ্গলবার।	নার-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
২২.	ভাগলপুর মেলা	ভাগলপুর বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	ওরস	ফাল্গুনের প্রথম মঙ্গলবাজার দিন।	কাঠের আসবাবপত্র, মাটির সামগ্রী ও মেলার প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
২৩.	মহোৎসব ও মেলা	কাথলী খুলনা।	আবির্ভাব	৪ ফাল্গুন	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
২৪.	জন্মতিথি ও মেলা	বেদান্ত আশ্রম খলিলপুর কুমিল্লা।	জন্মতিথি	৪ ফাল্গুন	ঐ
২৫.	জন্মতিথি ও মেলা	১ নং ঢাকেশ্বরী বটনমিল ঢাকা।	জন্মতিথি	৪ ফাল্গুন	ঐ
২৬.	দোল মেলা	বড়দল-দিরাই সুনামগঞ্জ।	দোল উৎসব	৫ ফাল্গুন থেকে ৫ দিন।	ঐ
২৭.	আনোয়ার মেলা	আনোয়ারা চট্টগ্রাম।	পূজা	৫ ফাল্গুন	হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
২৮.	পার্বতীপুর কলেজ মেলা	পার্বতীপুর দিনাজপুর।	কলেজ উন্নয়ন	৬ ফাল্গুন থেকে ৪ চৈত্র।	আনন্দ উৎসব, চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস, নাগরদোলা, ভাগ্য পরীক্ষার

					খেলা, সেই সঙ্গে মেলার সামগ্রী।
২৯.	বারুণী মেলা	চান্দাইকোনা রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।	পূজা উৎসব	৭ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ফাল্গুনের ফাল্গুনী স্নান উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাগম। মেলার আকর্ষণ মৃৎশিল্প, প্লাস্টিকের সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, নাগরদোলা ও প্রসাধন সামগ্রী।
৩০.	জলমভারতী মেলা	জলমভারতী বরুড়া কুমিল্লা।	বার্ষিক	৭ ফাল্গুন	মেলার যাবতীয় সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।
৩১.	চরডাক্তার মেলা	চরডাক্তার রামগতি নোয়াখালী।	বার্ষিক	৭ ফাল্গুন	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা।
৩২.	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মেলা	রামকৃষ্ণ আশ্রম সাভার ঢাকা।	বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান	৭ ফাল্গুন	ঐ
৩৩.	চামচিরির মেলা	চামচিরি বাজার চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	দরবেশ মেলা	৭ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	এ মেলার বিশেষ আকর্ষণ মাটির রঙিন পুতুল, মৃৎপত্র, প্লাস্টিকের সামগ্রী ও

					প্রসাধনের উপকরণ।
৩৪.	দাউদপুর কলেজ মেলা	দাউদপুর নবাবগঞ্জ দিনাজপুর।	কলেজ উন্নয়ন	৭ ফাল্গুন থেকে ২১ ফাল্গুন।	আনন্দ উৎসবের মেলা, আঞ্চলিক কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর সঙ্গে চিত্তবিনোদনের যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ, নাগরদোলা ও ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।
৩৫.	চামচিরি মেলা ও ওরস	চামচিরিবাজার চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	ফজলু মিয়া দরবেশ মেলা	৭ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ওরস উপলক্ষে মেলা। ভ্কত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার সামগ্রী কেনা-বেচা।
৩৬.	বাজিতপুর মেলা	বাজিতপুর রাজৈর মাদারীপুর।	কীর্তন ও স্নান	৮ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ঐ
৩৭.	উৎসব ও মেলা	রিকাবীবাজার মুন্সীগঞ্জ।	তিরোধান	৯ ফাল্গুন	ঐ
৩৮.	শীতলার মেলা	চন্দনাইস মুরাদনগর কুমিল্লা।	শীতলী পূজা	১০ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ সেই সঙ্গে মেলার বিচিত্র সামগ্রীর সমাহার।
৩৯.	বাউলের মেলা	বাউল বাজার কায়েতপাড়া ঢাকা।	তিরোধান	১১ ফাল্গুন	মৃৎশিল্পের সামগ্রী, খাবার দাবারের সমারোহ, আউল-

Dhaka University Institutional Repository

					বাউলের সমাবেশ।
৪০.	জন্মোৎসব ও মেলা	বাঁকাই গৌরনদী বরিশাল।	জন্মোৎসব	১১ ফাল্গুন	ঐ
৪১.	তিরোধান দিবস ও মেলা	ফুলকুড়ি বরিশাল।	তিরোধান	১১ ফাল্গুন	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৪২.	শিবচতুর্দশী মেলা	কালামপুর বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	শিবরাত্রি	১২ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা ও মেলা। মেলায় মাটির রঙিন খেলনা, পুতুল, কাঠের আসবাবপাত্রের বিরাট সমারোহ।
৪৩.	শিবালয় মেলা	শিবালয় কামালপুর মানিকগঞ্জ।	শিবচতুর্দশী	১২ ফাল্গুন থেকে ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা উপলক্ষে মেলা। মেলায় মৃৎশিল্পের খেলনা, পুতুল, বাঁশ ও বেত শিল্পের সামগ্রী, রুদ্রাক্ষর মালা ইত্যাদির বিরাট সমারোহ।
৪৪.	চন্দ্রনাথের মেলা	সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম।	ঐ	ঐ	মেলার আকর্ষণ হিন্দু সম্প্রদায়ের শিবচতুর্দশী উপলক্ষে চন্দ্রনগর পাহাড়ে বিরাট মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, ে শখরের লাঠি,

Dhaka University Institutional Repository

					রুদ্রাক্ষের মালা ইত্যাদির বিরাট সমারোহ।
৪৫.	আনোয়ার মেলা	আনোয়ারা চট্টগ্রাম।	শিব চতুদর্শী	১২ ফাল্গুন থেকে ৭ দিন।	স্নান যাত্রা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলায় স্থানীয় গ্রামীণ শিল্পের বিরাট সমারোহ।
৪৭.	স্বর্ণমতির মেলা	স্বর্ণমতি রংপুর।	ঐ	১৩ ফাল্গুন থেকে ৭ দিন।	ঐ
৪৮.	পোনাবালিয়া মেলা	পোনাবালিয়া বরিশাল।	শিব চতুদর্শী	১২ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ঐ
৪৯.	মহাদেববাড়ি মেলা	মহাদেবপুর সোনারগাঁও মাধবপুর, নারায়ণগঞ্জ।	ঐ	১২ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৫০.	শিবমন্দিরের মেলা	শিবমন্দির বাংলা বাজার ঢাকা শহর।	শিব চতুর্দশী	১২ ফাল্গুন	খেলনা পুতুল, বাঁশ, বেত শিল্প, প্লাস্টিকের গৃহ সামগ্রী।
৫১.	শিবমন্দিরের মেলা	শিবমন্দির প্রাঙ্গণ লালকুঠি ঢাকা	শিব চতুর্দশী	১২ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ঐ

		শহর।			
৫২.	বাসুদেব মেলা	তাঁতিবাজার ঢাকা।	শিব চতুর্দশী	১২ ফাল্গুন	ঐ
৫৩.	বিল্বকবির মেলা	পূর্ণানন্দ যোগাশ্রম বিশ্বকবি পাবনা।	ঐ	১২ ফাল্গুন দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মেলা। এ মেলায় মৃৎশিল্প, বাঁশ, বেত শিল্প, চাটাই, মাদুরের সমাহার।
৫৪.	শিব মেলা শিববাড়ি নিমাই	শিববাড়ি নিমাই বালিশিলা সিলেট।	ঐ	১২ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেত শিল্প, শীতল পাটি, খেলনা, পুতুল, প্রসাধন সামগ্রী।
৫৫.	শিব মেলা	কালিঘাট সিলেট।	শিব রাত্রি	১২ ও ১৩ ফাল্গুন ২ দিন।	ঐ
৫৬.	শিব মেলা	গাং জোয়ারা পটিয়া চট্টগ্রাম।	ঐ	১২ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫৭.	শিব মেলা	কালিঘাট সিলেট।	শিব রাত্রি	১২ ও ১৩ ফাল্গুন ২ দিন।	ঐ
৫৮.	শিব মেলা	কালিঘাট সিলেট।	শিব রাত্রি	১২ ও ১৩ ফাল্গুন ২ দিন।	ঐ
৫৯.	হবিগঞ্জ মেলা	ফুলবাড়ি দিনাজপুর।	পশুর কেনা-বেচা	১৩ ফাল্গুন থেকে ১০ দিন।	পশুপাখি বেচা-কেনা সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদনের সামগ্রী ও মেলার আয়োজন।
৬০.	প্রকাশ উৎসব ও মেলা	নলুয়া চট্টগ্রাম।	প্রকাশ উৎসব	১৩ ফাল্গুন	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।

৬১.	খলিলুর মেলা	খলিলুর বেদান্ত আশ্রম কুমিল্লা।	বার্ষিক	১৪ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ঐ
৬২.	সরস্বতী মেলা	সরস্বতী আশ্রম বগুড়া।	কীর্তন মহোৎসব	১৪ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ঐ
৬৩.	শ্রীবাড়ি মেলা	শ্রীবাড়ি।	বার্ষিক	১৪ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, খেলনা, পুতুল, প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা।
৬৪.	আদমপুর মেলা	আদমপুর সোনারগাঁ ঢাকা।	বার্ষিক	১৪ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পূজা ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, খেলনা পুতুল, প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৬৫.	রাজারবাগ মেলা	রাজারবাগ ঢাকা।	বার্ষিক	১৪ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ঐ
৬৬.	কসবা মেলা	কসবা মনোহরদি নরসিংদী।	ওরস	১৪ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	পিরের ওরস উপলক্ষে ভক্ত-মুরিদানের সমাবেশ ও মেলা।
৬৭.	রবিদাস মেলা	রবিদাসপাড়া ওয়ারী ঢাকা শহর।	বার্ষিক	ঐ	অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের সন্ত রবিদাসাজির পূজা ও মেলা।
৬৮.	টঙ্গীবাড়ি মেলা	টঙ্গীবাড়ি মুন্সীগঞ্জ।	কীর্তনোৎসব	ঐ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কীর্তন

Dhaka University Institutional Repository

					উৎসব ও মেলা।
৬৯.	নুরুল্লাপুর মেলা	নুরুল্লাপুর ঢাকা।	ওরস	ঐ	বিখ্যাত সাধক ও লোককবির ওরস উপলক্ষে ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকসঙ্গীতের আসর।
৭০.	রামপাল মেলা	রামপাল বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ।	স্নান উৎসব	১৪ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের বিখ্যাত স্নান যাত্রা উৎসব ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, খেলনা, পুতুল, প্রসাধন সামগ্রী, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
৭১.	বুড়াশিববাড়ি মেলা	বুড়াশিবধাম রমনা ঢাকা।	বার্ষিক	ঐ	মণ্ডা-মিষ্টি, প্লাস্টিকের সামগ্রী, প্রসাধনী ও শিশুদের খেলনা।
৭২.	কাগজিটোলার মেলা	কাগজিটোলা দেবেন্দ্রনাথ লেন।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
৭৩.	হাটখোলা মেলা	হাটখোলা মহাপ্রকাশমঠ ঢাকা।	বার্ষিক	১৪ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	মণ্ডা-মিষ্টি, প্লাস্টিকের সামগ্রী, প্রসাধনী, মৌসুমী ফল-

					মূল বেচা-কেনা হয়।
৭৪.	সুজানগর মেলা	সুজানগর দত্তবাড়ি বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ।	বার্ষিক	১৪ ও ১৫ ফাল্গুন	ঐ
৭৫.	কালিয়াপুর মেলা	কালিয়াপুর লাকসাম কুমিল্লা।	ওরস	১৪ ফাল্গুন	ভক্ত সমাবেশ ও মেলা।
৭৬.	বাংলাবাজার মেলা	বাংলাবাজার ঝদ্রেশ্বর শিবমন্দির ঢাকা।	বার্ষিক‘	১৪ ফাল্গুন	পূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৭৭.	লালকুঠি মেলা	লালকুঠি বুড়িগঙ্গা নদীরতীরে শিবমন্দির ঢাকা।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৮.	শিবগঞ্জ মেলা	শিবগঞ্জ বগুড়া।	বার্ষিক	১৪ ফাল্গুন	ঐ
৭৯.	ধাইনগর মেলা	রানীগঞ্জ হাইস্কুল মাঠ নবাবগঞ্জ।	ঐ	১৫ থেকে ৩০ ফাল্গুন।	চিত্তবিনোদনের আয়োজন ও আঞ্চলিক শিল্প সামগ্রীর বেচা-কেনা। মৌসুমী ফল-মূলের সমারোহ।
৮০.	গোমস্তাপুর মেলা	গোমস্তাপুর রাজশাহী।	আঃ হাসিদ গালর্স স্কুল উন্নয়ন	১৫ ফাল্গুন থেকে ১৫ দিন।	ঐ
৮১.	ওরস ও মেলা	শাহ (র.) এর মাজার শরিফ কাজীটুলী সিলেট।	ওরস	১৬ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নার-নারীর সমাবেশ। নিয়াজ-নজর কেনাবেচা হয়।
৮২.	ছাতনী মেলা	হিলি হাকিমপুর দিনাজপুর।	পশু বেচা-কেনা	১৮ ফাল্গুন থেকে ৩০ ফাল্গুন।	গরু, মহিষ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে উত্তর বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

					বিখ্যাত হাট, সেই সঙ্গে মেলা।
৮৩.	উৎসব ও মেলা	হিলি শিববাড়ির বালিশিয়া সিলেট।	বার্ষিক	১৯ ফাল্গুন	পূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৮৪.	ধকুরবাড়ির মেলা	বিরল দিনাজপুর।	গো-মহিষ বিক্রয়	২১ ফাল্গুন থেকে ২০ চৈত্র।	গরু, মহিষ বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত হাট। এ উপলক্ষে মেলা ও চিত্তবিনোদনের সামগ্রিক সমাবেশ।
৮৫.	দোলযাত্রার মেলা	নালগাঁও বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জ।	দোল-পূর্ণিমা	২৮ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা ও মেলা। মেলায় মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, শিশুদের খেলনা পুতুল, মৃৎশিল্পের আসবাবপত্র কেনা-বেচা হয়।
৮৬.	দোলযাত্রার মেলা	পানসিপাড়া লালাপুর নাটোর।	দোল উৎসব	২৮ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। ভক্ত নার-নারীর সমাবেশ, মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী, শিশুদের খেলনা পুতুল,

					মৃৎশিল্পের আসবাবপত্র বেচা-কেনা হয়।
৮৭.	আখড়ার মেলা	খাড়াইটেক আখড়া সিলেট।	দোল উৎসব	২৮ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ঐ
৮৮.	দোল মেলা	বিল্লকারী পাবনা।	ঐ	ঐ	ঐ
৮৯.	দোল মেলা	আনোয়ারা চট্টগ্রাম।	ঐ	২৮ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ঐ
৯০.	কালী পূজার মেলা	দেবীগঞ্জ পঞ্চগড়।	পূজা-মহোৎসব	২৮ ফাল্গুন থেকে ৫ দিন।	পূজা ও মেলা। মেলায় বাঁশ ও বেত সামগ্রী, মৃৎশিল্প, পাখি, প্রসাধন সামগ্রী, চিত্তবিনোদনের নাগরদোলা, সার্কাস হয়ে থাকে।
৯১.	দোলা মেলা	রাধামদন মোহন আশ্রম গঙ্গানন্দপুর যশোর।	দোল উৎসব	২৮ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, মৃৎশিল্প, পাখি প্রসাধনী সামগ্রী চিত্তবিনোদনের নাগরদোলাসহ মেলার সামগ্রিক উপকরণ।
৯২.	দোল মেলা	সাতবর্গ বি-বাড়িয়া।	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৯৩.	উৎসব ও মেলা	চরডাকাতিয়া বাগেরহাট।	উৎসব	২০ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	ঐ
৯৫.	উৎসব ও মেলা	গজারিয়া কিশোরগঞ্জ।	তিরোধান	২৯ ফাল্গুন	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৯৬.	শাহারজুমের মেলা	গোব্রাতলা নবাবগঞ্জ।	বার্ষিক	৩০ ফাল্গুন	ঐ
৯৭.	সরজান মেলা	সরজান মহিপুর নবাবগঞ্জ রাজশাহী।	সরজান স্কুল উন্নয়ন	৩০ ফাল্গুন থেকে ২ দিন।	মেলার সামগ্রী, চিত্তবিনোদনের সমাহার।
৯৮.	জিনজিরা মেলা	জিনজিরা কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	দোল পূর্ণিমা	ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প প্লাস্টিক সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী নাগরদোলা ও প্রসাধন সামগ্রী বেচা-কেনা হয়।
৯৯.	নন্দগাঁ মেলা	নন্দগাঁ দিনাজপুর।	শিবপূজা	ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী থেকে ২ দিন।	ঐ
১০০.	শিবরাত্রির মেলা	সংগীতা শামলা কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।	শিবরাত্রি	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১০১.	শিববাড়ি মেলা	শিববাড়ি মালডাঙ্গা কালীগঞ্জ ঝিনাইদহ।	ঐ	ঐ	ঐ
১০২.	দোলযাত্রার মেলা	রথখলা ঢাকা।	দোলযাত্রা	ফাল্গুনের পূর্ণিমা	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পূজা ও মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, প্লাস্টিকের সামগ্রী, শীতল পাটি, মণ্ডা-মিঠাই, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, নাগরদোলা, প্রসাধন সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।
১০৩.	বাস্তপাতলার মেলা	চরণতলা নালিতাবাড়ি শেরপুর।	ঐ	পূর্ণিমা থেকে ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ ও মেলা। মেলার সামগ্রী ছবাড়াও এতে মণ্ডা-মিঠাই, মৌসুমী ফল-মূল বেচা-কেনা হয়।
১০৪.	দোলযাত্রার মেলা	বলরামপুর কালিগঞ্জ ঝিনাইদহ।	দোলযাত্রা	ফাল্গুনী পূর্ণিমার ৭ দিন পর ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ ও মেলা–মেলার সামগ্রীর মধ্যে মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, প্রসাধন সামগ্রী, মৌসুমী ফল-

Dhaka University Institutional Repository

					মূল শিশুতোষ খেলনা কেনা হয়।
১০৫.	রামগড় বৌদ্ধ মেলা	রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম।	ফাল্গুনী পূর্ণিমা	পূর্ণিমা থেকে ৩ দিন।	ঐ
১০৬.	জুরমরং শিব মেলা	বাইবোন-ছড়া রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম।	শিব চতুর্দশী	তিথি অনুসারে ২ দিন।	ঐ
১০৭.	খাগড়াছড়ি বৌদ্ধ মেলা	বৌদ্ধ মন্দির রাঙ্গামটি পার্বত্য চট্টগ্রাম	বৌদ্ধ-পূর্ণিমা	ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে ৩ দিন।	বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ ও মেলা। মেলায় বাঁশ ও বেত শিল্প, প্রসাধান সামগ্রী, খাবার দ্রব্যাদি ও মৌসুমী ফল-মূল সমাহার।
১০৮.	অনুকূল ঠাকুরের মেলা	হেমায়েতপুর পাবনা।	স্মরণোৎসব	ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে ৭ দিন।	ভক্ত সমাবেশ, মণ্ডা-মিঠাই, প্রসাধন সামগ্রী ও নজর-নিয়ামের সামগ্রিক সমাহার।
১০৯.	পানছড়ি বৌদ্ধ মেলা	পানছড়ি বৌদ্ধ রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম।	ফাল্গুনী পূর্ণিমা	পূর্ণিমা থেকে ৩ দিন।	বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পার্বণ উপলক্ষে মেলা । এতে মেলার সামগ্রীসহ বৌদ্ধ নর-

					নারীর সমাবেশ।
১১০.	আদিবাসী মেলা	রাজ ভিলা।	ধর্মীয় পার্বণ	ফাল্গুনী পূর্ণিমা	বৌদ্ধ নর-নারীর সমাবেশ ও মেলার উপকরণ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান।
১১১.	দোলযাত্রার মেলা	বড়বাজার ময়মনসিংহ।	ফাল্গুনী তিথি	ফাল্গুনের শেষ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ ও মেলা। মেলায় মাটির রঙিন পুতুল, মৃৎপাত্র, প্লাস্টিকের সামগ্রী, প্রসাধনের উপকরণ কেনা-বেচা হয়।
১১২.	দোলযাত্রার মেলা	হাতকুন্দলী বড় গুয়ারা নেত্রকোনা।	ঐ	ঐ	ঐ
১১৩.	লালন মেলা	ছেঁউরীয়া আখড়া কুষ্টিয়া।	লালন উৎসব	দোল পূর্ণিমা থেকে ৩ দিন।	বাংলাদেশসহ ভারত থেকে আগত বাউল সমাবেশ। সেই সঙ্গে মেলার উপকরণ।
১১৪.	রামপুর মেলা	রামপুর হোসেনপুর কিশোরগঞ্জ।	অষ্টমী স্নান	অষ্টমী স্নান	মৃৎশিল্প, প্রসাধন সামগ্রী মণ্ডা-মিঠাই, খৈ-মুড়ি।
১১৫.	দোলযাত্রার মেলা	কালিগঞ্জ	দোলযাত্রা	দোলযাত্রা	হিন্দু সম্প্রদায়ের

					ধর্মীয় পার্বণ ও মেলা।
১১৬.	দোলযাত্রার মেলা	সাতপাড়, গোপালগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১১৭.	দোলযাত্রার মেলা	গোপালগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ
১১৮.	ৎদোলযাত্রার মেলা	ফরিদপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১১৯.	ষোলগড়িরর মেলা	চান্দাইকোনা শেরপুর বগুড়া।	ওরস	১ ফাল্গুন থেকে ৩ দিন।	ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ, সেই সঙ্গে মেলা। মেলায় মৃৎশিল্প, প্রসাধন সামগ্রী, মণ্ডা-মিঠাই, খৈ-মুড়ি ইত্যাদি বেচা-কেনা হয়।
১২০.	শিবযাত্রা	সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম।	শিবরাত্রি	কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ১৩ ও ১৪ ফাল্গুন।	ভক্ত নার-নারীর সমাবেশ ও মেলা। এ তীর্থে পূজা উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে যাবতীয় সামগ্রীর সমাহার।
১২১.	দিঘিনালা শিব মেলা	দিঘিনালা শিব মন্দির প্রাঙ্গণ রাঙ্গামাটি।	শিব চতুর্দশী	ফাল্গুন মাসের তিথি অনুসারে ২ দিন।	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

চৈত্র

ক্রমিক নং	মেলার নাম	স্থান/ঠিকানা	উপলক্ষ	তারিখ/স্থায়িতকাল	প্রধান আকর্ষণ
১.	খারাবাক মেলা	খারাবাক বিল্লনগর স্বরূপকাঠি পিরোজপুর।	বার্ষিক	১ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	মৃৎশিল্প সামগ্রী, শিশুতোষ খেলনা, কবি গান, যাত্রা, কীর্তন ও মেলার সামগ্রী ও চিত্তবিনোদনের কবি গান।
২.	মাদারীপুর মেলা	মাদারীপুর।	ঐ	ঐ	মেলার সামগ্রী ও চিত্তবিনোদনমূলক কবি গান।
৩.	সতৈর মেলা	সতৈর বোয়ালমারী ফরিদপুর।	ঐ	১ চৈত্র থেকে ২ দিন।	ঐ
৪.	বারটিয়া মেলা	বরটিয়া ঝিনাইগাতি শেরপুর।	ঐ	১ চৈত্র	মৃৎশিল্প সামগ্রী, খেলনা, পুতুল, মৌসুমী ফল-মূল
৫.	মহাস্থানের মেলা	শিবগঞ্জ বগুড়া।	চৈত্র সংক্রান্তি	১ চৈত্র থেকে ৩০ চৈত্র।	যাত্রা, সার্কাস পুতুল নাচ, নাগরদোলা, ভাগ্য পরীক্ষার খেলা ও মেলার যাবতীয় সামগ্রী।
৬.	সুরার আবদা মেলা	বানিয়াচং হবিগঞ্জ।	বার্ষিক	২ চৈত্র	মৃৎশিল্প, শিশুতোষ

Dhaka University Institutional Repository

					খেলনা সামগ্রী।
৭.	ওরস মেলা	ইরতা কলাবাগান সিংগাইর মানিকগঞ্জ।	ওরস	৩ চৈত্র	ভক্ত সমাবেশ ও মেলা।
৮.	চণ্ডিগড় মেলা	চণ্ডিগড় দুর্গাপুর নেত্রকোনা।	পঞ্চম দোল	৪ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	শিশুতোষ খেলনা, প্লাস্টিক সামগ্রী, প্রসাধনী ও মৌসুমী ফল-মূল।
৯.	ভোগবেতালের মেলা	ভোগবেতাল কটিয়াদী কিশোরগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১০.	দশমিনার মেলা	দশমিনা পটুয়াখালী।	ঐ	ঐ	ঐ
১১.	শ্রীপাঠের মেলা	শ্রীপাঠ বোধখানা যশোর।	পঞ্চম দোল	৪ চৈত্র থেকে ২ দিন।	মৃৎশিল্প, শিশুতোষ খেলনা, প্লাস্টিক সামগ্রী, মৌসুমী ফল-মূল।
১২.	আতুলীর মেলা	আতুলী সানুয়ারা ঢাকা।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩.	তিরোধান মেলা	নবরত্নমঠ নিমতা মানিকগঞ্জ।	তিরোধান উৎসব ও মেলা	৪ চৈত্র থেকে ২ দিন।	ভক্ত সমাবেশ ও মেলা।
১৪.	পাগল রাজেন্দ্র	বাগেরহাট।	উৎসব ও মেলা	ঐ	ঐ
১৫.	মুরাদপুর মেলা	মুরাদপুর কোতোয়ালী দিনাজপুর।	স্কুল উন্নয়ন	৭ চৈত্র থেকে ৩০ চৈত্র।	চিত্তবিনোদনের বিরাট সমাহার সেই সঙ্গে মেলা।
১৬.	মানন্দার মেলা	মানন্দা রাজশাহী।	রামাভিসেখ স্মরণোৎসব	৯ চৈত্র থেকে ১২ চৈত্র।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব,

					পূজা ও মেলা।
১৭.	পানান নগর মেলা	পানাননগর গোদাগাড়ি রাজশাহী।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
১৮.	পিরগাছি মেলা	পীরগাছি গোদাগাড়ি রাজশাহী।	ঐ	ঐ	ঐ
১৯.	বাগহারা মেলা	বাঘাহারা প্রেমতলী গোদাগাড়ি রাজশাহী।	পঞ্চম দোল	৪ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	বৈষ্ণব বাউল সমাবেশ ও মেলা।
২০.	কেতুর মেলা	কেতুর গোদাগাড়ি রাজশাহী।	ঐ	ঐ	ঐ
২১.	বাঘা মেলা	বাঘা রাজশাহী।	ঈদ-উল-ফিতর	ঈদ-উল-ফিতরের দিন থেকে ৫ দিন।	মুসলিম ধর্মীয় পার্বণ উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠান ও বিরাট মেলা।
২২.	বরদেশ্বরী মেলা	বরদেশ্বরী বাড়ি বুধ্য দিনাজপুর।	তিরোধান	১০ চৈত্র থেকে ৫ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারী সমাবেশ ও মেলা।
২৩.	বেলেশ্বরী মেলা	বেলেশ্বরী লাখাই হবিগঞ্জ।	বার্ষিক পূজা	১০ চৈত্র থেকে ২ দিন।	বেলেশ্বরী দেবীর পূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ ও

					মেলা
২৪.	করণখাইল মেলা	করণখাইল ত্রিবেনী সংগম চট্টগ্রাম।	বারুনি স্নান	১২ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থ স্থান, স্নান উপলক্ষে নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
২৫.	উত্তরবাহিনী নদীর মেলা	উত্তরবাহিনী নদী মাহুয়া দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
২৬.	ওড়াকান্দির মেলা	ওড়াকান্দি, কাশিয়ানী গোপালগঞ্জ।	মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশী	১২ চৈত্র থেকে ৭ দিন।	মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীর বিরাট সমাবেশ ও মেলা।
২৭. বারুনী স্নান ও মেলা	বারুণী স্নান ও মেলা	ধলেয়ার পূর্ব বাহিনী নদী দিনাজপুর।	বারুণী স্নান	১২ চৈত্র থেকে ২ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ, স্নান যাত্রা ও মেলা।
২৮.	ঐ	কাঁঠালবাড়ি দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
২৯.	ল্যাউর পোনা তীর্থের মেলা	লাউড় তাহিরপুর মুনামগঞ্জ	ঐ	ঐ	হিন্দু সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ধর্মপীঠ, স্নান যাত্রা উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্ত নর-নারীর সমাবেশ ও

Dhaka University Institutional Repository

					মেলা।
৩০.	বারুণী স্নান ও মেলা	করতোয়া নদী দেবীগঞ্জ ফরিদপুর।	বারুনি স্নান	১২ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পার্বণ স্নান যাত্রা উপলক্ষে নর-নারীর বিরাট সমাবেশ ও মেলা।
৩১.	ঐ	ফতেপুর ময়মনসিংহ।	ঐ	১২ চৈত্র থেকে ২ দিন।	ঐ
৩২.	ঐ	মাধবকুণ্ড বড়লেখা মৌলভীবাজার।	ঐ	১২ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র বলে খ্যাত। মাধবকুণ্ড স্নান যাত্রা উপলক্ষে অসংখ্য নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৩৩.	ঐ	কমলপতি, সরকারখালী রাউজান, চট্টগ্রাম।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪.	ঐ	গোপলা নদী সমশেরগঞ্জ সিলেট।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫.	ঐ	গোবরডাঙ্গা নড়াইল।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬.	ঐ	শীলদেবীর ঘাট বগুড়া।	ঐ	ঐ	ঐ

৩৭.	ঐ	কামারগাদি নদী রাজশাহী।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮.	ঐ	পতেঙ্গা বন্দর চট্টগ্রাম।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯.	ঐ	টিলাগাঁও কুলাউড়া সিলেট।	ঐ	ঐ	ঐ
৪০.	ঐ	চরডাকাতিয়া বাগেরহাট।	ঐ	১২ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	মৃৎশিল্প, শিশুতোষ খেলনা, প্লাস্টিক সামগ্রী, স্নান উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীর সমাবেশ।
৪১.	ঐ	বড়কোঠা বরিশাল।	ঐ	ঐ	ঐ
৪২.	পুঁথিরতিয়া মেলা	পুঁথিরতিয়া তাহেরপুর সুনামগঞ্জ।	বার্ষিক	১৩ চৈত্র	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৪৩.	কুমরিয়া মেলা	কুমরিয়া সিলেট।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৪.	হারাইটেক মেলা	হারাইটেক আখড়া সিলেট।	ঐ	ঐ	হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। নর-নারীর সমাবেশ ও মেলা।
৪৫.	বিরীবাজার মেলা	বিরানীবাজার সিলেট।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬.	বাসুদেব বাড়ির	বাসুদেব বাড়ি	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

	মেলা	আখড়া বি-বাড়িয়া।			
৪৭.	কাউমারবালী মেলা	কাইমারবালী বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮.	কালীবাড়ির মেলা	রায়দৌলপুর কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ।	বার্ষিক	১৪ চৈত্র	ঐ
৪৯.	চিনাইর মেলা	চিনাইর কুমিল্লা।	বার্ষিক	১৪ চৈত্র	ঐ
৫০.	রাদাই মেলা	বারুহাস তাড়াশ সিরাজগঞ্জ।	বার্ষিক	১৪ চৈত্র থেকে ২ দিন	ঐ
৫১.	লেরাইগাতি	চান্দাইকোনা রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ।	বার্ষিক	১৪ চৈত্র	ঐ
৫২.	সাবার নাসারা মেলা	রাজপুর বেলকুচি সিরাজগঞ্জ।	বার্ষিক	১৪ চৈত্র	ঐ
৫৩.	উৎসব ও মেলা	রামদাস বিদোর বাউলে।	বিশাখা মায়ের উৎসব	১৮ চৈত্র	ঐ
৫৪.	উৎসব ও মেলা	সিরাজদিখান গোষপল্লী বিক্রমপুর ঢাকা।	পূজা	২০ চৈত্র	ঐ
৫৫.	পূজা ও মেলা	আনোয়ারা গুজারা চট্টগ্রাম।	পূজা	২০ চৈত্র	ঐ
৫৬.	বাসন্তি উৎসব ও মেলা	হাসাইল গারুরগাঁও মুন্সীগঞ্জ।	বাসন্তি উৎসব	২০ চৈত্র	ঐ
৫৭.	১ নং ঢাকেশ্বরী কাটন মিল মেলা	নারায়ণগঞ্জ।	বার্ষিক	২০ চৈত্র থেকে ৪ দিন।	ঐ
৫৮.	বাসন্তী পূজা ও মেলা	বড়দিয়ায়, রামপাল, খুলনা।	মেলা	২০ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	ঐ
৫৯.	উৎসব ও মেলা	রাধাগোবিন্দ আশ্রম গাজীর হাট খুলনা।	বার্ষিক	২১ চৈত্র থেকে ২ দিন।	জনসমাগম ও মেলা
৬০.	চান্দপুর মেলা	চান্দরপুর মাছিহাতা বি-বাড়িয়া।	ঐ	চৈত্র	ঐ
৬১.	জন্মোৎসব ও	লক্ষ্মীকুল ফরিদপুর।	জন্ম উৎসব	২১ চৈত্র	ঐ

	মেলা				
৬২.	কীর্তন ও মেলা	রাধাগঞ্জ ফরিদপুর।	সংকীর্তন	২২ চৈত্র	ঐ
৬৩.	অষ্টমী স্নান ও মেলা	জীবনগঞ্জ বাজার নবীনগর বি-বাড়িয়া	অষ্টমী স্নান	ঐ	ঐ
৬৪.	অষ্টমী স্নান ও মেলা	জমিরুল্লা বগুড়া।	অষ্টমী স্নান	ঐ	ঐ
৬৫.	ঐ	কালিয়াপাড়া দিনাজপুর	ঐ	ঐ	ঐ
৬৬.	ঐ	মুলচর বিক্রমপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৬৭.	ঐ	আতর আলী বরিশাল।	ঐ	২১ চৈত্র	ঐ
৬৮.	ঐ	ভায়েলাবুনিয়া কাঁঠালিয়া বরিশাল।	ঐ	ঐ	ঐ
৬৯.	অষ্টমী স্নান ও মেলা	চিলমারী বন্দর সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদে কুড়িগ্রাম।	ঐ	ঐ	ঐ
৭০.	ঐ	কাউয়ামারা বিক্রমপুর ঢাকা।	ঐ	ঐ	ঐ
৭১.	অষ্টমী স্নান ও মেলা	লাঙ্গলবন্ধ ঢাকা।	অষ্টমী স্নান	ঐ	ঐ
৭২.	ঐ	আদিব্রহ্মপুত্র মঠখলা ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৩.	ঐ	দেশী কদমবাড়ি ফরিদপুর।	ঐ	২১ চৈত্র	ঐ
৭৪.	ঐ	ইছামতি নদী আনোয়ারা চট্টগ্রাম।	ঐ	২১ চৈত্র	ঐ
৭৫.	উৎসব ও মেলা	মান্দা রাজশাহী।	উৎসব	২২ চৈত্র	ঐ
৭৬.	মহোৎসব ও মেলা	পালাকান্দি চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।	গ্রামযজ্ঞ	২২ চৈত্র থেকে ১২ দিন।	ঐ
৭৭.	মহোৎসব ও মেলা	রবিফল মৌজায় রামকুট তীর্থ ধাম রামু চট্টগ্রাম।	মহোৎসব	২২ চৈত্র	ঐ

৭৮.	উৎসব ও মেলা	সিন্দুমতি লালমনিরহাট।	রামনবমী	২২ চৈত্র	ঐ
৭৯.	ঐ	লক্ষ্মীখালী খুলনা।	উৎসব	২৬ চৈত্র	ঐ
৮০.	ঐ	হরকাগ্রামে খুলনা।	ঐ	ঐ	ঐ
৮১.	আমতলী মেলা	আমতলী চিরিরবন্দর দিনাজপুর।	গো-মহিষ	২৭ চৈত্র থেকে ১১ বৈশাখ।	গো-মহিষসহ প্রধানত পশু কেনা-বেচা। সঙ্গে জমজমাট মেলা।
৮২.	কাট্টালী মেলা	কাট্টালী সমুদ্র উপকূলে চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	২৭ চৈত্র	জনসমাগম ও মেলা
৮৩.	সুবর্ণাসারা মেলা	সুবর্ণাসারা রাজপুর বেলকুচি সিরাজগঞ্জ।	ঐ	২৮ চৈত্র থেকে ২ দিন।	ঐ
৮৪.	গোষ্ঠের মেলা	গোছটু কাওয়াইল কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৮৫.	চালা মেলা	বেলকুচি সিরাজগঞ্জ।	ঐ	২৮ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	ঐ
৮৬.	রেকাবি বাজার মেলা	রেকাবি বাজার মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৮৭.	রামকৃষ্ণমিশন মেলা	বানিয়াচং হবিগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৮৮.	আফড়া মেলা	বানিয়াচং হবিগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
৮৯.	লেংটার মেলা	গোপালনগর ভেড়ামারা পদ্মারপার কুমিল্লা।	ঐ	২৯ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	ঐ
৯০.	বড়দিয়া মেলা	বড়দিয়া স্টীমারঘাট নড়াইল।	চৈত্র সংক্রান্তি	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
৯১.	রামভাদ্রাপুর মেলা	ভেদরগঞ্জ শরীয়তপুর।	চৈত্র সংক্রান্তি	চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন।	ঐ
৯২.	মনোহর মেলা	মনোহর শরীয়তপুর।	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ

৯৩.	কোট্টাপাড়া	কোট্টাপাড়া শরীয়তপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৯৪.	পাংগাসিয়া মেলা	পাংগাসিয়া কালকীনি মাদারীপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৯৫.	শিউলাপাটি মেলা	শিউলাপাটি কালকিনী মাদারীপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
৯৬.	শুকর্ণ মেলা	শুকর্ণঘাট বি-বাড়িয়া।	চৈত্র সংক্রান্তি	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
৯৭.	কোন্দাইর মেলা	আখাউড়া কুমিল্লা।	ঐ	ঐ	ঐ
৯৮.	করিসপুর মেলা	মুরাদনগর কুমিল্লা।	ঐ	ঐ	ঐ
৯৯.	চৈত্র সংক্রান্তির মেলা	রুহিতপুর কেরানীগঞ্জ ঢাকা।	বার্ষিক	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
১০০.	ঐ	শাক্তা কেরানীগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১০১.	কালীডেমদেবী মেলা	বীরগঞ্জ দিনাজপুর।	চৈত্র সংক্রান্তি	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
১০২.	মঙ্গলপুর মেলা	মঙ্গলপুর দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৩.	ডুকুরতারী মেলা	ডুকুরতারী দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৪.	মাগুড়াপাড়া মেলা	মাগুড়াপাড়া নোয়াবগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৫.	কোটলা মেলা	কোটলা নোয়াবগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৬.	তমালেশ্বরী মেলা	তমালেশ্বরী হাকিমপুর দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৭.	মুক্তারমেলা	মুক্তার ঠাকুরগাঁও।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
১০৮.	হাজীগঞ্জ মেলা	হাজীগঞ্জ ফুলবাড়ি দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১০৯.	বারাইমেলা	ফুলবাড়ী দিনাজপুর।	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১১০.	চিন্তামন মেলা	চিন্তামন ফুলবাড়ি দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১১১.	রাশ কবির মেলা	রাশ কবির বীরগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১১২.	সখাপিরের মেলা	বীরগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১১৩.	জিন্দাপুর মেলা	বীরগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১১৪.	মহামনি মেলা	মানিকছড়ি পাহাড়তলী চট্টগ্রাম।	বার্ষিক	৩১ চৈত্র থেকে ১৫ দিন।	ঐ
১১৫.	ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের মেলা	মুনিরাগ্রাম পাহাড়তলী চট্টগ্রাম।	ঐ	৩১ চৈত্র থেকে ১০ দিন।	ঐ
১১৬.	উৎসব ও মেলা	কালিপুর রাজশাহী।	ঐ	৩১ চৈত্র থেকে ৩ দিন।	ঐ
১১৭.	চড়কপূজা ও মেলা	ঘোড়াচাও মৌলবীবাজার।	ঐ	৩১ চৈত্র থেকে ৭ দিন।	হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা ও মেলা
১১৮.	ঐ	কাঁঠালতলী কালিয়কৈর গাজীপুর।	পূজা	ঐ	ঐ
১১৯.	ঐ	সমসখালী নাটোর।	পূজা	ঐ	ঐ
১২০.	চড়কপূজা	মহাদেববাড়ি সিমুলিয়া ধামরাই ঢাকা।	চড়ক পূজা	চৈত্রমাসের শেষ দিন।	ঐ
১২১.	ঐ	সাতপাড়া গোপালগঞ্জ।	ঐ	ঐ	ঐ
১২২.	চৈত্র সংক্রান্তির মেলা	মহাদেববাড়ি পারুলিয়া শিঙ্গাইর।	সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১২৩.	চড়কপূজা ও মেলা	জুষ খেলা বরিশাল।	চড়ক পূজা	ঐ	ঐ
১২৪.	ঐ	বিশ্বম্ভরপুর পরগনায় লাউড়।	ঐ	ঐ	ঐ
১২৫.	ঐ	চান্দানন্দ পাবনা।	ঐ	ঐ	ঐ
১২৬.	চৈত্র সংক্রান্তি মেলা	তিলকান্দি জামালপুর।	সংক্রান্তি	চৈত্রমাসের শেষ দিন।	ঐ
১২৭.	চৈত্র সংক্রান্তি	মিরপুর কুষ্টিয়া।	ঐ	ঐ	ঐ

১২৮.	চড়ক মেলা	গণপদি নকলা জামালপুর।	চড়ক পূজা	ঐ	ঐ
১২৯.	চিৎমরম বৌদ্ধ মেলা	রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম।	সংক্রান্তি	ঐ	বৌদ্ধ জনসমাগম ও মেলা।
১৩০.	মানিকছড়ি বৌদ্ধ মেলা	রাজবাড়ি বৌদ্ধ মন্দির রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩১.	চৈত্র সংক্রান্তির মেলা	বাজিজাতপুর বোয়ালমারী ফরিদপুর।	ঐ	ঐ	জনসমাগম ও মেলা
১৩২.	পাচ্চার মেলা	পাচ্চার বাজার শিবপুর মাদারীপুর	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৩৩.	আতওয়ারী মেলা	আতওয়ারী।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
১৩৪.	রুবা আজাদ মেলা	রুবা আজাদ মুক্তার ঠাকুরগাঁও।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৫.	বাড্ডা মেলা	বাড্ডা ঢাকা।	সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৩৬.	নয়নপাড়ার মেলা	নয়নপাড়া কমলাপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭.	চড়ক পূজা ও মেলা	উমা মহেশ্বর শিবের বাড়িতে গয়গড় রাজনগর মৌলভিবাজার।	চড়কপূজা	ঐ	ঐ
১৩৮.	ঐ	শ্যামপুর উল্লাপাড়া।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৯.	ঐ	গয়হাট উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪০.	ঐ	লক্ষ্মীপুর কুলাউড়া মৌলভীবাজার।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪১.	চৈত্র মেলা	মহাপ্রভুর বাড়ি নন্দনপুর মৌলভীবাজার।	চৈত্র মেলা	ঐ	ঐ

১৪২.	চড়কপূজা	কাতলা গাড়ী শৈলকুপা যশোহর।	চড়ক পূজা	ঐ	ঐ
১৪৩.	চৈত্র সংক্রান্তি মেলা	সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম।ঙ	চড়ক পূজা	ঐ	ঐ
১৪৪.	কাড়াপাড়ার মেলা	বাগেরহাট।	সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৪৫.	হাতিবান্দা মেলা	ভাতকুড়া মইপুর টাঙ্গাইল।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৬.	নাগরপুর মেলা	নাগরপুর টাঙ্গাইল।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৭.	চৈত্র সংক্রান্তির মেলা	বাল্লপাল বাজার টাঙ্গাইল।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৮.	জংগরার	জংগরা পাটগ্রাম নীলফামারী।	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৪৯.	ধওলার মেলা	ভেলাগরী রংপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫০.	সিন্দুরমতি মেলা	সিন্দুরমতি রংপুর।	বাসন্তীপূজা	তিথি অনুযায়ী চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
১৫১.	চড়ক পূজা ও মেলা	ফতেপুর বাগেরহাট।	চড়ক পূজা	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
১৫২.	ঐ	হালিশহর বাগেরহাট।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৩.	ঐ	কুসরাইল বাগেরহাট।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৪.	ঐ	ফলতিতা ফকিরহাট বাগেরহাট।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৫.	সালংদার মেলা	সালংদার ধর্মপুর ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৫৬.	দারাইল মেলা	দারাইল দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৭.	রাধার মার্কেট কোটি মেলা	মাঝপাড়া বি-বাড়িয়া	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮.	চৈত্র সংক্রান্তি মেলা	শাক্তা কেরানীগঞ্জ।	বার্ষিক	ঐ	ঐ
১৫৯.	রথখোলার মেলা	কচুয়া রথখোলা খুলনা।	চড়ক পূজা	ঐ	ঐ
১৬০.	গোহর মেলা	গোহর কোতোয়ালী পাড়া ফরিদপুর	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৬১.	কালীবাড়ি মেলা	মহেন্দদি কালীবাড়ি মাদারীপুর।	ঐ	চৈত্র সংক্রান্তির দিন।	ঐ
১৬২.	শেখেরনগর মেলা	শেখেরনগর সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	ঐ	চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৬৩.	মোল্লাপাড়া হাই স্কুল মেলা	মোল্লাপাড়া হাই স্কুল মাঠ বোচাগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
১৬৪.	মনদাল-বেলঘাট মেলা	মনদাল নোয়াবগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৫.	তারাফেন ঘাট অষ্টমী	তারফেন নোয়াবগঞ্জ দিনাজপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৬.	হাটখোলার মেলা	করটিয়া টাঙ্গাইল।	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৭.	বৈতরের চড়ক মেলা	বৈতর চাটমোহর পাবনা।	চৈত্র সংক্রান্তি ও চড়ক মেলা	চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে ৩ দিন।	ঐ
১৬৮.	গোলারবাজার মেলা	গোলারবাজার শিবচর মাদারীপুর।	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ, ৭ দিন।	ঐ
১৬৯.	বারদি মেলা	বারদি নারায়ণগঞ্জ।	বার্ষিক	চৈত্র মাসের শেষ দিন থেকে ৭ দিন।	ঐ
১৭০.	মাঝিপাড়া মেলা	মাঝিপাড়া শেকের নগর সিরাজদিঘা মুন্সীগঞ্জ।	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৭১.	দৈন্যমারা মেলা	দৈন্যমারা সিরাজদিঘা	ঐ	ঐ	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

		মুন্সীগঞ্জ।			
১৭২.	বুলমারী মেলা	বুলমারী আতয়ারী দিনাজপুর।	বার্ষিক	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
১৭৩.	চড়কপূজা ও মেলা	পারুলিয়া কাপাশিয়া ঢাকা।	চড়ক পূজা	চৈত্র মাসের শেষ দিন।	ঐ
১৭৪.	ঐ	চিতলমারী খুলনা।	ঐ	ঐ	ঐ
১৭৫.	চৈত্র সংক্রান্তির মেলা	চুনঘর কুলাউড়া মৌলভীবাজার।	ঐ	ঐ	ঐ
১৭৬.	চৈত্র মেলা	ঠাকুরবাড়ি ঢাকা।	চৈত্র মেলা	ঐ	ঐ
১৭৭.	চড়কপূজা ও মেলা	কাশিমপুর রামপাল বাগেরহাট।	চড়ক পূজা	ঐ	ঐ
১৭৮.	পাংগার মেলা	লালমনিরহাট রংপুর।	চৈত্র সংক্রান্তি	ঐ	ঐ
১৭৯.	খলিলপুর বেলা	খলিলপুর কুমিল্লা।	বাষিক	২০ চৈত্র থেকে ৪ দিন।	ঐ

মেলা আমাদের সাংস্কৃতির সবচেয়ে নিবিড় মাধ্যম হওয়ায় লোকালয়ে তার চাহিদা তুমুল এবং কোথাও কোথাও এখনো কোন উপলক্ষ্য ছাড়াই নিতান্ত শখের বসে মেলার আয়োজন হতে দেখা যায়। মেলা যে কারণেই হোক না কেন লোকশিল্পের জন্য তা সত্যিই ভীষণ অনুপ্রেরণার জায়গা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. মোহাম্মদ শাহজালাল (১৯৮৫), বাংলাদেশের মৃৎশিল্প, বাংলা একাডেমি, পৃ: ১১।

২. লালা রুখ সেলিম (২০০৭), মৃৎশিল্প, চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ: ৪৮৮

৩. S. K. Saraswati, Early Seulptures of Bengal, (Calcutta 1962), p. 91.

৪. দীপঙ্কর ঘোষ (২০০২), পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী' সংস্কৃতি কেন্দ্র, পৃ: ৩৩।

৫. মোহাম্মদ শাহজালাল (১৯৮৫), বাংলাদেশের মৃৎশিল্প পৃ: ৫২।

৬. লালা রুখ সেলিম (২০০৭), মৃৎশিল্প, চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ: ৫০১।

৭. শ্রী কালীনাথ চৌধুরী : রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯০৮।

৮. সায়মা খানম (২০০৫), ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত মৃৎশিল্প, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ : এম, এফ, এ, তত্ত্বাবধায়ক : প্রভাষক স্বপন কুমার সিকদার, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. Henry Glassic, Traditional Art of Dhaka, (Dhaka 2000), p. 208-210

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎপণ্য তৈরি ও বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–৭৫
মৃৎপণ্য তৈরির মাটি সংগ্রহ

চিত্র–৭৬
মৃৎপণ্য তৈরির মাটি সংগ্রহ

চিত্র–৭৭
মাটি সংরক্ষণ

চিত্র–৭৮
মাটি সংরক্ষণ

চিত্র–৭৯
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮০
মাটি প্রস্তুতকরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–৮১
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮২
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮৩
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮৪
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮৫
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮৬
মাটি প্রস্তুতকরণ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–৮৭
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮৮
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৮৯
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৯০
মাটি প্রস্তুতকরণ

চিত্র–৯১
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

চিত্র–৯২
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–৯৩
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

চিত্র–৯৪
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

চিত্র–৯৫
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

চিত্র–৯৬
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

চিত্র–৯৭
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

চিত্র–৯৮
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–৯৯
মৃৎসামগ্রী তৈরি পদ্ধতি

চিত্র–১০০
মৃৎসামগ্রী নকশাকরণ পদ্ধতি

চিত্র–১০১
মৃৎসামগ্রী নকশাকরণ পদ্ধতি

চিত্র–১০২
মৃৎপণ্য শুকানোর চিত্র

চিত্র–১০৩
মৃৎপণ্য শুকানোর চিত্র

চিত্র–১০৪
মৃৎপণ্য শুকানোর চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১০৫
মৃৎপণ্য শুকানোর চিত্র

চিত্র–১০৬
পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো

চিত্র–১০৭
পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো

চিত্র–১০৮
পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো

চিত্র–১০৯
পোড়ানোর জন্য চুল্লীতে সাজানো

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১১০
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

চিত্র–১১১
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

চিত্র–১১২
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

চিত্র–১১৩
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

চিত্র–১১৪
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

চিত্র–১১৫
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১১৬
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

চিত্র–১১৭
মৃৎপণ্য পোড়ানোর চুল্লী প্রস্তুত

চিত্র–১১৮
রং করণ

চিত্র–১১৯
রং করণ

চিত্র–১২০
রং করণ

চিত্র–১২১
খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য বড় মটকা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১২২
খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য বড় মটকা

চিত্র–১২৩
খাদ্য শস্য সংগ্রহের জন্য বড় মটকা

চিত্র–১২৪
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১২৫
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১২৬
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১২৭
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১২৮
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১২৯
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩০
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩১
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩২
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩৩
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩৪
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩৫
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩৬
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩৭
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

চিত্র–১৩৮
বিক্রয়যোগ্য মৃৎপণ্য

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

লোকসাহিত্যে মৃৎশিল্প

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

লোকসাহিত্যে মৃৎশিল্প

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের সাথে মানবজাতির সম্পর্কের ইতিহাস বহু প্রাচীন। মানব সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে মৃৎশিল্পের দানও অপরিসীম। গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজে, আচার ও ধর্মীয় প্রয়োজনে আবার কখনও খেলনা হিসেবে ব্যবহৃত মৃৎসামগ্রীর বিভিন্ন রূপ আবহমানকাল ধরে বাংলার সমাজ সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক ঐতিহ্যময় করেছে।

প্রাচীন এই জনপ্রিয় লোকশিল্প নিয়ে প্রচলিত আছে লোককথা, শাস্ত্রকথা বা লোকসংস্কৃতির জগতকে করেছে সহজ। এখানে মৃৎশিল্প নিয়ে বহুল প্রচলিত কিছু লোককথা, শাস্ত্রকথা ও শাস্ত্রকথা সংশ্লিষ্ট উপ্যাখ্যান বর্ণিত করা হলো।

ভিতরে গর্ত বিশিষ্ট মৃৎপাত্রের ব্যবহার মানুষ কখন থেকে শিখেছে তা সঠিক বলা যায় না। হতে পারে কাদামাটিতে পায়ের দাগ, রোদে শুকালে তার আকৃতি এবং বৃষ্টিতে তার পানি ধারণ ক্ষমতা দেখে মানুষের মাথায় এসেছে যে, এই ধরনের আকৃতির জিনিস সে নিজেও তৈরি করে ব্যবহারের উপযোগী করতে পারে।

কিংবদন্তী আছে যে, হাতী নিজের শুঁড় দিয়ে প্রায়শ: নিজের মাথায় কাদামাটি ছড়ায়। সে কাদামাটি শুকিয়ে একদা তার গোলাকার কপালের উপর থেকে এক খাপরা মাটিতে পড়ে গেলে, তা দেখে মানুষের মনে পাত্র তৈরির বুদ্ধি আসে। সংস্কৃত ভাষায় হাতীর কপাল আর মাটির কলস শব্দদ্বয়ের প্রতিশব্দ হলো কুম্ভ। মনে করা হয় তা থেকে কুম্ভকার শব্দের উৎপত্তি। সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ভিতরে গর্ত বিশিষ্ট মাটির পাত্রের বয়স আনুমানিক দশ হাজার বছরের বেশি।

পোড়ামাটির পাত্র আসে আরো পরে। আগুনের আবিষ্কার এবং নব্যপ্রস্তর যুগে খাবার রান্না করার প্রয়োজন অনুভূতি হয়। প্রথমে হাতে টিপে টিপে মামুলী পাত্র তৈরি হতো। কুমারের চাকা আবিষ্কারের ফলে পটারি বা মৃৎপাত্র তৈরি রীতিমত একটা গ্রামীণ শিল্পে পরিণত হলো। (তোফায়েল, ১৯৯৯ : ৮৯)

যেহেতু মানুষের জ্ঞান সাধারণত অজ্ঞানতা, অসাবধানতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের স্পৃহা থেকেই আসে সেহেতু মনে করা হয় মৃৎশিল্পের অবয়বটা হয়তোবা সেভাবেই এসেছে। এ প্রসঙ্গে একটা ধারণা এরকম –

একদিন গ্রামের কিছু মহিলা কোন এক কাজে ঝুড়িতে করে কাদামাটি বহন করছিলেন। ঝুড়িটি এক পর্যায়ে পুড়ে গেলে ঝুড়ির লেগে থাকা কাদামাটি ঝুড়ির আকারের একটি পাত্রের রূপ নেয়। এই আকস্মিক ঘটনা পরবর্তীকালে কাদামাটি দিয়ে উন্নততর মৃৎশিল্প আবিষ্কারে হয়ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। (সিতারা, ১৯৮৪ : ১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রবীণ লোকসংস্কৃতি গবেষক দিব্যজ্যোতি মজুমদারের সংকলনে মধ্যভারতের মান্ডলা এলাকার ধোবা আদিবাসী লোককথায় পোড়ামাটির মাত্র তৈরি নিয়ে আছে এক আকর্ষণীয় বয়ান–

"তারা যাযাবর । এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কিছু দেখে। অনেক নতুন কিছু শেখে। জানার আগ্রহও বেড়েছে। বর্ষাকাল। ওপর থেকে বৃষ্টি পড়ে। নিচে কাদামাটি। তারা পথ চলে। পায়ের গোড়ালি ডুবে যায় কাদায়। আঙুলের ফাঁকে আটকে থাকে কাদা। একদিন তারা দেখল, পায়ের আঙুলের কাদা শুকিয়ে গিয়েছে। আঙুলের ফাঁকগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভিজে নরম কাদা শুকিয়ে সাদাটে হয়ে গিয়েছে। আঙুলে ভালভাবে আটকে গিয়েছে। গুহায় ফিরে এল। বেশ শীত শীত করছে। আগুনের পাশে বসে হাত-পা গরম করে নিচ্ছে। আরে! একি! আগুনের তাপ লেগে পায়ের আঙুলের মধ্যে জমে থাকা কাদাগুলো যে আরও শক্ত হয়ে গেল! আশ্চর্য! হাত দিয়ে কাদা ভাঙতে লাগল।

এক বুড়ো একদিন আগুন পোয়াচ্ছে আর বনের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে ভাবল, আচ্ছা, আগুনের তাপ লেগে আঙুলের কাদা যদি এমন শক্ত হয়ে যায়, তবে কাদা দিয়ে তো বেশ পাত্র তৈরি করা যায়। দেখাই যাক্ না।

সে ভিজে ভিজে কাদা তুলে আনল গর্ত থেকে। তাই দিয়ে তৈরি করল একটা পাত্র। বেশ কয়েকদিন সেই পাত্রকে খোলা আকাশের নিচে রেখে দিল সূর্যের তাপ পেয়ে পাত্রটি শুকিয়ে উঠল। বেশ শক্ত-পোক্ত হয়েছে।

একদিন পশু শিকার করে এনে সে মাংসকে টুকরো টুকরো করল। পাত্রের মধ্যে অনেকটা জল ঢেলে চাপিয়ে দিল উনুনে। টুকরোগুলো ফেলে দিল পাত্রের লে। তিনটে পাথর দিয়ে সে উনুন তৈরি করেছিল। হঠাৎ পাত্র ফেটে গেল, সে চমকে উঠল। পাত্রের জল ও মাংস উনুনে পড়ল। আগুন নিভে গেল। বুড়ো ভাবনায় পড়ল। পাত্র তো বেশ শক্তই হয়েছিল। তবে? তবে এমন হল কেন? এত কষ্ট করলাম, শেষে ফেটে গেল? আগুন নিভে গেল?

বুড়ো আবার ভাবতে বসল। ভাবল, সূর্যের তাপ তেমন নয়, ওতে পাত্র শক্ত হবে না, যদি আগুন দিয়েই, আগুন জ্বালিয়েই রান্না করতে হয়, তবে আগুন দিয়েই পাত্র তৈরি করতে হবে। আগুনের জিনিস আগুনেই তৈরি করতে হবে। বুড়ো অনেক ভাবল।

এবার বুড়ো আবার ভিজে ভিজে মাটি দিয়ে শক্ত এক পাত্র তৈরি করল। সেই পাত্র একটু শুকিয়ে এলে তাকে আগুনে দিল। ভালভাবে পোড়াল, পাত্র কালো হয়ে এলো। বেশ শক্ত। আগুন দিয়ে কেমন টঙ্ টঙ্ আওয়াজ হচ্ছে। বুড়ো খুশি।

বুড়ো গেল শিকার করতে। অনেক কষ্টে পেল একটা পশু। তার মাংস টুকরো টুকরো করে পাত্রের জলে ছেড়ে দিল। দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে। টগবগ্ করে জল ফুটছে। পাত্র ঠিক রয়েছে, ফাটছে না, ভাঙছে না। সুন্দর সেদ্ধ হল মাংস। আঃ, কি আনন্দ! আগুন আছে, বনের পশু আছে আর এবার তৈরি হল শক্ত পাত্র। আগুনে দিলে এ পাত্র ফাটে না, ভাঙে না। আঃ। কি সুন্দর স্বাদ এই মাংসের।

সেই তখন থেকে মানুষ শক্ত পাত্র তৈরি করতে শিখল এবং একই সাথে আগুন দিয়ে রান্না করতেও শিখল।” (দীপঙ্কর, ২০০২ : ৩৪)

মৃৎশিল্প ও কুম্ভকারদের আদি ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে শাস্ত্রকথাও। ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে জানা যায়, ভস্মসুর বা অসুর শিবকে তপস্যা করে বর পায়। বরটি হলো, যার মাথায় হাত দেবে সে ভস্ম হবে। যখন অসুর পরীক্ষা করার জন্য শিবের মাথাতেই হাত দিতে চেয়েছিল তখন শিব ভয়ে পালিয়ে কুমেরাদের চাকের মধ্যে লুকিয়েছিল। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে ঘটেছিল বলে ওইদিন থেকে চাক চালানো হয় না। যখন শিবকে পাওয়া গেল না, তখন সব দেবতারা যুক্তি করে এবং কৃষ্ণ মোহিনীমূর্তি ধারন করে। এরপর ভস্মাসুরকে ভুলিয়ে নিজের মাথায় নিজে হাত তুলে ভস্মাসুর ভস্ম হয়। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন ভস্ম হয়। এরপর চাকের কাজ আবার শুরু হয়।

শাস্ত্রকথা ছাড়াও কুম্ভকার নিয়ে যে উপাখ্যান আছে তা হলো : শিবের বিয়ের সময় সপ্তঋষি ঘট চেয়েছিলেন শিবের কাছে। এ সময় শিব কিছু না পেয়ে তার রুদ্রাক্ষ দিয়ে একটি মানুষ আকৃতি তৈরি করলেন। এই মানুষকেই শিব আদেশ দিলেন তাকে একটি ঘট তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তখন এই মানুষটি ঘট তৈরির জিনিসপত্র চাইলেন শিবের কাছে। শিব তখন কৃষ্ণকে ডেকে তার কাছে থেকে সুদর্শন চক্র নিয়ে সেই মানুষটিকে দিলেন। ওই সুদর্শন চক্রই হচ্ছে চাক। ওই চাকটি ঘোরাবার জন্য লাঠি দিলেন। যেটি শিবের ত্রিশূল ছাড়া কিছু নয়। মাটি নিলেন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে জলের কমন্ডুল পেলেন। তাছাড়া তৈরি জিনিস চাক থেকে কাটার জন্য শিব নিজের পৈতে থেকে একটি সুতো দিলেন। এরপর ঘট তৈরি হলে ভাটিতে পুড়িয়ে শিবকে দেওয়া হল। এজন্য ব্রাহ্মণদের নয়টি পৈতার সুতো আছে, অন্যটি কুম্ভকারদের কাছে। মোট দশটি পৈতার সুতো ছিল। রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি মানুষটিই কৃম্ভকার যারা রুদ্রাপাল বলে পরিচিত। সংক্ষেপে পাল বলা হয়।

কুম্ভকার বা কুমোরদের সম্পর্কে শাস্ত্রকথা সংশ্লিষ্ট উপাখ্যানও বহুদিন ধরে চলে আসছে –

‘শিব যখন বসেছিলেন কৈলাস শিখরে।

শিবের বিবাহ হইবে দক্ষের মন্দিরে ॥

অধিবাসে বসিলেন কমলার পতি ।

স্বর্ণঘট আন বলেন ব্রহ্মা প্রজাপতি ॥

এ কথা শুনিয়া শিব বলেন জোড়হাত।

স্বর্ণঘট কোথা পাব বলুন দেবনাথ ॥

ঘটের কথা শুনি শিবের বড় হৈল জ্বালা।

ছিঁড়িয়া ফেলিলেন গলার রুদ্রাক্ষের মালা ॥

Dhaka University Institutional Repository

সেই মালায় জন্মে এক উত্তম নন্দন।

শিব তারে বলেন ঘট করহ গঠন ॥

ঘট গড়িব মহাশয় অস্ত্র কোথা পাব।

মাটির ঘট কিরূপেতে গঠন করিব ॥

নারায়ণ চক্র দিলেন চক্র করিবারে।

মহাদেব ত্রিশূল দিলেন চক্র ফিরাইবারে ॥

ব্রহ্মা কমণ্ডুল দিলেন জল নিবার তরে।

শিব বলেন এইবার ঘট গড়ি দেহ মোরে ॥

সেই চক্র শিরে ধরি করিল গমন।

পর্ব্বত উপরে চক্র করিলা স্থাপন ॥

বিশ্বকর্মা স্মরণ করি ঘট বানাইল।

কর্ণতাত তাপে শুকায়ে দাহন করিল ॥

দুর্ব্বাসা মহামুনির ঘটে হৈল স্থিতি।

সেই হৈতে আমাদের ঘট কল্প খ্যাতি ॥

রুদ্রপালের সন্তান মহাদেবের নাতি।

বিচার করিয়া বলুন হই কোন জাতি ॥’ (দীপঙ্কর, ২০০২ : ১৪, ১৫)

কুমোরদের উৎপত্তি সম্পর্কে যে মৌলিক গল্প চালু আছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। একদা শিব-পার্বতীর বিয়ে উপলক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল দুটি হাঁড়ি (মতান্তরে ‘আইহাঁড়ি’)। তখন শিব তাঁর রুদ্রাক্ষ মালা থেকে দুটি রুদ্রাক্ষ ছিঁড়ে নিয়ে বানালেন এক পুরুষ ও এক নারী। তারাই বিয়ের কুম্ভ তৈরি করে দিল। এই পুরুষ নারী থেকেই কুম্ভকার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সেইজন্য বাঙালি কুমোরদের উপাস্য দেবতা বিশ্বকর্ম নন। শিব। বৈশাখ মাসে রাঢ় অঞ্চলের কুমোররা চারেক ওপর শিবমূর্তি বসিয়ে রাখে এবং পুরো একমাস কাজ করে না। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত ছড়া :

Dhaka University Institutional Repository

বারো মাস ফল ধরে একমাস মানা।

যতগুলি ফল ধরে ততগুলি কানা ॥

এদের উপাধি রুদ্রপাল। লোকবিশ্বাস যে, শিবের সৃষ্ট প্রথম কুম্ভকারের নাম ছিল রুদ্রপাল।

কুমোরদের জাতি বর্ণগত উৎপত্তিরর ধারণাগুলিও বেশ মজার। যেমন ব্রহ্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ে বল হয়েছে :

বিশ্বকর্মা চ শূপ্রায়াং বীর্যাধানও চকার সঃ

তত যভূবঃ পুত্রাশ্চ অবৈতে শিল্পকারিণ ঃ

মালাকার কর্মকার শঙ্খকার কুবিন্দিকা ঃ

কুম্ভকার ঃ কাংস্যকারঃ ষড়েতে শিল্পীলাং বরাঃ ॥

অর্থাৎ, বিশ্বকর্মা শূদ্রাত্রীতে বীর্যবান করলে নয় রকমের শিল্পকার উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে মালাকার, কর্মকার, শঙ্ককার, কুম্ভকার, কুবিন্দক (তাঁতী) ও কাংস্যকার এই ছয়টি শ্রেণি শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আরেক গ্রন্থ ‘ভার্গরাম জাতিমালা’ মতে :

পট্টিকাৎ গোপকন্যায়াং কুলালো জায়তে তত:

অর্থাৎ পট্টিক থেকে গোপকন্যার গর্ভে কুম্ভকার জাতের উদ্ভব।

এ ব্যাপারে আরও কিছু মতবাদ প্রচলিত আছে, যেমন (ক) পট্টিকার থেকে তিলির গর্ভে (খ) বৈশ্যের গর্ভে ব্রাহ্মণের দ্বারা কুম্ভকারদের উদ্ভব।

‘পরাশর সংহিতা’ মতে মালাকার পিতা ও চর্মকার মাতার সংযোগে এই সম্প্রদায়ের সূচনা। মনিয়ের উইলিয়াম তাঁর সংস্কৃত অভিধানে উল্লেখ করেছেন কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি হয়েছে ব্রাহ্মণ পুরুষ ও ক্ষত্রিয় রমণীর সমন্বয়ে।

বলাই বাহুল্য যে, এসব বর্ণনা ও জাতিতত্ত্বের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তবে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে চতুবর্ণের মহিমা এসব তত্ত্বে বর্ণিত হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, চতুর্বর্ণের বাইরে যতগুলি জাত আছে সেগুলি ঐ চারবর্ণেরই সমন্বয়জনিত। মোট কথা বাংলার মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত কুম্ভকার শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত এবং পশ্চিমবঙ্গে ‘জল-চল’ কুম্ভকাররা নবশাখের অন্তর্গত। ‘পরাশর সংহিতায়’ নবশাখ (নবশায়ক) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।

কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥

অর্থাৎ নবশাখের অন্তর্গত জাতিগুলি : গোয়ালা, মালী, তেলী, তাঁতী মোদক, বারুই, কুমোর (কুলাল), কামার ও নাপিত। (সুধীর, ১৯৮৫ : ৬, ৭)

বৌদ্ধ, কুষান ও হিন্দুযুগের শেষ দিকে পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে লোকশিল্পধারার প্রাণবন্তরূপ টেরাকোটা শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বাংলার মধযুগীয় মৃৎশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অমরেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন যে, বাংলার মধ্যযুগীয় স্থাপত্যরীতি ও মৃৎশিল্প ইতিহাসের একই সূত্রে গাঁথা।

বাংলার গ্রামীণ জনসমাজে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং মৃৎশিল্পের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচিত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যেও মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পীদের কথা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মৃৎশিল্পের অস্তিত্বের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যের আলোচনাতেও উঠে এসেছে।

'যজুর্বেদ'-এ যে বিভিন্ন বৃত্তির উল্লেখ আছে তার মধ্যে 'কুলাল' শব্দে মৃৎশিল্প কারিগর কুম্ভকার সম্প্রদায়ের কথা বুঝানো হয়েছে। বৌদ্ধসাহিত্য জাতক কথামালায় খ্রিস্টপূর্বে প্রাচীন ভারতের যে মৃৎশিল্প ছিল তার উল্লেখ আছে। সাহিত্যের প্রাচীন ধারা থেকে মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে জানা যায়। কবি মুকুন্দরাম রচিত 'কবিকাঞ্চন চণ্ডী'তে কুম্ভকারদের কাজের পরিধি সম্পর্কেও জানা যায়। শুধু যে হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদিই তৈরি করত তা নয়, কুম্ভকারেরা ইটও তৈরি করত। কাব্যে আছে–

কুম্ভকার ইটা গড়ে   দস বিস গাঁজা পোড়ে

নিরবধি খাটে সূত্রধার।'

আবার পশুরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ অংশে বলা হয়েছে–

লেজ ধীর দেয় পাক   সিংহ যেন ঘোরে চাক

তথাপি সিংহের বড় বল।

আবার কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে শত্রুঘ্নর ক্রোধ প্রকাশের ভঙ্গি বোঝাতে কুম্ভকাররা কুমোরের চাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

'অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক।

বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক ॥'

Dhaka University Institutional Repository

চাকের উল্লেখ শুধু শক্তি প্রকাশের জন্য নয়, আকৃতিগত মিলে তা অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নারায়ণ দেবের ‘পদ্মপুরাণ-এ আছে

‘কুমারের চাক যেন হাতের বাহুটী।

শুধু চাক নয়, অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ও সাহিত্যে উঠে এসেছে। এসবের বয়ারেন আছে সমাজজীবনের কথা। তুলনা বা দর্শন কথাও। পোয়াল বা ভাটি বা চুল্লির কাজকর্ম বোঝাতে আগুনের অস্তিত্ব তার মনের ভিতরের জ্বালার সাদৃশ্যকে গভীরভাবে তুলনা করা হয়েছে। এর ভেতরের আগুনে মাটির জিনিসপত্র যেমন ধিকিধিকি পোড়ে, মানুষেল মনের গোপন বেদনার সঙ্গে তার তুলনা আছে বড়ু চণ্ডীদাস-এর ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এ

‘বন-পোড়ে আগ বাড়ায়ি জগজনে জানী।

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥’

এই ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর রাধাবিরহ অংশে আছে–

‘ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।

উত্তম জনের মেহা তেহেন মুরারী ॥

যে পুনি অধম জন আন্তরে কপট।

তাহার যে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট॥’

সোনার ঘট ভাঙলেও জোড়া যায় সজ্জনের প্রেমের মতো। কিন্তু কপটতাপূর্ণ অন্তর যায়, সেই অধম জনের প্রেম মাটির ঘটের সমান।

বাংলার লক্ষ্মীসরা ও নানা মঙ্গলঘটে মাঙ্গলিক চিহ্নের সূত্র পাওয়া যায়। এই ঘটকে মাঙ্গলিক চিহ্নে সুচিন্তিত করার প্রথা আজ্র বাংলার কোনও কোনও জায়গায় দেখা যায়। এই প্রথা যেমন ‘মনসার ভাসান’-এর স্ত্রী-আচারের বর্ণনায় পাওয়া যায়–

বেহুলা সুন্দরী মঙ্গলিল হাঁড়ি লখাই সাতবার,

হইয়া হরিষত করিল সর্ব্বনীত, তন্ত-সূত্র চারিধারে তার।’

Dhaka University Institutional Repository

'কবিকাঞ্চন চণ্ডী'-র কালকেতুর বিবাহের অনুকথা অংশে আছে–

'সেই বরযোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।

খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা ॥'

দ্বারিকাদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও কুম্ভকারের চাকের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে চাঁদ সওদাগরের নৌকা কুমোরের চাকের মতো পাক খাচ্ছিল দুর্বিপাকে পড়ে–

'নৌকা পায় পাক যেন কুম্ভকারের চাক।

শিব শিব ডাকে চান্দ এইবার রাখ ॥'

চাক, হাঁড়ি, মঙ্গলঘটের মতো লসি প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে। সেই সবের নানা কথা, সুর সরল ছন্দে ইতিহাসে গাঁথা হয়ে আছে।

অন্যদিকে বাংলা ধাঁধায় মৃৎশিল্প বিশেষ করে মৃৎপাত্রের উল্লেখ আছে, যেখানে পোড়ানোর পরেই যে মৃৎ-সামগ্রীর প্রকৃত স্থায়ীত্ব লাভ ঘটে বা বাঁচে তার উল্লেখ পাওয়া যায়–

'চাকাতে তার জন্ম হইল

কর্মের দোষে শুকাইল

আগুনে পুড়িয়া যে জন বাঁচিবে

সেজন মরিবে কিসে।'

আগুনে পুড়ে যা বাঁচে, তা কিসেই বা বিলুপ্ত হয়, এই গাঁথাতেই যেন পোড়ামাটির চিরকালীন ধারা রয়ে গেছে। সমাজ জীবনের নানা রীতি, আচার ইত্যাদির মধ্যে মৃৎশিল্প তথা সংস্কৃতির এই রূপ বেঁচে আছে। প্রয়োজনের নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বৈচিত্র্যে পোড়ামাটির সামগ্রী আজও টিকে আছে। গ্রামজীবনের এক বিশিষ্ট ধারা এই মৃৎশিল্প যা সমাজ-সংস্কৃতিতে একাত্ম হয়ে আছে। প্রায় একশো বছর আগে হুগলি জেলার জনাই-এর নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়েছে যে ছড়া তাতেও সমাজজীবনের স্পন্দন–

'হাটতলাতে বড় কাদা

তার পাশেতে হরি দাদা ॥

Dhaka University Institutional Repository

হরি দাদার দর্জি ঘর।

তার চালাতে শুধু খড় ॥

তার পাশেতে কুম্ভকার।

মাটি নিয়েই কারবার ॥

কুঁজো, কলসি, ভাঁড়, হাঁড়ি।

সারা উঠানে সারি সারি ॥

তৈরি হলেই হাটে যায়।

ঘরে এসেই ভাত খায় ॥”

পূর্ণচন্দ্র দাস পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি অঞ্চলের কলসি নিয়ে পদ্য আকারে কথা সংগ্রহ করেছেন–

কলসি জনম পেয়েছ তুমি চাকে,

মাটি দলা দলা করি বসালাম চাকেতে।

কলসি জনম পেয়েছ তুমি চাকে,

নারীর ভিতর সুতা নিয়া কাটলাম তোমাকে।

কলসি জনম পেয়েছ তুমি চাকে,

গয়না গাঁটি দিয়ে সাজাব ইন্দ্রের মুকুটে।

কলসি জনম তুমি পেয়েছ চাকে।

হাটে যাব বিক্রি করব কড়ি আনব তোকে।

কলসি জনম পেয়েছ তুমি চাকে,

ঘাটে যাব জল আনব নব যুবতীর কাঁখে।’   (দীপঙ্কর, ২০০২ : ৫)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া, গ্রাম বাংলার হেটো ছড়ায় কুমোরপাড়ার বিবরণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে লোকসংস্কৃতিবিদ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ যেমন–

(১)

‘কুমোর ঘরে হাঁড়ি নাদা।
ছড়িয়ে থাকে গাদা গাদা ॥
ভাঙছে কত রাশি রাশি।
তবুও গড়ে নিয়ে হাসি ॥’

(২)

“কুমোর হল সৃষ্টিধর।
বললে হল এটা কর ॥
পুতুল তৈরি জানে ভাই ।
পরান দানে শক্তি নাই ॥”

(৩)

ঘরে যদি চোখে পড়ে ভাঙা হাঁড়ি ভাণ্ড।
কথা ওঠে এই সব লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড ॥
চারিদিকে ভাঙা হাঁড়ি আবর্জনা কত।
তাল তাল মাটি নিয়ে শুধু কর্মরত ॥
দেব-দেবী ঘট-মূর্তি গড়ে কারিগর।
কুম্ভকার বাংলার অতি গুণধর ॥” (দীপঙ্কর, ২০০২ : ৭)

মৃৎশিল্প নিয়ে লোকছড়া গানও প্রচলিত আছে, বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরের একটি লোকছড়া হলো–

ঐদ্য দিড়ি বৈদও ধায়

দামড়া ছিঁড়ি দড়া ধায়

হৈত্য রানা হৈত্য করে

হাপলা মুড়ায় আগুন জ্বলে

একদেশ হিল একদেশ বীল

এক দেশতো মানুষ নাই

যে দেশেতে মানুষ নাই

হে দেশে ছিল তিন কুমার

এক কুমারে গড়ত জানে না

যে কুমারে গড়ত জানে না

সে কুমারে গড়ছে তিন আড়া

এক আড়া টুডা এক আড়া বুডা

এক আড়ার তলা নাই

যে আড়ার তলা নাই

সে আড়াত করি রাইনছে। (লক্ষ্মীপুর, ২০১৪ : ৮৭)

আবার, পাল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনেক সময় কু-লোকের নজরে জ্বালানির তেজ কমে যায়। এ জন্য তারা বাণ কাটা গুরুর শরণাপন্ন হয়। গুরু নতুন পাতিলে জল এনে তিনবার মন্ত্র পড়ে জলে ফুঁ দেয় এবং সেই জল পইনে ছিটিয়ে দেয়। অশুভ বাণ কেটে যায়, পইনের আগুনে তেজ বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে গুরু যে বাণটি ব্যবহার করে থাকে তা এরূপ–

করাত করাত করাত

ব্রহ্মা করাত,

আসতে কাটে,

যাতে কাটে,

উজানি কাটি,

ভাট্যালি কাটি,

দেব-দেবতার কালাফি কাটি,

বাণ কুজ্ঞান কাটি,

বিশ– বাসুলি কাটি,

মানুষের কালাফি কাটি,

অমুকের দোষ কাটি,

দোহাই কামাক্ষ্যা গুরু

গোসাইয়ের চরণের দোহাই। (শ্রী কালীনাথ, ১৯০৮)

বাংলাদেশের কুমরেরা নানারকমের যে সকল মাটির জিনিস তৈরি করেন তা নিয়ে আমাদের দেশের প্রবীণ ও খ্যাতনামা লোককবি মানিকগঞ্জের সাইদুর বয়াতির মাটির গান ও ছড়ায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মাটি দিয়া কুম্ভকারে

পুতুল পাতিল কতই গড়ে

ধন্য বলি তারে।

পানি দিয়া ছাইনা মাটি

তারে করে পরিপাটি

Dhaka University Institutional Repository

বানায় কত ঘাটিবাটি
জাতের অনুসারে।

সরা ঘোড়া মালসা মোড়া
বানায় বসে ঘরে
কালি দুর্গা রাধাকৃষ্ণ বীর হনুমান কার্তিকেরে ॥

শিক শঙ্কর শৃগাল ইঁদুর
সরস্বতী লক্ষ্মী ময়ুর
ফল ফুল ঘইরাল আদি
যা আছে সংসারে।

মেয়েরা বানিয়ে বেচে পয়সার খাতিরে
ঘরে বসে হয় মুনাফা
মাটির জিনিস তৈয়ার করে ॥

মাটির জিনিস তৈয়ার করো
বিশ্বে নাই এই বাংলা ছাড়া
দেশের মাটি মুক্তা ভরা
যে চিনিতে পারে।

মাটির জিনিস অতি খাঁটি

ভাবনা একবারে

এই মাটির তৈয়ার দেহ পাইয়া

সাইদ কত গৌরব করে ॥

মাটির মত হয়ে খাঁটি পণ কর জিয়ন মরণ

মওলাজির খাসমহলে যাবি মন।

মাটি থাকে মাঠে পড়ে

কোদালে কাটিয়া তারে

কুম্ভকারে নিয়া ওরে

কতই করে বিড়ম্বন

জল ঢালিয়া ছানা করে

আছাড়ের পর আছাড় মারে

নরম না হইলে পরে

পারায়ে করে নরম ॥

মাটি হইলে পরিপাটি

বানায় কত ঘটিবাটি

পাত্রটা গড়ে তখন

জেলে নিয়া চাকার পরে

Dhaka University Institutional Repository

ঘুরায় তারে ঘূর্ণিপাকে

করে নেয় মনের মতন ॥

রোদ্রে করে ভাজাভজা

সাজার উপর আরো সাজা

পাঁজা করে নেয় তখন

সাজায় নিয়া পইনের পরে

সাজায় অতি যত্ন করে

অনলে করে দহন ॥

পোড়া হয়ে যায় যখনে

নামায় তারে অতি যতনে

টুটাফাটা বাছট করে

সাজায়ে রাখে তারে

যে হইল মনের মতন ॥

নিয়ে তারে প্রেমবাজারে

প্রেমের দরে বিক্রি করে

গ্রাহকে সন্দেহ করে

পানিতে চুবায় তখন

তবুও সন্দেহ করে

Dhaka University Institutional Repository

পয়সা দিয়ে টোকায় একবারে

শক্তি পোড়া হইলে পরে

সেই টোকায় করে কনকনে ॥

মাটির চাইতে আর কি খাঁটি

বলনা দেখি ভাই

এই মাটিতে জন্ম নিয়া

তার বুকে লুকাই

কুম্ভকারে এই মাটিরে

সাজায় নানানভাবে

শিশু একাডেমি গেলে

সব জানতে পাবে

সামনে আছে শতরূপা

হরেক রকম খেলনা

হাতি ঘোড়া টিয়া তোতা

আম আনারস দোলনা

কলা কদু তাল বেল

ফুলের টব আর সরা

পিড়া মোড়া পানির ঘরা

তাজমহল আর ঘড়ি ॥

চিল চড়ুই ঈগলপাখি

গোখরা সাপের ফণা

সবই হল মাটির তৈয়ার

বলব কত নমুনা ॥ (শফিকুর, ১৯৯৫ : ৩৮-৪২)

ঐতিহ্যবাহী এই লোকশিল্প নিয়ে রচিত এই সকল লোককথার অন্যতম কারণ এই শিল্পের শিল্পীদের কাজ লোকজ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আদিবাসীদের মধ্যে যে গানের চর্চা রয়েছে সেখানেও আছে কুমার বাড়ির বর্ণনা, তেমনই একটা গান ঠাকুরগাঁওয়ের আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত নিচে দেয়া হলো–

'চান্নিরে চান্নি তোর জলম কুণ্ঠে

তোর জলম ঐ হাড়ির বাড়িতে

হাড়ি বানাইছে গারস্তে নিচে

আজ চান্নির গন্ধ্যা অধিবাস রে

কুলারে কুলা তোর জলম কুণ্ঠে

তোর জলম হাড়ির বাড়িতে

হাড়িয়ে বানাইছে খারস্তে নিছে

আজ কুলার সন্ধ্যা অধিবাস রে।

গোচারে গোছা তোর জলম কুণ্ঠে

তোর জলম ঐ কুমারের বাড়িতে

কুমারে গসাইছে খারস্তে নিছে

আছি গোছার গন্ধ্যা অধিবাস রে

পচিরে পেচি তোর জলম কুণ্ঠে

Dhaka University Institutional Repository

তোর জলম ঐ কুমারের বাড়িতে

কুমার বানাইছে গারস্তে নিছে

আজ পেচির সন্ধ্যা অধিবাসরে ।'

ঠাকুরগাঁও, ২০১৪ : ১৪৯

আদিবাসী গানেই শুধু নয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গম্ভীরা গান, মেয়েলী গীতেও জড়িয়ে আছে–এই লোকজ শিল্প। গম্ভীর গান–

(তুমি) কেন উদাসী, কাশিবাসী, ওহে কাশীশ্বর।

দুনিয়াটা যায় রসাতল, রক্ষা কর হর ॥

কামার কুমার ছুতার চাষা

ছাড়ল তার জাত ব্যবসা

চাকরি লয়ে বাবু ভাবছে কত বড়।

গাঁয়ের মাটি শিল্প হলো মাটি

বাংলার মাটি হরো খাঁটি

কৃষি শিল্পে শিখাও মোদের

(তুমি) দেশকে তুলে ধর।

চাষ উন্নতি করতে হলে

চলবে না আর পুরান চালে

দেশ-বিদেশের নতুন নিয়ম

আমদানি সব কর। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২০১৪ : ১৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের গান –

বাড়ির ধারে তিন ঘর পালন (কুমোর) ছিল,

দু'টি ঘরে লোক নেই, একটা ঘরে মানুষ নেই।

সেই ঘরে ঢুকে দেখে তিনটা হাঁড়ি রয়েছে।

দু'টু হাঁড়ি ভাঙা, একটা হাঁড়ি বোগলা,

যেটার তলা নেই, সেটা বাড়ি এনে,

চুলায় দিয়েছে চাপিয়ে।

মাছগুলি পড়ে গেছে চুলার খোলে,

ঝোলগুলি রয়ে গেছে হাঁড়িতে।

আমরা সকলে ভাত খেয়েছি,

সেই ঝোলগুলি দিয়ে।

আমরা সকলে খেয়েছি (ধুয়া) (অতুলচন্দ্র, ২০০৪ : ১৭৪)

প্রেমের গান –

একদিন শ্রীরাবিকা যমুনাতে গেলো

আকাশেরি চন্দ্র যেমন গো রাধে কলসী পুরাইলো

আকাশেরি...... ।

বাড়িতে গেলে জিজ্ঞাসিবে শাশুড়ী ননদী

কেমনে ভাঙিলি রাধে গো, রাধে সুবর্ণের কলসী।

রাধে সুবর্ণের .... ।

Dhaka University Institutional Repository

পথ পিছল ঘাট পিছল ঘাটের মাটি

আছাড়......... ।

ভাঙছে ভাঙছে কলসী গোটা তাতে ক্ষতি নাই

লক্ষ টাকার মান হারাইলাম কানাই করি কি উপায়।

লক্ষ টাকার........... ।

বাড়ির কাছে আছে আমার কুমারিয়া সই

ভালো করি গড়বো কলসীরে কানাই চিঙ্গন করি সই। (হরেকৃষ্ণ, ১৯৯৯ : ২২৬)

মেয়েলী গীত –

কুলক্ষণা কহুরে

সাত সকাল ব্যালারে

ক্যামুন কর‍্যা কলস ভাঙিলিরে।

শান বান্ধা ঘাটের

মাটির না কলসরে

আছাড় খাইয়া কলস ভাঙিলেরে।

গন্দে না কলসেরে

নন্দে না পুছেরে

হাড় পাখ্‌খি ভারীরে

ক্যামুন কর‍্যা কলস ভাঙিলিরে।

কাজ কামের হাতরে

Dhaka University Institutional Repository

মাটিরই না কলসরে

তাড়াহুড়ায় কলস ভাঙিলিরে। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২০১৪ : ২৩১)

আবার বন্দনা (ছড়া) তেও আছে মৃৎশিল্প –

বন্দনা (ছড়া)

প্রতিমা শিল্প

ধুয়া : পুণ্যময়ী বাংলা আমার প্রাণের প্রাণ

বাংলা মাকে হাজারো প্রণাম

সব্‌সে খাঁটি বাংলার মাটি

সোনার চেয়ে বেশি দাম

বাংলা মাকে হাজারো প্রণাম

পূণ্যময়ী প্রাণ।

এই মাটিতে শিল্প গড়ি সাতপুরুষ তামাম গো

এই মাটিতে তামাম।

মাটি আমার অন্নপূর্ণা

মাটি আমার মায়ের গয়না

শ্রীদামচন্দ্র ভাস্কর নাম

বারোঘোরিয়ায় নিজ ধাম গো।

পিতা সুরেশচন্দ্র ভাস্কর

Dhaka University Institutional Repository

বল্ছি আশি শ্রোতা বরাবর

আমরা বংশ-পরম্পরায়

দেব-দেবীর প্রতিমা বানায় গো।

পিতামহ কুড়াচন্দ্র ভাস্কর

প্রতিমার উত্তম কারিগর

সব পূজার প্রতিমা বানায়

লক্ষ্মী সরস্বতী কানাই।

ব্রক্ষ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর

শ্যামা গঙ্গা মোন্শার

কার্ত্তিক গনেশ শিত্লা পূজা

অন্নপূর্ণা দশভুজা গো।

তেত্রিশ কোটি দেবতার

কিছু কিছু বানায় তার

এই পেশা পূর্ব-পুরুষের

এখনও চলছে তাহার জের গো।

দ্যাশের মাটি মাতৃভূমি

মাতৃভূমির পদ্ চুমি

এই মাটিতে সাতপুরুষ নিদান

মাটিকে হাজারো প্রণাম

পূণ্যময়ী বাংলা আমার প্রাণের প্রাণ।

Dhaka University Institutional Repository

আস্‌বাব শিল্প

ধুয়া: মাটি দিয়ে বানাই যত ব্যবহার্য আস্‌বাব

গো মাটি দিয়ে বানাই যত ব্যবহার্য আস্‌বাব

মাটির শিল্প মাটির গল্প বল্‌বো আমি সব।

বদনা বর্ত্তন কলসি হাঁড়ি

ফুলের টব গরুর চাড়ি

ছাইদানি আর ফুলদানি

বানাই ব্যাংক পয়সাদানি।

ধুপ দেওয়ার ধুপ্‌চি গড়ি

প্রদীপ দিয়ালি করি

খোলা রুটি ভাজা বানাই

মুড়ি ভাজা ঝাঁজর গড়াই।

বানাই দইয়ের কাঁতারি

ঢুকাই নক্‌শিদার হাঁড়ি

মাটির গেলাস মাটির সরা

গুঁকার কল্‌কি মাটির খোরা।

পুতুল আরও কতকি

বানাই রকমারি পাখি

Dhaka University Institutional Repository

সাত পুরুষের এই পেশা

ধরে আছে মাটির নেশা।

আমাদের মাটির ঘরে বাসা

এই মাটি মোদের আশা

এই মাটিতে জনম আমার

এই মাটিতে মরণ আমার

এই মাটি দ্যাশের খাঁটি দিশা

অন্য দ্যাশের চাইতে খাসা

নাম গোপাল পাল

বাবা ঝাড়ু পাল

বারোঘোরিয়া ধাম

বাংলা মাকে হাজারো প্রণাম

পূণ্যময়ী বাংলা আমার প্রাণের প্রাণ।

(চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ২০১৪ : ৩৫৫, ৩৫৬)

অধ্যাত্মিক কথায়–

"কুমারের হাঁড়ি পাতিল ভাঙলে না যায় জোড়া,

ওরে এমন সোনার তনু ক্যামনে যাইবে পোড়া।"

(লোকশ্রুতি, ২০০৪ : ১৭৮)

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিপ্রধান গ্রামীণ জনসমাজের প্রয়োজন, গ্রামীণ অবস্থানে এই মৃৎশিল্পধারা গ্রামীণ অর্থনীতির মোড়কেই টিকে আছে। গ্রামীণ হাটে। আবার মেলায় ও মৃৎসামগ্রীর দেখা মেলে। বাংলার অখণ্ড জনজীবনের সঙ্গে মৃৎ-সামগ্রীর অবিচ্ছিন্ন যে একাত্মতা, হেটো-ছড়ার মধ্যেও তার রেশ পাওয়া যায়–

প্রণাম করি গ্রামের দেবী করগো রক্ষা সকল জলে।

নানান জাতি বেঁধেছে ঘর বন্যার পরে পড়ছে মনে ॥

কামার আছে হাতুড়ি নিয়ে বানায় কত লাঙল ফলা।

ছুতোর গড়ে গরুর গাড়ি হাটেতে যায় আনাজ কলা ॥

কুমোর থাকে গ্রামের মাঝে তাহার ঘরে সকলে যায়।

কলসি হাঁড়ি গামলা কত মনের মতো কিনতে পায় ॥

গ্রামের তাঁতি বুনছে রঙিন শাড়ি চওড়া পাড়।

গ্রামের বধূ বাকিতে কেনে ছাগল বেচে শোধবে ধার ॥

(দীপাঙ্কর, ২০০২ : ১৩৭)

সবরকম হস্তশিল্পীদের মধ্যে কুমোরদের অবস্থাই সম্ভবত দরিদ্রতম। অথচ মহেঞ্জোদারোর সময় থেকেই এই শিল্পী জাতি সক্রিয় ও চলমান। এঁদের শিল্পের উপাদান সবচেয়ে সুলভ ও সহজ প্রাপ্য। অথচ এঁদের জীবন ভীষণ অসহায়। এঁদের দারিদ্র ও দুরবস্থা সম্পর্কে হিন্দি একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

নিশ্চিন্তে শুতে কুম্‌হারা

মাটিয়া নায়নে যায় চোর ॥

অর্থাৎ কুমোর নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কেননা মাটি চোরে নেয় না। এই ব্যঙ্গ আজও নির্মম। (সুধীর, ১৯৮৫ : ৭৭)

সরল, সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই কুম্ভকার। কুমোর বা পালরা মৃৎসামগ্রী তৈরিতে বরাবরই তাদের শিল্পমনের পরিচয় দিয়েছে। লোকজ জীবনের নিজ ব্যবহার্য মৃৎসামগ্রীই তাদের শিল্পীদের মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঐতিহ্যবাহী এই লোকশিল্প নিয়ে রচিত সকল লোককথার অন্যতম কারণ এই শিল্পের শিল্পীদের কাজ লোকজ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

'সমসাময়িক জীবনের কোন বস্তুই এই মৃৎশিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথার নানা গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথার নানা কাহিনী যেমন এই ফলকগুলিতে দৃষ্টিগোচর, তেমনই দৃষ্টিগোচর প্রত্যন্ত বাংলার নানা আদিবাসী নর নারীর নানা দেহরূপ নানা অভ্যাস, নানা সংস্কারের চিত্র, কাল্পনিক প্রাণীজগতের বিচিত্র নিদর্শন–গন্ধর্ব, কিন্নরী, অর্ধমানব-অর্ধপশুর লীলাময় কল্পনার ছন্দিত রূপ; সমৃদ্ধ পশুপক্ষী জগতের নানা বিচিত্র নিদর্শন প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় এবং বিষয়বস্তুর মর্যাদা ও বৈচিত্র্যানুযায়ী রূপায়িত; নানা ভঙ্গিমায় জননী ও শিশু; কুস্তিকসরত ও নানা শরীর ক্রিয়ারত মল্লবীর, যষ্ঠিধৃত দ্বারপাল; কূপে জলাহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী; গৃহপ্রবেশরতা নারী; স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী ধনুর্ধর; দীর্ঘশ্মশ্রু আনতপৃষ্ঠ ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক; লাঙ্গলবাহী কৃষক; মৎস্যবাহিনী ও মৎস্যকর্তনরতা নারী; নৃত্যরা ও সংগীতরতা নারী; শিকারবাহী ব্যাধি; গীতবাদ্যরত পুরুষ; ধর্মাচরণরত ব্রাহ্মণ; অস্তিচর্মসার, ন্যাঙ্গোটিমাত্র পরিহিত, স্বন্ধদেশে প্রলম্বিত ষষ্ঠির দুইপ্রান্তে পুঁটুলিটা ঝুলানো পথিক সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক; নানা কৌতুকময় ঘটনা, রূপ ও ভঙ্গিমা; মোগের ও ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি জীবনের অসংখ্য বিচিত্ররূপ; (নীহাররঞ্জন, ১৩৫৬ঃ ২২১)

মৃৎশিল্পীদের এই বৈচিত্র্যময় শিল্পকর্ম প্রায় সবটুকুই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঘিরে। তাই সঙ্গতভাবেই মৌলিক মৃৎশিল্পের লোককথার প্রচলন ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র :

১. তোফায়েল আহমদ, (১৯৯৯), লোকঐতিহ্যের দশ দিগন্ত। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. সিতারা খোরশেদ, (১৯৮৪)। মৃৎশিল্পে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, ঢাকা।

৩. দীপঙ্কর ঘোষ, (২০০২)। পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

৪. সুধীর চক্রবর্তী, (১৯৯৫)। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা।

৫. শামুসজ্জামান খান, প্রধান সম্পাদক, (২০১৪)। লক্ষ্মীপুর বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, লক্ষ্মীপুর। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৬. শ্রী কালীনাথ চৌধুরী, (১৯০৮)। রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রাজশাহী।

৭. শফিকুর রহমান চৌধুরী, (১৯৯০)। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮. অতুলচন্দ্র ভৌমিক, (২০০৪)। সারি গান লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মৃৎশিল্পী (পরম্পরা)

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্পী (পরম্পরা)

বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের গৌরবময় সুবিশাল ক্ষেত্রের মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম। আর এই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে জনগোষ্ঠী তারা আমাদের কাছে মৃৎশিল্পী হিসেবে পরিচিত। এই শিল্পীরা বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন মানুষেরা সহজলভ্য মাটিকেই বেছে নিয়েছিল তাদের শিল্পিমনের প্রকাশমাধ্যম হিসেবে। সেদিনের সেই অপরিণত শিল্পবোধই কালের পরিক্রমায় নান্দনিক রূপ লাভ করেছে।

কোন দেশের শিল্পকলায় সাধারণত দুটি মূলধারা বিরাজ করে। একটি সনাতন বা লোকজ শিল্প আর একটি হচ্ছে সময়ের অভিঘাতে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত ও বিবর্তিত সাম্প্রতিক বা আধুনিক শিল্পধারা।

১. একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক যা যুগে যুগে প্রবাহিত সাধারণ মানুষের দ্বারা পালিত ও চর্চিত হয়ে থাকে। প্রায় অপরিবর্তিত ধারার এই শিল্প, জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সামাজিক ঘটনাবহুল আচার-বিচার, বাদ-প্রতিবাদ, জীবন-সংগ্রাম, অন্যায়-অবিচার নিয়ে কাঁচা হাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ চিত্র।

২. অপরটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে আগুয়ান প্রাচ্য-প্রতীচ্য আধুনিক জগতের সাম্প্রতিক ইঙ্গিতময় কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল চিন্তা, বোধ ও উপস্থাপনা দ্বারা একটি যুগোপযোগী শিল্পধারা।

এই দুটি ধারা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নমুখি হলেও দ্বিতীয়ধারা সব সময়ই প্রথমধারাটি দ্বারা প্রভাবিত ও নির্ভরশীল কিন্তু প্রথমধারা কখনো দ্বিতীয়ধারার ওপর নির্ভর করে চর্চিত হয় না।

লোকজ শিল্প সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একে বাদ দিয়ে তাদের জীবন চলে না। বাংলাদেশের লোকশিল্প তাই খুবই শক্তিশালী ও ঐতিহ্যময় এবং গৌরবের। আর এই লোকশিল্পের মধ্য মৃৎশিল্প অন্যতম। যেহেতু এটি মৌলিক, আদি ও স্বয়ম্ভুঃ তাই বহুমাত্রিক। মোট কথা মৃৎশিল্প হচ্ছে শিল্পের আদি ও মূল আঁধার। যেখান থেকে ধারণা, শৈলী, পরিসর ও আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু আহরিত হয়ে থাকে।

পরম্পরায় শিল্পীরা বাংলার পুতুল, মাটির, নানাবিধ পাত্র, গ্রামের নারীপুরুষ, পশুপাখি, নিসর্গ থেকে নিয়ে সহজ সরল রেখা ও রংসমূহ দিয়ে তাঁরা নিজস্ব শিল্প সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে আধুনিকতার আলোয় মার্জিত শিক্ষিত ভদ্র সমাজের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পটি তার উৎপাদনের শেষ সীমায় এসে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে চলছে। বাস্তবচিত্র কিন্তু তা নয় বরং পল্লীর আপামর দরিদ্র পরিবারের কুম্ভকার সমাজের তৈরিকৃত মৃৎশিল্প এখনও যেভাবে তার কারুশিল্পগত জীবনীশক্তি নিয়ে সমাদৃত এবং পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রার তালে তালে বর্ধিত হচ্ছে তা দেখে রীতিমত বিস্ময় জাগে। আশ্চর্য হতে হয় তাদের জীবনীশক্তির সবটুকু নিয়ে এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরে থাকতে দেখে।

শিল্পের প্রতি শিল্পীর অকৃত্রিম ভালোবাসার ফলে এই শিল্প কখনও ঐতিহ্যর বাহক হিসেবে আবার কখনও ব্যবহার্য সামগ্রীর চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। বিস্মিত হতে হয় তখন যখন দেখি সামান্য যন্ত্রপাতি ও সহজলভ্য অফুরন্ত মাটির তালকে গ্রামীণ কারিগররা অর্থাৎ কুম্ভকাররা শিল্পগত সুষমায় অনন্য দৃষ্টিনন্দন রূপ দিয়ে চলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের জীবনাচার

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের জীবনাচার

পরম্পরা মৃৎশিল্পী বলতে পূর্বপুরুষদের পেশায় নিয়োজিত শিল্পীদেরকে বুঝে থাকি। যারা কিনা বংশ পরম্পরায় বাবা, দাদা, চাচা, ভাইদের কাছ থেকে কাজটি শিখে নিয়েছে।

শৈশবে কখনও খেলার ছলে মাটির কাছে এসেছে আবার কখনও সাহায্যকারী হিসেবে এই শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কের গাঁটছড়া বেঁধেছে। শৈশবের সেই বন্ধন শিল্পীর রুটি রুজির বন্দোবস্ত যেমন করেছে তেমনি আত্মার খোরাকও যুগিয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ কুমারই মাটির কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও এঁদের মধ্যে সকলকেই মৃৎশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় কিনা সেটা ভেবে দেখার মতো। যদিও এ কথা সত্যি যে, একসময় হাঁড়ি পাতিল তৈরি করার কারিগররাই পরবর্তী সময়ে মৃৎশিল্পী হয়েছেন। কিন্তু আজও বহু কুমার কেবল হাঁড়ি পাতিল তৈরির কাজেই তাদের কর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কমলকুমার মজুমদার লিখেছেন– "কুম্ভকারগণই স্বভাবতঃ মৃত্তিকা লইয়া শিল্প রচনা করিয়া থাকে, সেহেতু এই কথা কোনক্রমে বলবার উপায় নাই যে, কুম্ভকারগণই মৃৎশিল্পের জনক। ইহারা সাধারণত হাঁড়ি কলস ইত্যাদি গৃহস্থের নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু করে থাকে, অবশ্য ইহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছে যাহারা মূর্তি ও পুতুল গড়ে। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাধারণ কুম্ভকারদের বৈবাহিক সূত্র বড় একটা নেই। অবশ্য এই পার্থক্য কালক্রমেই ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়, একদা আধুনিক শ্রেণীই একই ছিল।"

পালপাড়া গুলো ঘুরে দেখা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই মূলত এই পেশার সাথে যুক্ত। কদাচিৎ মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেল কর্মসহযোগীই পরবর্তীতে সরাসরি এই শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে।

সাধারণত নদী তীরবর্তী এলাকায় কাজের উপযোগী মাটির সহজলভ্যতার কারণে কুমারদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে তাই নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলোতে কুমার পল্লীর দেখা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কুমার পাড়া, কুমারগাঁও, কুমারখালী, কুমারটোলী, কুমারভাঙ্গা ইত্যাদি স্থানের নাম মৃৎশিল্পী সম্প্রদায়ের পরিচয় বহন করে আসছে। অপর দিকে মুসলমান মৃৎশিল্প পল্লীর নামকরণ ও তাদের উপাধি অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন চট্টগ্রামের প্রায় মৃৎশিল্প পল্লীর নাম 'কুলালপাড়া'।

বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক জীবনে মৃৎশিল্পের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই মনে হতে পারে কারা এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে মৃৎশিল্প মূলত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্প্রদায়টি হচ্ছে কুমার বা কুম্ভকার এবং এদের উপাধি হচ্ছে পাল। ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে

Dhaka University Institutional Repository

আর্যশাসিত পাক ভারতে বর্ণভেদ ও কৌলিন্য প্রথার উদ্ভব ঘটে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটে। মৃৎশিল্পী কুম্ভকাররা এর অন্তর্ভুক্ত।

চারুকলার ক্ষেত্রেও এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বহমান বিভিন্ন ব্রত ও অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠানের আল্পনায়, কাঁচা বা পোড়ামাটির তৈরি পুতুল ও খেলনায় মনসা বা গাজীর পটচিত্রে, মাটিলেপা বেড়ার উপর অথবা সরা ও ঘটের উপর নানা রঙিন চিত্র ও নকশায়। আরও নানা প্রকারের গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়িত শিল্পের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আর এই সব বিচিত্র প্রকাশের ভিতর দিয়েই বহু শতাব্দী ধরে আমাদের কৌম গ্রামীণ লোকায়াত মানস নিজেকে ব্যক্ত করেছে।

মাটির সাথে কুমোরদের সম্পর্ক জলের সঙ্গে মাছের মতো। মাটির সাথে সম্পর্কিত এই পেশার মানুষের জীবনাচার অত্যন্ত সরল সাধারণ। কাজের উপযোগী মাটি যেখানে সুলভ, সহজপ্রাপ্য সেখানেই গড়ে উঠেছে মৃৎশিল্পের উপনিবেশ।

কবি জসিমউদ্‌দীন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পল্লীশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'মাটির গায়ে যেমন আল্‌পনা তেমনি মাটি দিয়া কুমারেরা বিচিত্র রকমের হাঁড়িকুড়ি, লক্ষ্মীর সরা, প্রদীপ, জোড়খুঁটি নানা দেবদেবীর প্রতিমা ও বহুপ্রকারের পুতুল তৈরি করিয়া থাকে। কোন কোন কুমার গৃহিনী চিত্রবিদ্যায় বেশ নিপূণ।' মৃৎশিল্পের এই ধারা বর্ণনায় পরবর্তীকালেও নানা তথ্যসন্ধান পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' রচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন "মৃৎশিল্পে, বিশেষত গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের পরিবিস্তৃত বাঙলাদেশে নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে, মাঠের মধ্যে বসিয়া কাদা লইয়া খেলা, আঁটালো মাটির নরম ঢেলা লইয়া বিচিত্র রূপ গড়া ও ভাঙা, ভাঙা ও গড়া, দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার, আনন্দ-বেদনার, বিচিত্র গতি ও স্থিতির নানারূপ এই মুহূর্তে আছে পরের মুহূর্তে নাই, এমন সব রূপের বাতি জ্বালানো এবং নেভানো, মাটির নরম তাল লইয়া খেলার ইহাই তো প্রকৃতি। কিন্তু, এই সব বিচিত্র রূপের লীলা প্রত্যক্ষ করিবার কোনও উপাদানই আজ আর আমাদের হাতে নাই। মাটিতেই যাহার সৃষ্টি মাটির ধুলায়ই কবে তাহা গিয়াছে মিশিয়া! তবু, এই সব রূপ কালজয়ী, কালাতীত; কালপ্রবাহকে অতিক্রম করিয়া তাহারা আজও আমাদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে; বাঁচিয়া আছে আমাদের ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানা মূর্তিতে, গ্রামের কুমোরের তৈরি নানা মাটির পুতুল ও খেলনায়। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার আমলে সিন্ধু নদীর তীরে বসিয়া সমসাময়িক লোকেরা যে পুতুল তৈরি করিত, বাংলার গ্রামে নদীর ধারে পুকুর পাড়ে বটের ছায়ে বসিয়া বাঙালী শিশু, বাঙালী কুমোর, বাঙালী ব্রতধর্মী নারী আজও তাহাই করে।' (নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৫৬ : ৬৩৬) সমাজ ইতিহাসের নানা পটভূমিতে মৃৎশিল্পের এই পরম্পরা হয়তো ভিন্নধর্মী খাতে প্রবাহিত হয়েছে, তবুও সামগ্রিক বিস্তার ও বিন্যাসে এই পরম্পরা আজও যে অনেকাংশে সজীব তা বলা চলে।

মৃৎশিল্পকে পারিবারিক শিল্পও বলা যায়। পরিবারের নারী, পুরুষ এমনকি শিশু কিশোররাও এই কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সম্পূর্ণ কাজ মৌখিকভাবে সক্রিয়ভাবে বংশপরম্পরায় শেখানো হয়। কেবল পেশাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই কুমারদের মধ্যে বিবাহ প্রথা নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও বর্তমানে এর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হচ্ছে। একইসাথে এটা বলা যায় এক একটি কুমারপল্লী দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা এক একটি পরিবার।

এঁদের নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সাথে সাথে উপকরণ তৈরির কাঁচামাল পর্যন্ত লেনদেন করে থাকে। কোন বিবাহ উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান হলে পল্লীর সকল সদস্যই এতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীরা এখন পর্যন্ত তাঁদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিকে অনুসরণ করে আসছে। এমনকি কাজের জন্য ব্যবহৃত উপকরণসমূহ, হাতিয়ার, সাজ-সরঞ্জামেরও তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

মৃৎশিল্প একটি বংশপরম্পরাগত শিল্পকর্ম। পেশাগত দিক থেকে পরিচিত এই কুম্ভকার শ্রেণীর জীবন-যাত্রা প্রণালী অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ নারী পুরুষ সবাইকে এ পেশায় সমভাবে শ্রম দিতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে নারীদের শ্রমের ভাগটাই অনেক বেশি হয়ে থাকে।

কুমোরদের বা পালদের মৃৎসামগ্রী তৈরির পুরো প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

১. মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
২. মাটিকে মৃৎসামগ্রী তৈরির উপযোগী করা
৩. পাত্রের আকৃতি তৈরি (হাতে অথবা চাকের সাহায্যে)
৪. রং করণ
৫. অলংকরণ
৬. রৌদ্রে শুকানো ও
৭. আগুনে পোড়ানো।

এই কর্মপ্রক্রিয়ায় পুরুষ, মহিলা এবং পরিবারের ছোট বড় অন্য সদস্যরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। এরমধ্যে কিছু কাজ আছে যা কিনা শুধু পুরুষরাই করেন, যেমন মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা, মাটিকে কাজের উপযোগী করার জন্য মাটি প্রস্তুত করা, চাকের কাজ এবং পোড়ানো এ ধরনের কাজগুলো পুরুষরাই করে থাকে। মহিলারা হাতে বা ছাঁচের সাহায্যে নানা ধরনের খেলনা ও পুতুল এবং হাতে পিটিয়ে বিভিন্ন পাত্র তৈরি করে। এছাড়াও সংগৃহীত মাটি ছানা, মাটি পরিষ্কার করা, পাতিলে কষ দেওয়া, পাতিল অথবা তৈরি মৃৎসামগ্রীসমূহ রৌদ্রে শুকানো, পাত্র ও খেলনায় অলংকরণ ও রংকরণ, গৃহজাত করা প্রভৃতির স্তরের সঙ্গে নারীদের কোন না কোনভাবে যুক্ত থাকতেই হয়। তার ফলে পাল পরিবারের পুরুষদের অবসর থাকলেও রমণীদের অবসর ভোগের সৌভাগ্য কখনো ঘটেনা। পুত্র-কন্যার যত্ন, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবার সঙ্গে মৃৎপাত্রের বিভিন্ন স্তরে তার কল্যাণ হস্তের স্পর্শ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। পাল পাড়ায় সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে মৃৎসামগ্রীর কর্মপ্রক্রিয়া। অধিকাংশ সময়ে পরিবারের মহিলারা সকালে খেয়ে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করেন এবং সারাদিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় গোসল করে খেতে বসেন। কতটা শ্রম, কতটা ভালোবাসা জড়ানো থাকে তাদের সৃষ্টিতে তা অজানাই থেকে যায় ক্রেতার কাছে।

কুম্ভকার, বা কুমোররা নিতান্তই সাদামাটা জীবনযাপন করেন। কিছু ধর্মীয় আচার আচরণ ছাড়া তেমন কোন বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না। কুমোররা যেহেতু অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাই তাদের জীবনাচারে ও কর্মক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

কুম্ভকাররা সাধারণত বৈশাখ মাসে তাদের কাজ বন্ধ রাখে। প্রচলিত আছে শিব-পাবর্তীর বিয়ে উপলক্ষে প্রয়োজন হয়েছিলো দু'টি কুণ্ড (মতান্তরে আইহাড়ী)। তখন শিব তাঁর রুদ্রাক্ষ থালা থেকে দু'টি রুদ্রাক্ষ ছিঁড়ে নিয়ে বানালেন এক পুরুষ ও এক নারী। তারাই বিয়ের কুণ্ড তৈরি করে দিলো। এই পুরুষ ও নারী থেকেই কুম্ভকার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সেইজন্য বাঙালি কুমোরদের উপাস্য দেবতা 'শিব'। বৈশাখ মাসে কোন কোন অঞ্চলের কুমাররা চাকের উপর শিবমূর্তি বসিয়ে রাখে এবং পুরো একমাস কাজ করে না। এদের উপাধি রুদ্রপাল। আবার কোথাও বৈশাখ মাসে শুধু চাকের কাজ বন্ধ রাখেন কিন্তু হাতে তৈরির কাজ বন্ধ রাখেন না। তবে প্রায় সব কুমাররাই বৈশাখ মাসে চাক বন্ধ রাখেন। এই সময়টা তারা হাতের কাজ করেন। ঘর মেরামত করা, মহিলারা কাঁথা সেলাই করা এই ধরনের সাংসারিক কাজগুলো এই মাসেই করে থাকেন। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার পাইরুল গ্রামে রুদ্রপাল উপাধি ধারণকারী কারিগররা পাটি তৈরি করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম তারিখ থেকে চাকের কাজ শুরু হয়।

মৃৎসামগ্রী তৈরিতে পাল বা কুমার সম্প্রদায়ের কাছে 'চাক' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সম্প্রদায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 'পাইনশালা'। পাইনশালা বলতে মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর চুলাকে বোঝানো হচ্ছে। কুমার সম্প্রদায় এই চুলাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। রায়ের বাজার, বজরাপুর ও বিজয়পুরে 'পইন', কমখাপালং-এ 'মেইল্যা', অথবা 'পইনচারি'। এই পাইনকে ঘিরে তাদের কিছু নিয়মনীতি বা কুসংস্কার প্রচলিত আছে। চুলায় আগুন দেবার আগে কুমার সম্প্রদায় কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। রোদে শুকানো মৃৎশিল্প যখন পাইনশালায় আগুন দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন এর চতুর্দিকে ধূপ দেয়া হয়। একটি পানির পাত্রে সোনা-রূপা রেখে সেই পানি চুলায় ছিটিয়ে দেয়। চুলার এক কোণে উঠান ঝাড়ু দেয়ার 'পিছা' রাখা হয় যাতে চুলায় কারো কুদৃষ্টি না পড়ে। তাছাড়া ভাটা সাজাবার সময় খারাপ বা ফাটা জিনিসের দিকে চাওয়া যাবে না। বিশ্বাস করা হয় এতে নাকি ভাটার সব জিনিস নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। চুলার কাছে মেয়েদের যেতে দেয়া হয় না। বিভিন্ন প্রকার খেলনা, পুতুল, মাটির ব্যাংক ইত্যাদি রং করা হয। রং করার কাজে মহিলারাই বেশি অংশগ্রহণ করে থাকে। পাল সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে যে সব অবিবাহিত মেয়েরা মৃৎশিল্পে সিদ্ধহস্ত বিয়ের বাজারে তাদের কদর বা চাহিদাও বেশি। কেননা পরবর্তীতে তারা কাজে সহায়তা করতে পারবে এবং সংসারে দ্রুত উন্নতি হবে এমন সম্ভবনার কথাই তারা ভেবে থাকেন। নারী ও পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টাতেই এই শিল্প পরম্পরা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও এখনও গ্রামের লোকেরা বিশেষ করে নিরক্ষর লোকেরা মাটির পাত্রেই রান্না বান্না করে। তাদের পূর্বপুরুষেরা এসব মাটির পাত্রেই রান্না বান্না করত বলেই তাদের বিশ্বাস, এসব মাটির পাত্রে রান্না করা খাবার স্বাস্থ্যসম্মত। এমনি একজন ক্রেতা রুবিনা বেগম (২৫)। তার স্বামী কাউসার রাজমিস্ত্রির কাজ করে। গোহিল বাড়ি, মঙ্গলামোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জে তার বাড়ি। রুবিনা বলে তার স্বামী মাটির পাত্রের খাবারই বেশি পছন্দ করে। তাই সে নিয়ামিত মাটির পাত্রেই রান্না করে আসছে তার বিশ্বাস এতে খেলে নাকি খাবার হজম হয় ভাল। তাই অসুখ বিসুখ কম হয়।

পালপাড়ার সব মৃৎশিল্পীদেরই সকাল থেকে সন্ধ্যা কাটে মাটির সাথে আর তাই তাদের জীবনাচারও এই শিল্পকে ঘিরেই।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের কাজের বিষয় বৈচিত্র্য

Dhaka University Institutional Repository

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের কাজের বিষয় বৈচিত্র্য

মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। বাংলাদেশের লোকশিল্পের অন্যতম প্রাচীন ধারা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাঙলার যে পেশাজীবী সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তারাই কুম্ভকার বা কুমার নামে পরিচিত। কুম্ভকার শব্দটির আভিধানিক অর্থে কুম্ভ অর্থাৎ কলস সহ অন্য মৃৎমাত্র তৈরিতে যে কারিগর নিয়োজিত। কুম্ভকার বৃত্তি বা পেশা হল জাতিগত।

মৃৎসামগ্রী তৈরির জন্য সংগৃহীত মাটিকে পানি দিয়ে মেখে নরম করে, মাটি থেকে বাতাস বের করে নেয়া হয়। প্রয়োজনীয় মাটিকে কর্ম উপযোগী করে উপকরণ তৈরি করার পর তা শুকানো হয়। শুকিয়ে গেলে অলংকরণ করে অথবা রং করে কখনও বা কিছু না করেই মৃৎসামগ্রী পুড়িয়ে তা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ দেয়া হয় মাটি দিয়ে শুধুমাত্র ঘর-গৃহাস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেন না কুম্ভকাররা। সাধারণত যে সমস্ত জিনিস বা সামগ্রী পোড়ামাটির রূপে পাওয়া যায় তা হলোঃ

ক. গৃহস্থালির বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্রসহ অন্য আনুষঙ্গিক উপকরণ;

খ. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক উপকরণ যেমন বিভিন্ন ধরনের ঘট, প্রদীপ, উৎসর্গের হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি;

গ. পুতুল এবং খেলনা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিবিধ খেলান;

ঘ. বিশেষ প্রয়োজনভিত্তিক মৃৎপাত্র যেমন তন্দুরি রুটি তৈরি করার জন্য বিশেষ তন্ডুল, নৌকাযাত্রায় পানি সংরক্ষণের জন্য বৃহৎ আকারের ‘জালা’ বা মৃৎ আধার শষ্যজাতীয় জিনিস সংরক্ষণ করার জন্য ‘মটকা’ ইত্যাদি;

ঙ. বাদ্যযন্ত্রের কাঠামো যেমন মৃদঙ্গ বা খোল, তবলা, আদিবাসী নাচের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

চ. গৃহসজ্জার বিভিন্ন সামগ্রী মাটির তৈরি দেখা যায়। এর মধ্যে টালিও অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়াও মূর্তি বা প্রতিমা পোড়ানো না হলেও ভালভাবে শুকিয়ে নেয়া হয় এবং রঙের প্রলেপ দিয়ে তা দৃষ্টিগ্রাহী ও নান্দনিক করে তোলা হয়।

বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় মৃৎশিল্পের কাজ হয়ে থাকে। স্থানভেদে কাজের ধরনে তেমন পরিবর্তন না থাকলেও কুম্ভকারদের প্রস্তুতকৃত শিল্প সামগ্রীতে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে।

ঠাকুরগাঁও জেলায় অধিকাংশ কুমোরদের বাড়ি মাটির তৈরি। ধারণা করা হয় যে, মাটি সহজলভ্য হওয়ায় কুমার পাড়ার প্রায় সব বাড়িই মাটির তৈরি এই জেলার কুমার সম্প্রদায়ের মানুষ মাটি দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করেন। যেমনঃ পূজার বা বিয়ের ঘট, প্রদীপ, সানজাল (ধূপদানি), ব্যাংক, ডুকি (লোটা ধরনের পাত্র), দইয়ের ছোটো পাতিল, কারেন্ট জালের শিকল, পোনা (ঝাজড়ি), ফুলের টব, তোয়া (কড়াই ঢাকনা),

পশুন (হাড়ির ঢাকনি), হাড়ি পাতিল, মাটির সানকি প্রভৃতি। খেলনার মধ্যে আছে বাঘ, সিংহ, গন্ডার, হাতি, পুতুল, ঘোড়া, বাচ্চা কোলে পুতুল, দেবতা, গণেশ প্রতিমা, ফুলদানি, ঘোড়ায় চাড় যোদ্ধা প্রভৃতি।

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের কুমাররা তৈরি করতেন মিডা বা গুড়ের বড়ো বড়ো কলসি। বর্তমানে পিঠার খোলার জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের খোলার মান উৎকৃষ্ট। কারণ এই অঞ্চলের মইনা মাটিতে এমন উপাদান রয়েছে যা দিয়ে উন্নতমানের পিঠার খোলা তৈরি হয়। শীত ছাড়াও কোরবানি ঈদে খোলার চাহিদা বেশি থাকে। তখন চিতল পিঠা, খোলাজা পিঠা, আটার রুটি, চালের রুটি বানানো বা সেকার জন্য মাটির খোলা বা তাবা ব্যবহৃত হয়। পিঠার খোলার চাহিদা বেশি থাকায় বর্তমানে উত্তর আঁধার মানিক ও দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামে পিঠার খোলা তৈরি হয়। এখানকার তৈরি পিঠার খোলা বৃহত্তর নোয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়।

সিরাজগঞ্জের মৃৎশিল্পীরা দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ে থাকেন। যদিও প্রতিমা নির্মিত হয় মূলত মৌসুমভিত্তিক। শিল্পীরা সাধারণত পূজার মৌসুমেই দেব মূর্তি বা প্রতিমা গড়ে থাকে। এই প্রতিমাগুলোর সাথে জড়িয়ে থাকে হিন্দু ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় ভাবনা। মৃৎশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে লাভ বেশি প্রতিমা তৈরিতে। প্রতিমার রয়েছে প্রচুর জনপ্রিয়তা।

প্রতিমা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ জেলার মৃৎশিল্পীগণ হাড়ি, পাতিল, কলসসহ সাধারণত সবকিছুই তৈরি করে থাকেন। যেমনঃ হুলোই বা মালসা, কুয়ার চাক, ফুলের টব, বিভিন্ন ধরনের ও আকৃতির তাওয়া (পাঁচ তাওয়া, তিন তাওয়া), ছোট বড় আকৃতির চাড়ি (নাদা), সড়া, ঢাকুন, ঢুকসা, ধূপ দেয়ার ধূপচি, মুড়ি ভাজা ঝাঁঝড়, লালিগুড় রাখা পাত্র, টুপো, দই রাখার মালসা, মঙ্গলপ্রদীপ (খুড়ি), বিভিন্ন আকৃতির ঘট, খেলনা পুতুল, বিভিন্ন আকৃতির মাটির ব্যাংক প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের মৃৎপাত্র তারা তৈরি করেন।

লক্ষ্মীপুর জেলার লোকসংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে মাটির বাসন যা স্থানীয়ভাবে 'মাডিয়া হানক' নামে পরিচিত। এখানকার মৃৎশিল্পীরা কুমোর নামে পরিচিত। কুমোরপাড়াতে মাডিয়া হানক ছাড়াও হাঁড়ি-পাতিল, মটকি, কলস, বদনা, বইয়াম, মুচি বাতি, আগুনের বোশি প্রভৃতি গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করেন। এছাড়া পুতুল ও বিভিন্ন ধরনের খেলনা গরু, ঘোড়া, পাতিল, হাঁস-মোরগ, টিয়া, চড়ুই,বাঘ, হাতি, ব্যাংক ইত্যাদি তৈরি করেন।

নরসিংদী অঞ্চলের মৃৎশিল্পের একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ছিল যা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। একসময় 'চাক' মৃৎসামগ্রী তৈরির প্রধান অবলম্বন হলেও বর্তমান প্রজন্ম চাকের ব্যবহার ভুলতে বসেছে। চাক ছাড়াই, সাঁচের মাধ্যমে নারী মৃৎশিল্পীরা বড় কলসি, হাঁড়ি, পাতিল, ধুপতি, ব্যাংক, ছোট কলসি, মুচি, বড় পাতিল, খেলনার ঠুলি, সরা, ঝাঁঝর, তাওয়া, ভাপা পিঠার সাঁচ, নকশি পাতিল, ঘটি, মটকি, রাইঙ্গ (বড়-মুখওয়ালা পাতিল), দইয়ের হাঁড়ি (এক থেকে দশ কেজির) ছোট বড় ঘটি, টোপা, ঘট, শিশুদের হাঁড়ি পাতিল, বড় কলস, ছোট কলস, কলসি কাঁখে বঁধূ, বালতি, পেয়ালা, বাটি তৈরি করে থাকেন। সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী ছাড়াও ঘর সাজানোর শোপিস, কলসি কাঁখে পুতুল, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, টিয়া, ঈগল, ময়না পাখি,

Dhaka University Institutional Repository

ছোট পাখি, মোরগ, মাছ, বানর, পুতুল (নারী ও পুরুষ), বড়-মাঝারি আকারের পুতুল, ফুলসহ ফুলদানি ইত্যাদি চল্লিশ রকমের খেলনা তৈরি করে থাকেন। নরসিংদী জেলার শিবপুরে জসরবাজার গ্রামের মৃৎশিল্পীরা ছোট আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি আবার কামরাব গ্রামে অনেক বড় আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি তৈরি হয়ে থাকে।

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মুলাডুলি গ্রামে বেশ বড় পাল পাড়া রয়েছে। এরা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য্য জিনিস তৈরি করে থাকেন। যেমন কলস, চাড়ি, দই এর বাটি। মালসা, ঝাজর, ছাবনা, সানকি, ফুলের টব তৈরি করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খেলনা এবং হিন্দুদের বিভিন্ন পূজার জিনিসপত্র সহ নানা ধরনের মূর্তিও তৈরি করে থাকেন।

যশোরের শাখারী পাড়া (দেয়াপাড়া) গ্রামের মৃৎশিল্পীরা মাটির হাঁড়ি, মাটির কলস, মাটির মালসা, মাটির সরা, মাটির কোলা, মাটির নান্দা, মাটির চাড়ি, মাটির ব্যাংক প্রভৃতি প্রধান। পয়সা জমানো পাত্র হিসেবে মাটির ব্যাংক বেশ জনপ্রিয়। বিভিন্ন আকৃতিতে তৈরি হয় ব্যাংক। মাছ, মোরগ, পাখি, তাল, আম, বেল, কুমড়া, নাড়িকেলসহ সুদৃশ্য মাটির ব্যাংক বানিয়ে এগুলোতে আবার রং তুলির আঁচড়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। মৃৎশিল্পীরা মনের মাধুরী মিশিয়ে দেবী, দুর্গা, মা কালী, শিক্ষার দেবী সরস্বতী, ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীসহ নানা দেব-দেবী মূতি, নান্দনিক কারুকার্যে শোভিত বড় ফুলদানী তৈরি করে থাকেন। প্রাচীন কাল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরিতে মাটির চাড়ি বা রিং ব্যবহার হতো। তৎকালীন সময়ে চাড়ি তৈরি করে পরিবেশ সচেতনতায় বিশেষ অবদান রেখেছিল মৃৎশিল্পীরা। এছাড়া বাঘারপাড়া উপজেলার দিয়াড়া, আব্দুল বাড়িয়া, দোহাকুলো ও দরাজহাটি গ্রামের পালদের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো হাঁড়ি, ঢাকনা, শানকি, ভাড় বা ঠিলা, পিঠে বানানো খোল, পিঠা বানানোর ছাঁচ, ধুনচি ইত্যাদি।

রাজবাড়ীর কুমররা আগে ভাত তরকারি রান্নার জন্য হাঁড়ি-পাতিল, পানি রাখার কলসি, পিঠা বানানার জন্য খোলা, ছাঁচ ইত্যাদি তৈরি করত। বর্তমানে হাঁড়ি-পাতিল, কলসি, তৈরির পাশাপাশি পুতুল, দেব-দেবীর মূর্তি, নকশা করা পাতিল, ঘর সাজানোর উপকরণ, খেলনা পুতুল, রঙিন ফুলদানি, ফুলের টব, ছাইদান, বড় ঘট (মটকা), ছোট ঘট (পূজায় ব্যবহৃত হয়), গামলা, চারি কুলা, কুইনো, ডাবল, ঝাঝর, ছাবনা, খোলা, তাওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের খেলনা ফলমূল, পুতুল তৈরি করেন।

মাগুরার সদর উপজেলার বরই পালপাড়ায় অতীতে মাটির হাঁড়ি পাতিলসহ বিভিন্ন তৈজসপত্র মূল উৎপাদিত দ্রব্য হলেও, বর্তমানে আধুনিক রং এর ছোঁয়া ও ডিজাইনের ফুলদানী, কলমদানী, মশার কয়েলদানী, পুতুলসহ বিভিন্ন ধরনের শো পিস ও বাহারী পণ্যর প্রচলন বেড়েছে। এছাড়া উৎপাদন শৈলীতে একইভাবে লেগেছে রূপান্তরের ছোঁয়া। মাগুরায় সদর উপজেলার পালদের তৈরি মৃৎসামগ্রীর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

গাইবান্ধার প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কুমারপাড়া আছে। গাইবান্ধা অঞ্চলে কুমোরদের পাল বলা হয়। এখানকার পালদের তৈরি থালা, হাঁড়ি, পাতিল, কোলা, চাড়া, বাট, বাটনা, সরপোষ, নকশি হাঁড়ি, মুড়ি ভাজার চালুনি, পূজা পার্বণে চেরাগ জ্বালানোর ডিয়ার, গ্লাস, কলস পিঠা তৈরির ছাঁচ, ধান ভিজানোর কোলা, গুড় রাখার

Dhaka University Institutional Repository

কোলা, ধানের বীজ রাখার কোলা, মাটির প্রদীপ ক্রেতার সন্তুষ্টি ও মুগ্ধতা দুটোই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও জেলার বেশিরভাগ কুমারদের বাড়ি মাটির তৈরি। ধারণা করা হয় ভালো মাটি এখানে সহজলভ্য হওয়ায় কুমার পাড়ার সবার বাড়িই মাটির তৈরি। ঠাকুরগাঁও জেলার কুমার সম্প্রদায়ের মানুষ মাটি দিয়ে যে সকল শিল্পসামগ্রী তৈরি করেন সেগুলো হচ্ছে পূজার বা বিয়ের ঘট, প্রদীপ, সানজাল (ধূপদানি), ব্যাংক, ডুকি (লোটা ধরনের পাত্র), দুইয়ের ছোট পাতিল, কারেন্ট জালের শিকল, পোনা (চজাড়ি), ফুলের টব, পাট, স্পব, তোয়া (কড়াই ঢাকা), পশুন (হাঁড়ির ঢাকনি), হাঁড়ি পাতিল, মাটির সানকি প্রভৃতি। এছাড়াও বাঘ, সিংহ, গন্ডার, হাতি, পুতুল, ঘোড়া, বাচ্চা কোলে পুতুল, দেবতা, গণেশ প্রতিমা, ফুলদানি, ঘোড়ায় চড়া যোদ্ধা প্রভৃতি খেলনাসামগ্রীও তৈরি করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের পালেরা হাঁড়ি-পাতিল, খোলা, তাওয়া, সরপোশ, সানকি, প্রেসার কুকারের খোলা (প্রেসার কুকার বসানোর ফাঁকা একটা পাত্র), ঢাকুন, মাছ ধুবার পাত্র, দৈ, এর কাতারি, ধূপচি, ঘট, ছোট প্রদীপ, গ্লাস, কোপট্যা, ভাঁড়, দেউনি, ব্যাংক ছোট, বড়, মাঝারি ধরনের টব, ন্যাদ (গরুকে খেতে দেবার পাত্র), দীপাধার, ছাইদানী, কলমদানী, চারি, ফুলদানী ইত্যাদি তৈরি করেন। এছাড়াও আধুনিক জীবনে ঘর সাজানোর জন্য মাটির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী যেমন প্রজাপতি, পাখি, ফুলদানী, আবার খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখার জন্য নানা ধরনের ফল যেমন–আম, জাম, কামরাঙা, আপেল, কমলালেবু, কলাও তৈরি করেন। এগুলো ছাড়াও মাটির তৈরি নানা রঙের ছোট ছোট সব পুতুল যেমনঃ মা-মেয়ে, বর-বধূ, প্রেমিক-প্রেমিকা, রাধা-কৃষ্ণ, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী-নারায়ণ, ময়ূর প্রভৃতি দৃষ্টি নন্দন জিনিস মধ্যবিত্ত সমাজে বহুকাল থেকেই ব্যবহার্য। মৃৎসামগ্রীর মধ্যে তাওয়া বা খোলা, ঢাকনা, প্রেসার কুকারের তাওয়া, দৈ এর কাতারি বা ডাবগার চাহিদা বেশি। মাটির খোলা চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনপ্রিয় লোকখাদ্য কালাইয়ের রুটি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে এই খোলা বিক্রিও হয় বেশি। কেননা এই লোকখাদ্য কালাইএর রুটি তৈরির জন্য আধুনিক কোন পাত্র ব্যবহার করা যায় না। একমাত্র খোলা ব্যবহার করেই এই লোকখাদ্য উপাদেয় হয়ে ওঠে। এই পাত্র মুড়ি ভাজারও কাজে লাগে।

গোলাপগঞ্জ এর মৃৎশিল্পীরা কোলা, তাগারি, ছাবনা, বালিয়ান, জ্বালা, খোরা, হাঁড়ি, কুনো, ঘট বেশি তৈরি করেন। এছাড়াও বিভিন্ন পার্বণের আড়ংয়ে মাটির তৈরি গরু, ঘোড়া, হাতি, মাছ, ব্যাংক, আম, কাঁঠাল, তরমুজ, বাঙ্গি এখনও ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। কোটালীপাড়া উপজেলার হিরণ, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বাজুলিয়া গ্রাম খেলনা মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। সদর উপজেলার বড় ডোমরাপুরের শিল্পীরা মাটির মূর্তি নির্মাণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার রামভদ্রপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম কার্তিকপুর। মৃৎশিল্পের জন্য এই গ্রামের সুখ্যাতি যুগ-যুগান্তরের। গ্রামের পালরা মাটি দিয়ে বাসন-কোসন, হাঁড়ি, পাতিল, বদনা, মটকা, কলস তৈরি করলেও, বর্তমানে এদের কাজে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। মাটির আধুনিক পণ্য তৈরির জন্য ৩টি ফ্যাক্টরি রয়েছে। এখানে তৈরি হয় মাটির টেরাকোটা, টাইলস্, মোমদানি, ফুলদানি, ফুলের টব, নাইট

ক্যান্ডেল, কয়েন বক্স, সিনারি ওয়াল প্লেট, ক্যাকটাস টব, ওয়াল প্লাস্টার, ওয়াল টব, কলমদানি, ভিজিটিং কার্ড বক্স, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নেইটি বেইটি হাউজ, মা মেরির মূর্তি, ক্রিসমাস হ্যাংগিং রিংসহ অন্তত তিনশ ধরনের শো পিস।

কুমিল্লার বিজয়পুর মৃৎশিল্পের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ৫৫ বছরের বেশি সময় ধরে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। দেশে বিদেশে এখানকার মৃৎশিল্পীদের হাতের তৈরি মাটির হাঁড়ি, পাতিল,বাটি, বদনা, মটকা, প্রদীপ, ছাইদানী, গেলাস, সানকি, ঘড়া, কল্কি, গামলা, জলাবিড়া, জটধুসি, জলকান্দা, চুনপাত্র, সরাই, দুধের হাঁড়ি, ফুলদানী, মালসা, থালা পানের বাটা, সন্ন্যাসীর গাড় খেলনা, কলস, মুবঘট, লক্ষ্মীঘট, আয়োঘট, পূজারঘট, দোয়াত বৈয়াম, দুধ সানার পাত্র, লক্ষ্মীসরা, মটকা, কাজলবাটি, নাদা তবলার বায়া, মৃদংগ নাল, পাখোয়াজের মাটির খোল, গাছা প্রদীপ, দইছোবা, ক্রোকারিজ, শো পিচসহ অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন মৃৎশিল্পসামগ্রী অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ মৃৎশিল্পসামগ্রী প্রয়োজনের সাথে সাথে, আকৃতি ও রঙের রকমফেরে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বৈচিত্র্যময় এই মৃৎশিল্পসামগ্রী বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মতো নামের যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি অকৃতিগত পার্থক্যও চোখে পড়ে। মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে আকার আকৃতিতে একই অঞ্চলেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মৃৎসামগ্রী ছড়িয়ে আছে সে সব থেকে কিছু সামগ্রীর বর্ণনা দেয়া হলো–

হাঁড়ি বা পাতিল

অতি পরিচিত একটি মৃৎপাত্র হচ্ছে হাঁড়ি। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের যেমন একে দেখা যায় তেমনি নামেও দেখা যায় ভিন্নতা। হাঁড়ির উপরের অংশ তুলনামূলক প্রশস্ত বা বিস্তৃত এবং নিচের অংশ উত্তল হয়। হাঁড়ি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই অনুযায়ী নামকরণও করা হয়, যেমন রান্নার হাঁড়ি, ঝাঁঝরি হাঁড়ি, মঙ্গল হাঁড়ি, দইয়ের হাঁড়ি ইত্যাদি। হাঁড়ি রান্নার কাজে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিয়ে, পূজা-পার্বণে, সামাজিক অনুষ্ঠানে (মিষ্টি, পিঠা নেয়ার জন্য) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সখের হাঁড়িকে জায়গাভেদে দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক) রাজশাহী অঞ্চলের লাল রংয়ের সখের হাঁড়ি, রং চোখ জুড়ানো সুন্দর। লাল, গোলাপী, হলদে কিংবা গাঢ় পোড়া মাটির রংয়ের গায়ে মিহিন কাজ, মানুষী ফিগার কিংবা জ্যামিতিক নকশা। কোন কোন হাঁড়িতে লাল দ্বিতীয় রং হিসেবে ব্যবহৃত হয় হাঁড়ির গা-ও লাল। এই লালের ওপর লাল অদ্ভুত আমেজ আনে, অনেকটা ভাস্কর্যের মতন। রাজশাহী অঞ্চলের সখের হাঁড়ির ঐতিহ্য এসেছে পাহাড়পুর থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত পাহাড়পুরের পটারী ভালোভাবে পোড়ান লাল কিংবা হলদেটে সবুজে, তার ওপর লাল মাখান পাটির মতন করে কিংবা তলা বাদে সারা জমিন জুড়ে। প্রায় সকল পাত্রের তলা ভারি, ভেতরটা ছড়ানো। মনে হয় ঐ রীতিই বহমান এখনো, সখের হাঁড়ির গড়ন ও রং লাগানো তারই ইঙ্গিতবহ।

খ) ঢাকা-ময়মনসিংহ-কুমিল্লা অঞ্চলের হাঁড়ির পাত্র হলদেটে রংয়ের, বেগুনি আভাওয়ালা লালচে খয়েরি কালি দিয়ে আঁকা। দ্বিতীয় রংয়ের ব্যবহার নেই কিংবা কম। কোন কোন হাঁড়ি বেশি পোড়ানোর দরুন ঈষৎ সবুজ কিংবা গোলাপী সাদা কিংবা ঈষৎ ছাই-ছাই। আবার মধ্যে মধ্যে সাদা আস্তর। নরম তুলি দিয়ে নকশা আঁকা, রং কালো থেকে সোপিয়া, তার থেকে লালচে ব্রাউন চোখে শান্তি এনে দেয়। এই অঞ্চলের হাঁড়ির ঐতিহ্যের উৎস ময়নামতী। ময়নামতির পটারী ফ্যাকাশে লাল ও সাদাটে নরম, নমনীয় আধপোড়া। প্রায় সব পটারীর ওপর লালের প্রলেপ মাখান। পটারী কারুকাজ খচিত। বাঁকা নকশাভর্তি। অন্যতম নকশা পদ্মফুলের। ময়নামতির শেষ পর্যায়ে পটারীর নকশা কমে এসেছে। পটারীতে এসেছে হালকা হলুদের ছোট নক্সা। এই পর্যায়ের পটারী ভালোভাবে পোড়ান, গা পুরু, গড়ন সুন্দর। ঢাকা-ময়মনসিংহ-কুমিল্লা অঞ্চলের কুমাররা ঐ রীতিতে কাজ করছেন এখনো।

হাঁড়ি নিয়ে প্রবাদ প্রবচনেরও প্রচলন রয়েছে। যেমন ‘হাটে হাঁড়ি ভাঙা’, ‘হাঁড়ির খবর’। ঘরকন্নার কাজের সাথে সাথে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানেও হাঁড়ি স্বরূপে আর্বিভূত হয়। লৌকিক শব্দকোষে কামিনীকুমার রায় জানিয়েছেন যে ডেগ, ডেকচি, টউ, পাতিলা, বগুনা (বগনো), তোলো, তিজেল, পাতিল, ডখি, রাইন, আতলা, মালসা, জ্বালা সবই হাঁড়ি পর্যায়ভুক্ত।

কলস

লোকজীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি মৃৎশিল্পসামগ্রী কলস। কলসের অবকাঠামো কিছুটা হাঁড়ির মত। কলসের উপরের খোলা অংশ বা মুখ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কান্দা বা গলা কিছুটা খাড়া ও লম্বা আকৃতির হয়। তবে নিচের অংশ অনেকটা হাঁড়ির মতো গোলাকার হয়। তৈরির পদ্ধতিও হাঁড়ির মতো। এই কলস কুম্ভকারগণ দুই অংশে তৈরি করে থাকেন। উপরের অংশ চাকে করা হয় এবং নিচের অংশ ছাঁচে করে নিয়ে পরে জোড়া দেয়া হয়। এই মৃৎপাত্র অনেক ক্ষেত্রে কলসি নামেও পরচিত। অঞ্চলভেদে এর নাম ও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যেমন কলস, কলসি, ঘড়া, ঘট, ঠিলা, ঠিলি, ঠেল্যা নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে আকারের ক্ষেত্রেও তারতম্য দেখা যায়। কুম্ভ ও কলসিও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। কলসির বাইরে গোলাকার অংশ বরাবর অনেকসময় অলংকরণ করা হয়। কলস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পানি রাখার কাজে ব্যবহার হলেও গুড় ও রস রাখাসহ মঙ্গল কলস আচার-অনুষ্ঠানেও ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাওয়া

তাওয়া সরল আকৃতির মৃৎপাত্র। এই পাত্র অনেকাংশে চাকতির চাকাতির মতো দেখতে। হাতে তৈরি হয় এই মৃৎপাত্র। রুটি ভাজার কাজে তাওয়া ব্যবহৃত হয়। রুটি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার পিঠা তৈরিতে তাওয়ার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

খোলা

খোলা অনেকটা মালসা আকৃতির হলেও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কড়াইয়ের মতো বাঁকানো হাতলও থাকে। খোলা মুড়ি ভাজার কাজেই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষ অন্যান্য কাজেও ব্যবহৃত হয়।

সরা

'ধরাকে সরা জ্ঞান' প্রবাদ প্রবচনের এই সরা বাংলাদেশের রমণীদের কাছে বহু ব্যবহৃত ও অতি পরিচিত একটি মৃৎসামগ্রী। গোলাকার এবং নিচের অংশ কিছুটা উত্তল আকৃতির। সরা তৈরি করার জন্য ছাঁচের প্রয়োজন হয়। প্রথমে মাটি প্রস্তুত করে পরিমাণ মত মাটি নিয়ে ছাঁচের উপর রেখে হাতের কৌশলে সরা তৈরি করা হয়। সরা তৈরির জন্য পিটনিরও প্রয়োজন হয়। হাঁড়ি ও কলসির ঢাকনা হিসেবে সরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর এই মৃৎসামগ্রীটি পূজা-অর্চনাতেও ব্যবহৃত হয়। পুজোর নৈবেদ্য দেওয়ার জন্য যে সরা ব্যবহার করা হয় তা 'পূর্ণপাত্র'। ছোট ছোট সরাকে 'মুচি-সরা' বলে। শ্রাদ্ধ কাজে যেমন মুচি-সরা তেমনি মৃত অশৌচে 'প্রেত-সরা' ব্যবহৃত হয়। যে সরাতে আবার ধুনো দেওয়া হয় তা 'ধূপ-সরা'; আর শিশু জন্মানোর সময় আচারে যে সরা লাগে তা 'আঁতুড়-সরা' বা 'ফুল-সরা' বলে। বিয়েতে যে সরা লাগে তা 'এয়ো-সরা'। রঙিন রঙে রঞ্জিত সরা প্রয়োজন বিশেষ ব্যবহার করা হয়।

লক্ষ্মীর সরার গঠন এবং বিষয় ভেবে দেখবার মতন। সরার আকারে স্পেস সীমিত, এই সীমিত স্পেসে নির্দিষ্ট বিষয় চিত্রিত। ডিজাইনে দুটি মূল উপাদান চোখে পড়ে প্রথম হচ্ছে সরার চক্রাকার গঠন, দ্বিতীয় হচ্ছে ফর্মের মধ্যকার গড়ানো ঢেউ। চক্রাকার গঠনের মধ্যে গড়ানো ঢেউয়ের নিয়ম মেনে ফিগারগুলি চিত্রিত। মূল বিষয় লক্ষ্মীর ফিগারে, পেঁচার ফিগারে ঢেউয়ের মতন, গড়ানো ঢেউয়ের ভাবের জন্য ফিগারগুলি মনে হয় ভাগে চোখে, একই সঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে ধরা দেয়। তার দরুন কম্পোজিসনের ভাবরূপ সরার চক্রাকার গঠন এবং গড়ানো ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি করা। তুলির কৌণিক পুনরাবৃত্তি শাড়ির ভাঁজ, উত্তোলিত দুই বাহু, পেঁচা সব মিলে যায়, এভাবে চক্রাকার স্পেসের মধ্যে ছন্দ তৈরি হয়, সেই ছন্দে সংক্রমিত হয় ফিগারগুলি, আবার ফিগারগুলি চক্রাকার ছন্দে আবদ্ধ সরার গঠনে।

পাতিল

পাতিল তৈরি করতে সাধারণত চাক ব্যবহার করা হয়। কখনও কখনও ছাঁচ ও হাতের সাহায্যে করা হয়। কুম্ভকাররা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির পাতিল তৈরি করে থাকেন যেমন ছোট, মাঝারি, বড়। পাতিল সাধারণত রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীও রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মালসা

মালসা ছাঁচেই তৈরি হয়ে থাকে। এই মৃৎপাত্র অনেকাংশে অর্ধবৃত্ত আকৃতির। মুড়ি ভাজার খোলাও অনেক জায়গায় মালসার মতো দেখতে। উপরের খোলা অংশ বিস্তৃত হয় এবং ক্রমশ সংকুচিত হয়ে নিচের উত্তল অংশের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও দৈনন্দিন কাজে কিছু রাখা আবার মাছ ধোয়া এমন কাজেও মালসার ব্যবহার দেখা যায়।

চাড়ি

মালসার বড় আকারটিই চাড়ি নামে পরিচিত। ছাঁচে অর্থাৎ শক্ত মাটির ঢিবির উপর নরম মাটি পিটনা দিয়ে পিটিয়ে এই মৃৎপাত্র তৈরি হয়। পুরুত্ববিশিষ্ট এই পাত্রের উপরের কিনারা অপেক্ষাকৃত আরও মোটা হয়। ছাঁচে তৈরির পর আলাদা মাটির প্রলেপে কিনারা বা ধার তৈরি করা হয়। গরুর খাবার দেওয়া, ধান ভেজানো ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়।

ঘট

পাল সম্প্রদায়ের মৃৎশিল্পীদের একটি অংশ ঘট তৈরি করে থাকে। ঘট তৈরির জন্য আঠালো কাদা প্রয়োজন হয়। ভালো ঘট তৈরি করার জন্য মাটি সংগ্রহ করার পর রৌদ্রে শুকিয়ে গুঁড়া করে চালনি দিয়ে ঝাড়া হয়। এরপর পানি দিয়ে আঠালো করে রুটির মতো বেলে, বালি মাখিয়ে খণ্ড খণ্ড করে প্রয়োজন মতো ছাঁচে ঢেলে নিতে হয়। অনেক শিল্পী ছোট চাকে কাদার তাল বসিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘটের আদল নিয়ে তারপর মূল আকৃতি দিয়ে থাকে। ঘট পূজার কাজে ব্যবহৃত হয়। পূজার ঘট সাধারণত লাল হয় এতে রাঙা মাটি ব্যবহার করা হয়।

মঙ্গলঘট

বিবাহ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আলপনা শোভিত মঙ্গলঘটের প্রচলন আছে। সম্পূর্ণভাবে চাকে তৈরি ঘটের প্রয়োজন ও ব্যবহারের নিরিখে নামের ভিন্নতা দেখা যায়। গঠনগত তারতম্যের জন্যও ঘটের আলাদা আলাদা নাম হয়। এর মধ্যে দ্বারঘট, দেবীঘট, ধর্মের ঘট, কার্তিক ঘট, মনসা ঘট বেশ পরিচিত। দ্বারঘটের নিচের অংশ কিছুটা সরু ধরনের, দেবীঘট উত্তল, আবার লক্ষ্মী ঘটের উপর লক্ষ্মী এবং গণেশ ঘটের উপর গণেশের অবয়ব থাকে। স্থান ও অনুষ্ঠানভেদে ঘটের নাম ও আকৃতির বিভিন্নতার তথ্য পাওয়া যায় কামিনীকুমার রায়ের লেখা ‘লৌকিক শব্দকোষ’ বইটিতে। যেমন দ্বারঘট কোনও শুভানুষ্ঠানে ঘরের বাইরে দ্বারের দুই পার্শ্বে আম্রপল্লব ও সশীর্ষডাব শোভিত জলঘট স্থাপন করা হয়। দেবীঘট যে ঘট পুজোর বেদীতে বা দেবতার মূর্তির সম্মুখে স্থাপন করা হয়। মঙ্গলঘট বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে স্থাপিত সুচিত্রিত ঘট। চিত্রিত ঘটের মধ্যে নাগঘট ও মনসাঘট সর্বাধিক অলংকৃত।

মটকা

মটকাকে কলসির বৃহদাকার বলা যায়। এই পাত্রে মূলত বেশি পরিমাণ খাদ্যবস্তু যেমন ধান, গম, চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যশস্য ও পানি মজুত রাখা হয়। উপরের অংশ কলসের চেয়ে বেশি খোলা এবং কানা বা গলা অংশটি অপেক্ষাকৃত নিচু, চাক ও হাতের সাহায্য নেওয়া হয় এই মৃৎপাত্র তৈরিতে। অঞ্চলভেদে এই মটকা জালা, কোলা, মেটে, জরে ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

কুঁজো

কুঁজো কলসেরই আর একটি রূপ। দৃশত এদের মধ্যে পার্থক্য গলা বা কানাতে। সাধারণ কলসের চেয়ে এর গলা তুলনামূলক লম্বা হয়ে থাকে। এই মৃৎপাত্রটি কালো ও লাল এই দুই রংয়েরই হয়ে থাকে। ছাঁচ ও চাকের যৌথ প্রক্রিয়ায় এটি তৈরি হয়ে থাকে। ছাঁচের সাহায্যে তৈরির জন্য অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন অলংকরণও দেখা যায়। বাংলাদেশে রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে কুঁজোর ব্যবহার দেখা যায়।

ফুলের টব

টব বাংলাদেশে অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত একটি মৃৎশিল্পসামগ্রী। বিভিন্ন আকৃতির এই শিল্পপণ্যটি ছাঁচেরই তৈরি হয়ে থাকে খুব স্বল্প সংখ্যক মৃৎশিল্পী একে চাকে তৈরি করেন। টব খুব ছোট থেকে প্রায় দু'ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে মৃৎশিল্পীরা গোলাকার ও চারকোণবিশিষ্ট টব তৈরি করে।

হাড়া

হাড়া মৃৎপাত্রটি তৈরির জন্য মাটিকে ভালভাবে পরিষ্কার করে নেয়া হয়। মাটি চাকের উপর রেখে হাতের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের হাড়া তৈরি করা হয়। হাড়াতে সাধারণত চাল রাখা হলেও গম, ধান, গুড়া ইত্যাদি রাখার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পিঠা তৈরির ছাঁচ

পিঠা তৈরিতে ছাঁচের ব্যবহার অপরিহার্য। তাওয়া আকৃতির পাত্রে পিঠা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অংশে ছাঁচের গর্ত তৈরি করতে হয়। এই গর্ত একাধিকও হয় যা ছাঁচের সাহায্যেই করা হয়। সংখ্যা হিসাবে এক খুপি, দুই খুপি, তিনি খুপি, চার খুপি, পাঁচ খুপি, ছয় খুপি, সাত খুপি পিঠের সরাও দেখা যায়। ওপরের ঢাকনা ওল্টানো সরা বা মালসা আকৃতির, যার মাঝখানে গোলাকৃতি ছোট ধরার হাতল আছে।

ব্যাংক

মাটির ব্যাংক কমবেশী সব পরিবারেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাঁচে বা চাকে তৈরি ঘট আকৃতির পয়সা রাখার পাত্রের উপরের আশ সরু হয়ে বন্ধ। একটু শুকিয়ে গেলে উপরের অংশে পয়সা ঢোকানোর জন্য পয়সার মাপ অনুযায়ী খানিকটা কেটে ফাঁকা করা হয়। ভিতরটা ফাঁপা থাকে। পোড়ানোর পর অনেকসময় আলাদা রঙের অলংকরণ করা হয়। ছাঁচের তৈরিতেও বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ দেখা যায়। বর্তমানে মাটির ব্যাংক বিভিন্ন

আকারের দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু, ফল, সবজি, বাড়ির আকারের ও মাটির ব্যাংক দেখা যায়। কোথাও একে লক্ষ্মীর ভাঁড়ও বলা হয়।

প্রদীপ

যে সকল গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি সেখানে প্রদীপই ভরসা। প্রদীপের কিছু অংশ ছাঁচে এবং কিছু অংশ চাকে তৈরি হয়। প্রদীপ লম্বা আকৃতির গাছাযুক্ত। প্রথমে চাকের উপর মাটি নিয়ে প্রদীপের উপরের অংশটুকু তৈরি করা হয় তারপর একইভাবে চাকে গাছা তৈরি করা হয়। কখনও বা সম্পূর্ণ প্রদীপটিই ছাঁচে তৈরি হয়। হাতে বা অংশত ছাঁচে তৈরি এই সামগ্রীর এক দিক সরু আকৃতির হয় সলতে ব্যবহারের জন্য। তেল রাখার জন্য আঙুলের কৌশলে তৈলাধার তৈরি হয়। স্বর্ণকারদের ব্যবহারের জন্য যে প্রদীপ তৈরি হয় তা স্বর্ণপ্রদীপ নামে পরিচিত। আবার অনেক জায়গায় একই প্রদীপের নিচে জলের আধারসহ জলপ্রদীপও তৈরি হয়। প্রদীপের মুখও অনেকসময় একাধিক হয়। যেমন চারমুখ বিশিষ্ট, বা পাঁচমুখবিশিষ্ট।

ধূপদানী

ধূপ থেকেই এসেছে ধূপদানি শব্দটি। পালদের চাকেই তৈরি হয় এই মৃৎসামগ্রী। উপরের অংশ বাটির মতো গোলাকার গর্তযুক্ত। নিচের অংশ চিকন লম্বাটে এবং ভিত্তি একটু বড় ও গোলাকার যেন দুটি অংশ বসানোর সময় উপরের অংশের সাথে ভারসাম্য ঠিক থাকে। এতে ধরার জন্য একটি হাতলা থাকে। বড় ধূপদানি দুই অংশে তৈরি করা হয়। চাকে বাটি ও ভিত্তি আলাদা আলাদাভাবে তৈরি করে একটু শক্ত জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় পিটানো পদ্ধতিতেও ধূপদানি তৈরি করা হয়।

কলকে

কলকে মাটির তৈরি। অনেকটা কলকে ফুলের মতো। সম্ভবত কলকে ফুল থেকে এর আকৃতি দেয়া হয়েছে। এটা কুম্ভকারগণ চাকে তৈরি করে এবং শক্ত বলে গায়ে বাঁশের টুলস দিয়ে নকশা করে থাকে। গ্রামেই কলকের ব্যবহার দেখা যায়।

কাঠি

জালে ব্যবহার করা হয় কাঠি। কাঠি হাত দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। হাতের দুই আঙুল দিয়ে সুন্দর করে তৈরি করে বাঁশের খিল দিয়ে ছিদ্র করে নেয়া হয়। জালে ব্যবহৃত হওয়ায় জেলেদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কাঠি।

দইয়ের হাঁড়ি

দইয়ের হাঁড়ি বর্তমানে ছাঁচে তৈরি হলেও আগে চাকেই তৈরি হতো। রোদে শুকানোর পর অন্যান্য পাত্রের মতোই পুড়ানো হয়ে থাকে।

ছাঁচ

পালপাড়া গুলোতে বর্তমানে ছাঁচের আধিক্য লক্ষ্যণীয়। কোন বস্তু একই আকৃতির অনেক সংখ্যক উৎপাদনের জন্য ছাঁচ ব্যবহার করা হয়। ছাঁচ সাধারণত লোহা, পিতল, সিমেন্ট, কাঠ ছাড়া তৈরি হয়। কুম্ভকারগণ মাটি দিয়ে ছাঁচ তৈরি করে শুকিয়ে জলভাবে পুড়িয়ে নেন।

এই ছাঁচ তৈরির পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকে একই আছে। মৃৎপাত্র তৈরিতে যেমন ছাঁচ ব্যবহার করা হয় তেমনি কিছু কিছু ছাঁচে আবার পিঠার উপর নকশা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তৈজসপত্র

মাটির তৈরি থালা, বাটি, গ্লাস আগে গ্রামের সাধারণ মানুষ ব্যবহার করলেও এখন সেটা শহরের শৌখিন মানুষের কাজে আদরণীয় হয়ে উঠছে। এই শৈখিন দ্রব্যগুলো ছাঁচের সাথে সাথে ক্ষেত্রবিশেষ চাকেও তৈরি হয়ে থাকে।

খেলনা, পুতুল

লোকজীবনে মাটির তৈরি পুতুল আর খেলনায় যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। পুতুল হাতে তৈরি হয় আবার ছাঁচেও করা হয়। হাতে টিপে টিপে পুতুল তৈরি হয় তাকে টেপা পুতুল বলে। খেলনা সাধারণত ছাঁচের মাধ্যমেই বানানো হয়। বানানো হয়ে গেলে ভালো করে শুকিয়ে পোড়ানো হয় সবশেষে রং করা হয়ে থাকে। খেলনার মধ্যে হাতি, ঘোড়া, পাখি, মাছ, ময়ূর, নৌকা, বাড়ি, বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন আম, কাঁঠাল, কামরাঙা, আতা, কলা ইত্যাদি, খেলনা হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করা হয়ে থাকে। গ্রাম বাংলার সব মেলাতেই এই খেলনাগুলো পাওয়া যায়।

হাতি ঘোড়া

হাতি-ঘোড়া দেবদেবীর থানে উৎসর্গ করার একটি প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। ঢাকার অদূরে সাভারে ঘোড়া পীরের মাজারে যেমন মানত করা ঘোড়া দেয়া হয়। এছাড়াও শহরের শৌখিন মানুষের কাছে সমাদর লাভে সক্ষম হয়েছে টেরাকোটা হাতি, ঘোড়া। এগুলো ছাঁচে এবং হাতে তৈরি হয়ে থাকে। একেবারেই ছোট হাতি ঘোড়া হাত দিয়েই তৈরি করা হয়ে থাকে। কখনও আবার হাতি ঘোড়ার কিছু অংশ ছাঁচে আবার কিছু অংশ হাতে করা হয়। পোড়ানোর পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কালো রংয়ের হাতি-ঘোড়াও দেখা যায়।

তুলসীমঞ্চ

তুলসী গাছসহ তুলসীমঞ্চ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বেশ একটা জায়গা করে আছে। তুলসীমঞ্চের আকার গঠনবৈচিত্র্য ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা থাকলেও মূল অবয়বে মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা যায়। তুলসীমঞ্চ চারকোণ, ছয়কোণ, আটকোণ বা গোলাকৃতি হলেও চারকোণ ও গোলাকৃতি বেশি চোখে পড়ে। তুলসীমঞ্চের বাইরের গায়ে পোড়ামাটির শিল্পকাজ দেখা যায়। ফুল, লতা-পাতা, পাখিসহ অন্য জ্যামিতিক অলংকরণ যেমন দেখা যায় তেমনি আল্পনাও থাকে আবার কখনও সম্পূর্ণ অলংকরণ বর্জিত অবস্থাও দেখা যায়।

টালি

ঘরের চালা বা ছাউনির জন্য পোড়ামাটির টালির ব্যবহার বহুদিনের। সচরাচর টালি ছাঁচে তৈরি হলেও কোথাও কোথাও বল-প্রেস যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও তৈরি করা হচ্ছে। টালি বাড়ির ছাদে বেশি ব্যবহৃত হলেও মেঝেতে, দেয়ালে টাইলস হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সাতক্ষীরার কলারোয়াতে উন্নতমানের টালি তৈরি হয় যা কিনা দেশের চাহিদা পূরণ করে ইউরোপের বাজার দখল করেছে।

বাংলাদেশের সর্বত্র মৃৎশিল্পের বৈচিত্র্যময় সম্ভার ছাড়িয়ে আছে। পরিচিত মৃৎসামগ্রী যেমন আমরা হাতের নাগালেই পাই তেমনি অঞ্চল ভেদে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৃৎশিল্পসামগ্রীও দেখা যায়। যেমন তান্দুরি রুটির জন্য তন্ডুল, বা তন্দুল, মাটির উনুন, প্রদীপ দানি, টালি, পাতকুয়ার বেড়, টব, বনসাই টব, জালের কাঠি, মৃদঙ্গ বা খোল। তবলা, ঝাঁঝারি হাঁড়ি ইত্যাদি নানা সামগ্রী অঞ্চলভেদে তৈরি হয় এবং বৃহত্তর জনজীবনের চাহিদা মেটায়। ব্যপ্তি ও গুরুত্বে মৃৎশিল্প তাই অনন্য। আর এই শিল্পের শিল্পীদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ

Dhaka University Institutional Repository

পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ

শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ধারা আজও বহমান। আর এই বয়ে নিয়ে চলার কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করে চলেছে বংশ পরম্পরার মৃৎশিল্পী কুমার সম্প্রদায়রা বা কুম্ভকাররা। গ্রামবাংলার সমাজচিত্রে কুম্ভকার এক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী। কুম্ভকার বা কুমোরদের কাজের সাথে সমাজ সংস্কৃতির চাহিদাও সম্পৃক্ত হয়ে আছে। মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরির কাজের মধ্যে যেমন পরম্পরার সাংস্কৃতিক অবস্থা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপস্থিতি রয়েছে ঠিক তেমনি নতুন শিল্পকৌশল আয়ত্ব করে বৃহত্তর বাণিজ্যিক স্বার্থেও তার ব্যবহার হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প অতীত ঐতিহ্যকে ধারণ করার সাথে সাথে আমাদের লোকশিল্প জগতকে করেছে সমৃদ্ধশালী। তাই এই শিল্পের শিল্পীদের জীবন-যাপন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, চাওয়া পাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানা এবং সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসাটা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর এসব জানাতে হলে শিল্পীদের সাথে সরাসরি কথা বলার বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের সাথে কথোপকথন থেকে কয়েকজন মৃৎশিল্পীর বক্তব্য ও তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হলো –

হরিভক্ত পাল (৭২) গ্রাম উত্তর বাগদিয়া, ইউনিয়ন কলসকাঠি, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। স্ত্রী স্বরস্বতী পাল। বাবা আশ্বিনী পাল, মা মৃত ফুলমালা পাল। চার ছেলে এক মেয়ে। ছেলেমেয়েরা সবাই বিবাহিত। পরিবারের আটজন সদস্য এই কাজের সাথে জড়িত। মেয়ে জড়িত নেই। চাক ও হাতের সাহায্যে কাজ করেন। একসময় বিভিন্ন ধরনের মৃৎসামগ্রী তৈরী করলেও বর্তমানে ঢোলানো পাতিল, নার্সারীর চারার টালি (ছোট টব) তৈরি করেন। ১৩-১৪ বছর বয়স থেকে এই কাজের সাথে জড়িত। নার্সারীর টবের চাহিদা বেশি হওয়ায় সেটাই বেশি তৈরি করেন। প্রতি ২ মাসে তিনবার মাল পোড়ান। নার্সারীর টালি একবার পোড়াতে (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) ৮০০০ টাকা আর মুড়ি ভাজার পাতিল তৈরিতে ৫০০০ টাকা খরচ হয়। আনুমানিক ছয়-সাত হাজার টাকা লাভ থাকে যা দিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটান। আয়-ব্যয় সমান হওয়াতে লাভের খাতাটা শূন্যই থাকে। ছেলেমেয়েরা বংশ পরম্পরার পেশায় আসতে আগ্রহী নন, কারণ :

ক. আর্থিক অসচ্ছলতা,

খ. নিরাপত্তার অভাব

গ. এই শিল্পের আর্থিক মূল্যমান কম।

Dhaka University Institutional Repository

এ বছরই প্রতিবেশীদের মধ্যে ৭টি পরিবার ইন্ডিয়া চলে গিয়েছে। বর্তমানে এই পেশার শ্রম প্রবণতা ও নিষ্ঠা কমে গেছে, তাই মৃৎশিল্পের মান নিম্নমুখী। বিপণনের ক্ষেত্রে সাহায্য প্রয়োজন।

সমীর পাল (৪৬) গ্রাম মদনপুরা, বাউফল, পটুয়াখালী, স্ত্রী সীমারাণী পাল (৩৯) বাবা মৃত সুবলপাল। মা গীতারানী পাল (৬০)। আগে গৃহস্থালীর তৈজসপত্র তৈরি করলেও বর্তমানে আধুনিক শৌখিন সামগ্রী তৈরি করেন। ফুলদানী, ওয়ালফুলদানী, কলমদানী, এস্ট্রে, ছত্রিশ পিসের ডিনার সেট, প্লেট, গ্লাস, ফিরনির বাটি, তরকারি এবং ডালের বাটি, মগ, জগ, কয়েলদানী, কারি বোল, স্যুপ বোল, ম্যাগনেট ফুলদানী, পা ঘষা বাসন, ইত্যাদি তৈরি করেন। শিল্পী সমীর পাল শৈশব থেকেই এই কাজের সাথে জড়িত। স্বামী-স্ত্রী বাদে ৬ জন কারিগর এই কাজের সাথে যুক্ত আছেন। এই শিল্পীর মোটর হুইল আছে চারটি। মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরি করতে ব্যবহার করেন নদীর পাড়ের এঁটেল মাটি। এক নৌকা মাটি পনের হাজার টাকা, এতে দুইশত মন মাটি ধরে। একবার পইন জ্বালাতে ৪০ মণ কাঠ প্রয়োজন, প্রতিমণ কাঠ ১১০ টাকা। এই শিল্পীর নির্দিষ্ট ক্রেতা আছে শাহাবুদ্দিন, শংকর পশ্চিম ধানমন্ডি আর একজন মালেক, রায়ের বাজার, ঢাকা। দুইজন ক্রেতাই ৫০,০০০ টাকা করে ১০,০০০ টাকার মৃৎশিল্পসামগ্রী কেনেন প্রতি মাসে। শিল্পী সমীর পাল (১৫-২০) % লাভ ধরে দাম নির্ধারণ করেন।

বাজার চাহিদা ক্রমশ: হ্রাস পাওয়ায় এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলেও সে অনুপাতে লাভের অংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই সমীর পাল বলেন ভালো সুযোগ পেলে অন্য পেশায় যুক্ত হতে আগ্রহী। শিল্পী সরকারের কাছে হ্রাসকৃত সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পেতে চান। সরকার থেকে বিদেশে মৃৎশিল্পসামগ্রী রপ্তানীর উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে মনে করেন এই শিল্পী। আয়-ব্যয় সমান, সঞ্চয় বলে কিছু নেই। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক।

স্বপন পাল (৪২) বাবা মৃত নারায়ণ চন্দ্রপাল, মা তরঙ্গীনি পাল (৯০) স্ত্রী জোছনা রানী পাল (৩০) চার ছেলে। সবাই পড়াশোনা করে। অবসর সময়ে তিনজন কাজ করেন। চাক, হুইল এবং হাতে টিপে শিল্পসামগ্রী তৈরি করেন। আগে অনেক কিছু তৈরি করলেও বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী মালসা ও ঢাকনা তৈরি করেন। নির্দিষ্ট ক্রেতা আছেন। মো. জহির রামপুরা, ঢাকা। বাতেন সর্দার নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, আলামিন মুড়াপাড়া, ঢাকা। মাখন পাল লাঙ্গলবন্দ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, শিল্পী স্বপন পালের নিয়মিত ক্রেতা।

মৃৎশিল্পী স্বপন পাল তার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট তার সামাজিক অবস্থান নিয়েও সন্তুষ্ট। কম-বেশি সারা বছরই কাজ করে থাকেন। তিনি মনে করেন মার্কেটে চাহিদা বাড়ানোর জন্য প্রচার প্রচারণার যেমন প্রয়োজন তেমনি দরকার সরকারি উদ্যোগ এবং সুদবিহীন ঋণ।

বিমল পাল (৬৩) স্ত্রী ছবিরানী পাল (৫৬)। বাবা মৃত রশিক পাল, মা মৃত মনোবালা পাল। ১৩-১৪ বছর বয়স থেকেই এই কাজের সাথে আছেন। বর্তমানে ছেলে, ছেলের বৌ সহ চারজনই তারা এই কাজের সাথে জড়িত। চাক ও হাতের সাহায্যেই মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। বিষখালী নদী পাড়ের মাটি তিনি ব্যবহার করে থাকেন। দৈনন্দিন ব্যবহার্য মৃৎসামগ্রী উৎপাদন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিমল পালের নির্দিষ্ট ক্রেতা আছে। উত্তম পাল, টঙ্গী, ঢাকা, আঃ রহমান, মিরপুর, গোলার ঘাট, পালপাড়া, ঢাকা। শেখ বাবুল, রায়ের বাজার, ঢাকা। শতকরা ৭-৮ টাকা লাভে উৎপাদিত পণ্য তৈরি ও বিক্রি করে থাকেন। আয়-ব্যয় সমান সমান হওয়াতে সঞ্চয়ের খাতা শূন্যই থেকে যায়। মাসে ১.৫০ লক্ষ টাকার মৃৎসামগ্রী বাকিতে বিক্রি করেন। ক্রেতা পর্যায়ক্রমে টাকা দিয়ে থাকে তবে কোন ক্রেতাই অগ্রীম পাওনা পরিশোধ করে না। অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট এই শিল্পী। মৃৎশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রচার-প্রচারণার বিকল্প নাই বলে মনে করেন।

হরিপদ পাল (৪৭), স্ত্রী শৈলবালা পাল (৩০)। শৈশব থেকেই এই কাজের সাথে জড়িত আছেন। ঠাকুরগাঁওয়ের এই শিল্পীরা দইয়ের ছোট পাতিল, ডুকি (লোটা ধরনের পাত্র), হাঁড়ি-পাতিল, তোয়া (কড়াই ঢাকা), পশুন (হাঁড়ির ঢাকনি), মাটির সানকি। ফুলের টব, পাট, স্পব, পূজার বা বিয়ের ঘট, প্রদীপ, সানজাল (ধূপদানি), ব্যাংক ডুকি ইত্যাদি। খেলনার মধ্যে বাঘ, সিংহ, গন্ডার, হাতি, ঘোড়া, বাচ্চা-কোলে পুতুল, দেবতা, গণেশপ্রতিমা, ফুলদানি, ঘোড়ায় চড়া যোদ্ধা, বিভিন্ন ধরনের ফল প্রভৃতি তৈরি করেন। শিল্পী চাক, ছাঁচ এবং হাতের সাহায্যে এই মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন।

শিল্পীর বসত বাটি মাটির তৈরি। মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে এবং মেঝেতেও মাটির প্রলেপ। এই অঞ্চলের পালপাড়ার সবার বাড়িই মাটির তৈরি। টাঙন নদী থেকে আবার কখনও রামরায় দীঘির পাশের দয়ারবালি থেকে মাটি কিনে আনেন। আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুন্নত।

শ্রীলক্ষণ রায় মালাকার (৬৭) প্রতিমা শিল্পের সাথে জড়িত। বংশ পরম্পরায় এই কাজ করছেন। অত্যন্ত ধৈর্য্য ও শৈল্পিক গুণসম্পন্ন হয় এই শিল্পীরা। কয়েকটি ধাপে তৈরি করা হয় প্রতিমা। যেমন প্রাথমিক কাঠামো দান, চূড়ান্ত আকৃতি দান, রঙ দেয়া এবং সাজসজ্জা।

শিল্পী শ্রী লক্ষণ রায় তার এই শিল্প পেশা নিয়ে সন্তুষ্ট। শিল্পী অর্থ এবং সম্মান দুটোই আছে এই কাজে।

হারাধন পাল (৫০) স্ত্রী সাবিত্রী পাল (৪২)। নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার কামরা গ্রামের এই শিল্পীরা তাদের সব ধরনের মৃৎশিল্পসামগ্রীই ছাঁচের মাধ্যমে করে থাকেন। এই শিল্পী হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, দইয়ের হাঁড়ি এক থেকে দশ কেজির সরা, ঝাঁঝর, তাওয়া এইসব ঘর গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শৌখিন শিল্পসামগ্রী যেমন ফুলদানি, ফুলসহ ফুলদানি, ছোট-বড় পুতুল, খেলনা হাতি, ঘোড়া, পাখি ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন।

শিল্পী জানান নরসিংদী জেলার কামরাব গ্রামে অনেক বড় আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি তৈরি হয় আবার শিবপুরের জসরবাজার গ্রামের মৃৎশিল্পীরা ছোট আকৃতির দইয়ের হাঁড়ি তৈরি করেন। এখানকার শিল্পীরা মৃৎপাত্রে নকশার মধ্যে দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য যেমন, ধানের ছড়া, ফুল, লতা-পাতা, ইত্যাদি নকশাই করে থাকে। ফুল, লতা-পাতা, সুখ-সমৃদ্ধি, ধানের ছড়া ঐশ্বর্য ও জীবন বিকাশের প্রতীক হিসেবে

নকশা করেন। বেলাব উপজেলায় শিল্পীরা ডাইস অথবা চাকের মাধ্যমে মৃৎশিল্প তৈরি করেন। নরসিংদীতে মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরীর ক্ষেত্রে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

সুরেশ চন্দ্র পাল (৭২) ফেনীর দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের নামকরা কুমার। বিভীষণ চন্দ্র রুদ্রপালের কাছেই প্রথম মাটির কাজ শেখেন। ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

শিল্পী তার কর্মজীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন বাবার কাছে প্রথম কাজ শেখেন। প্রথম দিকে ছোটো দইয়ের পাতিল তৈরি করলেও পরবর্তীতে হাঁড়ি, পাতিল, বড়ো কলসি, প্রদীপদানী, সিদ্ধির কলকি সহ অন্যান্য জিনিস তৈরি করেন। শিল্পী বলেন, বৃন্দাবনী হুঁকা ছিল নামকরা হুঁকা। তখনকার সময় অভিজাত শ্রেণির লোকজন এই হুকায় তামাক খেতেন। এখন থেকে ২২-২৩ বছর আগে বিডিআর-এর হাবিলদার মোহাম্মদ আলীকে তিনি বৃন্দাবলী হুঁকার জন্য মাটির কলকি তৈরি করে উপহার দিয়েছিলেন। হাবিলদার মোহাম্মদ আলী জগন্নাথ দিঘি বিডিআর ক্যাম্পে বদলি হয়ে আসলে পর সুরেশ চন্দ্র পালের কাছ থেকে মাটির কলকি কিনে নিয়ে যান।

ফেনীর উত্তর মানিক গ্রামে মাটির খোলা তৈরি করা হয় পিঠা বানাবার জন্য। শীত ঋতু ছাড়াও কোরবানি ঈদে খোলার যথেষ্ট চাহিদা থাকে। তখন চিতল পিঠা, খোলজা পিঠা, চালের রুটি, আটার রুটি বানানো ও সেকার জন্য মাটির খোল বা তাবার ব্যবহার বেড়ে যায়। এছাড়া মিঠার (গুড়) কলস, জলের কলস তৈরি হতো। এক একটি গুড়ের কলসে ১ মন ৫ সের গুড় রাখা যেত। এখন কলসের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক নয় বলে জানালেন শিল্পী সুরেশ চন্দ্র পাল।

গোপী কৃষ্ণ পাল (৬৩) স্ত্রী বিজলী রানী পাল (৫৫) বাবা মৃত কুন্তল কৃষ্ণ পাল, মা কুলবালা। লক্ষ্মীপুরের এই শিল্পী ২ ধরনের পাতিল, সরা, ঝাঁঝড়, জোড় ঘট, পুতুল, পাখি, ব্যাংক এই ধরনের আরও অনেক কিছু তৈরি করে থাকেন। পরিবারের ছয় জন সদস্য এই মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরির কাজে সম্পৃক্ত।

অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি। শিল্পী মনে করেন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে আরো ভালো করা সম্ভব।

শ্যামপদ পাল (৬০) স্ত্রী অনন্ত রানী পাল (৫৫) মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরিতে চাক ও সাঁচের ব্যবহার করে থাকেন। এই শিল্পীরা হাঁড়ি, পাতিল, কলসসহ ফুলের টব, কুয়ার চাক, বিভিন্ন আকৃতির তাওয়া (পাঁচ তাওয়া, তিন তাওয়া), সরা, ঢাকুন, ঢুকসা, হুলোই বা মালসা, ছোট-বড় আকৃতির চাড়ি (নাদা), লালিগুড় রাখা পাত্র, মুড়ি ভাজার ঝাঁঝড়, দই রাখার মালসা, বিভিন্ন আকৃতির মাটির ব্যাংক টুপো, খেলনা পুতুল, ধূপ দেওয়া ধূপোচি, বিভিন্ন আকৃতির ঘট, মঙ্গলপ্রদীপসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা রকমের মৃৎপাত্র তারা তৈরি করে থাকেন। কাজের চাপ বেশি থাকলে কারিগর নিয়ে থাকেন সহযোগী হিসেবে।

পূজার মৌসুমে দেব মূর্তি বা প্রতিমা তৈরি করে থাকেন। প্রতিমা নির্মাণ মূলত মৌসুমভিত্তিক। প্রতিমার সাথে জড়িয়ে রয়েছে হিন্দু ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় ভাবনা। সিরাজগঞ্জের এই মৃৎশিল্পী জানান মৃৎশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে

বেশি লাভ প্রতিমা তৈরিতে। প্রতিমার রয়েছে প্রচুর জনপ্রিয়তা। সিরাজগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় মৃৎশিল্প তৈরি হলেও শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ সদর উল্লেখযোগ্য স্থান।

সুকুমার পাল (৪৭) নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার জসর গ্রামের একজন প্রতিমা শিল্পী। এই গ্রামে চার-পাঁচ পুরুষ ধরে বসবাস করছেন। তার পূর্ব-পুরুষরা প্রতিমা শিল্পের সাথে জড়িত ছিল। বাবা রাজকুমার পাল দুর্গা প্রতিমা তৈরি না করলেও কালী ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমা তৈরি করতেন। ১০/২১ বছর বয়সে বাবার কাছে কালী ও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমা তৈরির হাতে খড়ি হয়। বাবার কাছে প্রতমিা তৈরির কাজ পুরোপুরি রপ্ত করার পর দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ শেখেন। বর্তমানে প্রতিমা শিল্পী ওস্তাদ গৌরাঙ্গ পালের প্রধান কারিগর হিসেবে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। তার তত্ত্বাবধায়নে চার-পাঁচজন কারিগর কাজ করে। তিনি দুর্গা, কালী, শীতলা লক্ষ্মী, মহাদেব, রাধঅকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারায়ণ, বিষ্ণু, গণেশ ইত্যাদি প্রতিমা তৈরি করেন।

তার স্ত্রী বাসনা রানী পাল পদ্মফুলের মধ্যে লক্ষ্মী পেঁচার উপর লক্ষ্মী, সরা, সাতনাগ, নয় নাগ, মনসার প্রতিমা তৈরি করেন। শিল্পী জানান এই কাজে যথেষ্ঠ সম্মান আছে।

শংকর পাল (৭০), স্ত্রী অনিমা রানী পাল। ১৫ বছর বয়স থেকে এই শিল্পের সাথে আছেন। হাতে টিপে মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। নিতান্তই নিরূপায় হয়ে এই পেশায় যুক্ত আছেন। অত্যাধিক পরিশ্রম কিন্তু সে অনুপাতে আয় কম হওয়াতে শিল্পী হতাশাগ্রস্ত। সরকারি সাহায্য আশা আশা করেন এই শিল্পী।

মধুসূদন পাল (৪৫), স্ত্রী মিনুরানী পাল (৪০) প্যাডেল হুইল-এর সাহায্যে এবং হাতে টিপে মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। ব্যাংক, খেলনা, হাঁড়ি, পাতিল, ফুলের টব, নার্সারির চারা লাগানোর টালি, কড়াই, পাতিল (মুড়ি ভাজার জন্য) এগুলোই বেশি তৈরি করে থাকেন। মৃৎসামগ্রী তৈরিতে নদীর পাড়ের এঁটেল মাটি ব্যবহার করেন।

এই শিল্পীর নির্দিষ্ট ক্রেতা নেই। মোট খরচকে বিবেচনায় রেখে দাম নির্ধারণ করেন। তবে দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে কখনও কখনও লোকসানে বিক্রি করেন। সাথে আনুমানিক দশ হাজার টাকার মৃৎসামগ্রী বিক্রয় করেন চার-পাঁচ হাজার টাকা লাভ থাকে যা দিয়ে সংসার চালান। অন্য কাজ না জানা থাকায় অনন্যোপায় হয়েই এই পেশায় যুক্ত আছেন।

প্ল্যাস্টিক, মেলামাইন, সিলভারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে। শিল্পী মধুসূদন পাল মনে করেন, মাটির তৈরি দ্রব্যাদির ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত দিক এবং অন্যান্য বিষয়াদি উল্লেখ করে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে চাহিদা বৃদ্ধি করলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বলরাম পাল (৬১), স্ত্রী প্রতিমা পাল (৫৩) পশ্চিম মহেশপুরের এই শিল্পী মাটির ব্যাংক, জলবিড়া, ঝুড়ি সরা, টালি, পটারীসহ বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরি করেন।

শিল্পী জানান, একদিকে মাটির জিনিসপত্রের দাম কম, অপরদিকে মাটি সংগ্রহ, জ্বালানি দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ও বিক্রয়ের সঙ্গে মিলে না থাকায় পাল সম্প্রদায় প্রতিনিয়ত ঋণের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা তৈরি এবং সরকারি অনুদান পেলে তা তাদের এই শিল্পকর্মের সহায়ক হতো বলে মনে করেন শিল্পী।

নিত্য নন্দন পাল (৬৯), স্ত্রী সবিতা পাল (৬০), বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠি ইউনিয়নের এই শিল্পী ফুলদানী, ছবির স্ট্যান্ড, বিভিন্ন ধরনের ঘর সাজানো ওয়ালম্যাট, মাটির গহনা, মাটির শো-পিস ইত্যাদি তৈরি করেন। চাক ও হাতের সাহায্যে কাজ করেন।

শিল্পী নিত্যনন্দন পাল দুঃখ করে বলেন মাটির তৈজসপত্রের চাহিদা কমে যাওয়ায় কুমোরদের মধ্যে অনেকেই রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি চালানো এবং গার্মেন্টস শিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাছাড়া গ্রামের মানুষ শহর ও বিদেশমুখী হওয়ায় তাদের অবস্থা সচ্ছল এবং এই কারণে মৃৎশিল্পের ব্যবহার আরও কমে গেছে।

রনজীত কুমার মন্টু পাল (৫৬) খুলনার দিঘলিয়ার দক্ষিণ পালপাড়ার এই শিল্পী জানান আগে দিঘলিয়ার ৪ শত পাল পরিবার থাকলেও এখন মাত্র ৬০টি পরিবার এই পেশায় টিকে আছে। ভাদ্র, পৌষ, মাঘ মাসে শীতকালীন পিঠা-পুলি তৈরির কারণে এলাকাজুড়ে মাটির জিনিসের চাহিদা থাকলেও চড়া দামে মাটি ও জ্বালানী ক্রয়ের কারণে বিক্রয় মূল্যের সাথে সমতা রক্ষা হয় না। ফলে লোকসান গুনতে হয়।

শিল্পী রণজীত কুমার মন্টু পালসহ এখানকার অন্যরাও মনে করেন, পরিবারভিত্তিক ব্যাংক ঋণ ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এই মৃৎশিল্পকে এখনও আলোর পথ দেখাতে পারে।

সুরেন চন্দ্র পাল (৪৭)। গাইবান্ধা জেলার বোনারপাড়া এই শিল্পীর কাছ থেকে জানতে পারি, মাটির তৈজসপত্র বানাতে এখন আগের তুলনায় ৩ গুণ খরচ বেশি পড়ে। আবার বিক্রি করতে গেলে ঝামেলায় পড়েন চাহিদা কমের কারণে তার উপর সঠিক দামটাও পান না।

এই অঞ্চলের শিল্পীরা মাটির কলস, হাঁড়িপাতিল, শানকি, মালসা, বদনা, নান্দা (চাড়ি) পাতকুয়ো বা ইন্দারার রিং তৈরির পাশাপাশি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য মটকি, হাউদা, ধান সিদ্ধ করার পাত্র, গুড়ের ভাঁড় বা পাত্র, মাছ ধরার কুনো, শস্যবীজ সংরক্ষণের জন্য হাঁড়ি, হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা পার্বণের উপকরণ হিসেবে ঘট, দিয়া প্রভৃতি তৈরি করেন। একই সাথে নানা ধরনের পুতুলসহ খেলনা সামগ্রী ও ঘর সাজানোর অসংখ্য শৌখিন উপকরণ তৈরি করেন।

সুদান কুমার পাল (৪৫), বাবা মৃত বিজয় কৃষ্ণপাল, মা মৃত চম্পারানী পাল। পশ্চিম মহেশপুর নিবাসী এই শিল্পী হুইল, চাক এবং হাতে টিপে মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। আয়-ব্যয় সমান সমান। এই পেশায় লাভের মুখ না দেখলে সন্তানদের এই পেশায় আনবেন না। স্থানীয় মহাজন মধুসূদন পালই তার নির্দিষ্ট ক্রেতা।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী বর্তমানে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। এর মধ্যে আসা থেকে ৪০,০০০/- মহাজন থেকে ১,০০,০০০/- গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৩০,০০০/- ঋণ নিয়েছেন। মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে করে যাচ্ছেন শিল্পকর্ম, কিছুটা বংশপরম্পরার এই শিল্পকর্মকে ভালোবেসে কিছুটা নিরূপায় হয়ে।

মানিক কুমার পাল (৩৬), স্ত্রী লক্ষ্মী রানী পাল (২২)। বাবা কানাইচরণ পাল (৬৫), মা কমলা রানী পাল (৫৫)। পটুয়াখালীর বাউফলের এই শিল্পীরা বড় ফুলদানী দেয়াল ফুলদানী, কলমদানী, কয়েলদানী, মিনি ফুলদানী, ঘট, টব, কাপ পিরিচ, ৪২ /৬৫/৮২/৯৬/১০০ পিসের ডিনার সেট, কারিপাত্র, ঢাকনা বোল, গামলা, এস্ট্রে ইত্যাদি তৈরি করেন।

বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী পরিবারের এই চার সদস্য ছাড়াও আরও ৬ জন কারিগর কাজ করেন। কাজের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরদের (৫-১০) হাজার টাকা বেতন দিতে হয়। মোটরসেট সহ হুইল, হাতে চালিত হুইল ব্যবহার করেন। এই শিল্পীর নির্দিষ্ট ক্রেতারা হচ্ছেন হমায়ুন কবির, (ভোলা হ্যান্ডি ক্রাফ্‌টস, চাংখার পোল), সালেহ আহমেদ (শরিয়তপুর স্টোর), মো. শাহাবুদ্দিন (হেরিটেজ) ক্র্যাফট, শংকর, পশ্চিম ধানমন্ডি), নবাব আলী (বাংলার মাটি, শিশু একাডেমী)। ২০% লাভ ধরে মালামালের দাম নির্ধারণ করা হয়। মাসিক ১০-১৫ হাজার টাকা লাভ থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ভাল। শিল্পী সন্তুষ্ট।

শম্ভু পাল (৫৫)। ৭/৮ বছর বয়স থেকেই এই কাজের সাথে আছেন। এই শিল্পী বর্তমানে শুধু দইয়ের হাঁড়িই তৈরি করছেন। শিল্পী সাঁচ ব্যবহার করে না। চাকের মাধ্যমেই দইয়ের পাত্র তৈরি করেন। জিনজিরার মহাজন বিল্লাল তার নির্দিষ্ট ক্রেতা।

শিল্পী, মৃৎশিল্পী পরিবারগুলির মধ্যে সহযোগিতার খুব অভাব বোধ করেন। নিজ পেশায় সন্তুষ্ট। আবার উপায়ও নেই অন্যকিছু করার।

গৌরিপাল (৫০)। স্ত্রী কল্পনা পাল (৩৯)। নয়নগর পালপাড়ার এই শিল্পী হালিমের বাটি, দইয়ের হাঁড়ি ধুপ্তি এই ধরনের জিনিসই বেশি তৈরি করেন। চাকের সাহায্যে মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন।

সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো বললেন শিল্পী গৌরিপাল। নিজ পেশায় সন্তুষ্ট নন। অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা মোটামুটি।

নগেন পাল (৫৭)। মানিকগঞ্জ জেলার সানবান্দা গ্রামের এই শিল্পী জনান তার আদি নিবাস রামকৃষ্ণপুর গ্রামে ছিলো। হরিরামপুরের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম নদী ভাঙনের মুখে পড়লে এই অঞ্চলের শিল্পীরা রামকৃষ্ণপুর ছেড়ে সানবান্দা গ্রামে চলে আসেন। বৈশাখ মাসে কাজ করেন না। 'পালানি' বলে, এটি তাদের পূর্ব-পুরুষদের সংস্কার। একমাস পর বিশ্বকর্মা পূজা দিয়ে কাজ শুরু করেন। মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্র মাস মাটির কাজের উপযোগী তাই এই সময় কাজও বেশি হয়।

শিল্পী হাঁড়ি-পাতিল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পিঠার সাজ তৈরি করেন। চিতই পিঠার সাজ এবং ভাপা পিঠার সাজ আলাদা হয়ে থাকে। আবার কুলি পিঠার সাজ হয় অন্যরকম। তবে সবচেয়ে বেশি করেন দইয়ের পাতিল। ঢাকা থেকে মহাজন এসে তৈরি সামগ্রী নিয়ে যান।

হরিপদ পাল (৭৫)। শিল্পী বংশপরম্পরার এই শিল্পকে এবং নিজ পেশাকে ভালোবাসেন। তবে নিজের সন্তানদের এই পেশায় আনতে চান না। কারণ ঝুঁকি বেশি। পরিশ্রম অনুযায়ী অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নেই। শিল্পীর ভাষায় শিল্পী মন পরিতৃপ্ত কিন্তু আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটে না। মেলা তার আগের জৌলুস হারিয়েছে বলে মন খারাপ করলেন।

রবীন্দ্র মণ্ডল (৩৭) একজন প্রতিমা শিল্পী। এই শিল্পে একজন গুরুর সান্নিধ্যই কাজ শিখতে হয়। রবীন্দ্র মন্ডল এর ওস্তাদ হচ্ছেন দীলিপ পাল। সাত বছর বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে এখন নিজেই প্রতিমা গড়েন। বর্তমানে তিনি স্বাধীন প্রতিমা শিল্পী। বিগত ১৫ বছর ধরে টাকার বিনিময়ে প্রতিমা বানাচ্ছেন। কাজ অনুযায়ী উপার্জন হয় না, বছরে গড়ে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা থাকে। পেশা ছাড়াও অনিচ্ছুক এই শিল্পী বলেন টাকা না থাকুক সম্মান আছে, সুনাম আছে, যা অনেকের নেই।

শিল্পী রবীন্দ্র মন্ডল আরো বড় প্রতিমা শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখেন। প্রতিমা বানিয়ে আনন্দ পান এই শিল্পী। বলেন 'খুব ভক্তি করে বানাই যাতে মা রুষ্ট না হয়। সব দেব-দেবীকেই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। মা যদি সদয় থাকে আমি একদিন বড় শিল্পী হবো।'। বছরের যে সময়টাতে প্রতিমা গড়ার কাজ থাকে না সেই সময়টাতে দেয়াল লিখে, ব্যানার লিখে, আল্পনা এঁকে যা পান তাই দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্বাহ করেন।

বাদল দাস (৪৭) প্রতিমা শিল্পী। এই শিল্পী বংশ পরম্পরার শিল্পী নন অর্থাৎ তিনি পাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন। নরসিংদীর এই শিল্পী বিক্রমপুরের প্রতিমা শিল্পী শান্তি পালের কাছে কাজ শেখেন। নিজ এলাকার বাইরে কিশোরগঞ্জ, শিবপুর, ঘোড়াশাল, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ আরও অন্যান্য জেলায় গিয়ে প্রতিমা তৈরি করে দেন। এক সেট দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে তার সময় লাগে দশ দিন।

প্রতিমার মধ্যে দুর্গা ছাড়াও কালী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, মনসা, বিশ্বকর্মা, লক্ষ্মীর মূর্তি তৈরি করেন। এছাড়াও খেলনা হাতি, ঘোড়া, পুতুল, চীনা পুতুল, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি তৈরি করেন। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল।

প্রদীপকুমার পাল (৪৮), স্ত্রী প্রতিমা পাল (৩৯) শরীয়তপুরের এই শিল্পীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আছে 'মসীর মৃৎশিল্প' নামে। ভাই সমীর কুমার পাল ভারত চলে গেছেন, সেখানেই থাকেন। সেখান থেকে বিভিন্ন বিদেশি ডিজাইন সংগ্রহ করে পাঠালে সে অনুযায়ী তার পণ্য তৈরি করে থাকেন। ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের অর্ডার অনুযায়ী বছরে প্রায় ৩০/৪০ লাখ টাকার কাজ করে দেন।

ব্যবসায়ী এই মৃৎশিল্পী আক্ষেপ করেন, শিল্পপণ্যের সঠিক মূল্য পান না বলে। যেমন ১ ফিট মাপের একটি নাইট ক্যান্ডেল (পরী) তৈরি করতে মাটি, শ্রমিকসহ খরচ পড়ে ৬০ টাকা কিন্তু বিক্রি করে ৭৫ টাকায়। এই

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পপণ্যটিই ঢাকায় বিক্রি হয় আড়াইশ-তিনশ টাকায়, বিদেশে ২০ ডলারে। অন্যান্য শিল্পপণ্যরও একই অবস্থা। মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছেই বন্দী হয়ে আছে মৃৎশিল্পীরা। সরকারিভাবে বিপণন ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো বলে মনে করেন।

দীলিপচন্দ্র পাল (৫৯) স্ত্রী রেনুকা পাল (৫৩)। এই মৃৎশিল্পী আগে হাঁড়ি, পাতিল, কলসের মতো গৃহস্থালী তৈজসপত্র তৈরি করলেও বর্তমানে খেলনা, মোমদানি, ফুলদানি, শেপিস ধরনের মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। মানুষের পছন্দের পরিবর্তন হওয়াতে তারাও চেষ্টা করছেন পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে। তাদের কাজের চাহিদা, এবং জনপ্রিয়তা থাকলেও সঠিক দামটা পাচ্ছেন না। পুঁজির অভাবে বিদেশে রপ্তানি করতে পারছেন না আবার বংশ পরম্পরার এই পেশাকেও ছাড়তে পারছেন না।

সনাতন পাল (৬৫) মাগুরার সদর উপজেলার বরাই গ্রামের মৃৎশিল্পী। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৃৎসামগ্রী তৈরি করছেন। তাদের তৈরি মৃৎশিল্পসামগ্রীর আধুনিক নকশার কারণে জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তাদের তৈরি ফুলদানি, কলমদানি, মাটির আম, কলা, কামরাঙা, কানের দুল, গলার সেট, মাটির ব্যাংক, পূজাসহ বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হয়। মাগুরা ও আশেপাশের জেলায় অনুষ্ঠিত মেলায় বিশেষ করে বাবুখালি, বুনাগাতি, মহম্মদপুরের বড়ুলিয়া, ঝামা, পলাশবাড়িয়া, শালিখার আড়পাড়া, শ্রীপুরের বরিশাট, সদরের গাংনালিয়াসহ বিভিন্ন গ্রামে শীত ও ঈদকে কেন্দ্র করে যেসকল মেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মৃৎসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়। এছাড়াও মাগুরা শহরের দুর্গা পূজার ঠিক একমাস পরে অনুষ্ঠিত কাত্যায়নি পূজা উপলক্ষে আয়োজিত একমাস ব্যাপী কাত্যায়নী মেলায় আধুনিক মানের এই মৃৎ পণ্য বিপুল পরিমাণে বিক্রি হয়ে থাকে। এই চাহিদার জন্য ছেড়ে যাওয়া অনেক মৃৎশিল্পী আবার নিজ পেশায় সানন্দে ফিরে এসেছেন। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণে, জীবন যাত্রার মানেও ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তির মেশিন ব্যবহৃত হওয়ায় মৃৎশিল্পে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। হুইল মেশিনে মাটি দ্বারা তৈরি খেলনা বিক্রি করে অনেকেই প্রচুর লাভবান হচ্ছেন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে তারা বিদেশেও তাদের তৈরি মৃৎসামগ্রী পাঠাতে পারতেন বলে মনে করেন।

হরিপদ পাল (৬৫)। বংশ পরম্পরায় প্রতিমা শিল্পী। শিল্পী হরিপদ পাল নানা ডিজাইনের খেলনা পুতুল, ছাইদানি তৈরি করেন। এছাড়া শিল্পীর তৈরি দুর্গা, শিব-পার্বতী, কালী, কৃষ্ণ-অর্জুন মূতি শাঁখারি বাজার কালী মন্দিরে সংরক্ষিত আছে। হরিসভা পুরাতন মন্দিরে তাঁর তৈরি গৌর, নিতাই, রাধাকৃষ্ণর মূর্তি রয়েছে। রাজারবাগ কালীমন্দিরে বিড়দেশ্বরী কালী মূর্তির দু'পাশে তাঁর দু'টি অশুর শম্ভু ও নিশম্ভু মূর্তি শোভা পাচ্ছে। মূর্তিগুলো দেখলে শিল্পীর মেধা, শ্রম আর ভালোবাসা উপলব্ধি করা যায়।

সাভার থানার শিমুলিয়া গ্রামের এই সাধক শিল্পীর আছে নিজস্ব জীবন দর্শন। তাঁর মতে মাটি ও পানি হচ্ছে জীবন, উর্বরতা ও সজীবতার প্রতীক। তাইতো এই শিল্পকর্মের মধ্যে তিনি জীবনকে অনুভব করেন। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই বলে তিনি মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অমূল্যচন্দ্র পাল আনুমানিক ১৩৪২ /১৩৪৩ সালে ঢাকার পাথালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জিতেশ্বর পাল। এই শিল্পীর জন্ম পাথালিয়া গ্রামে হলেও প্রথমে ধামরাই, পরবর্তীতে কাগজিপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শুরুতে হাঁড়ি-কলসি, ছাইদানি, খেলনা ব্যাংক বানালেও পরে ডিজাইন করে জিনিস বানাতে শুরু করে।

অমূল্যচন্দ্র পাল প্রথম মাটির স্মৃতিসৌধ তৈরি করেন। সাভার স্মৃতিসৌধের কাছে তার দোকান দেখে কাকরানের আরও কয়েকজন পাল এখানে দোকান বসায়। খেলনা, মাটির ব্যাংক, ফুলদানি, ছাইদানি তখনই প্রথম ছাচে বানানো শুরু হয়। ওয়ালপ্লেট বানানোর পর হাতি, ঘোড়া, টেরাকোটা টাইলস-এর নতুন নতুন ডিজাইন করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে এই মেধাবী শিল্পী ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেল মধুসূদন, শরৎচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, গৌতমবুদ্ধ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শিশু, রাধাকৃষ্ণ কুলার মধ্যে সরস্বতী, একতারা হাতে বাউল, বৌ চলছে গরুর গাড়ি, লাঙল কাঁধে কৃষক, তাজমহল বানিয়ে ফেলেন।

শিল্পীর উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পগুলো হচ্ছে জয়নুল আবেদিনের ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের ছবি, বাংলাদশের মানুচিত্র, মুক্তিযোদ্ধা, মৎস্য কন্যা, টিয়া, পাখি, গরুর গাড়ি, পালকি, ছনের ঘর, ইত্যাদি।

শিল্পী শাস্ত্র বিষয়েও বেশ জ্ঞান রাখেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান, কবিতা লেখেন। বিচারগান করেন।

সন্ধ্যা রানী পাল এর সাক্ষাৎ মেলে মিরপুর গোলারটেক পালপাড়ায়। যদিও এই পালপাড়ার শুধু নামটুকুই আছে। সন্ধ্যা রাণী পাল জানান তার স্বামী হরি মঙ্গল পালের মৃত্যুর পর তিনি মৃৎশিল্পের কাজ আর করেননি। এই পাল পাড়ায় আরও যে সকল পালরা ছিলেন তারা সবাই পেশা পরিবর্তন করেছেন।

গোলারটেক পালপাড়ার পালরা বর্তমানে হোটেল ব্যবসা এবং মুদি দোকানের ব্যবসায় জড়িত। তাদের মতে মুদি দোকানে লাভ বেশি শ্রম কম।

হারু পাল (৫৭)। বান্দুরা (কলাকূপা) র এই শিল্পী। চাক বা হুইলে ফিরানী বাটি তৈরি করেন। যদিও আজকাল ফিরনী বাটি, দইয়ের হাঁড়ি অধিকাংশ ছাঁচেই তৈরি হয়ে থাকে।

হারু পালের ছেলেও এই মৃৎশিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। বংশ পরম্পরার এই শিল্পকে ছাড়তেও পারছেন না আবার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টও নন।

নীপেন চন্দ্র পাল ধামরাইয়ের ভগলপুরে থাকেন। এই শিল্পী বংশপরম্পরায় মাটির হাঁড়ি পাতিল, বাসন, মাটির ব্যাংক, খেলনা তৈরি করে থাকেন। আদি বা বংশানুক্রমে পাওয়া এই পেশায় নিয়ে কথা বলতে গেলে অতীত ঐতিহ্যের সোনালী সময়ের সাথে বর্তমানের সময়ের মিল খুঁজে পান না।

ধামরাইয়ে মৃৎশিল্পীদের বাড়ি ‘কুমার বাড়ি’ হিসেবে পরিচিত। এখানকার শিল্পীর সরকারী পৃষ্ঠপোষকা আশা করেন।

কমল পাল (৪৭), কাকরানের এই শিল্পীর দাদা ক্ষেত্রত্রপাল এবং বাবা দীনবন্ধুপালের কাছেই শিল্পের হাতেখড়ি। তিন সন্তানের কাউকেই বংশপরম্পরার এই শিল্পের সাথে যুক্ত করেননি। এই শিল্পী তার স্ত্রী ও তিনজন কারিগর নিয়ে কাজ করছেন।

শিল্পী বিভিন্ন ধরনের মৃৎসামগ্রী তৈরি করলেও তিনি সবচেয়ে বেশি করেন দইয়ের হাঁড়ি। তার কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দইয়ের হাঁড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাঁচে তৈরি হলেও তিনি চাকে দইয়ের হাঁড়ি তৈরি করেন। সীমিত লাভ থাকে বলে জানালেন। পিস প্রতি কখনও পঞ্চাশ পয়সা কখনও এক টাকা লাভ পান। শিল্পী তার সামাজিক অর্থনৈতিক উভয় অবস্থা নিয়েই অসন্তুষ্ট তথাপি মৃৎশিল্পের সম্ভাবনার ব্যাপারে আশাবাদী।

তরণী পাল (৮০) স্ত্রী জ্যেৎস্না রাণী পাল। কাকরান পাল পাড়ার এই শিল্পী হুইলে বা চাক ব্যবহার করে তার শিল্পকর্ম করে থাকেন। এই শিল্পী ফুলদানী তৈরি করে থাকেন।

তরণী পালের চার ছেলে পাঁচ মেয়ে। চার ছেলের মধ্যে দুই ছেলে কাঁলাচান পাল ও দুলাল পাল বাংলাদেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছেন। সেখানেও তারা এই শিল্পকর্মের সাথেই যুক্ত আছেন। অভিমানী এই শিল্পী কোন ব্যাপারেই মন্তব্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

বিশ্বেশ্বর পাল। পিতা অর্চুতানন্দ পাল ও মাতা সৌধামণি রাণী পাল। বিশ্বেশ্বর পাল এর জন্ম ১৯৫২ সালে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার মদনপুরা গ্রামে।

বিশ্বেশ্বর পাল শুধু ঐতিহ্যবাহী ধারার একজন শিল্পী নন। এই ধারার পাশাপাশি তিনি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এর উৎকর্ষ সাধন করেছেন। ১৯৮৪ সালে এই শিল্পীর নেতৃত্বে কারিতাসের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কোর দি জুট ওয়ার্কাস এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক হারে বাউফলের মনদপুরা পণ্য সরবরাহ শুরু করে।

সফল এই শিল্পী ১৯৭৬ সালে পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে সম্মাননা, ১৯৮১ সালে তার নেতৃত্বে বাউফলের পালরা ঢাকায় বাংলা একাডেমীর মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং সম্মাননা পান, এছাড়াও ১৯৯৩ সালে যুব উন্নয়ন কর্তৃক সেরা মৃৎশিল্পী সম্মাননা, ১৪২০ সালে বিসিক বৈশাখী মেলায় সেরা স্টলের পুরস্কার, ১৪২১ সালে বিসিক কর্তৃক করে শিল্পী পুরস্কার অর্জন করেন।

বিশ্বেশ্বর পালের উৎপাদিত পণ্যর মধ্যে টি-সেট ডিনার সেট, ফুলদানি, পেন হোল্ডার, আগরদানি, ওয়ালম্যাট, ফ্লাওয়ার ভাস সহ বহু উন্নতমানের সামগ্রী রয়েছে। এই মৃৎপণ্য সামগ্রী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের পাশাপাশি বিদেশেও যাচ্ছে।

মৃৎশিল্পের সফল এই শিল্পী স্বপ্ন দেখেন মদনপুরা পাল পাড়াকে কেন্দ্র করে একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র করার, শিল্পী মনে করেন সম্মান স্বীকৃতি পালদের উন্নত শিল্পকর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে পাল সম্প্রদায় পেশাগত দিক থেকে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকর্মের জন্য পালপাড়া গুলো ছিল একসময় উৎসবমুখর। এখনও কাজ হচ্ছে তবে শিল্পীর মুখের হাসি স্তিমিত হয়েছে কপালের ভাঁজের সংখ্যা বেড়েছে। আগে মৃৎসামগ্রী তৈরির প্রধান উপকরণ মাটি, মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর জন্য জ্বালানী কিনতে হতো না, গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের লোকেরা তাদের বাৎসরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (হাঁড়ি, পাতিল, কলস, পিঠার সাঁচ, ধূপদানি, প্রদীপদানী, তাওয়া ইত্যাদি) বিনিময়ে মাটি, জমিতে সৃষ্ট ধানের খড়, বাঁশের মোথা কুমারদের এমনিতেই দিয়ে দিত। অথচ বর্তমানে এইসব জ্বালানীদ্রব্য উচ্চমূল্য দিয়ে কিনতে হয়। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিন-চারগুণ। কিন্তু সেই অনুপাতে মৃৎসামগ্রীর দাম বেড়েছে যৎসামান্যই। এসব ছাড়াও অনেক সময় তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, ফুলের টব ও অন্যান্য সামগ্রী বাজারজাত করতে গিয়ে পরিবহন জটিলতার কারণে বিনষ্ট হয় আবার কখনও কখনও পইন একেবাে ধসে যায়। তারফলে তার যেই আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তা থেকে উদ্ধার পাওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের বংশ পরম্পরার শিল্পীরা এক অদ্ভুত মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ অল্পে সন্তুষ্ট এই শিল্পীরা ন্যূনতম চাওয়া থেকেও যখন বঞ্চিত হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তখন তা শিল্পের জন্য অমঙ্গলজনক। না পাড়ছে এই শিল্পীরা বর্তমান সময়ের আধুনিকতার সাথে তাল মেলাতে, না পাড়ছে বংশপরম্পরার এই শিল্পকে ছেড়ে যেতে। শিল্পের প্রতি গভীর ভালোবাাস থাকায় নিতান্তই অপরাগ না হলে পেশা ছাড়তে চান না তবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মকে টেনে আনতে চান না। কর্ম সহকারী হিসেবে সন্তানকে নয় বরং তার চেয়েও দরিদ্রতম মানুষটিকে কারিগর হিসেবে নিযুক্ত করে থাকেন। অনেক শিল্পীই আবার মনে করেন এর বাইরে অন্য কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব না তাই অনেক সময় পেশা ছেড়ে দিয়ে আবারও ফিরে আসার গল্পও রয়েছে অনেক। বংশপরম্পরার এই শিল্পীদের একটা বড় অংশকে শিল্পকর্মের সঠিক মূল্য না পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে চলে গেছে। সব সময় সব জায়গায় যে ব্যর্থতার গল্প তা নয় কিছু কিছু পালপাড়া আবার বেশ জোড়োশোরেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিদেশেও মৃৎশিল্প পণ্য রপ্তানি হচ্ছে তবে তাদের সংখ্যা অপ্রতুল। কিছুটা সরকারি সাহায্যে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নকশার পরিবর্তনের ধারার সাথে এদের যুক্ত করে দিতে পারলেই এই শিল্প আর শিল্পীর বন্ধন আরও মজবুত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ শাহজালালের লেখা বাংলাদেশের মৃৎশিল্প বইটি থেকে ১৯৮৬ সালে বিসিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মৃৎশিল্প পল্লীর তালিকা দেওয়া হলো :

বাংলাদেশের মৃৎশিল্প-পল্লীর তালিকা

ঢাকা জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	কোতয়ালী	রায়ের বাজার	৫	১০	৭	১৭
২	কালিয়াকৈর	বেনুপুর	৪০	১০৬	৫৪	১৬০
৩	”	উল্টাপাড়া	৩২	৮৪	৪৩	১২৭
৪	সাভার	নইহাটি	১০	২০	১২	৩২
৫	”	কাতলাপুর	৯	২৩	১৮	৪১
৬	জয়দেবপুর	কড্ডা	১০	২৭	২৫	৫২
৭	ধামরাই	হাজীপুর	৬০	২৫০	৪০	২৯০
৮	”	কাগজীপাড়া	৬০	২৩০	৪৫	২৭৫
৯	”	ব্রজের টেক	১৮	৫০	৩০	৮০
১০	”	কাকরান	৬০	২২০	৪০	২৬০
১১	পলাশ	ঘোড়াশাল	৭	১১	৮	১৯

ময়মনসিংহ জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
৩৪	কোতয়ালী	অষ্টবার	১৬	–	–	৮৩
৩৫	”	বলাশপুর	১২	–	–	৬২
৩৬	গফরগাঁও	বৌহা	৫	–	–	১২
৩৭	”	প্রমাদপুর	১২	–	–	৭০
৩৮	”	জয়ধলখালী	১০	–	–	৩০
৩৯	মুক্তাগাছা	রঘুনাথপুর	১৭	–	–	১১৪
৪০	ফুলবাড়ীয়া	বেড়ীবাড়ী	২৯	–	–	১৭৮
৪১	হালুয়াঘাট	রঘুনাথপুর	১০	–	–	৫৮
৪২	”	নড়াইল	৮	–	–	৫৭
৪৩	”	ইটাখোলা	২৩	–	–	১৪৮
৪৪	ফুলপুর	গুজিয়াম	৯	–	–	৪৪

টাংগাইল জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
৫৬	টাংগাইল	আলী শাকান্দা	১৫	১৫	৩০	৪৫
৫৭	”	তারটিয়া	২৫	২৫	৫০	৭৫
৫৮	”	ব্রাহ্মণকেশিয়া	২০	২০	৪০	৬০
৫৯	”	রসুলপুর	১০	১০	২০	৩০
৬০	দেলদুয়ারা	আগ এলাসিন	৬০	২০	৪০	৬০
৬১	ঘাটাইল	দোয়াজানি	১৫	–	–	৬০
৬২	কালিহাতি	কুমারিয়াবাড়ি	১৭	৩৪	৬৮	১০২
৬৩	”	বাড্ডা	৩৮	৩৮	১১৪	১৫২
৬৪	”	বল্লা	৫৯	৫৯	২৩৬	২৯৫
৮৫	”	বেতডোবা	১৬৭	১৬৭	৮৩৫	১০০২
৬৬	বাসাইল	নলকি	৪৯	৪৯	৯৮	১৪৭

জামালপুর জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
৭৮	জামালপুর	বজরাপুর	–	–	–	–
৭৯	জামালপুর	ঘরঘরিয়া	৮	১২	১৬	২৮
৮০	সরিষাবাড়ী	বারই পটল	৫১	১৩২	৯০	২১৩
৮১	মাদারগঞ্জ	বালীজুরি	৬০	১২৫	১১৫	২৪০
৮২	”	কয়ড়া	১২	২০	১৬	৩৬
৮৩	ইসলামপুর	রৌহাকান্দা	২৫	৩০	৩৫	৬৫
৮৪	মেলান্দহ	মেঘারবাড়ী	২০	৪২	৫৮	১০০
৮৫	”	সুরুলিয়া	১১	১৯	২৫	৪৪
৮৬	শেরপুর	রবয়রাপরানপুর	৩৩	৩৩	৩৩	৬৬
৮৭	নখলা	বিহারীর পড়	১৩	২৪	২০	৪৪
৮৮	ঝিনাইতি	মালিজিকান্দা	২০	২৩	২৭	৫০

ফরিদপুর জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
৮৯	কোতয়ালী	খলিলপুর	১০	–	–	৮৫
৯০	”	চিলারকান্দি	১০	–	–	৮০
৯১	”	ভবানন্দপুর	২০	–	–	১৫০
৯২	”	গ্রহলক্ষীপুর	১১	–	–	১০৪
৯৩	আলফাডাঙ্গা	জটিগ্রাম	৩৩	–	–	৮১
৯৪	ভাঙ্গা	মুনসুরাবাদ	১৮	–	–	৯০
৯৫	নগরকান্দা	গোপালপুর	২০	–	–	৮০
৯৬	”	জদুররিয়া	২০	–	–	৯০
৯৭	”	রামনগর	১৮	–	–	৯০
৯৮	”	সোনাপুর	১৫	–	–	৬০
৯৯	”	বিনাগদিয়া	১৭	–	–	৬০

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১২২	সীতাকুণ্ড	সীতাকুণ্ড	২৪	–	–	৬৯
১২৩	”	ছোট কুমিরা	৪০	–	–	১৬৫
১২৪	”	সোনাই ছড়ি	২২	–	–	৫২
১২৫	মীর সরাই	ঘোরামারা	২২	–	–	৬৮
১২৬	”	হাজীসরাই	১৭	–	–	৪৮
১২৭	রাউজান	ডাবুয়া	১৫	–	–	৭৯
১২৮	”	কদলপুর	৬০	–	–	২২৫
১২৯	”	৬৯ পাড়া (পাতাড়তলী)	৫০	–	–	২৭৫
১৩০	রাংগুনিয়া	হোসানাবাদ	৭০	–	–	২৪৫
১৩১	”	রাজানুপুর	২০	–	–	৪২
১৩২	সন্দীপ	কাছিয়াপাড়া	২৫	–	–	১০০
১৩৩	”	হরিষপুর	১০	–	–	৪০
১৩৪	”	মাইভাঙ্গা	২০	–	–	৮০
১৩৫	ফটিকছড়ি	কুলালপাড়া	১৫০	–	–	৭৫০
১৩৬	”	মাইজভাণ্ডার	৬০	–	–	৩০০
১৩৭	”	হারুয়ানাছড়ি	৮০	–	–	৪০০
১৩৮	হাটহাজারী	মির্জাপুর	৯০	–	–	৩৬০
১৩৯	”	চারিয়া	৮০	–	–	৩০০
১৪০	”	পরপাট্টি	৩০	–	–	১৫০
১৪১	আনোয়ারা	হাজীগাঁও	৩০	–	–	–
১৪২	সাতকানিয়া	ছদাহা	২০	–	–	৭০
১৪৩	”	পদ্য়া	২৫	–	–	৮০

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লা জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৬০	কোতয়ালী	বিজয়পুর	১৬০	–	–	৬০০
১৬১	”	বারপাড়া	৭০	–	–	২৫০
১৬২	”	মাটিয়ারা (চৌয়ারা)	৩০	–	–	৯০
১৬৩	”	নয়াপাড়া	২০	–	–	৬০
১৬৪	”	ময়নামতি	২০	–	–	৫৫
১৬৫	বুড়িচং	আতবাতা	৭০	–	–	–
১৬৬	”	কোমার খোলা	৩০	–	–	৮৫
১৬৭	ব্রাহ্মণপাড়া	ঘাইটশালা	৬০	–	–	২৪০
১৬৮	লাকসাম	সাইক চালাই	৩০	–	–	২১২
১৬৯	”	ধামচা	১০	–	–	৪৪
১৭০	চৌদ্দগ্রাম	ডিমাতলী	৫০		–	১০০

সিলেট জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৩	বিয়ানী বাজার	কোনাগ্রাম	১৩	–	–	–
১৯৪	”	সালেশ্বর	৫	–	–	–
১৯৫	বড়লেখা	গল্লা সাংগর	২০	–	–	–
১৯৬	”	রাজপুর	৮	–	–	–
১৯৭	”	গোসলা	১০	–	–	–
১৯৮	রাজনগর	ফকিরপাড়া	২০	–	–	–
১৯৯	”	ইন্দ্রেপুর	২৫	–	–	–
২০০	মাধবপুর	কাটিয়ারা	২৫	–	–	–
২০১	”	হরিশ্যামা	৩০	–	–	–
২০২	গোলাপগঞ্জ	খদ্দাপাড়া	৩৪	–	–	–
২০৩	বড়লেখা	সায়পুর	১০	–	–	–

Dhaka University Institutional Repository

নোয়াখালী জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০৪	ফেনী	ফাজিলপুর	২৫	–	–	৫০
২০৫	”	পাঁচ গাছিয়া বাজার	১৫	–	–	৩০
২০৬	সোনাগাজি	মালেকান্দি	১০	–	–	৩০
২০৭	ছাগলনাইয়া	চম্পকনগর	৫০	–	–	১৫০
২০৮	”	দক্ষিণ যশপুর	৫	–	–	–১০
২০৯	বেগমগঞ্জ	দুর্গাপুর	১৭	–	–	–

রাজশাহী জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
২১০	পুটিয়া	নামাজ গ্রাম(পলিপাড়া)	১৭	২৬	২১	৪৭
২১১	গোদাগাড়ী	বলিয়াঘাটা	১৯	৩৪	২৮	৬২
২১২	”	বাসুদেবপুর	১৭	৩৪	২৮	৬২
২১৩	তানোর	কালিগঞ্জ	১৩	৩০	২৫	৫৫
২১৪	”	শ্রীখাড্ডা	২৬	৫২	৫৪	১০৬
২১৫	চারঘাট	খোদ্দগোবিন্দপুর	২০	২৫	১৪	৩৯
২১৬	বাঘমারা	খাজাপাড়া	২০	৩০	১৫	৪৫
২১৭	পবা	সিন্দুরকুসুম্বী	১৬	২৩	১৮	৫১
২১৮	”	বাঘধনি	২৮	৪৫	৩৫	৮০
২১৯	মান্দা	নারায়ণপুর	৬৬	১২৮	১২২	২৫০
২২০	”	নুরল্লাবাদ পালপাড়া	২৮	৪০	৪১	৮১

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
২৪৩	সাঁথিয়া	নন্দনপুর	১২	১৬	১৫	৩১
২৪৪	সিরাজগঞ্জ	ভদ্রঘাট	১০	১২	১৫	২৭
২৪৫	ঈশ্বরদি	পালপাড়া	৩০	৩৫	৪০	৭৫
২৪৬	”	মাজদিয়া	২১	২৮	৩০	৫৮
২৪৭	রায়গঞ্জ	হামিলদাহিল	২০	২৫	৩২	৫৭
২৪৮	”	বৈদ্যমলডোব	১০	১২	১৫	২৭
২৫০	রায়গঞ্জ	ধানগড়া	১০০	১৫০	১৪০	২৯০
২৫১	উল্লাপাড়া	বাড়ইয়া	৭০	৭০	৫০	১২০

বগুড়া জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
২৫২	সদর	আড়িয়া পালপাড়া	৬৫	১০০	১১৭	২৪৭
২৫৩	”	এরুলিয়অ	৪২	৮৫	১১৬	২০০
২৫৪	”	আড়িয়া	১০০	২০০	১০০	৩০০
২৫৫	বগুড়া	উলিপুর	৬৬	৮০	১০০	১৮০
২৫৬	কাহালু	ঘারিয়া নিশিন্দারা	২২	৪০	৬০	১০০
২৫৭	”	কালায় কুমারপাড়া	৬০	১৫০	১৭০	৩২০
২৫৮	আদমদিঘী	তালয়ন	৫৪	১৪৫	১১৫	২৬০
২৫৯	”	রামপুরা	৭০	১৫০	১৩০	২৮০
২৬০	”	তারতা	৬০	৫০	৭০	১২০
২৬১	শেরপুর	কল্যাণী	৪৪	৬০	৭৬	১৩৬
২৬২	”	চণ্ডীজাল	৪৪	৬৮	৯০	১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
২৭৪	কোতয়ালী	শ্যামপুর	৫	–	–	–
২৭৫	গাইবান্ধা	খোলাহাটি	৩৩	–	–	১০০
২৭৬	সুন্দরগঞ্জ	বেলকা	৩০	–	–	৩৫
২৭৭	ফুলছড়ি	রসুলপুর	১০	–	–	৩০
২৭৮	সাদুল্লাপুর	রসুলপুর	২২	–	–	৫০
২৭৯	গোবিন্দপুর	আর্জিশাহপুর	৫০	–	–	২০০
২৮০	পলাশবাড়ী	হিজগাড়ী	৫৩	–	–	১৫০
২৮১	কুড়িগ্রাম	কৃষ্ণপুর	১৬	–	–	৭২
২৮২	ফুলবাড়ী	চন্দ্রঘানা	৩০	–	–	৯০
২৮৩	হাতিবান্ধা	দক্ষিণ গণ্ডিমারী	১৫	–	–	৩৫
২৮৪	সৈয়দপুর	চওড়া পালপাড়া	২০০	–	–	৫০০

দিনাজপুর জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
২৮৫	কোতয়ালী	বালুবাড়ী	১৫	১৮	১২	৩০
২৮৬	বীরগঞ্জ	প্রাণনগর	৮	২০	১৫	৩৫
২৮৭	নবাবগঞ্জ	তপনঘাট	৫০	৬৫	৫৫	১২০
২৮৮	”	বাড়বাড়ী	১২৫	৮০	৬৮	১৪৮
২৮৯	”	দাউদপুর	৩০	৬৫	৫৫	১২০
২৯০	ফুলবাড়ী	দুর্গাপুর	২০	১২	৮	২০
২৯১	ঠাকুরগাঁও	কেশামত কেশুরবাড়ী	৫৬	৮০	৭৫	১৫৫
২৯২	”	ফুটকিবাড়ী	২০	৩৫	২৭	৬২
২৯৩	”	মালিগাঁও	১৯	৪২	২৮	৭০
২৯৪	”	দক্ষিণ ঠাকুরগাঁও	২৭	৫৭	৪৩	১১০
২৯৫	”	বেউলবাড়ী	৫০	৫৫	৪৫	১০০

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
২৯৬	কোতয়ালী	ভবানীপুর	৪০	–	–	–
২৯৭	”	আলইপুর	৩০	–	–	–
২৯৮	”	চাঁনপুর	১৫	–	–	–
২৯৯	বটিয়াঘাট	আমিরপুর	৬০	–	–	–
৩০০	দৌলতপুর	দৌলতপুর	১৫	–	–	–
৩০১	ফুলতলা	গাড়াখোলা	২৫	–	–	–
৩০২	”	আলকা	২০	–	–	–
৩০৩	”	ধোপাখালী	৩০	–	–	–
৩০৪	বাগের হাট	তালেশ্বর	৩০	–	–	–
৩০৫	সাতক্ষীরা	ইটাগাছা	১০	–	–	–
৩০৬	কালীগঞ্জ	মোকন্দপুর	২০	–	–	–
৩০৭	দেবহাটা	দেবহাটা	১০	–	–	–

যশোহর জেলা

ক্রমিক নং	উপজলো /থানা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
৩১৯	কালিয়া	চাচুড়ী	২৫	৭৫	৫০	১২৫
৩২০	”	নরাগাদী	২৫০	৬০০	৩৫০	৯৫০
৩২১	”	জয়নগর	২৫	৮০	৫৫	১৩৫
৩২২	নড়াইল	চণ্ডিতলা	১৫০	৩০০	১০০	৪০০
৩২৩	লোহাগড়া	কুন্দশী	৪৫০	৯০০	৬০০	১৫০০
৩২৪	”	মল্লিকপুর	৭০	১৫০	৮০	২৩০
৩২৫	”	দিঘলিয়া	৮০	২০০	১২৫	৩২৫
৩২৬	মাধবপুর	আক্রবাড়ী	৭০	১৫০	১০০	২৫০
৩২৭	শ্রীপুর	সবদলপুর	৫০	১৫০	৭৫	২২৫
৩২৮	হরিণাকুণ্ড	কুলবড়িয়া	২০	৪৫	২০	৬৫
৩২৯	কোটচাঁদপুর	বাজেবামুন্দা	২০	৪৫	২০	৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্প আমাদের ঐতিহ্যময় শিল্প। আর এই অতীত ঐতিহ্যই আমাদের বর্তমান ভিত্তি। তাই আমাদের শিল্প সংস্কৃতির ভিত্তির উপর যে সংস্কৃতি শিল্প গড়ে উঠবে সেটাই হবে আসল, নিজস্ব, স্বকীয় এবং দীর্ঘস্থায়ী। স্বাভাবিকভাবেই তাই ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প এবং শিল্পী গোষ্ঠীর সুরক্ষায় আমাদের সচেতন হওয়া অতি আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. দীপঙ্কর ঘোষ, (ডিসেম্বর ২০০২) পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প।

২. নীহাররঞ্জন রায়, (প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬), বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব।

৩. M.A.A. Quadir, (1963) Paharpur.

৪. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, (জুলাই ২০০৩) বাংলাদেশের লোকশিল্প পৃঃ ৩৭–৩৮

৫. লালারুখ সেলিম, (ডিসেম্বর ২০০৭) চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৬. মোহাম্মদ শাহজালাল, (২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫) বাংলাদেশের মৃৎশিল্প।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পী

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং গৌরবময় হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোথাও ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। মৃৎশিল্পের চাপের মুখে পড়ে যাওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে মৃৎশিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উৎকর্ষতা লাভ না করা। তাই স্বশিক্ষায় শিক্ষিত এই বংশপরম্পরার শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন হলো আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠানিক শিল্পীদের আর এই প্রয়োজন থেকেই প্রতিষ্ঠানের সূচনা এবং প্রশিক্ষিত শিল্পীদের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প নির্মাণ পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক উন্নত মৃৎশিল্প শিক্ষার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তেজগাঁয় ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম 'গ্লাস এন্ড সিরামিকস ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান হয়। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষানবীশদের উন্নতমানের মৃৎশিল্প যেমন মাটি তৈরি থেকে শুরু করে পোড়ানো, অলঙ্করণ ইত্যাদির জন্য আধুনিক যন্ত্র প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। (কেবলমাত্র কারখানায় নির্মিত ব্যবহারিক তৈজসপত্র) যাতে ছাত্ররা আধুনিক মৃৎশিল্পের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে মৃৎশিল্পের কারখানায় পোসিলিন ও স্টোনওয়ারের ব্যবহারিক মৃৎপাত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগর রূপে চাকরির সুযোগ পায় সে উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, হাবিবুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিরা সবাই বাংলাদেশে এসে ১৯৪৮ সালে পুরানো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এই পর্যায়ে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। ১৯৫৬ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারিক শিল্পকলা বিভাগের ছাত্র শিল্পী মীর মোস্তফা আলী শিল্প শিক্ষা পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে মৃৎশিল্পের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য লন্ডনে 'বারসলেম কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস' প্রতিষ্ঠানে যান। সেখানে তিনি মেধা ও দৃঢ়তার সাথে শিল্প শিক্ষা সমাপ্ত করে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ)-এ ফিরে আসেন এবং অবহেলিত বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পকে আধুনিক সমাজের কাছে পরিচিত করার স্বপ্ন দেখেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন শিল্পী মীর মোস্তফা আলীকে মৃৎশিল্প বিভাগ খোলার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে মীর মোস্তফা আলী ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং এশিয়ান ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬১/৬২ সালে ঢাকার শাহবাগে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আধুনিক মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই বিভাগকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের একান্ত ইচ্ছানুযায়ী শিল্পী মীর মোস্তফা আলীকে বিভাগীয় প্রধান করে আধুনিক মৃৎশিল্পের একাডেমিক পাঠ্যক্রম শুরু হয়। মৃৎশিল্প বিভাগটি প্রতিষ্ঠায় জাপানি মৃৎবিশেষজ্ঞ কোইচি তাকিতা (জন্ম ১৯২৭) বিশেষ ভূমিকা রাখেন। মৃৎশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভের পর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী মীর মোস্তফা আলী পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণে মৃৎশিল্পের শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করেন। এ-পর্যায়ে জাপানের জনৈক মৃৎশিল্পী কোইচি তাকিতার আগমনের পর মৃৎশিল্প বিভাগ পাশ্চাত্য ধারার সাথে প্রাচ্য ধারাকেও অনেকটা বিকশিত করে তোলে। ফলে এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধারার সংমিশ্রণে নতুন আঙ্গিকে এই বিভাগে মৃৎশিল্পের চর্চা শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের আজকের এই অবস্থানের জন্য ঐতিহ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একযোগে কাজ করছে। বাংলাদেশে বিগত চার দশকে আধুনিক শিল্পকলার অগ্রগতি বেশ প্রশংসনীয়। একাধারে এদেশের শিল্পকলা বলিষ্ঠ, বৈচিত্র্যময় এবং উদ্দীপ্ত। বাংলাদেশের সমকালীন আধুনিক মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদেশেল শিল্পীদের প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা, ঐতিহ্য-চেতনার সাথে সম্পৃক্ততা। এদেশে মৃৎশিল্পের আধুনিক চর্চা খুব বেশি দিন না হলেও মৃৎশিল্পের জটিল আর কঠিন রাসায়নিক সমীকরণ সাপেক্ষে নিয়মিত শিল্পী হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। এ শিল্পমাধ্যমে যারা নিয়মিত চর্চা করেছেন, তারাই শুধু শিল্পভাষা আর নতুনত্বের অনুসন্ধানপূর্বক শিল্পনির্মাণ করেছেন। (ফয়সাল (সম্পা. মনির) ২০১৪: ১১১)

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের গৌরবময় সুবিশাল ক্ষেত্রের মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম। যে কোন দেশের শিল্পকলায় প্রধারণত দুটি ধারা বিরাজ করে। এর একটি সনাতন বা অপ্রাতিষ্ঠানিক যা যুগে যুগে সাধারণ মানুষ বংশ পরম্পরায় চর্চিত করে থাকে। আর একটি প্রাতিষ্ঠানিক যা প্রাচ্য-প্রতীচ্য আধুনিক জগতের সাম্প্রতিক ইঙ্গিতময় কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল চিন্তা, বোধ ও উপস্থাপনা দ্বারা একটি যুগোপযোগী শিল্পধারা।

ইউরোপীয় চিত্রকর ও ভাস্করদের মৃৎশিল্পে আত্মনিয়োগ নানামুখি মৃৎপাত্র নির্মাণ মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। দক্ষ ও অদক্ষ মৃৎশিল্পীদের সাথে অন্য শিল্প মাধ্যমের গুণী শিল্পীগণ সম্মিলিত কর্মসম্পাদন করেছেন। পাবলো পিকাসো, হেনরি মাতিস, সালভাদর দালি, ওয়াসিনি কালিলস্কি স্টুডিওভিত্তিক সৃজনশীল, মৃৎশিল্প নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যার প্রভাব জার্মান, ব্রিটেন, চায়না জাপান, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও বাংলাদেশে পড়েছিলো।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের চেষ্টায় ঢাকা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকঐতিহ্যকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন জন্মভূমি সচেতন স্বদেশপ্রেমী সত্তার সুদৃঢ় ভিত্তির শিকড় থেকে উঠে আসা মানুষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। যিনি আমাদের শিল্পচর্চার অভিভাবক। তিনি চেয়েছিলেন, এমন কিছু করতে যাতে আমাদের রুচির পরিবর্তন ঘটে। তাঁর স্বপ্ন ছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্পের অন্যান্য বিষয়ের সাথে বাংলার নিজস্ব শিল্প মৃৎশিল্পের পাঠ্যক্রম ও চালু করা। এই লক্ষ্যেই তিনি গ্রাফিক্স ডিজাইন গ্রাজুয়েট মীর মোস্তফা আলীকে মৃৎশিল্প বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ পাঠান এবং ফেরার পর তাঁকে প্রধান করেই প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানের মৃৎশিল্প বিভাগ।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের চেষ্টায় ঢাকা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পী মীর মোস্তফা আলীর উদ্যোগে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধারায় আধুনিক উপাদান উপকরণের সমন্বয়ে সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণের গতিপথ তৈরি হয়। পরবর্তীতে হোম ইকনোমিক্স কলেজ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠান বিসিক (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন) সহ বেসরকারীভাবেও কোথাও কোথাও মৃৎশিল্পের প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে মৃৎশিল্পচর্চা ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের শিল্পীদের দক্ষতা ও পরম্পরার সাথে ধীরে ধীরে যুক্ত হতে থাকে মৃৎশিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন।

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের নতুন ধারা শুরু হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় দীক্ষিত নতুন প্রজন্মের হাত ধরে। মৃৎশিল্পের মান উন্নয়ন, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নান্দনিক রূপ দেয়ার কৃতিত্ব যেমন এই তরুণ প্রশিক্ষিত শিল্পীদের তেমনি প্রতিষ্ঠানের গুণী শিল্পী প্রশিক্ষকদের।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো–

চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে আধুনিক মৃৎশিল্পচর্চার ক্ষেত্রে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদয়ের তাড়না থেকেই শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন তাঁর প্রাণের প্রতিষ্ঠান চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (তদানীন্তন আর্ট কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে মীল মোস্তফা আলী ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং এশিয়ান ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬১ সালে ঢাকার শাহবাগে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আধুনিক মৃৎশিল্প বিভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিভাগীয় প্রধান মীর মোস্তফা আলী (জন্ম ১৯৩২) স্টুডিও এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিরামিক্সের উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন লন্ডন থেকে। বিভাগটি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন জাপানি মৃৎবিশেষজ্ঞ কোইচি তাকিতা (জন্ম ১৯২৭)।

প্রতিষ্ঠা:

প্রতিষ্ঠাকালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের নাম ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট। ১৯৬৩ সালে এটিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করে নামকরণ করা হয় ‘বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৮৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে ‘চারুকলা ইনস্টিটিউট’ নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে এটি অনুষদের মর্যাদা লাভ করে চারুকলা অনুষদ নাম ধারণ করে।

চারুকলা অনুষদের বিভাগসমূহ :

- অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ
- ছাপচিত্র বিভাগ
- ভাস্কর্য বিভাগ
- কারুশিল্প বিভাগ
- গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ
- প্রাচ্যকলা বিভাগ
- মৃৎশিল্প বিভাগ
- শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ

১৯৬১/৬২ সালে মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বিভাগে সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হয় এবং ১৯৬৩ সালে পাঁচ বৎসরের (প্রাক ডিগ্রী দুই বৎসর + বিষয়ভিত্তিক তিন বৎসর) বি.এফ.এ (ব্যাচেলার অব ফাইন আর্ট) কোর্স চালু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে মৃৎশিল্পের উপর বি.এফ.এ ডিগ্রী কোর্স চালু হয়। ১৯৭৮ সালে দুই বৎসরের এম.এফ.এ (মাস্টার্স অব ফাইন আর্ট) কোর্স চালু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বি.এফ.এ(সম্মান) ৪ বৎসরের কোর্স-এ বিষয়গুলো হচ্ছে–

প্রথম বর্ষ :

ক. ড্রইং,

খ. স্কেচ

গ. বেসিক ডিজাইন

ঘ. পরিপ্রেক্ষিত

ঙ. অনুশীলন ও কম্পোজিশন

চ. মাটি প্রস্তুত প্রণালী

ছ. মৃৎশিল্পের ইতিহাস ও

জ. বিশ্বশিল্পের ইতিহাস।

দ্বিতীয় বর্ষ :

ক. ড্রইং

খ. জলরং অনুশীলন

গ.ডিজাইন

ঘ. ফ্রি হ্যান্ড মৃৎশিল্প

ঙ. হুইল থ্রোইং

চ. মৃৎশিল্পের ইতিহাস

ছ. মৃৎশিল্পের করণকৌশল

জ. পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় বর্ষ :

ক. ড্রইং

খ. ব্যবহারিক মৃৎশিল্প

গ. ম্যুরাল

ঘ. মৃৎশিল্প ভাস্কর্য

ঙ. মৃৎশিল্প ডেকোরেশন

চ. মৃৎশিল্প রসায়ন

ছ. দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলার শিল্পের ইতিহাস

চতুর্থ বর্ষ :

ক. ড্রইং

খ. সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন

গ. সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেলিং

ঘ. বিএফএ (সম্মান) চূড়ান্ত কার্যক্রম, এসাইনমেন্ট

ঙ. নন্দনতত্ত্ব

চ. বিশ শতক এবং লোক ও নৃগোষ্ঠীর শিল্প

এমএফএ – এম.এফএ প্রোগ্রামটি দুটি পর্বে বিভক্ত :

প্রথম পর্ব : ক্রিয়েটিভ সিরামিক

ক. নিরীক্ষামূলক ড্রইং

খ. নিরীক্ষামূলক ম্যুরাল

গ. নিরীক্ষামূলক কম্পোজিশন অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিরামিক

ঘ. নিরীক্ষামূলক ড্রইং

ঙ. নিরীক্ষামূলক ডেকোশেন

Dhaka University Institutional Repository

চ. নিরীক্ষামূলক সিরামিক

ছ. বাংলাদেশের শিল্প

দ্বিতীয় পর্ব : ক্রিয়েটিভ সিরামিক

ক. নিরীক্ষামূলক ড্রইং

খ. স্টুডিও সিরামিক

অথবা

গ. নিরীক্ষামূলক ড্রাই

ঘ. ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিরামিক

ঙ. সমকালীন মৃৎশিল্প

বিকল্প

চ. অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী

সত্তরের দশকে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের ২৯ মে ডিসেম্বর কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সমন্বয়ে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করে। এর প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন প্রফেসর বনিজুল হক। তৎকালীন সময়ে এটি রাজশাহী শহরে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ চত্বরে অবস্থিত ছিল।

১৯৮৩-৮৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ হাবিবুর রহমান হলের উত্তরে রেল লাইন সংলগ্ন ১০ বিঘা জমির ওপর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। নব্বইয়ের দশকে ১৬ জন শিক্ষক, ১৪ জন কর্মচারী এবং কিছু শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে এর পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। চারুকলা শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯ মার্চ ১৯৯৪ সালে মহাবিদ্যালয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে চারুকলা বিভাগ নামকরণ করে। পরবর্তীতে এটি অনুষদের মর্যাদা লাভ করে।

বিভাগসমূহ :

চারুকলা অনুষদে মোট ৩টি বিভাগ রয়েছে :

ক. চিত্রকলা, প্রাচ্য কলা ও ছাপচিত্র বিভাগ

খ. গ্রাফিক ডিজাইন, কারু শিল্প ও হিস্ট্রি অব আর্টস বিভাগ

গ. ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্প বিভাগ।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ (আজিমপুর)

১৯৬১ সালে আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও যুক্তরাষ্ট্রের ওকলহামা স্টেট ইউনিভার্সিটির সহায়তায় ঢাকায় গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ স্থাপিত হয়। ওকলহামা স্টেট ইউনিভার্সিটির হোম ইকনমিক্স ডিমার্টমেন্টের ডীন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি হিসেবে কলেজটির একাডেমিক নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ দায়িত্ব পালন করছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক এবং ১৯৬৩ সালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান শুরু করে। ১৯৭৩ সালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েন পাশাপাশি স্নাতক সম্মান (গার্হস্থ অর্থনীতি) কোর্স চালু হয়। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে সমন্বিত গার্হস্থ্য অর্থনীতি থেকে ৫টি বিভাগ ৫টি সম্মান কোর্স চালু করা হয়। বিভাগগুলি হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ, গৃহব্যবস্থাপনা ও গৃহায়ন, শিশুবিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক, ব্যবহারিক শিল্পকলা এবং বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প।

ব্যবহারিক শিল্পকলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প, নকশা, বুনন, প্রিন্টিং, মৃৎশিল্প, পাটশিল্প ইত্যাদি। এখানকার শিক্ষার্থীরা কয়েল পদ্ধতি, স্ল্যাব পদ্ধতিতে হাতের সাহায্যে মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরি করে থাকে।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ (আজিমপুর) ছাড়াও বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকোনমিক্স, ময়মনসিংহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজেও মৃৎশিল্প বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে খুলনা চিটাগাং ও নারায়ণগঞ্জে আর্ট কলেজ রয়েছে। এখানে বর্তমানে মৃৎশিল্প বিভাগ না থাকলেও অদূর ভবিষ্যৎ-এ মৃৎশিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মৃৎশিল্পের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাই যুগোপযোগী আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রতিষ্ঠান সমূহই পারে মৃৎশিল্পের গৌরবজ্জ্বল অতীতকে বর্তমান করতে।

প্রশিক্ষিত শিল্পীদের কাজে ব্যবহার্য দিকের সাথে নান্দনিকতার মেলবন্ধন বাংলাদেশের মৃৎশিল্পকে বিশ্ববাজারে নতুন করে পরিচিত করেছে। একই সাথে হারানো ঐতিহ্যকে ঘুরে দাঁড়াতেও সাহায্য করছে। প্রশিক্ষিত শিল্পীদের শিল্পকর্ম আমরা দেখতে পাই আড়ং, যাত্রা, ক্লে ইমেজ হ্যান্ডমেইড সিরামিক (সানরাইজ প্লাজা), ক্লে স্টেশন (বনানী কে ব্লক, রোড ২০, বাড়ি ২৮) শিল্পচর্চা (বাড়ি–২, সড়ক ৭, ব্লক-সি, সেকশন–৬, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬), আইডিয়া ক্রাফটস (মোহাম্মদপুর, ঢাকা) আইডিয়া'স কর্ণার, ভার্টিক্যাল (আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা), আইডিয়া, কাঠঠোকরা (আসাদগেট, ঢাকা) ছাড়াও আরও বেশ কিছু শো-রুমে।

বাংলাদেশে আধুনিক মৃৎশিল্পচর্চার ক্ষেত্রে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ-দেশের কয়েকজন শিল্পী বিদেশে মৃৎশিল্পের উপর শিক্ষা সমাপন

করে বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক কলাকৌশলের পরিচয় ঘটে। এদেশে সমকালীন শিল্পীরা মৃৎশিল্পের ব্যবহারিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে নতুনতর ভাবনায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। ফলে শিল্পীরা এক নিবিড় ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে আধুনিক কলাকৌশলের সহায়তায় সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণ করে চলেছেন। সাম্প্রতিক সময়ের মৃৎশিল্প সৃজনশীল না আধুনিক ভাবধারার উপস্থাপনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কালের পরিক্রমায় তা ধারণ করেছে আধুনিক থেকে আধুনিকতার রূপ। ঐহিত্যবাহী মৃৎশিল্পকে সমকালের উপযোগী করে ব্যবহার করার জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

বিসিক

(বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মূখ্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী নৈপুণ্যভিত্তিক প্রযুক্তির পাশপাশি আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, সমীক্ষা প্রণয়ন, বিপণন ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিয়োজিত কারুশিল্পীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করে থাকে।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার এদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালে সরকারি আইনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কুটির শিল্পসহ সমগ্র শিল্পখাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার কুটির শিল্পকে পূর্ণগঠন এবং কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাকে পূর্ণগঠন করে নতুন নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) । (কুটির শিল্প-বাংলা পিডিয়া)

শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশেল ঐতিহ্য আধুনিকতার সমন্বয়ে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কুটির শিল্পের নানা ধরনের সৌখিন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী। এর উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ডিজাইন সেন্টারে অন্যান্য পাঁচটি বিভাগের পাশাপাশি মৃৎশিল্প বিভাগটি ঐতিহ্যবাহী আধুনিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যবাহী আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত করে রং-তুলির সংমিশ্রণে উজ্জীবিত করা এবং আধুনিক বিশ্বে এর পরিচিতি আনয়ন করা। তখন মৃৎশিল্প বিভাগে একজন ক্রাফটসম্যান ও একজন ডিজাইনার নিয়ে শুরু হয়। তখন মোস্তফা শওকত কামাল মৃৎশিল্প বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। ডিজাইন সেন্টারে যোগদানের পর ২-৩ বছর সময় লেগেছে বিভাগটি তৈরি করতে। প্রথম দিকে এ বিভাগে শুধু নমুনা তৈরি করা হতো।

ডিজাইন সেন্টারে মৃৎশিল্প বিভাগে দুইটি হুইল ও একটি চুল্লী নিয়ে কাজ শুরু হয়। সে সময় ডিজাইন সেন্টারে এসে কেউ কাজ শিখতো না। মোস্তফা শওকত কামাল প্রথমদিকে নিজে বাংলাদেশের বিভিন্ন কুমার পল্লী অঞ্চলে গিয়ে সরকারি লোক হিসাবে পরিচয় দেন এবং ট্রেনিং এর ব্যাপারে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাকে দেখে তারা রীতিমত ভয় পেত। ডাকলে কাছে এসে কথা বলতে চাইতো না। অবশেষে দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেক কষ্টে তাদেরকে বুঝিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য রাজী করানো হয় এবং ট্রেনিং দেয়া হয়। এই ট্রেনিং এ তাদের মোল্ড ও থ্রোইংয়ের উপর শিক্ষা দেয়া হতো। মোল্ডের উপর বেশি জোর দিয়েছেন কারণ তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন কোন কোন অঞ্চলের মাটির প্লাস্টিসিটি কম, প্লাস্টিসিটি কম থাকলে মাটি থ্রোইংয়ের সময় ভেঙে যেতে পারে। এছাড়াও তাদেরকে মাটির ছাকন পদ্ধতির ধারণা দিতেন। কিভাবে মৃৎসামগ্রী গুলো ডিজাইনের মাধ্যমে সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা যায় এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আগে কুমাররা সাধারণ হুইল ব্যবহার করতো তাতে সেন্টারিং ঠিকমতো হতো না। ফলে মৃৎসামগ্রী অনেক বিনষ্ট হতো। কিন্তু 'ডিজাইন সেন্টার' থেকে চালিত হুইল দ্বারা কিভাবে দ্রব্যের গুণগত মান উৎকর্ষ সাধন করা যায় তা

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথম দিকে কুমারদের আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ করার আগ্রহ তৈরির জন্য একশত টাকা করে স্টাইফেন দেয়া হতো বিসিক থেকে এবং যে সব কুমাররা ভালো কাজ করতো তাদের পুরস্কার হিসেবে পায়ে চালিত হুইল ফ্রি দেয়া হতো। এভাবে অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার ফলে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তাদের জীবন মাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। এভাবে ষাটের দশকে ১৯৬৮ সালের দিকে কুমার সম্প্রদায়গণ বিসিক এর সহযোগিতায় ছোট-খাটো বিভিন্ন দোকানে তাদের কাজ বিক্রি করতে লাগলো। এভাবে মৃৎশিল্পের উপর প্রশিক্ষণের ফলে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হতে থাকে।

বিসিক এর অধীনে একাধিক ট্রেনিং সেন্টার বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। যেমন পটুয়াখালী, খুলনার মউকরনী, বহুড়ার মহিষাবান, ঢাকার কাকরান ও নয়ারহাট ছাড়াও আরও অনেক জায়গায়। পরবর্তীতে দেখা যায় বংশ পরম্পরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ট্রেনিং নিতে আসে। প্রথম দিকে বিসিক থেকে পরম্পরার শিল্পীদের গ্লেজের উপর প্রশিক্ষণ দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি কেননা গ্লেজ শিখতে পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন যা তাদের ছিলনা। কিন্তু তাদের উৎপাদিত সামগ্রীগুলো বিসিক এর চুল্লীতে গ্লেজ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। মৃৎশিল্পীদের ব্যবসার সাহায্যার্থে বিসিক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। যারা পূর্ব পুরুষদের পেশা ত্যাগ করেছিল, প্রশিক্ষণ লাভের ফলে শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আস্থাশীল হয়েছে।

১৯৮৫ সালে বিসিক কারুপল্লী নামে একটি সমীক্ষাভিত্তিক বই প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় বাংলাদেশে ৬৬৬ টি কারূপল্লীতে ১৮ হাজার পরিবার ৭৬ হাজার মৃৎশিল্পী কারিগর রয়েছে। এই শিল্পে মোট বিনিয়োগ ১০ কোটি ৬০ লক্ষ। বাৎসরিক পণ্য উৎপাদন ৩৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার। মৃশিল্প পরিবার, পাড়া ও স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক। এ শিল্পের কারিগর প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। চিটাগাং এ একটি গ্রাম আছে যেখানে সব কুমাররাই মুসলিম। এছাড়া নোয়াখালীর আরও দু'এক জায়গায় স্বল্প সংখ্যক মুসলমান কুমারদের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্প পল্লীগুলোর মধ্যে কুমিল্লার বিজয়পুর, পটুয়াখালীর মদনপুরা, ফেনীর চম্পকনগর, শরীয়তপুরের কার্তিকপুর, সাতক্ষীরার কলারোয়া এবং ঢাকার রায়ের বাজার অন্তর্ভুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানটি বংশপরম্পরার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের ঐতিহ্যবাহী নৈপুণ্যভিত্তিক প্রযুক্তির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, সমীক্ষা প্রণয়ন, বিপণন ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিয়োজিত কারুশিল্পীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করে।

এছাড়া বেসরকারিভাবে আবার কোথাও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা পরম্পরার শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশিক্ষিত শিল্পী এবং শিল্পকর্ম

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রশিক্ষিত শিল্পী এবং শিল্পকর্ম

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের আধুনিকতায় পর্দাপণ প্রশিক্ষিত শিল্পীদের হাত ধরেই। আধুনিক শিল্পের বিকাশ লোকজধারা থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত, পরিমার্জিত, বিবর্তিত, উন্মেষিত ও পরিশীলিত হতে হতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে নিজের মতো নতুনতর সময়োপযোগী শিল্প নির্মাণের প্রশিক্ষিত শিল্পীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনের মৌলিক নান্দনিক ও দার্শনিক গুণাবলির সাথে এই শিল্পীরা তাদের একান্তই নিজস্ব শিল্পকর্মের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন কিছু তৈরি করে একদিকে শিল্প-ভাস্বর্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি অপরদিকে তাদের শিল্পকর্ম মানুষের কল্যাণে মৌলিক রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এগিয়ে নিয়েছে বিশ্বকে।

বিংশ শতকে ইউরোপে শিল্পান্দোলনের অংশ হিসেবে মৃৎশিল্প মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্টুডিও মৃৎশিল্পের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে সময় অনেক শিল্পী সৃজনশীল মৃৎশিল্প তৈরিতে আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপীয় চিত্রকর ও ভাস্করদের মৃৎশিল্পে আত্মনিয়োগ ও নানামুখি মৃৎপাত্র নির্মাণ মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রকে করেছে সমৃদ্ধশালী। দক্ষ ও অদক্ষ মৃৎশিল্পীদের সাথে অন্য শিল্পমাধ্যমের গুণী শিল্পীগণ সম্মিলিত কর্মসম্পাদন করেছেন। পাবলো পিকাসো, হেনরি মাতিন, সামলভাদর দালি, ওয়াসিলি, কান্দিনস্কি স্টুডিওভিত্তিক সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যার প্রভাব জার্মান, ব্রিটেন, চায়না, জাপান, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও বাংলাদেশে পড়েছিল। (ফয়সাল, ২০১৪ : ১১০) এবং কালের পরিক্রমায় স্টুডিও সিরামিকের ব্যাপ্তি বেড়েই চলেছে। শিল্পীর একান্ত নিজস্ব শিল্পময় নান্দনিক মনোভঙ্গি প্রকাশের জন্য এই মাধ্যমটি তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কমবেশি ৩০,০০০ বছরের পুরোনো একটি মাধ্যম নতুন মাত্রায় শিল্পের জগতকে আরো বেশি বিকশিত করে তুলেছে।

বাংলাদেশে আধুনিক মৃৎশিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগের ভূমিকা শুরু থেকে আজ অবধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬২ সালে সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণের যাত্রা শুরু হয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উৎসাহে শিল্পী মীর মোস্তফা আলী এবং জাপানি মৃৎশিল্পের শিক্ষক কোইচি তাকিতার হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই প্রতিষ্ঠানে আর একজন শিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি হলেন শিল্পী মরণচাঁদ পাল। শিল্পাচার্যের আরেক আবিষ্কার। ঢাকার রায়ের বাজারের পাল সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক শিল্পী মরণচাঁদ পালকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তাই শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে ফলে এখানকার মৃৎশিল্প এক নান্দনিক রূপ লাভ করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকজন শিল্পী বিদেশে মৃৎশিল্পে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার (১৯৫৪-২০০৫) চীন থেকে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। শিল্পী অলক রায় ভারতের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেরাকোটার ওপর ডিগ্রি লাভ করেন। ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক কলাকৌশলের পরিচিত হয় এখানকার শিল্পীরা। সমকালীন শিল্পীরা মৃৎশিল্পের ব্যবহারিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে নতুনতর ভাবনার সংযোগ ঘটিয়েছেন তাদের শিল্পকর্মে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগ বাংলাদেশে গবেষণামূলক নতুনতর আবিষ্কারের মৃৎশিল্প নির্মাণ কেন্দ্রস্থল। এখান থেকেই বর্তমানের সৃজনশীল ধারার মৃৎশিল্পের বিস্তৃতি এখানকার শিক্ষার্থী শিল্পীদের ভাবনায় রয়েছে মৌলিক গবেষণা ও শিল্পদর্শনের নিরীক্ষা। বাংলাদেশের সমকালীন মৃৎশিল্প ভুবনের কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে বিশালায়তন এবং প্রায় তিন দশকের বিভিন্ন প্রজন্মের অসংখ্য শিল্পদ্রষ্টার কর্মনিষ্ঠার বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ হয়েছে সৃজনশীল মৃৎশিল্প। প্রথম সারির তথা পূর্বসূরি মৃৎশিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজন্মের মৃৎশিল্পী এবং সমকালের অপেক্ষাকৃত নবীন শিল্পীরা শিল্পাঙ্গনে নব নব মাত্রা যোগ করে অগ্রজ শিল্পদ্রষ্টাদের সাফল্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে বিগত তিন দশকে আধুনিক মৃৎশিল্পের অগ্রগতি বেশ প্রশংসনীয়। এদেশের সমকালীন আধুনিক মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিল্পীদের প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা, ঐতিহ্য চেতনার সাথে সম্পৃক্ততা। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অনেক শিক্ষার্থী শিল্পীর ভাবনায় রয়েছে মৌলিক গবেষণা ও শিল্পদর্শনের নিরীক্ষা। ব্যয়বহুল এই শিল্প মাধ্যমে নিয়মিত হওয়া কষ্টসাধ্য। তাই অনেক শিল্পী অনিয়মিতভাবে এই শিল্পচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এই আধ্যায়ে যে ক'জন শিল্পীরা নিরলসভাবে মৃৎশিল্প গবেষণা ও নির্মাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই শিল্পকে বিশেষ মর্যাদা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এবং রাখছেন তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

শিল্পী মরণচাঁদ পাল

১৯৪৬ সালে ঢাকার রায়ের বাজার পাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মৃৎরাজ মরণচাঁদ পাল। পিতা স্বর্গীয় রাণী পাল। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প যেহেতু একটি বংশপরম্পরার শিল্প তাই পারিবারিক রেওয়াজ স্বরূপ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মরণচাঁদ পাল ও শৈশব থেকে মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরির কাজে যুক্ত হন। শিল্পী আনুমানিক ১৯৬০ সাল থেকে কাজ করছেন। স্মৃতিচারণ করে জানান সেই সময় যাদের সাথে কাজ করতেন তারা হলেন মহাদেব পাল, কালিচরণ পাল, অমূল্য পাল ও হরিমঙ্গল পাল। মরণচাঁদ পালের বক্তব্য অনুযায়ী 'বঙ্গবিনোদ রায় নামে একজন জমিদার ছিলেন। তিনি প্রতিমা বানানোর জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে পাল নিয়ে এসেছিলেন। সেই পালরাই এখন রায়ের বাজারের বাসিন্দা। নিঃসন্দেহে মরণচাঁদ পাল মুর্শিদাবাদ থেকে আসা সেই পালদের একজন যোগ্য উত্তরসূরি।

মরণচাঁদ পাল মাটি শিল্পের কারিগর। তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রতিমা তৈরি করলেও মূলত মাটির হাঁড়ি পাতিলই তৈরি করতেন। মাটির তৈরি তৈজসপত্র ও দেব-দেবতার মূর্তির দেয়াল টপকে মৃৎসামগ্রীকে তিনি নিয়ে গেছেন শিল্পামোদী মানুষের কাছে। মাটিতে দিয়েছেন শিল্পের নতুন মাত্রা। মৃৎসামগ্রীকে করেছেন মৃৎশিল্প। খ্যাতনামা শিল্পী মরণচাঁদ পালকে তাই মৃত্তিকার বরপুত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশের শিল্পকলার পুরানো ও চিরায়ত। শিল্পকর্মগুলোকে তিনি নিজস্ব আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন।

শিল্পী আর্ট কলেজে আসার স্মৃতিচারণ করলেন এভাবে "রায়েরবাজারে তখন একটা নদী ছিল। সেখান থেকে আমরা দল বেঁধে মাথায় করে মাটি নিয়ে এসে ঘরে বসে নানান ধরনের পুতুল বানাতাম। তখন সিক্স, সেভেনে পড়ি। এরকম একদিন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এলেন রায়েরবাজার পালপাড়ায়। তার সঙ্গে ছিল আর্ট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। স্বশিক্ষিত পালদের হাতের তৈরি কাজ দেখে তার খুব ভাল লেগে যায়। তিনি পালদের কাজে শিল্পের ছোঁয়া দিতে চাইলেন। আর এ জন্য তিনি তখন মরণচাঁদ পালের জ্যাঠামশাইকে ডেকে বলেন, 'আপনাদের ঘরে তো অনেক পোলাপাইন। একটা আমাদের দ্যান।' যেই কথা সেই কাজ।' মরণচাঁদ পালের জ্যাঠামশাই ভুল করেননি। উল্লেখ্য যে, মরণচাঁদ পালের নাম ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ পাল। 'মরণচাঁদ পাল' নামটি শিল্পাচার্যের দেয়া।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কিশোর মরণচাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিকটি বিবেচনা না করে শুধু কারিগরি দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে ভর্তি করে নেন মৃৎশিল্প বিভাগে। তাঁর এই সিদ্ধান্তটি যে কতখানি যুগান্তকারী ছিল তা প্রমাণিত হয় পরবর্তীকালে। এই কিশোরই পরবর্তীতে মৃৎশিল্প বিভাগটির হাল ধরেছিলেন।

মরণচাঁদ কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতিচারণ করেন এভাবে "১৯৬১ সাল, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে চলে গেলাম চারুকলা ইনস্টিটিউটে। এখনকার জয়নুল গ্যালারির পেছনে ছিল তখন মৃৎশিল্প বিভাগ। ওখানে মাটিতে বসেই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। তিনিও ওদিন ওই ক্লাসের ছাত্র হয়ে যান। ক্লাসে মাটির একটি শিল্পসামগ্রী দেখিয়ে শিল্পাচার্য আমাকে বললেন, বুঝলা, তুমি এইসব বানানো শিখাইবা। তারপর বিভাগীয় শিক্ষাক মীর মোস্তাককে ডেকে আমাকে দেখিয়ে বলেন, নেন, একে মানুষ করেন।" ১৯৬১

সালে শুরু হয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের মৃৎশিল্প বা সিরামিকস ডিপার্টমেন্টের প্রথম ব্যাচের পড়া। এই বিভাগে তখন মাত্র পাঁচজন ছাত্র ছিলেন । ছাত্ররা হলেন গোপেশ মালাকার, হাশেম খান, মোস্তফা শওকত কামাল, সিরাজুল ইসলাম ও মরণচাঁদ পাল। জয়নুল আবেদিন তখন প্রতিদিন ক্লাসে আসতেন। খোঁজ নিতেন ক্লাসের অনুশীলনের। অনুশীলন করতে করতে মরণচাঁদ পাল একদিন অনুভব করলেন মাটি তো মাটি না, এ যে সোনা! এই মাটিকে যা বলি তাই হয়। হাতি বললে হাতি, পাখি বললে পাখি। শিক্ষা কোর্স শেষ হয় ১৯৬৩ সালে। তিন বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন তিনি। ১৯৬৫ সাল থেকে চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। (আজহারুল, ২০১১ : ২০১)

শিল্পী মরণচাঁদ পাল ১৯৬৩ সালে মৃৎশিল্পের ওপর সার্টিফিকেট কোর্স এবং ১৯৭৯ সালে ভারতে পটারি ডেভলপমেন্ট সেন্টারে মৃৎশিল্পের কোর্স করেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সমকালীন শিল্পকলার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে মৃৎশিল্পের ওপর শ্রেষ্ঠ এবং ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন থেকে শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হন। ১৯৮৬ সালে এশিয়ান রিজওনাল আর্টিজ্যান ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে “মাস্টার ক্রাফ্টম্যান” সার্টিফিকেট লাভ করেন। একই বছর তিনি জাতীয় কারুশিল্পী পরিষদ থেকে মৃৎশিল্পে দক্ষতার জন্য “শিলু-আবেদ” পুরস্কার পান। তিনি দীর্ঘ ৪৪ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষক ছিলেন। ২০০০ সালের ২১ মে হতে ২১ জুলাই পর্যন্ত দুই মাসব্যাপী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত “বাংলাদেশের সমকালীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প” প্রদর্শনীতেও মরণচাঁদ পাল তাঁর উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পকর্ম নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় জাদুঘরকে এসব শিল্পকর্ম উপহার হিসেবে প্রদান করেন। জাতীয় জাদুঘরের “পুতুল” গ্যালারিতে এই শিল্পকর্মগুলো স্থান পেয়েছে। (আজহারুল, ২০০৭ : ১১)

বাংলাদেশের শিল্পকলার পুরনো ও চিরায়াত শিল্পকর্মগুলোকে তিনি তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে তৈরি করে মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর তৈরি পুতুল, হাতি, ঘোড়া, কচ্ছপ, ছাইদানিসহ ঘর সাজানোর বিভিন্ন মনলোভা শিল্পকর্ম যে কারও দৃষ্টি কাড়ে। আজ যে কেউ তার কাজ দেখলেই চিনতে পারে যে এটা মরণচাঁদ পালের কাজ। এটাই তার শিল্পী জীবনের সার্থকতা। মাটি শিল্পেরদ এই কারিগর বংশপরম্পরার সূত্রে পাওয়অ মৃৎশিল্পের কাজ করতে করতেই আজ ‘মৃৎরাজ’। তিনি নিজ উদ্যোগে নিজ গৃহে গবেষণামূলক কাজের পাশাপাশি স্থানীয় যুবক ও যুব মহিলাদের মৃৎশিল্পের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন। “মৃৎরাজ” নামে খ্যাত মরণচাঁদ পাল পশুপাখির প্রতিকৃতি গড়গার অনন্য কারিগর। শুধু দেশেই নয় বিদেশেও তাঁর শিল্পকর্মের চাহিদা রয়েছে। খ্যাতনামা শিল্পী মরণচাঁদ পালকে মৃত্তিকার বরপুত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

‘মরণচাঁদের বাড়ির সামনে মাটির ফলকে লেখা ‘মৃৎরাজ’। এটা তাঁর স্টুডিও। নিজেকে তিনি মৃৎরাজ বলেন। অহংকারে নয়, মাটিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। কারণ মাটি এমন স্বর্ণ প্রসবা যে তাকে রাজা বানিয়ে দিয়েছে। রায়ের বাজারের এই বাড়ি থেকে হাতি-ঘোড়ায় চড়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সাগর বাড়ি দিয়ে

যাচ্ছে অন্য মহাদেশে। ৮ হাজার হাতি যাচ্ছে কানাডায়। ২ হাজার মিনি ঘোড়া যাচ্ছে জাপানে। ২ হাজার কচ্ছপ এগুচ্ছে আমেরিকার দিকে। (মইনুদ্দীন খালেদ, প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০৪।)

বাণিজ্যিক ধ্যানধারণা নির্ভর পটারি নির্মাণ করলেও তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে স্বকীয়তার সন্ধান পাওয়অ যায়। স্টুডিও পটারিগুলো হুইল ব্যাজ আদের্নওয়ার (Earthen Ware) ঐতিহ্যবাহীর আদলে নির্মাণ করেন শিল্পী। আধুনিক ফর্মের তোয়াক্কা না করে শিল্পী এদেশের ঐতিহ্যবাহী (হাঁড়ি, মটকা, ঝাঁজর, দুনা ইত্যাদি) বিভিন্ন পটারির ফর্ম বা আদলকে ভেঙে নতুন রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন নিজস্ব ঢংয়ে। যা একটি নতুন বৈশিষ্ট্যে আবির্ভূত হয়ে নিজস্ব রূপ ধারণ করে। শিল্পী তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন আকৃতির পটারিতে বিভিন্ন রংয়ের গ্লেজ ব্যবহার করেছেন, যা পটারির আদলকে করেছে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয়। বিশেষ করে তাঁর তৈরি বিস্কুট রঙের ওপর সাদা গ্লেজের রিলিফ আলপনা করা পটারির জনপ্রিয়তা পরবর্তী প্রজন্মের অনেক শিল্পীকে আকৃষ্ট করে।

ঐতিহ্যের ধারক মরণচাঁদ পাল স্টুডিও পটার এর সাথে সাথে পুতুল শিল্পী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। মরণচাঁদ পাল পুতুল তৈরিতে ব্যবহার করেন দেশীয় উপকরণ। তিনি পুতুলকে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য শুধু হাতে নয় প্রয়োজনে হুইল বা চাকের ব্যবহার করেছেন। এতে লোকজ ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পুতুলের ক্ষেত্রে কখনো ছাঁচের ব্যবহারও করেছেন। তবে বেশিরভাগ পুতুলই হাতে টিপে টিপে করেছেন। মরণচাঁদ পাল যেত ধরনের পুতুল তৈরি করতেন তার মধ্যে দাঁড়ানো ঘোড়া, চাকাওয়ালা ঘোড়া, হাতির পিঠে মানুষ, গুডলাক হাতি, রাজা ও মাহুত হাতি, হাতির পিঠে মোমদানি, সাইকেল চালক ও শিশু, লাল ও কালো রঙের মেয়ে পুতুল, দাঁড়ানো ভঙ্গিমায় মা ও শিশু, মা ও শিশু বসা পুতুল, পুতুলের চুল বাঁধার দৃশ্য, ময়ূর মোমদানি, বড় হাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সব পুতুল ক্রমান্বয়ে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। শিল্পী মরণচাঁদ পাল তাঁর নিজস্ব কৌশলে তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছেন। ষাটের দশকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনের দিকে যাত্রা শুরু করে মরণচাঁদ পালের মৃৎশিল্প। তখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কুসুম হুদার চম্পক নামে একটা দোকান ছিল তিনি মরণচাঁদের টেপাপুতুল পছন্দ করে ফেলেন । শুরু হলো বাংলার টেপা পুতুল সরবরাহ, যা কিনা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বিদেশিদের হাত ধরে গেল বহুদূর। এরই ধারাবাহিকতায় ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির স্বনামখ্যাত হেনরি গ্লাসি তাঁর ট্রাডিশনাল আর্ট অব ঢাকা বইতে শিল্পী মরণচাঁদ সম্পর্কে লিখেছেন –

> Maran Chand takes a terracotta statue from the shelf to tell us. “I made this elephant on the basis of the idea I formed from that horse,” It was his own idea. He threw the legs, modeled the head and made the mold. From the mold he lifts the rough form to which he applies ears and eyes and tusks and ornaments. Having designed one at the scale of the original horse, he then, as with the horses, added smaller elephants. One of the small elephants, modeled on the large one, he glazes in a manner reminiscent of the celebrated pottery of Haji in Japan. Smaller

> and smaller ones are slipped and fired, red or black. The masters of khamarpara push realism in their horses and elephants. Maran Chand does the opposite. He confines his horses and elephants in symmetrical abstraction. (Henry, 2000 : 289) Henry Glasie, Traditional Art of Dhaka, Bangla Academy. Dhaka, May 2000, Page 289.

মাটির প্রতি শিল্পীর ভালোবাসা জন্ম-জন্মান্তরের তাইতো মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ে মাটি ছেড়ে কোথাও যাননি শিল্পী মরণচাঁদ পাল। বহু বিপদ-আপদের মধ্যে মাটির এই মানুষটি দেশের মাটি আঁকড়ে রয়েছেন। রাজাকারদের হাতে বন্দিও হয়েছিলেন সে সময়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ফিজিক্যাল ট্রেনিং ক্যাম্পে। কিন্তু তাঁর শিল্পকর্মের এক ভক্ত রাজাকার সেদিন শিল্পীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি তাঁর বাড়িতে স্কুল খুলে ছিলেন। অসহায়, পঙ্গু মানুষদের মৃৎশিল্প তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। তাদের কাজ শিখিয়ে আবার মাসে ৭৫ টাকা বৃত্তি দিতেন তিনি। এ টাকা তাঁদের কাজ বিক্রি করেই সংগ্রহ করতেন তিনি। তবে বেশিদিন চালাতে পারেননি এই স্কুল। তিনি প্রায় দুই শত শিক্ষার্থীকে মৃৎশিল্প নির্মাণ বিষয়ে সরাসরি শিক্ষা দিয়েছেন। (আজহারুল, ২০১১ : ১০৩)

মৃৎশিল্পী মরণচাঁদ পালের অজস্র শিল্পকর্ম দেশ-বিদেশে যেমন বাংলাদেশকে পরিচিত করেছে তেমনি খ্যাতিও অর্জন করেছে। বিশ্বের অনেক দেশের জাদুঘরেও সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর কাজ। বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনে তাঁর নির্মিত টেরাকোটা ফলক, বিসিআইসি ভবনসহ একাধিক ব্যাংকে তাঁর কাজ সংরক্ষিত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য মরণচাঁদ পাল ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প নির্মাণে দেশ এবং বিদেশে ব্যবসায়িক সাফল্যের অগ্রদূত হিসেবে উল্লিখিত। তিনি তাঁর কাজে ঐতিহ্যের ধারণাকে লালন করেছেন। ঐতিহ্যের ধারক মরণচাঁদ পাল স্টুডিও পটার এর সাথে সাথে পুতুল শিল্পী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১৩৯
শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৪০
শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৪১
শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৪২
শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৪৩
শিল্পী মরণচাঁদ পালের শিল্পকর্ম–৫

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার

শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই শিল্পীকে ইংল্যান্ডের বানার্ড লীচ ও জাপানের সোজি হামাদার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দেখা হয়। গুণী এই শিল্পীর বাংলাদেশে স্টুডিও পটারির প্রসারে বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি এদেশে স্টুডিও পটারিকে সৃজনশীল শিল্প হিসেবে পরিচিত করেছেন।

চারুকলা অনুষদের প্রথম বিভাগীয় প্রধান মীর মোস্তফা আলীর সুযোগ্য ছাত্র আবু সাঈদ তালুকদার চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা শেষ করে চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে চীনের বেইজিং সেন্ট্রাল একাডেমী অব এ্যাপ্লায়েড আর্টস ব্যাচেল অব আর্টস ডিগ্রি ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের মৃৎশিল্প বিভাগে শিল্পী তৈরির মহান ব্রত নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন।

শিল্পী আবু সাঈদ প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে মৃৎশিল্পকে নতুন মাত্রা দিতে চেষ্টা করেছেন। ঢাকার মিরপুরে স্টুডিও স্থাপনের মাধ্যমে সৃজনশীল শিল্পে আত্মনিয়োগ করে আধুনিক মৃৎশিল্পের বিভিন্ন নিরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সফল হয়েছেন তিনি। সমকালীন বাংলাদেশের আধুনিক মৃৎশিল্পের সার্বিক অবস্থান, গুণগত মান এবং ব্যবহারিক মৃৎশিল্পের পাশাপাশি সৃজনশীল মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস চেষ্টা এবং ত্যাগ বিশেষ লক্ষ্যণীয়। একজন প্রকৃত শিল্পীর মতই তিনি সব সময় নিয়োজিত ছিলেন সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে। তাঁর নেশা ও পেশাই ছিল নতুন ফর্ম সৃষ্টি বা আবিষ্কার করা। তিনি সকল বিষয়ের মধ্যে নতুন কিছু অন্বেষণ করেন। শিল্পী তার শিল্পনুভূতি ও শিল্পবোধ সচেতনতার সবদিক মিলিয়েই সৃষ্টি করেন তাঁর শিল্প, যা শিল্প পিপাসু মানুষকে আনন্দ দান করে। শিল্পী তার জীবনদ্দশার পুরোটা সময়ই মৃৎশিল্পের সৌন্দর্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই শিল্পে নতুন মাত্রা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে বিরামহীনভাবে চর্চা করেছেন স্টুডিও পটারির। এই বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প মাধ্যমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছেন আবার কখনও সফলতার দেখা পেয়েছেন। অদম্য এই শিল্পী ব্যর্থতা ও সফলতাকে সঙ্গী করেই একের পর এক নব নব নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এর শিল্পকর্মে। নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলেন শিল্পী।

শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার পটারির ফর্ম বা আদলের মধ্যে এবং পাত্রের ওপরে অর্থাৎ পাত্রের গায়ে অলংকরণের প্রক্রিয়য়ার মধ্যে নান্দনিকতা বা শিল্পের বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলেন। শিল্পীর তৈরি পটারির আবার, আকৃতি এবং অলংকরণের প্রক্রিয়াতেও বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। শিল্পী তরি তৈরি পটারির আদল সম্পর্কে বলতেন, 'আমি আদল নির্মাণে পটারির বেসিক ফর্ম স্কোয়ার, বৃত্ত, ট্রাঙ্গেল, অর্ধবৃত্ত, সিলিন্ডার) নিয়ে বিভিন্ন মাত্রায় রূপ দেয়ার চেষ্টা করি।

এর মধ্যে মানুষ, পশু, পাখি, ফুল, মাছ ও অন্যান্য বস্তুর ফর্মকে পুরোপুরি বিমূর্তভাবে উপস্থাপন করি আবার নিজস্ব বোধশক্তির স্বকীয়তায় নান্দনিকতা দিয়ে। (সাক্ষাৎকার : শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার)

শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও সুন্দরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানালোকের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেছিলেন। ফলে একটি ভাস্কর্যের আদল নির্মাণে বৈচিত্র্যের যে সন্ধান মেলে তেমনি একটি পটারির আদল নির্মাণেও বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। যাকে ভাস্কর্যের গুণাগুণসম্পন্ন শিল্পকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তার তৈরি সমস্ত পটারির ফর্ম নয় বরং এক রঙের অভিনব বিন্যাস এবং নানান গ্লেজের বৈশিষ্ট্য শিল্পবোদ্ধাদের আকৃষ্ট করেছিল। মৃৎসামগ্রীতে সাধারণত উজ্জ্বল রঙের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও শিল্পী সাঈদ তাঁর তৈরি পটারিতে রং একটু ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। শ্যাওলা, নীলচে, আকাশি, ধূসর, হালকা সবুজ, কমলা, বাদামি, খয়েরি, গাঢ় সবুজ, ময়ূরকণ্ঠি, তমাটে ইত্যাদি রংই প্রাধান্য পেয়েছে শিল্পী আবু সাঈদের শিল্পকর্মে। শিল্পী গতানুগতিক ধারা অনুসরণে চিত্রাঙ্কনে যুক্ত না হয়ে বরং পটারিতে কখনও আমাদের লোকজ নকশার আদর্শ ফুটিযে তুলেছেন। আবার কখনও সূক্ষ্ম সাবলীল সরল কিংবা রঙিন রেখার টানে নকশা ফুটিয়ে তুলেছেন। পটারির গায়ে। কোথাও তৈরি করেছেন বিমূর্ত–চিত্রকলার স্বাদ, যেমন পটারির গায়ের বিভিন্ন টেকচার, রেখা, আদল যা কখনও প্রচণ্ড সূর্যের তাপে ফেটে যাওয়া মাঠ, কখনও নানান ফুলের বাহারে বসন্তকাল আবার কখনওবা শিশিরের ভেজা ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুর সৃজনশীলতায় শিল্পবোধের উন্মেষ ঘটেছে। পটারির ত্রিমাত্রিক আকৃতির ক্ষেত্রে শিল্পীর ভাবনা একট নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কেননা একটি পটারি তার গঠনগত দিক দিয়ে ত্রিমাত্রিক কিন্তু সেই পটারির গায়ে অঙ্কিত চিত্রগুলো দ্বিমাত্রিক। অর্থাৎ শিল্পী সাঈদ ত্রিমাত্রিক গঠনে দ্বিমাত্রিক চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতার মাধ্যমে।

শিল্পী সাঈদ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বা করণকৌশলে পটারি নির্মাণ করেছিলেন। যেমন ফ্রিহ্যান্ড কয়েল বা স্ল্যাবে, আধুনিক হুইলে এবং এক্সট্রোডরের মাধ্যমে। ডিজাইন বা ড্রইং থেকে শুরু করে মাটি তৈরি, আদল নির্মাণ, পোড়ানো, গ্লেজ তৈরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর স্বকীয়তা লক্ষ্যণীয়। মৃৎশিল্পের প্রায় সকল মাধ্যমে তিনি কাজ করেছিলেন। যেমন আর্দেনওয়্যার (Earthenware) ট্রাইকালার পটারি, লেড গ্লেজ পটারি, মেডলিকা পটারি। স্টোনওয়্যার (Stoneware) স্টোনওয়ার পেরিয়াম পটারি, হার্ড গ্লেজ পটারি, সফট গ্লেজ পটারি। তবে লক্ষ্যণীয় চীনে উচ্চতর শিক্ষালাভের ফলে শিল্পীর কাজের মধ্যে চীনের অভিজ্ঞতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল অংশ মৃৎশিল্প, শিল্পী সাঈদের পটারির আদলে আমাদের লোকশিল্পের ঐতিহ্যবাহীতার মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও পটারির গায়ে অঙ্কিত চিত্রের নানা রূপের মধ্যে সেই লোকজ ধারার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না যা পাওয়া যায় তাকে চীনের ঐতিহ্যধরার পর্যায়ভূক্ত বলা যায়। তিনি পটারির আকৃতি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এদেশের ঐতিহ্যকে কিন্তু চিত্রায়নের বিষয় এসেছে অন্য উৎস থেকে। অর্থাৎ শিল্পী দেশীয় ঐতিহ্য ও চীনের ঐতিহ্য এ দুটি ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন আঙ্গিকে নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন।

শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার বাংলাদেশে সাতটি এবং চীনে একটি একক স্টুডিও পটারির প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে সফল আয়োজন। যা কিনা উত্তরসূরিদের দিক নির্দেশনার পথকে সুপ্রশস্ত করে এবং তাদের শিল্পকর্ম নির্মাণে বা স্টুডিও পটারির চর্চ করার উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে। মৃৎশিল্প জগতে উজ্জ্বল এই শিল্পী দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান অল্প বয়সে। তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মৃৎশিল্পে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ হারিয়েছে আধুনিক মৃৎশিল্পের এক পথ প্রদর্শককে। তবে শিল্পী সাঈদ তালুকদারের সৃষ্টি করা পথে ক্রমশ: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের স্টুডিও ভিত্তিক মৃৎশিল্প চর্চার নতুন ধারা।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১৪৪
শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৪৫
শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৪৬
শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৩

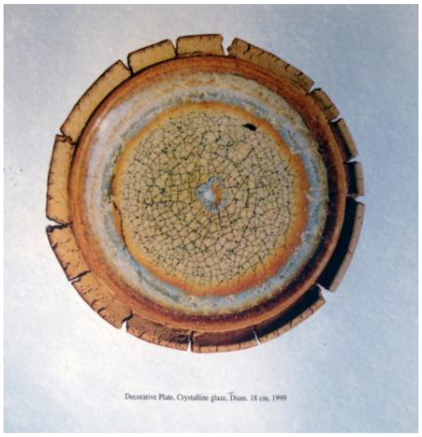

চিত্র–১৪৭
শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৪৮
শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৪৯
শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৬

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী অলক রায়

শিল্পী অলক রায় বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ভুবনে এক অতি পরিচিত নাম। গুণী এই শিল্পীর শুরুটা মৃৎশিল্প দিয়ে না হলেও আধুনিক মৃৎশিল্পে শিল্পী অলক রায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন।

শিল্পী অলক রায় ১৯৭৩ সালে বি. এফ. এ সম্পন্ন করেন ঢাকা কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফট থেকে। ১৯৭৮ সালে ভারতের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃৎশিল্প বিদ্যায় এম. এ. সম্পন্ন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগত শিক্ষা আর এদেশের ঐতিহ্যরীতি কৌশলের সমন্বয়ে নির্মিত মৃৎভাস্কর্যে এই শিল্পীর অবদান উল্লেখ করার মতো। ব্যতিক্রমী শিল্পী সৃষ্টির প্রয়াস নিয়ে মাটিকে ব্যবহার করেছেন সর্বোচ্চ নান্দনিক ও শৈল্পিক ভাবনায়। শিল্পী অলোক রায় মৃৎশিল্প বিদ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনশীল মৃৎশিল্প শিক্ষাদানে নিয়োজিত হয়েছেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত নবীন শিল্পী শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভাস্কর্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৮৬-১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ১২তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মান পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। পরবর্তীকালে তিনি মৃৎভাস্কর্যের নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা আর নবতর বিন্যাসে সম্মানসূচক পুরস্কার অর্জন করেন তৃতীয় এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে। ১৯৮৫ সালে তৃতীয় এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়ে শিল্পী শিল্পবোদ্ধাদের নজরে পরেন। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ৪র্থ এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। শিল্পী অলোক রায়ের এই সাফল্য বাংলাদেশের ভাস্কর্য তথা পোড়ামাটির ভাস্কর্যকে করেছে গৌরবান্বিত।

"১৯৮৫ সালে অলোক রায় পোড়ামাটির কাজ দিয়ে শিল্পানুরাগীদের হৃদয়মনে বড় ধরনের এক অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পোড়ামাটির কাজে আর্ত, বিপর্যস্ত ও অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও বেঁচে থাকার আর্তি ছিল। পরবর্তীকালে এই পোড়ামাটি নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। শিল্পী জীবনের প্রথম পর্বে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই চেতনাকে ধারণকরে তিনি পোড়ামাটি দিয়ে ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন, এইসব কাজে ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিক গুণাবলির মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন দেশের একজন অগ্রগণ্য ভাস্কর।" (Exhibition, 2008 : Encology of Mind-2)

প্রথিতযশা এই শিল্পীর শিল্পকর্মে ভাষা-আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরে নির্মাণ করেছেন টেরাকোটা ভাস্কর্য। আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ জীবন ও বাস্তবতার নানান বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে শিল্পীর পোড়ামাটিতে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিল্পী নির্মাণ করেছেন টেরাকোটার ফলক যা এদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্ভারকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেভ।

শিল্পী অলক রায় তার দীর্ঘদিনের পথ পরিক্রমায় সর্বদা সন্ধান করেছেন জীবনের নানা অনুষঙ্গ এবং তার সৃষ্টিতেও এই চেতনাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের করণকৌশলের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি আর নানান উপাদানের গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তাঁর ভাস্কর্য নির্মাণে। এদেশে কুম্ভকারদের ব্যবহৃত কমনক্লে (common clay) এবং পরম্পরার কিছু টেকনিককে তুলে ধরেছেন শক্তিশালী ভাস্কর্যরূপে তার সাবলীল ভঙ্গিতে। অনেক ক্ষেত্রে টেরাকোটার ঐতিহ্যবাহী রীতির সঙ্গে ব্যবহার করেছেন গ্লেজ, ফলে স্থায়িত্ব আর বিষয় বৈচিত্র্যে হয়েছে প্রাঞ্জল। টেরাকোটার ফলকে মাটির সাথে অক্সাইড ব্যবহার করে তারপর এনগব্স পদ্ধতি এদেশে তিনিই প্রথম সফলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন।

> If we look for the distinguishing marks of Alak Ray’s sculptures, the list won’t be too long, but each will certainly stand out for its uniqueness. Alaks early terracotta work shows both his predilection for installation-like arrangements (his work, indeed, is a precursor to that recent art form in this country) and his sharp eye for detail; his site-specific sculptures reveal an intimate understanding of what the Chinese call fang shui, or the spirit of the place: and instend of working solely on the put side of a sculpted object, he often starts with its interior spaces, slowly reaching outwards. This necessarily invites the viewer’s gaze both to the exterior and interior of an art object, thus eliminating restrictions of mass, volume and dimensionality. (Syed, Alak Ray, Exhibition 2008) (Syed Manzoorul Islam, Alak Roy’s Sculpture, Exhibition 2008)

শিল্পী অলক রায়ের কাজে রয়েছে মাটি ও মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, মাটি ও হাতের গভীর ছোঁয়া। আদিম ভাবানুভূতিতে সৃষ্ট সহজ সরল সাধারণ প্রকাশ। তিনি তাঁর কাজে তুলে ধরেছেন ধরিত্রীর রূপ অর্থাৎ মানব-মানবী, বীজ-বীজাধার, জল-কাদামাটি, আলো-বাতাস, বালি-পাথর প্রভৃতির পরস্পরের ভারসাম্য। আর মানব জীবনের প্রকৃতির বহুবিধ বৈচিত্র্যতায় সৃষ্ট শক্ত ও নরমের সামঞ্জস্যতাকে মানুষের অভিব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাকে অনুভব করতে চেয়েছেন মনের গভীরে। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে সৃষ্টিশীল আবিষ্কারের নেশায় আকাশ, চাঁদ, সূর্য এবং পৃথিবীকে আরো বসবাসযোগ্য করার দায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। বিন্যাস করেছেন পোড়ামাটির ভাস্কর্যে আধুনিক রূপ। শিল্পী ফ্রি হ্যান্ড মাধ্যমকে প্রাধান্য দিয়েছেন ফলে তাঁর শিল্পকর্ম তৈরিতে আধুনিক–যন্ত্রপাতির ব্যবহার মুখ্য নয়। প্রাচীন মৃৎশিল্প নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরণে কাদামাটি দিয়ে সাবলীল গড়ন আবিষ্কার করে নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। বাংলাদেশের মাটি পোড়ানোর পর তার পরিপক্ব রং তৈরির যাবতীয় বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করে যাচ্ছেন নিজের তৈরি স্টুডিওতে। সহজলভ্য সাধারণ মাটি ও এর সার্বিক গুণাগুণসহ সর্বোপরি মৃৎশিল্পের জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত করে যাচ্ছেন স্মরণকালের সৃজনশীল মৃৎশিল্পকে। চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে স্টুডিও স্থাপনসহ মৃৎশিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রের গবেষণায় যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্তমূলক। শিল্পী অলক রায়ের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আর সৃষ্টিশীল গবেষণায় এদেশের পোড়ামাটির ভাস্কর্য এবং সর্বোপরি মৃৎশিল্প পেয়েছে সমকালীন

শিল্পকলার বিবেচনায় সর্বোচ্চ সম্মান। বৃহদাকার ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে মাটি আর অল্পবিস্তর আধুনিক রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি করেছেন নানান টেক্সচার ও ভিন্নতর ইমেজ। আবার কখনও কখনও এদেশের মাটি আর চায়না মাটি মিশ্রণের কম্পোজিশনে ভাস্কর্যে ফুটে উঠেছে রং বৈচিত্র্যের বিশেষ আবেদন। অতিসাধারণ, সহজ সরল নির্মাণশৈলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের নানা রকম প্রতিকৃতিতে নানা ধরনের অভিব্যক্তি। (আজহারুল, ২০১১ : ২০৬)

ভাস্কর্য নির্মাণে শিল্পী অলক রায়ের বহুমাত্রিক সৃজনশীল উপস্থাপন বাংলাদেশের শিল্পকলার মানকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি শিল্পী দর্শক, সমালোচক এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ আর উদ্দীপনা, কেননা ঐতিহ্য চেতনার সাথে আধুনিক ভাবনার সমন্বয়ে শুধু আনন্দই প্রদান করে না, একই সাথে তৈরি করে ব্যাপক সৌন্দর্যবোধ আর উৎসাহ। ২০০৬ সালে চীনের বেইজিং-এ আয়োজিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ল্যান্ডস্কেপ ভাস্কর্য নির্মাণে পেয়েছেন একটি সম্মাননা পুরস্কার। হাজার বছরের সমৃদ্ধ পোড়ামাটি মাধ্যম পেয়েছে শিল্পী অলকের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে আধুনিক রূপ। গুণী এই শিল্পী পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, চীন, ডেনমার্ক, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে মৃৎশিল্প মাধ্যমের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

শিল্পী অলক রায়ের শিল্পভাবনা ও নির্মাণশৈলীর ধারায় প্রতিনিয়ত উৎসাহী হয়ে উঠেছে শিল্পী শিক্ষার্থী শিল্প সমালোচক ও শিল্পপ্রেমী মানুষ। আর এটা সম্ভব হয়েছে শিল্পকর্মে শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে। তাঁর পোড়া মাটির কাজে আর্ত, বিপর্যস্ত ও অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও বেঁচে থাকার আর্তি ছিল। প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পী জীবনের প্রথম পর্বে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই চেতনাকে ধারন করে তিনি পোড়ামাটি দিয়ে নিজস্ব ধারণানুযায়ী অসংখ্য ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন। এই সব কাজে ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিক গুণাবলি সঞ্চারের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন এদেশের একজন অগ্রগণ্য ভাস্কর। বর্তমানে মৃৎশিল্প ভাস্কর্যে বাংলাদেশের হয়ে বিশ্ব শিল্প দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছেন শিল্পী অলক রায়।

চিত্র–১৫০
শিল্পী অলক রায়-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৫১
শিল্পী অলক রায়-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৫২
শিল্পী অলক রায়-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৫৩
শিল্পী অলক রায়-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৫৪
শিল্পী অলক রায়-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৫৫
শিল্পী অলক রায়-এর শিল্পকর্ম–৬

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার

বাংলাদেশের সমকালীন মৃৎশিল্পের ভুবনে যে কয়জন শিল্পীর শিল্পকর্ম ও অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাদেরই একজন শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার। খ্যাতিমান এই শিল্পী বাগেরহাটের রামপালে ১৯৬১ সালের ২৮ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষক শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার মৃৎসামগ্রী নির্মাণের ঐতিহ্যিক কৌশল যেমন রপ্ত করেছেন, একইভাবে এ সকল শিল্পসামগ্রীকে কি করে আরো বেশি আধুনিক আবেদনময় করে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যরূপে গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৯২ সালে স্বপন কুমার সিকদার মৃৎশিল্প বিভাগ থেকে এমএফএ সম্পন্ন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টেরাকোটা নির্মাণে স্বপন সিকদার উক্ত গ্রুপের সঙ্গে নিজেকে অনেকদিন গভীরভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। যদিও এরও অনেক আগেই শিল্পী মরণ চাঁদের নিজস্ব স্টুডিওতে কয়েকজন শিল্পীর সমন্বয়ে একটি আর্টিস্ট গ্রুপ তৈরি হয়েছিল, ১৯৮৪ সালে এ গ্রুপে ছাত্র অবস্থাতেই যোগ দেন স্বপন কুমার সিকদার এবং দীর্ঘদিন সম্পৃক্ত থাকেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের টেরাকোটা এবং ব্র্যাক সেন্টারের টেরাকোটা সহ সরকারি বেসরকারি ভবনে টেরাকোটা নির্মাণে শিল্পী স্বপন সিকদারের দক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ সমস্ত টেরাকোটায় সূক্ষ্ম বিষয় উপস্থাপন ও বাস্তবধর্মী আঙ্গিকের প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে নতুন নতুন ভবন নির্মাণ ও এর অনুষঙ্গ হিসেবে টেরাকোটা মাধ্যমটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে টেরাকোটার বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, রূপসী বাংলা, মাছধরা, কৃষক ও বাঙালি জীবন সংগ্রাম ও এদেশের সংস্কৃতি। আর শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের পরিমিত ড্রইং ও কাদামাটির যথোপযোগী ব্যবহারের দক্ষতায় তাঁর নির্মিত টেরাকোটা শিল্প হয়ে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত। বাস্তবধর্মী, ডিটেল ও বিষয় বিন্যাস উৎকীর্ণ, টেরাকোটা শিল্পে স্বপন সিকদারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমের অনুশীলন। যেমন হুইল। ফ্রিহ্যান্ড, ভাস্কর্য, টেরাকোটা ম্যুরাল, গ্লেজ তৈরি ও এর প্রয়োগ একই সাথে নানান ধরনের ডিজাইন অঙ্কন ইত্যাদি। এখানে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রিত রূপের গঠিত সিলেবাসে এখানে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শিল্পী এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। ছাত্রজীবনে তিনি নানান মাধ্যমে সফলভাবে কাজ করেছেন এবং বেশ কয়েকটি একাডেমিক পুরস্কারে সম্মানিত হোন। শিল্পের সব মাধ্যমে কাজের দক্ষতা অর্জনকারী শিল্পীর সংখ্যা অনেক কম আর এই কম সংখ্যকের একজন শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার তাঁর দৃঢ় পরিশ্রমের মানসিকতায় তিনি দক্ষ হয়ে উঠেন প্রায় সকল মাধ্যমে। বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো'র মত অনুযায়ী একজন প্রকৃত শিল্পীর তিনটি বৈশিষ্ট্য দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সাহসিকতার সব কটিই শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের মধ্যে বিদ্যমান। উপরোল্লিখিত গুণের পাশাপাশি শিল্পীর মধ্যে নান্দনিক শিল্পীত দৃষ্টিভঙ্গি ও দার্শনিক মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এর সবকিছুই প্রতিফলিত হয়েছে তার শিল্পকর্মে।

শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার ১৯৯৭ সালে মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পাঙ্গনে বিগত দুই যুগ ধরে নিরলস পরিশ্রম, গবেষণা আর আত্মনিবেদনের সাথে নতুন শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করে আসছেন এই শিল্পী। প্রতিনিয়ত গবেষণার জন্য শিক্ষক হওয়ার পূর্বেই নির্মাণ করেন নিজস্ব স্টুডিও। শিল্পী তাঁর নিজের স্টুডিও তে বিজ্ঞান আর শিল্পের সমন্বয় ঘটিয়ে নিয়মিত ভাবে মৃৎশিল্প চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শিল্পী তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, ঐকান্তিক পরিশ্রমে আর গবেষণালব্ধ জ্ঞানে আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশে প্রাপ্ত কমনক্লের নানান ফরমুলা। সহজপ্রাপ্ত মাটির সাথে বেশকিছু উপাদানের মিশ্রণ সেই সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী কমবেশী তাপমাত্রার প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী মৃৎসামগ্রী তৈরি করে যাচ্ছেন। শিল্পীর তৈরি টিসেট, জগ, মগ সেট, ডিনার সেট, বিভিন্ন ধরনের বৈয়াম, গ্লাস সহ অন্যান্য সামগ্রীতে কখনো লালচে আবার কখনও সিলভার ইমেজ তৈরি হয়েছে অসাধারণভাবে। এই পাত্র তৈরিতে রয়েছে তার ব্যাপক অনুশীলন ও ঐতিহ্য আধুনিকতার মিশ্রণ। মৃৎপাত্র সাদা রঙের গ্লেজের ব্যবহার অনবদ্য। এই আর্দেনওয়ার সামগ্রীর সর্বোচ্চ ফলাফল হিসেবে দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী কুম্ভকারদের মৃৎপাত্রের চেয়ে অনেক মজবুত, ব্যবহার উপযোগী ও আকর্ষণীয়। প্রতিটি পাত্রের আকৃতি, রং ও নকশায় রয়েছে আধুনিকতার ছাপ আবার একই সাথে এই রং নকশা আমাদেরকে সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের কথাও মনে করিয়ে দেয়। স্বপন কুমার সিকদারের শিল্পকর্মে সবসময়েই আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। পরম্পরার শক্তিশালী মৃৎশিল্পী মরণ চাঁদ পালের যোগ্য ছাত্র শিল্পী স্বপন কুমার পাল তাঁর শিল্পকর্মে বরাবরই সহজাত শিল্পপ্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন।

শিল্পী ‘টেরাকোটা’তেই নিজের শিল্পকর্মকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং মৃৎশিল্পের সকল মাধ্যমেই তার অবধি বিচরণ। বাংলাদেশের সহজলভ্য মাটি ও এর সঙ্গে সামান্য উপাদান মিশ্রণের ব্যবহারে তিনি এক নতুন শৈলী প্রতিষ্ঠা করেছেন পটারি শিল্পে পটারিতে পোড়ামাটির বৈচিত্র্যপূর্ণ রংকে তাপমাত্রার সাথে সমন্বয় করে আরো বর্ণাঢ্য উপস্থাপন রীতিমত নজরকাড়া। শিল্পী পটারিগুলো মূলত হুইলের মাধ্যমে বিভিন্ন আকৃতি যেমন লম্বাটে গোলাকার, সিলিন্ডার ইত্যাদিতে টুলসের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী আল্পনা করেছেন। সাবলীল ভঙ্গিমায়। পরবর্তীতে পটারির খোদাই করা অংশে রং ব্যবহারের ফলে মৃৎপাত্রের মৌলিক রং ও লালচে রঙের অলংকরণ মৃৎসামগ্রীকে দেয় ভিন্নমাত্রা। পটারি তৈরি ও অলংকরণের এই পদ্ধতিকে বলা হয় টেরাসিগিলা। শিল্পী স্বপন কুমার শিকদার এ মাধ্যমে অসংখ্য নির্মাণ করেন এবং সফল বাণিজ্যিক ফলাফল তৈরি করেন। ঢাকার সমৃদ্ধ দোকান যেমন কারুপল্লী, কারিকা, আইডিয়াস এর মাধ্যমে ক্রেতা শিল্পবোদ্ধাদের কাছে থেকে ইতিবাচক সাড়া পান। এই মাধ্যমের পটারি বা মৃৎসামগ্রীগুলো ক্রমশঃ ছড়িয়ে যেতে থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিপণন কেন্দ্রে। নব্বই এর দশকে গৃহসজ্জার জন্য এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় এ মাধ্যমে উৎসাহী হয়ে উঠেন বিভিন্ন এলাকার কুম্ভকার সম্প্রদায়ভুক্ত মৃৎশিল্পীরা। অনুকরণ করতে শুরু করেন ঐতিহ্যবাহী টেরাসিগিলা মাধ্যমের মৃৎশিল্প নির্মাণ। শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের আবিষ্কৃত পদ্ধতি সহজ সরল নান্দনিক ও আকর্ষণীয় হওয়ায় এই মাধ্যমের অনুসারী শিল্পী গড়ে উঠে সারাদেশে। একজন প্রকৃত শিল্পীর জন্য এটা অনেক বড় একটা সাদরে গ্রহণ করা ও তাঁকে অনুসরণ করা। পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যেতে থাকে টেরাসিগিলা আর আল্পনা আঁকা পটারি। আর শিল্পী মগ্ন হন সৃজনশীল নতুন গবেষণায় নবতর উৎসাহ উদ্দীপনায়। গুণী

Dhaka University Institutional Repository

এই শিল্পী বিসিক থেকে শ্রেষ্ঠ কারু শিল্পী পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি তাঁর দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্মের জন্য বিসিক থেকে সর্বমোট পাঁচটি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের সৃজনশীল আঙ্গিকে উপস্থাপনার জন্য বিশেষ করে তাঁর হুইল থ্রোইং দক্ষতার বিষয়টি যুগান্তকারী উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা ২০০৮ সালে বাংলাদেশে অবস্থি মার্কিন দূতাবাস ও মৃৎশিল্প বিভাগের যৌথ উদ্যোগে রাকু গ্লেজ এর একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় আমন্ত্রিত প্রশিক্ষক ছিলেন সমকালের বিশ্বখ্যাত মৃৎশিল্পী রেমন ক্যামেরিলিও। তিনি রাকু গ্লেজ ও হুইল থ্রোইং বিশেষজ্ঞ। তাঁর নির্মিত পটারির আদল, আকৃতি এবং দেয়াল অত্যন্ত পাতলা। এরকম দক্ষ হুইল শিল্পী সারা পৃথিবীতে যথেষ্ট কম। রেমনের থ্রোইং টেকনিক এবং পাতলা দেয়ালের বৈশিষ্ট্য এক অভিনব আবিষ্কার। এই কর্মশালায় শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার প্রশিক্ষক শিল্পী রেমনের পার্শ্বের একটি হুইলে তৈরি করেছিলেন বেশ কয়েকটি পটারি। শিল্পী রেমন শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারের কাজগুলো হাতে নিয়ে কর্মশালায় উপস্থিত অশগ্রহণকারী শিল্পীদের সামনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রেমন বলেছিলেন এ ধরনে শিল্পীর অবস্থান করতে হতো আমেরিকায় তাহরে খ্যাতি আর অর্থ সমৃদ্ধির দিক থেকে উপকৃত হতো শিল্পী, আর বিশ্ববাসী পেতো সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প।

শিল্পী ও শিক্ষক স্বপন কুমার সিকদারের ভাস্কর্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর কথা। সহজ সরল সাবলীল ভঙ্গির ত্রিমাত্রিক পোড়ামাটির ভাস্কর্যে উপস্থাপন করেছেন এদেশের নারীর কোমল স্বভা ও কর্মব্যস্ত তম অতি সাধারণ জীবন। টেপা পুতুলের কর্মকে নিজের মতো ভেঙ্গে জ্যামিতিকতায় দিয়েছেন অর্পর্ব ব্যঞ্জনা। কখনো ভাস্কর্যে গ্লেজ করেছেন আবার অনেক ক্ষেত্রে মাটির নরম কোমল ছোঁয়ায় সম্পন্ন করেছেন শিল্পকর্ম। তাঁর তৈরি গ্লেজ পেইন্টিংগুলোতে রয়েছে লোকায়ত জীবনের নানান চিত্র। পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যতায় বিন্যাস করেছেন লোক ও নাগরিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে গুণী স্বনামধন্য এই শিল্পীর শিল্পকর্ম।

শিল্পী স্বপন কুমার যে শুধু গবেষণায় নিমগ্ন তা নয় বরং তার গবেষণালব্ধ অর্জন তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁর শিক্ষার্থী এবং গ্রামীণ কুম্ভকারদের মধ্যেও। কখন সরকারি আবার কখনও ব্যক্তি উদ্যোগে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন শিল্পানুরাগী মৃৎশিল্পীদের। বাংলাদেশে অবস্থিত ডি. এফ. আই. ডি. নামে একটি বিদেশি সংস্থার উদ্যোগেও তিনি বিভিন্ন গ্রামীণ কুম্ভকারদেরকে মৃৎশিল্প প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। শিখিয়ে দিয়েছেন সঠিক তাপমাত্রার চুল্লি নির্মাণ ও তাঁর গবেষণায় প্রাপ্ত ইতিবাচক ফলাফলের নানা করণকৌশল ও মৃৎশিল্প নির্মাণ পদ্ধতি।

শিল্পী স্বপন কুমার সিকদারকে একজন জাত শিল্পী বলা যায়। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প আন্দোলনে যে কয়জন মহান শিল্পী নিরন্তর আন্তরিক গবেষণায় নিবেদিত সেখানে এই শিল্পীর কর্ম ও অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি মৃৎশিল্পের অতীত অনুসন্ধান পূর্বক সমকালের বাস্তবতাকে মূর্ত করে তুলেছেন তার শিল্পে। তাঁকে অনুসরণ করে তৈরি হবে আরো আধুনিক শিল্পী, তৈরি হবে অর্থনৈতিক ভিত ও মৃৎশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১৫৬
শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৫৭
শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৫৮
শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৫৯
শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৬০
শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৬১
শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৬

শিল্পী দেবাশীষ পাল

দেবাশীষ পাল মৃৎশিল্প জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত নাম। আধুনিক মৃৎশিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী ও সম্ভাবনাময় একজন শিল্পী। সার্থক এই শিল্পী ১৯৭১ সালে ১ সেপ্টেম্বর নেত্রকোনা জেলা আটপাড়া থানার লুনেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা এদেশের খ্যাতনামা প্রতিমা শিল্পী জগৎচন্দ্র পাল এবং মা সুশীলা পাল একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তাদেরই যোগ্য সন্তান শিল্পী দেবাশীষ পাল। দাদা প্রাণকৃষ্ণ পাল এবং নানা বৈকুণ্ঠ রুদ্রপাল। অর্থাৎ শিল্পী বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পে সুপরিশীলিত পর্যায়ের পাল সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাইতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই শিল্পী একাধারে বংশপরম্পরারও একজন জাত শিল্পী।

নেত্রকোনা নদী হাওর-বাওর আর লোক ঐতিহ্যে ভরপুর একটি জেলা। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, যাত্রাগান, কবিগান, বাউলগান, নৌকাবাইছ, ষাঁড়ের লড়াই বাঙালি সংস্কৃতির নানান উৎসবমুখর নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানায় জন্ম নেয়ায় শৈশব থেকেই শিল্পী শিল্প সংস্কৃতির জগতে সাবলীল।

একদিকে পারিবারিক শিল্প নির্মাণের গতিধারায় বেড়ে উঠা অপরদিকে শৈশবের বিপুল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অবলোকন। এ সব কিছুই তাঁর শিল্প নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন পৌরাণিক মূর্তি ও লৌকিক দেবতার মূর্তির পাশাপাশি নিত্য ব্যবহার্য হাঁড়ি, সরা, কলস, মটকা, ঘটি বাটি শিশুদের নানান খেলনা সামগ্রীর সমন্বয়ে রচিত বাংলার মাটির মহাকাব্য, শিল্পী শৈশব থেকে পাঠ করে আসছেন। লোকজ মৃৎশিল্প ভাণ্ডার ও তার নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নানারকম ধরন তাঁর চোখ ও শিল্পানুভূতির পথকে সুগম করেছে। পরম্পরায় মৃৎশিল্পীরা এমনিতেই এতটা দক্ষ থাকে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে দেবাশীষ পাল শিল্পী মরণচাঁদ পালের মতো শৈশবেই শিখেছিলেন পেশাদার মৃৎশিল্পীদের বহুবিধ করণকৌশল।

শিল্পী দেবাশীষ পাল লোকশিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শিল্পানাভূতির টানে এসএসসি সম্পন্ন হবার পর ১৯৮৭ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। ফলে আবহমান গ্রাম বাংলার লোক ঐতিহ্যের দৃঢ় শক্তিমত্তার সাথে যুক্ত হয়েছিলো। শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। সে সময় চারুকলা অনুষদে সম্মিলিতভাবে উচ্চ মাধ্যমিক সমকালের কোর্সে প্রাক বি.এফ.এ. চালু ছিল। এই কোর্সে প্রায় আশিজন ছাত্র ভর্তি হতো। কোর্সের মেয়াদ ছিল দুই বছর। পাশ্চাত্য ধারার সিলেবাংস অনুযায়ী বাস্তব ভিত্তিক ড্রইং, জলরং, কালিকলম এবং চারুকলার অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন মাধ্যমের সাবসিডিয়ারি ক্লাস করতো শিক্ষার্থীরা। প্রাক বি.এফ. এ কোর্সের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভাগ নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া হতো। শিল্পী দেবাশীষ পাল ছিলেন তাঁর ব্যাচের সেরা ছাত্র। মেধাবী এই শিল্পী মেধা তালিকায় প্রথম হয়েও প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করে ভর্তি হন মৃৎশিল্প বিভাগে এবং তার এই সিদ্ধান্ত সকলকে বিস্মিত করে। কেননা মেধা তালিকার প্রথম সারির ছাত্ররা চিত্রকলা বিভাগকে পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থানে রাখতেন সেই তুলনায় মৃৎশিল্প বিভাগ উপেক্ষিত ছিল অনেক শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের কাছে। শিল্পকলার সেরা চিত্রকলাকেই বিবেচনা করা হয় সব সময়। গতানুগতিক ধারাকে উপেক্ষা করে নিজের বিশ্বাস আর শিল্পভাবনায় সচেতন শিল্পী দেবশীষ এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে মৃৎশিল্পে বিরাজমান শিল্পদর্শনের সন্ধানস্বরূপ নিজেকে নিয়োজিত করেছেন গভীর অধ্যাবসায়।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী দেবাশীষ পাল শিক্ষক শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদারকে। সেই সময় আবু সাঈদ তালুকদার চায়না থেকে মৃৎশিল্পে উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন করে, চারুকলা অনুষদে শিক্ষক হিসেব যোগদান করেন। এবং গতানুগতিক ধারার পাশাপাশি সম্পূর্ণ স্বাধীন মৃৎশিল্প উপস্থাপনে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক উৎসাহ দেন। শিল্পী দেবাশীষ ছাত্রজীবনের প্রতিটি অনুশীলনে নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং ঐতিহ্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি আধুনিক গতিধারা তৈরিতে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রেখেছিলেন। ছাত্রবস্থাতেই টেরাকোটার ফলক, মৃৎভাস্কর্য, টেবিল ওয়ার, বিভিন্ন ধরনের পটারিসহ যাবতীয় বিষয়কে সচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মাণ করেন এবং সফলতা অর্জন করেন। মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর যে কয়জন উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপন করেন তার মধ্যে শিল্পী দেবাশীষ অন্যতম। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁ অনুশীলন ও শিল্প ভাবনা ছিল অসাধারণ।

শিক্ষক শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার নব্বই এর দশকে নিজস্ব স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রথাগত মৃৎশিল্পের আঙ্গিককে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আধুনিক উচ্চতর উপস্থাপনে আবু সাঈদ তালুকদার গভীর মনোযোগী হয়েছিলেন। শিল্পী দেবাশীষ উচ্চ স্টুডিওতে সহযোগী হিসেবে ছাত্রজীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন। ফলে আগ্রহী হয়েছেন আধুনিক মৃৎশিল্প নির্মাণ ও গবেষণা শিল্পী। মেধাবী এই শিল্পী বি.এফ.এ-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৯৭ সালে যৌথ উদ্যোগে শিল্পী মাইনুল ইসলাম, মুজিবর রহমান, মাসুদুর রহমান ও মো. আজহারুল ইসলামের সমন্বয়ে গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু স্কয়ারের সুবিশাল ম্যুরাল নির্মাণে দেবাশীষের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। এই শিল্পী শতাধিক ম্যুরাল নির্মাণের সাথে সাথে টেরাকোটা ফলক নির্মাণের দলীয় কার্যক্রম বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এদেশের সর্ববৃৎ টেরাকোটা ফলক রয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, সেখানেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। শিল্পীর এই কাজ জাতীয় পর্যায়ে মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। শিল্পী দেবাশীষ পাল একাধারে যেমন বাংলাদেশের মৃৎশিল্প শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ তেমনি এদেশে আধুনিক মৃৎশিল্প চর্চার ধারক ও বাহক।

মৃৎশিল্পের সাধক দেবাশীষ পাল কমন ক্লের সাথে বিভিন্ন অক্সাইড সহযোগে নিজস্ব ফরমূলায় উদ্ভাবিত যে স্লিপের ব্যবহার করেছেন তা এক কথায় অসাধারণ। মৃৎশিল্প বিভাগ থেকে এম.এফ.এ শেষ করে তিনি আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন, স্টুডিওভিত্তিক শিল্প নির্মাণের যৌথ উদ্যোগ নেন। এর ফলস্বরূপ শিল্পী স্বপন পাল এবং শিল্পী শাহাদাত হোসেনের সমন্বয়ে 'আর্দেন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বাণিজ্যিক এবং সৃজনশীল মানসিকতায় তৈরি এই প্রতিষ্ঠানটি ২০০৩ সালে চারুকরা অনুষদ জয়নুল গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রদর্শনীটি বাণিজ্যিক সফলতার সাথে সাথে নান্দনিক শিল্পবোধ প্রকাশেও সফল হয়েছিল।

২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদে মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন শিল্পী দেবাশীষ পাল। এই সময় থেকে নিজেকে গবেষণা কর্মে সম্পূর্ণ নিয়োজিত রেখেছেন। এবং সফলতাও পেয়েছেন। প্রতিনিয়ত মৃৎশিল্পের গবেষণায় আধুনিক উপাদানের সমন্বয়ে উদ্ভাবিস শিল্পকর্ম তৈরিতে তিনি বেশ আলোচিত। মৃৎশিল্পের প্রতিটি মাধ্যমের তাপমাত্রা ও কাঁচামালের নতুন ফরমূলা আবিষ্কারের মাধ্যমে

উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিল্পকর্ম তিনি তৈরি করেন। টেরাকোটা ফলকের মতো সারফেসে তিনি উচ্চতাপ মাত্রার গ্লেজ প্রয়োগ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে আমাদের আবহমান গ্রাম বাংলার হাজার বছরের সংস্কৃতি। হাজার বছরের পুরোনো ইমেজ ধারণ করে তার শিল্পকর্মগুলো। শিল্প দর্শন আর মৃৎশিল্পের নানাবিধ উপকরণের সুচারু ব্যবহার পূর্বের কোন শিল্পীর মধ্যে দেখা যায়নি। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর নানা অমানবিকতা এবং সিডরের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সৃজনশীলতায় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে শিল্পী দেবাশীষ পাল।

শিল্পী দেবাশীষ পাল শিল্পকর্মে সবসময় ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিষয়াবলি স্টাইলাইজড ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কনটেমপোরারি পোর্ট্রেট অফ বাংলাদেশের ফসিল অফ বাংলা, অবজারভার, ডেসক্রিপশন অফ অলিম্পিক প্রভৃতি সিরামিক মাধ্যমনির্ভর স্থাপনায় শিল্পী সবচেয়ে বেশি সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তার কাজের মধ্যে গভীর বক্তব্য রয়েছে। সমকাল ও অতীতকালের একটা সম্বন্ধসূত্রও এতে খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পীর কখনও মাটির মধ্যে স্ক্রিনপ্রিন্ট করে দৈনিক পত্রিকার ঘটনাবলি জুড়ে দিয়েছেন আবার কখনও গলিত কাদার মতো মাটি বইয়ের গড়নে রূপান্তরিত করে পুরাকালের বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন। এতে করে ইমেজ ও টাইপোগ্রাফির সংশ্লেষে বা মিথস্ক্রিয়ায় তার শিল্প নতুন মাত্রা পেয়েছে। তাঁর কাজে বৃহদাকার মানুষ মুখ যা সর্বাংসহা মানুষী সত্তার মতো উপস্থাপিত হয়েছে তা সম্ভবত প্রতিমা দেখায় অভিজ্ঞ শিল্পীর অবচেতন মন থেকে উঠে আসা কোন বিশেষ প্রতীক। বস্তুর অন্তর্গত শক্তির রহস্যভেদ অন্য মাধ্যমের শিল্পীদের মতো মৃৎশিল্পের এই শিল্পীর কাছেও প্রধান গবেষণার বিষয় হয়েছে। তাঁর এই গবেষণার ফলে বাংলাদেশের মৃৎশিল্প যে বহুমাত্রিকভাবে প্রকাশ পেতে পারে তার সম্ভাবনার পথ উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর নিয়মিত গবেষণায় রাকু গ্লেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে বা ইতিপূর্বে বৃহাদায়কার গড়নে কোন শিল্পী সম্ভবত শিল্পকর্ম করেননি। সাধারণত বর্তমানে বিদেশি মৃৎশিল্পীরা পটারির গায়ে রাকু গ্লেজ ও অন্যান্য গ্লেজ প্রয়োগ করে থাকেন; কিন্তু শিল্পী দেবাশীষ পাল বিন্যাস করেন মৃৎভাস্কর্য, যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নতুনত্ব সৃষ্টির এক যুগান্তকারী উদাহরণ।

আধুনিক মৃৎশিল্পী দেবাশীষ পাল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমকালে এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। ছাত্রজীবন থেকে আজ অবধি এই শিল্পীর অর্জনের তালিকাটাও নেহায়েত ছোট নয়। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত জাতীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে তিনি সকল মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন।

২০০৯ সালে দ্রবীভূত অতীত ও বর্তমান শীর্ষক একক প্রদর্শনী হয় বেঙ্গল গ্যালারীতে এই প্রদর্শনীতে তাঁর বহুমাত্রিক শিল্পকর্ম শিক্ষার্থী, শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলো। অতীত ও বর্তমান সময়ের বিবর্তিত রূপের অপূর্ব ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর আধুনিক মৃৎশিল্পে। ২০০৯ সালে চায়নার মঙ্গলিয়ায় Peach and Friendship শীর্ষক আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন কৃতিত্বের সাথে। প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকর্ম যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক মৃৎশিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী শিল্পী দেবাশীষ পাল চীন, কোরিয়া, মরিশাসসহ দেশ-বিদেশে মৃৎশিল্পের নতুন ভাষা উপস্থাপন তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম বাংলাদেশ ও বিদেশের উল্লেখযোগ্য স্থানে সংগৃহীত রয়েছে। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির অভিব্যক্তিতে রয়েছে মানুষ, জীবন আর সুখ দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ। বর্ণাঢ্য শিল্পকর্মগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় দেবাশীষ পাল একজন জাত শিল্পী।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১৬২
শিল্পী দেবাশীষ পাল-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৬৩
শিল্পী দেবাশীষ পাল-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৬৪
শিল্পী দেবাশীষ পাল-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৬৫
শিল্পী দেবাশীষ পাল-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৬৬
শিল্পী দেবাশীষ পাল-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৬৭
শিল্পী দেবাশীষ পাল-এর শিল্পকর্ম–৬

শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম

ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে নিজের মতো নতুনতর সময়োপযোগী শিল্পনির্মাণে অগ্রগামী বর্ণাঢ্যময় ও সাফল্যমণ্ডিত পথে চলা এই শিল্পী ১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারি যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃতী এই শিল্পীর শৈশব কেটেছে যশোর জেলার চারুপীঠ ও খেলাঘরের মতো সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ছোটবেলা থেকেই নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তাঁর মননশীলতা তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এই শিল্পীর মধ্যে ছোটবেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি গভীর মমত্ববোধ আর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পকলা অবলোকন এবং আঁকাআঁকির মধ্যে দিয়েই শুরু হয় শিল্প-উপলব্ধি ও শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার তুমুল আকাঙ্ক্ষা। শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম স্থায়ীভাবে শিল্পের সাথে জীবন যাপন শুরু করেন ১৯৮৯ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটে, ভর্তির মধ্যে দিয়ে। অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং সফলতার সাথে তিনি তাঁর শিল্প শিক্ষা জীবন সমাপ্তও করেন। শিল্প চারুকলায় বেশ কয়েকটি বিভাগের মধ্যে মৃৎশিল্প বিভাগটিকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর শিল্পকর্মের ক্ষেত্র হিসেবে।

বাংলাদেশে আধুনিক মৃৎশিল্পের চর্চা কয়েক দশক ধরেই তার নিজস্ব গতিতে চললেও নব্বই-এর দশক থেকে মৃৎশিল্পের চর্চায় ভিন্নতর আবেদন প্রকাশ পায়। বাংলাদেশে বিগত চার দশকে আধুনিক শিল্পকলার অগ্রগতি বেশ প্রশংসনীয়। আর এই অগ্রগতির কাণ্ডারী হিসেবে দেখতে পাই মো. রবিউল ইসলাম ও তাঁর মতো আরও কয়েকজন গুণি শিল্পীকে। শিল্পী রবিউল ইসলাম শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে। ফলস্বরূপ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান বি.এফ.এ সম্পন্ন করেন। ১৯৯৮ সালে আই, সি, সি, আর স্কলারশীপ নিয়ে গুজরাটের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে যান এম.এফ.এ. পড়ার জন্য। আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই শিল্পী ২০০০ সালে এম.এফ.এ. সম্পন্ন করার পর ২০০১ সালে ২৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটের মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। শিল্পানুরাগী এই শিল্পী এখন শিল্পী তৈরির কারিগর। মেধাবী ছাত্রদের মৃৎশিল্প বিদ্যায় পড়াশোনার আগ্রহ সেই সাথে উন্নতকরণ কৌশল ধারণ করা জ্ঞানী ও মেধাবী তরুণ শিক্ষকদের আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। মীর মোস্তফা আলী, মরণ চাঁদ পাল, আবু সাঈদ তালুকদার-এর যোগ্য উত্তরসুরী। শিল্পী রবিউল ইসলাম ছাত্রাবস্থায় মৃৎশিল্পের যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে তার সবগুলোই যথার্থ দক্ষতার সাথে রপ্ত করেছেন। আর্দেনওয়ারের মাধ্যমে ভাস্কর্য নির্মাণ আর স্টোনওয়ার মাধ্যমের টেকনিক করণকৌশলসহ সৃজনশীল কম্পোজিশানের বিষয়ে তাঁর ধারণা স্পষ্ট। মৃৎশিল্পে তার অর্জিত জ্ঞান পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু ভাববার, নতুনভাবে সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণে উৎসাহী করেছেন। শিল্প অন্তঃপ্রাণ এই শিল্পীর ধ্যান জ্ঞান সবই তাঁর শিল্পকর্মকে ঘিরে।

বাংলাদেশের সমকালীন আধুনিক মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদেশের শিল্পীদের প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা, ঐতিহ্য চেতনার সাথে সম্পৃক্ততা। এদেশে মৃৎশিল্পের আধুনিক চর্চা খুব বেশি দিনের না। কয়েকজন শিল্প অন্তঃপ্রাণ শিল্পী মৃৎশিল্পের জটিল ও কঠিন রাসায়নিক সমীকরণ নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন। এই শিল্পমাধ্যমে যারা নিয়মিত চর্চা করছেন তারাই শুধুমাত্র শিল্পভাষা ও নতুনভাবে অনুসন্ধানপূর্বক শিল্প নির্মাণ করে চলছেন।

ইতিহাস ঐতিহ্য সচেতনতার সাথে সাথে সমকালের নানান বিষয় বিশ্লেষণ করে শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম নিয়মিত কাজ করছেন। শিল্পীর শিল্পকর্মে অতীত ঐতিহ্য নানাবিধ নস্টালজিয়ার অনুভূতি, শৈশব স্মৃতি, পোড়ামাটির কম্পোজিশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। লাটিম, ডাংগুটি খেলা, ঘুড়ি উড়ানোর মতো আনন্দময় শৈশব স্মৃতি শিল্পী সযতনে তার শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমের চেয়ে বিষয়গত আঙ্গিককে অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে আসছেন যা তার প্রতিটি কাজেই প্রস্ফুটিত। শিল্পকর্মের এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে অন্য শিল্পীদের থেকে সহজেই আলাদা করে ইঙ্গিত করে। তাঁর নিজস্ব ধারার কাজগুলো মূলতঃ বাল্য স্মৃতি নির্ভর। শিল্পকর্ম গুলোর নামকরণেও তিনি এ ধারাকেই বহন করেন। তাঁর 'নস্টালজিয়া' শিল্পকর্মে দেখা যায় লাটিম, ঘুরির, লাটাই, ডাং-গুলি, রিং খেলা ইত্যাদি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পীর এই শিল্পকর্মগুলো স্বাভাবিকভাবেই দর্শককে স্মৃতিকাতর করে তোলে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনে বাল্য স্মৃতির পরশ বুলিয়ে দেয়। তার "কম্পোজিশন" নামের শিল্পকর্মটি এসেছে ভিন্ন রূপে। পোড়ামাটির কম্পোজিশনে মাটির তৈরি লাটিম ঝড়াপাতার মাঝে প্রকৃত লাটিম খেলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, কোনটি সুতায় প্যাচানো পোড় খাওয়া এবং হেরে যাওয়া লাটিমের ক্ষতবিক্ষত দেহ, শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন তার অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতায়। ছাত্রবস্থাতেই এই শিল্পী তার নিজস্ব স্টাইল নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। গুজরাটের বরদা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় শিল্পী নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বিখ্যাত শিক্ষকদের সান্নিধ্যে নিজেকে নিরীক্ষায় নিয়োজিত করেন। এখানে তিনি পোড়ামাটির অনেক ভাস্কর্য তৈরি করেন। নস্টালজিয়াকে অতিক্রম করে শিল্পী এই সময়ে তার শিল্পকর্ম জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। দেশ, মাটি, মানুষ মানুষের নানা সাংস্কৃতি আর বৈচিত্র্যে ভরা প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় স্থান পায় তার পোড়ামাটির ভাস্কর্যে। প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য জীবনযাপন, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার ফ্রি হ্যান্ডে করা পোড়ামাটির ভাস্কর্যে। রং ও ত্রিমাত্রিক ফর্মের বিন্যাসে মানবজীবন সম্পর্কিত প্রকৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভাবাবেগ উপস্থাপিত হয়েছে। ক্যাকটাসের কাটার কাঠিন্যর মাঝে নরম সজীব কোমলতাকে মানুষের মুখাবয়বের সাথে বিন্যাস করেছেন আধুনিক রূপে। শিল্পীর শিল্প কর্মগুলো সরলতায় মোড়া, যা বুঝতে সহজ আবার ভাবনার জগতেও টেনে নিয়ে যায়।

শিল্পী রবিউল ইসলাম ভারতে পড়াকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও পরবর্তীতে দেশে ও দেশের বাইরে আরও প্রায় শতাধিক প্রদর্শনী কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। শিল্পীর বিভিন্ন সময়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কর্মশালা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর শিল্পকর্মে প্রয়োগ করেছেন নিজস্ব স্টাইলে। সরলতায় মোড়া বক্তব্যময় শিল্পকর্মগুলি এককতায় অনবদ্য। গুণী এই শিল্পী ইতিমধ্যে স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক সহ অসংখ্য পুরস্কার, স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্কুলে তাঁর শিল্পকর্ম সংগ্রহে রয়েছে, যা কিনা একজন শিল্পীর জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক।

শিল্প গবেষক এই শিল্পী মৃৎশিল্পের পাশাপাশি চিত্রকলা, ভাস্কর্যসহ অন্যান্য মাধ্যমেও তার শিল্প ও প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। নিজের গবেষণালব্ধ জ্ঞান তিনি শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে তৎপর। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী (শিক্ষক গাইড) 'চারু ও কারুকলা' জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম এর সাথে এই শিল্পী সক্রিয়ভাবে জড়িত। চারুকলা অনুষদে মৃৎশিল্প বিভাগে যোগদানের মধ্য দিয়ে শিল্পী নিজেই একজন শিল্পী তৈরির কারিগর। মৃৎশিল্প নিয়ে শিল্পী রবিউল ইসলাম প্রতিনিয়ত যে গবেষণা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন তার সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান শিল্পী শিক্ষার্থীদেরও উপকৃত করছে। প্রতিনিয়ত গবেষণা আর শিক্ষা প্রদানের আন্তরিকতায় গড়ে উঠছে শিক্ষার্থী শিল্পীরা সেইসাথে অগ্রসর হচ্ছে মৃৎশিল্প।

শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া না পাওয়ার কথা, শৈশব স্মৃতি মূর্ত করে তোলে সেই রিদম যা রঙে, গড়নে, নান্দনিকতায় এক ভিন্নতার জিজ্ঞাসা এঁকে দেয় মনে। যা থেকে জন্ম নেয় স্বপ্ন। আমরা স্বপ্ন দেখি পোড়ামাটির পুনরুত্থানের। সর্বোপরি মানবিক সম্পর্ক নির্ণয়ের যোগসূত্র তৈরিতেও শিল্পীর কাজের শিল্পমূল্য নিরূপিত হয়েছে। এই শিল্পীর শিল্পকর্ম বাংলাদেশের মৃৎশিল্প ভাণ্ডারকে করেছে আরও সহজতর। নিঃসন্দেহে তাই শিল্পী মো. রবিউল ইসলামকে একজন সার্থক শিল্পী বলা যায়। নিঃসন্দেহে নিজের আলোয় দেদীপ্যমান এই শিল্পীর হাতে মৃৎশিল্পের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

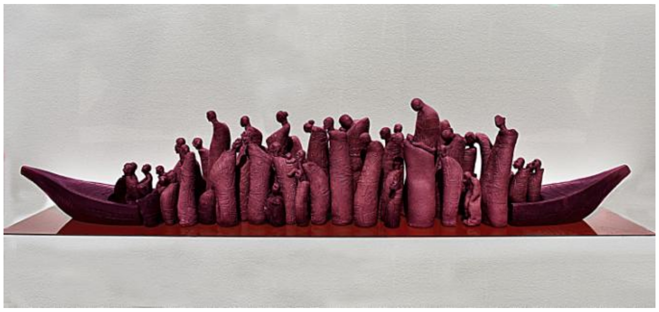

চিত্র–১৬৮
শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৬৯
শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৭০
শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৭১
শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৭২
শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৭৩
শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম-এর শিল্পকর্ম–৬

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার

মৃৎশিল্পের জগতকে আলোকিত করেছেন যে সকল গুণী শিল্পীরা তাদেরই একজন শিল্পী আবদুল মতিন তালুকদার। জ্ঞানপিপাসু এই শিল্পী শিল্পকর্ম তৈরির পাশাপাশি মৃৎশিল্প নিয়ে গবেষণার কাজে নিজেকে পুরোপুরি সমার্পণ করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ ২০০৫ সালে তিনিই প্রথম মৃৎশিল্পীদের মধ্যে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি গবেষণা করেছিলেন বরেন্দ্র অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির ভাস্কর্য নিয়ে। শিল্পী এই গবেষণায় উদ্ঘাটন করেছেন ভাস্কর্য শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যকে, যা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে মৃৎশিল্পের সমকালীন শিল্পানুশীলনকে ও পোড়ামাটির গবেষণাকে।

১৯৬১ সালে মৃৎশিল্প শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ভীত তৈরির সাথে সাথে এগিয়ে যেতে থাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিমার্জিত, পরিশোধিত মৃৎশিল্প মাধ্যম, এদেশের মৃৎশিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গবেষণার নানান স্তরে অন্য যে কোন আধুনিক মৃৎশিল্পীর সমগোত্রীয়। কেননা শিল্পের সুবিস্তৃত পরিসরে সারা বিশ্বময় এক পরিবার। মৃৎশিল্পের উপাদান উপকরণ আর নির্মাণের ধরনসহ যাবতীয় বিষয়াবলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশে আধুনিক পর্যায়ের মৃৎশিল্প চর্চা শুরু হয় চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। গতানুগতিক ধ্যানধারণা নির্ভর মৃৎশিল্পচর্চায় ঐতিহ্যবাহী কুম্ভকার সম্প্রদায়ের করণকৌশলে যুক্ত হয় বিদেশি করণকৌশলের অভূতপূব্ সমন্বয়। এদেশের মৃৎশিল্প নির্মাণে নতুন নতুন টেকনিক বা পদ্ধতি সংযুক্ত হতে থাকে বিদেশ ফেরত শিক্ষার্থী শিল্পীদের কাজ থেকে। বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী শিল্পীদেরই একজন আধুনিক মেধাবী শিল্পী আবদুল মতিন তালুকদার। কুম্ভকারদের করণকৌশল ও গ্লেজবিহীন সামগ্রী নির্মাণের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে যারা বিদেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে প্রদেশের মৃৎশিল্প তথা মৃৎশিল্পের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

সর্বপ্রথম বিদেশি করণকৌশল, মৃৎশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে তাপমাত্রা ইত্যাদি এদেশের শিল্পের সাথে যুক্ত করেন শিল্পী মীর মোস্তফা আলী, দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার এবং তৃতীয় পর্যায়ের মৃৎশিল্পী আবদুল মতিন তালুকদার। মৃৎশিল্প বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা আলীর নিরলস শ্রম, মেধা আর মননশীলতার গড়ে তোলেন চরিুকলা ইনস্টিটিউটের মৃৎশিল্প বিভাগ তাঁর উৎসা উদ্দীপনা এবং মৃৎশিল্প আন্দোলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুরদর্শী পরিকল্পনায় মেধাবী ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন বিদেশে পড়াশুনায়। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় শিল্পী মতিন তালুকদারের সুযোগ ঘটে বিদেশে পড়াশোনা করার। শিল্পী ১৯৮২ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মৃৎশিল্প বিভাগ থেকে মৃৎশিল্পে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি মেধা আর সৃজনশীল দক্ষতা দিয়ে অর্জন করেন বালাদেশ ও চীন সরকারের বৃত্তি। ১৯৮৪সাল ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি সেন্ট্রাল একাডেমী অফ আর্টস এন্ড ডিজাইন রেইজিং এ নিজেকে গভীর অধ্যবসায়ে নিয়োজিত রাখেন। এই একাডেমী থেকে ১৯৮৭ সালে বি.এফ.এ (সম্মান) সম্পন্ন করেন প্রথম বিভাগে। মৃৎশিল্পে যেহেতু উপাদান উপকরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সেহেতু উক্ত একাডেমীতে গবেষণার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী চায়না মৃৎশিল্পের করণকৌশলসহ তিনি নানান মাধ্যমে সফলতার সাথে কাজ করেন। ১৯৯২ সালে এই শিল্পী বাংলাদেশ ভারত সরকারে কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রমে আই.সি. সি. আর বৃত্তি নিয়ে ভারতের এম.এস বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদায় পড়াশোনা করতে যান। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সালে কৃতিত্বের সাথে এম. এ. সম্পন্ন করেন ভাস্কর্য বিদ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আবদুল মতিন তালুকদারের কাজে তার নিজস্ব মাধ্যমের বাইরে চীনা ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ এবং চীনা পদ্ধতি গ্লেজের প্রয়োগে সুচারু করণকৌশল বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। শিল্পী গবেষণা করেছেন বিভিন্ন গ্লেজ তৈরি এবং এর ব্যবহার বিষয়ে। তৈরি করেছেন অসংখ্য মৃৎপাত্র। তিনি যখন ব্যবহারোপযোগী মৃৎপাত্র তৈরি করেছেন তখন প্রথমেই ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মৃৎপাত্রের ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে পাত্র নির্মাণের পর প্রয়োগ করেছেন উন্নততর উচ্চ তাপমাত্রার বিভিন্ন রকম গ্লেজ। তৈরি করেছেন উৎকৃষ্ট মানের মৃৎপাত্র। শিল্পী উন্নত উপাদান উপকরণকে কিভাবে আরো দৃষ্টিনন্দিত অবস্থায় উন্নিত করা যায় তা নিয়ে নিরলস মনোযোগী হয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি ঐতিহ্যের মৃৎপাত্রকে পরিশোধিত মাত্রায় আধুনিক গঠনে বিন্যাস করেছেন। আন্তর্জাতিক মানকে বজায় রাখাসহ মৃৎপাত্রে উজ্জ্বল রং ব্যবহারের বিষয়ভিত্তিক যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মৌলিক রংকে প্রাধান্য দিয়েছেন তার সৃষ্ট মৃৎকর্মে। মৃৎশিল্পের নানান শাখা প্রশাখায় বিরাজমান রীতি ও বহুমাত্রিক গ্লেজে সুদক্ষ এই শিল্পী প্রয়োগ করেন, সফট গ্লেজ, রাকু গ্লেজ, ব্রিস্টল গ্লেজ, সল্ট গ্লেজ, ক্রিস্টালাইন গ্লেজসহ হার্ড গ্লেজের অনেক সূত্র। এর প্রমাণ আমরা পাই শিল্পীর তৈরি টি-সেট, মগসেট, ফুলদানিসহ ব্যবহারিক টেবিলওয়ার সামগ্রীতে যা কিনা রঙের বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিক আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে ভাস্কর্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতে রয়েছে এর একটি সুবিশাল ক্ষেত্র। ভারত উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে পোড়ামাটির ভাস্কর্য। বাংলাদেশেও রয়েছে ভাস্কর্য শিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাস। এখানকার ভাস্কর্যের পরম্পরায় দেখা যায় গ্লেজবিহীন ভাস্কর্যের নানা রূপের বৈচিত্র্য। বারোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন অবস্থায় শিল্পী আয়ত্বে আনেন পোড়ামাটির ভাস্কর্য নির্মাণশৈলীর অন্তর্নিহিত বিষয়াবলি। দক্ষতা অর্জন করেন সাধারণ মাটি (যা কমনক্লে হিসেবে পরিচিত) তার তাপমাত্রা প্রয়োগের কৌশল। এ মাধ্যমে শিল্পী গবেষণা করেন সাধারন মাটির বিভিন্ন রকম বডি তৈরির ফরমুলা ও কারিগরি দিক। গ্লেজবিহীন ভাস্কর্য নির্মাণে প্রথমতই দরকার একটি নতুনতর উৎকৃষ্ট গড়ন আবিষ্কার। পরম্পরার মৃৎশিল্পের গতিধারা পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন সাপেক্ষে যাবতীয় সৃষ্টিশীল আবেগে, শিল্পীর মনকে জাগিয়ে বিন্যাস করতে হয় ভাস্কর্য শিল্পকে। এক্ষেত্রে রঙের চেয়ে শিল্পের গড়ন এবং নিরীক্ষাধর্মী মাটির গুণাগুণ উপস্থাপনের বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর শিল্পী আবদুল মতিন তালুকদারের ভাস্কর্য নির্মাণৈ রয়েছে বিষয় ও মৌলিক উপাদানের ব্যাপক গবেষণা। আর স্বাভাবিকভাবেই তার গবেষণা কর্মের সুপ্রভাব পড়েছে। আমাদের মৃৎ ভাস্কর্যে।

গবেষক শিল্পী মতিন তালুকদার চায়না ওয়াশ পদ্ধতিকে ভালভাবে রপ্ত করে প্রকাশ করেন তাঁর দ্বিমাত্রিক শিল্পকর্মে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে তাঁর অসাধারণ দক্ষতায় এখানে তাঁর সৃষ্ট পোড়ামাটির ভাস্কর্যে লক্ষ্য করা যায় অভিব্যক্তিসহ মানুষ ও মানুষের জীবন সম্পর্কের ইতিবাচক হৃদয়স্পর্শী আবেদন। বিশ্বের সকল মানুষ এক, মানুষের প্রয়োজন এক, অনুভূতি এক। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় দেশকাল ব্যাপী আন্তর্জাতিক বোধের ব্যাপক সূচনা ঘটে তাঁর সৃষ্টি মানব মুখাবয়বের ভাস্কর্যে। শিল্পীর ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর নির্মিত ভাস্কর্যের প্রধান বিষয় মানুষ ও তার আত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধি। তিনি বঙ্কিম চন্দ্রের মতো বিশ্বাস করেন যে, সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। মানুষের মুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা এবং কাঙ্ক্ষিত মনের আশা ভরসাই তার শিল্পের মূল মন্ত্র। মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আর উচ্ছৃঙ্খল মনোভাব ও

Dhaka University Institutional Repository

অসৎ চরিত্রের বিপরীত মেরুতে এই শিল্পী মনের অবস্থান। তাইতো এই শিল্পী তার শিল্পকর্মে মানুষের মুখাবয়বককে দেখিয়েছেন বন্ধুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে একত্রে, বিন্যাস করেছেন অনেকগুলো মুখের অভিব্যক্তি।

শিল্পী মতিন তালুকদারের ভাস্কর্যে তাই স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছে হৃদয়ের বন্ধন, শিল্পী সচেতনভাবেই উপস্থাপন করতে সচেষ্ট ছিলেন মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্য। পোড়ামাটির ভাস্কর্যের গড়নে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এই কৃতী শিল্পী।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১৭৪
শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৭৫
শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৭৬
শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৭৭
শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৪

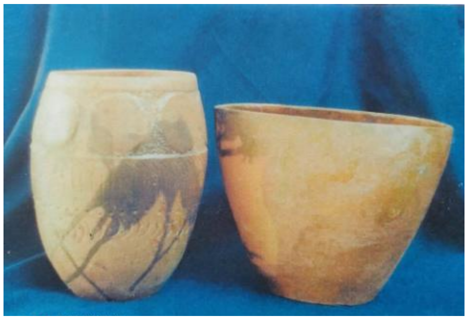

চিত্র–১৭৮
শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৫

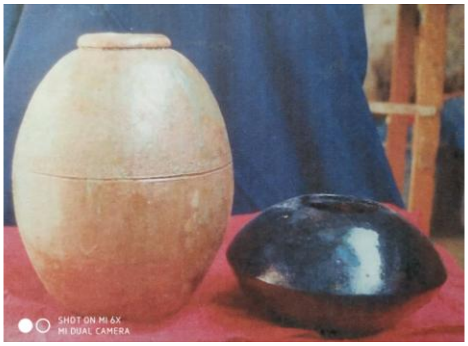

চিত্র–১৭৯
শিল্পী ডক্টর আবদুল মতিন তালুকদার-এর শিল্পকর্ম–৬

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল

ড. আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল একজন উঁচুমানের শিল্পী। বহুমুখী শিল্প প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী, সমস্ত প্রাণের আকর যে মাটি, দিবানিশি তার মান উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি ১৯৭০ সালের ২৭ জানুয়ারি নেত্রকোনা জেলার বারহাট্টা উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বলয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি। পিতা নুরুল ইসলাম শেখ চিন্তা ভাবনায় মননে কর্ষণে একজন সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবেই বারহাট্টার সর্বমহলে সুপরিচিত। শিল্পী আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল কর্মে পিতার শিল্পীসত্তাকে শুধু ধারণ ও লালনই করেননি বরং নিয়ে গেছেন অনন্য এক উচ্চতায়।

পারিবারিকভাবে একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বলয়ে বেড়ে উঠা শিল্পী শেখ ছাত্রজীবন থেকেই তার মেধার পরিচয় দিয়ে আসছেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর ১৯৮৯ সালে ভর্তি হন তৎকালীন চারুকলা ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে চারুকলা অনুষদ)। মৃৎশিল্প বিভাগ থেকে ১৯৯৩ সালে বিএফএ এবং ১৯৯৬ সালে এমএফএ তে কৃতিত্বের সাথে উন্নীত হন। পরবর্তীতে ২০১২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশের মৃৎশিল্প : রূপ রূপান্তর' শীর্ষক বিষয় নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গুণী এই শিল্পী টেরাকোটা ভাস্কর্যে এবং মৃৎশিল্প মাধ্যমে নান্দনিক ও বাণিজ্যিকভাবে সফল। ম্রিয়মন ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে নতুনভাবে, ভিন্ন মাত্রায় সময়োপযোগী বিন্যাসে তুলে ধরেন দেশ-বিদেশে।

তাঁর নিরলস গবেষণা আর ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি সবাইকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। চারুকলা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তিনি শৈশবে আহরিত শিল্পকলার অপরাপর অভিজ্ঞতাগুলো একত্রে গ্রন্থিত করে নিজের শিল্পকর্মকে সুর, ছন্দ, রূপ ও রঙের বৈচিত্র্যে শাণিত করেছেন সাবলীলভাবে।

একজন সৃজনশীল মৃৎশিল্পীকে একাধারে কেমিস্ট, ডিজাইনার এবং কারিগরি দিক থেকেও দক্ষ হতে হয়। এই সকল গুণসমূহ শিল্পী ড. আজহারুল ইসলামের মধ্যে বিদ্যমান। মিষ্টভাষী এই শিল্পী মৃৎশিল্পকে নিয়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা করে চলেছেন । তিনি একটি ধারায় প্রভাবিত না হয়ে প্রতিনিয়তই ভিন্ন স্বাদে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে কাজ করে যাচ্ছেন। কাজগুলোর মধ্যেও রয়েছে নিত্য নতুন গবেষণার ছাপ। ছাত্রবস্থায় তিনি এক্সপেরিমেন্টাল সিরামিক্সে কাজ করতে করতেই প্রতিষ্ঠা করেন 'ভার্টিক্যাল' নামে একটি সৃজনশীল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এখানে একইসাথে এক্সপেরিমেন্টাল সিরামিকসের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকাতে সিরামিকসের শিল্পকর্ম সাধারণ শিল্পবোদ্ধারা সংগ্রহ করতে পারেন সুলভমূল্যে। তাঁর এই উদ্যোগ থেকে আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় মেলে।

শিল্পী শেখ চঞ্চল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে এসে মাটির শিল্প রচনায় শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগ তাঁকে অনুশীলনে মগ্ন করেছে, শিল্পরচনার পথ দেখিয়েছে মাত্র। তাঁর গভীরতর শিক্ষা ও আত্মজাগরণ তাঁর আঁতুরআবাস সাদামাটিখ্যাত নেত্রকোনায়। নিজের ঐতিহ্যের গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে শিল্পে স্বতন্ত্র্যের মাত্রা যুক্ত হয়না। এ সত্যকে উপলব্ধি করেই আজ অনেক শিল্পী

দেশজ লোকজ শিল্পের মাত্রা প্রসারিত করে যাচ্ছেন। এই ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য করা যায় আজহারুল ইসলামের শিল্পকর্মে শিল্পী তাঁর ছাত্রাবস্থায় এক্সপেরিমেন্টাল সিরামিকসে কাজ করতে করতেই প্রতিষ্ঠা করেন 'ভার্টিক্যাল' নামে একটি সৃজনশীল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এ দেশে হাতেগোনা কয়েকজন শিল্পী সিরামিকস্ ভাস্কর্য করেন। তার মধ্যে শিল্পী আজহারুল ইসলামের মৃৎভাস্কর্যের স্টাইল, সাইজ এবং স্ট্রাকচার অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বকীয়, যা কিনা শিল্প বোদ্ধা ও শিল্প সমালোচক মহল অকপটে স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের সিরামিক্স ভাস্কর্যের ইতিহাসে তাঁর এই নতুনধারার উপস্থাপনাটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের সমকালীন আধুনিক মৃৎশিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিল্পীদের প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতা, ঐতিহ্য-চেতনার সাথে সম্পৃক্ততা। আর শিল্পী আজহারুল ইসলাম ঐতিহ্য সচেতনতার সাথে সাথে সমকালের নানান বিষয় বিশ্লেষণ করে নিয়মিতভাবে শিল্পকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। শিল্পী ট্রাডিশনকে ধরে রেখেই বাড়তি অনেক কিছু যোগ করেছেন। নিজের দ্রহন, দর্শন এবং সমকালকে দারুণ ব্যাখ্যা করেছেন। নির্মাণ করেছেন নিজস্ব শিল্পভাষা। যা তার শিল্পকর্মগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

লোকঐতিহ্যকে জিইয়ে রেখে এবং লোকঐতিহ্যকে মনেপ্রাণে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়া এই শিল্পী এ যাবত শতাধিক যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এই প্রদর্শনীতে তর্নি যে সকল শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেছেন তা শিল্পবোদ্ধা থেকে শুরু করে সাধারন দর্শককে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর সৃষ্ট মৃৎশিল্পসমূহ কারুশিল্পের পর্যায় অতিক্রম করে চারুশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সচারাচার দশক যে ধরনের (সাধারণ) মৃৎশিল্প দেখে থাকেন, শিল্পী আজহারুল ইসলামের শিল্পকর্মগুলো তার চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। শিল্পীর প্রদর্শিত শিল্পকর্মগুলোই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ২০১৩ সালের ২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকার চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে শিল্পীর একক প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। এই প্রদর্শনীটির প্রায় সকল কাজই দর্শক দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। 'ইউফোরিয়া অব হারভেস্ট্র', 'লাস্ট লিরিক অব ভিক্টোরি', 'দি বিউটি এন্ড দি বিস্ট', 'স্পেস এন্ড ফর্ম' (সিরিজকর্ম) এই সকল শিল্পকর্ম পরিকল্পিত সমন্বিত এবং সৃষ্টিশীল কাজের নির্দশন। শিল্পী-সৃষ্ট ও সকল শিল্পকর্মে ব্যবহৃত রয়, ফর্ম এবং রেখার ব্যবহার ও এ সবের আবেদন উচ্চমার্গীয়। ব্যবহৃত।' উপকরণের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবকে অক্ষুণ্ন রেখে মৃৎশিল্পের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিল্পীর শিল্পকর্ম কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সামগ্রীর ইঙ্গিত দিলেও শিল্পীর নির্মাণকৌশল এবং শিল্পবিষয়ক সচেতনতার কারণে সেগুলো ভাস্কর্যসুলভ স্বভাবে উন্নতীত হতে সক্ষম হয়েছে। প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি শিল্পকর্মের রয়েছে নিজস্বতা। কৃষিজীবী সমাজ, সমাজের অবক্ষয়, পারিবারিক বন্ধন, একাত্মতা, প্রকৃতিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ, হিংস্রতা, গণহত্যা বিষয় ফুটে উটেছে। শিল্পীর প্রত্যেকটি কাজ নিরীক্ষাধর্মী। 'রেমিনিসেস অব জেনোসাইড' শিল্পকর্মটিতে তিনটি ফিগার; ফিগারগুলোর চারপাশে অনেকগুলো হাত দেখানো হয়েছে। হাতগুলো প্রতিবাদের চিহ্নস্বরূপ, মাখখানের বড় ফিগারটিতে শিং দিয়ে পশুর হিংস্রতার প্রকাশ বুঝানো হয়েছে। পাশের দুটো ফিগারে বিষণ্নতার ছাপ সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বকে তুলে ধরেছে। সব মিলিয়ে শিল্পকর্মটি ১৯৪৭-এর দেশভাগ, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ২০০৯ এর বিডিআর বিদ্রোহ তথা রাজনৈতিক অস্থিরতারই বহিঃপ্রকাশ। আবার 'ইউফরিয়া অব হারভেস্ট' এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এই শিল্পকর্মে আমাদের গ্রামবাংলার কৃষিসমাজের চিরায়ত দৃশ্য ফুটে উঠেছে। গ্যালারির মাঝখানের বড়

Dhaka University Institutional Repository

আকৃতির মটকাটি গ্রামবাংলার কৃষিপণ্যের আধার এবং বড় মটকাটি ঘিরে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট মৃৎপাত্র রাখা বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও মসলা রাখাতে ভিন্ন রং ও ভিন্ন আকার-আকৃতির দ্রব্যাদির পরপর বৃত্তাকার বিন্যাস শিল্পকর্মটি একটি আলপনার রূপ ধারন করেছে। আবার কৃষকের কষ্টার্জিত নানা স্বাদের ফসল যে আমরা নগরে বসে খুব সহজে পেয়ে যাচ্ছি সে ব্যাপারটিও মনে করিয়ে দিয়েছে। 'দি বিউটি এন্ড দি বিস্ট' শিল্পকর্মটি তে মানব এবং দানবের প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একদিকে বিশ্বসমাজ শিক্ষায়, অর্জনে, মানবতায় সভ্যতার শীর্ষ সোপানে অধিষ্ঠিত, অন্যদিকে সমাজের একাংশ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, পেশীশক্তি প্রদর্শনে অসুর জীবনে নিমজ্জিত। বর্তমানে আমাদের সমাজের সর্বত্রই সুন্দর আর অসুন্দরের, সত্য আর অসত্যের, সভ্য আর অসভ্য, মানব আর দানবের দ্বন্দ্ব। এই শিল্পকর্মটি শিল্পীল সমাজ সচেতনার উপলব্ধিকেই প্রকাশ করে। সার্বিকভাবে প্রদর্শনীটিতে যে সকল শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে তাতে শিল্পীর গবেষণালব্ধ শিল্পভাবনা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। মৃৎশিল্পের অতীত ধারণাকে পরিবর্তন করে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে শিল্পবোদ্ধা ও শিল্পানুরাগী দর্শককে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী টেরাকোটাতেও দেখিয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রতিভা। মৃৎশিল্পের অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে টেরাকোটা শিল্প বা দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকচিত্র। একসময় আমাদের দেশ ও এ শিল্পে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতি বৌদ্ধবিহারের টেরাকোটা জগৎবিখ্যাত যা কিনা হাজার বছরের পুরোনো। এছাড়া বগুড়ার মহাস্থানগড়, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ ও দিনাজপুরের কান্তাজির মন্দিরে প্রায় তিনশো বছর আগের পোড়ামাটির টেরাকোটা দেখতে পাওয়া যায়। টেরাকোটা শিল্পের অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই শিল্পমাধ্যমটি একসময় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা ধনাঢ্য শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মসজিদ, মন্দির স্থাপনায় টেরাকোটা ইতিহাস অনেক পুরনো। কালের পরিক্রমায় টেরাকোটার সৌন্দর্য এখন আর অতীতের মতো দুর্লভ নয়। গৃহসজ্জায় সাধারন মানুষের কাছে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে টেরাকোটার জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কয়জন মৃৎশিল্পী টেরাকোটা নিয়ে কাজ করেছেন তাদেরই একজন শিল্পী আজহারুল ইসলাম। ঐতিহ্যের পোড়ামাটি চিত্র অনুধাবনের পাশাপাশি সমকালীন টেরাকোটা নির্মাণে এ শিল্পীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্থাপত্যশৈলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ অংশে স্থান করে নিয়েছে শিল্পীর আজহারুলের নিরীক্ষাধর্মী টেরাকোটা। তিনি টেরাকোটা সৌন্দর্যের উপস্থাপনকে নতুনমাত্রা দিয়েছেন। অতীতে টেরাকোটাকে স্থানান্তর করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি সহজে স্থানান্তর করা যায় এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। টেরাকোটায় বিমূর্ত, আধা-বিমূর্ত, স্টাইলাইজড, টেক্সচার, বেইজড, জ্যামিতিক ইত্যাদি বহুবিধ আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন আধুনিক ইন্টেরিয়রের সাথে সমন্বয় রেখে। তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় আধুনিক উপকরণের মিশ্রণ, যা মৃৎশিল্পের নবতর ভাষা তৈরি করেছে। টেরাকোটা-র মাধ্যমে তৈরি হয় উচ্চধারার শিল্পকলা। শিল্পী মনোযোগ দিয়েছেন টেরাকোটায় চিত্রকলার ইমেজ তৈরিতে। রাসায়নিক অক্সাইড ও টেকনিকের ব্যবহার তাঁর তৈরি টেরাকোটাকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করেছে। সহজ সাধারণ মাটির সারফেসসমূহ লাইন, ফর্ম ও রঙের বিন্যাসে এ্যান্টিক আবেদন সৃষ্টি করেছে, যাতে শিল্পীর একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

ভাস্কর্য আর টেরাকোটার মত ভাব গাম্ভীর্যময় শিল্পকর্মের বাইরে মৃৎশিল্পের ব্যবহারিক দিক নিয়েও শিল্পী কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি শহুরে মানুষের কাছে মৃৎশিল্পকে গ্রহণযোগ্য করে তুলছেন নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে। কখনও শিল্পকর্মের সঙ্গে ব্যবহারিক গুণ যুক্ত করেছেন কখনও বা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যে শিল্পের সংযোগ ঘটিয়েছেন। নিজস্ব নক্সায় তৈরি করেছেন শোপিস, লুকিং গ্লাসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী। এতে করে শিল্পী অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হয়েছেন তেমনি মৃৎশিল্পকে নতুন রূপে শহরে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। শিল্পীর এমন সূক্ষ্ম অনেক কাজ, কারুকাজ শিল্পের মেধাকে, দক্ষতাকে প্রকাশ করে। তার নিরীক্ষার সফলতা প্রমাণ করে। শিল্পীর এই নিরীক্ষা শিল্প ও সুন্দরের পরিচর্যা মৃৎশিল্পকে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মোড়কে উপস্থাপন করেছে।

মৃৎশিল্পচর্চায় নিয়ত নিরীক্ষার পথযাত্রী শিল্পী আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল। এদেশের মৃৎশিল্পের নতুন সম্ভাবনার রূপায়নে এগিয়ে চলছে যাদের চিন্তা-চেতনায়, তাদেরই একজন এই শিল্পী। যার কিনা রয়েছে সারা বিশ্বের মৃৎশিল্পের প্রতি বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও সুস্পষ্ট ধারণা আর মৃৎশিল্পের রূপায়ণে একাডেমিক দক্ষতা ও শৈল্পিক চেতনার বলিষ্ঠ প্রয়াস। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের শিল্পমানকে আরো অনেক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবেন ড. আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল।

Dhaka University Institutional Repository

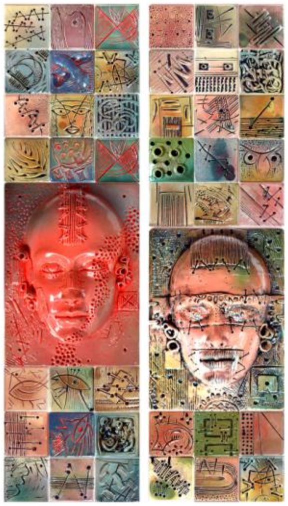

চিত্র–১৮০
শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৮১
শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৮২
শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৮৩
শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৮৪
শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৮৫
শিল্পী ডক্টর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল-এর শিল্পকর্ম–৬

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে যে কয়জন প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পী মৃৎশিল্প নিয়ে গবেষণা করছেন। মৃৎশিল্প নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের অন্যতম একজন শিল্পী নূরুল আমীন। শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিশীলতার সাক্ষর রেখে চলছেন এই প্রতিভাবান শিল্পী মৃৎশিল্পের মতো একটি সৃজনশীল শিল্পের সাথে নিজেকে শুধু যুক্তই করেননি বরং এই শিল্পকে তিনি ধারণ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার মেলবন্ধন লক্ষ্যণীয়। মৃৎশিল্পের হাজার বছরের শিল্প ঐতিহ্যকে অনুধাবন করেই হয়তো শিল্পী এই মাধ্যম নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হয়েছেন। মৃৎশিল্প নিয়ে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষা ও গবেষণায় শিল্পী নিজেকে যেভাবে সমার্পণ করেছেন তাতে এই শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিল্পী নূরুল আমীনের মৃৎশিল্পের রূপায়ণে একাডেমিক দক্ষতা ও শৈল্পিক চেতনার বলিষ্ঠ প্রয়াস। তাঁর মৃৎশিল্পী হয়ে উঠার পেছনে তাঁর জন্মস্থান বাংলার ভাটি অঞ্চলখ্যাত নেত্রকোনার হাওড়-বাওড়ের লোকজ, সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে সমকালের উপযোগী করে ব্যবহার করার জন্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, যা শিল্পী সফলতার সাথেই সম্পন্ন করেছেন। একই সাথে বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মৃৎশিল্পের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলির পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিল্পী নিজেকে নিয়োজিত করেছেন আধুনিক ও যুগোপযোগী মৃৎশিল্প নির্মাণে। তাঁর শিল্পকর্ম তাঁর মেধা, দক্ষতা ও শৈল্পিক মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং সেই সাথে শিল্পবোদ্ধাদের মনে স্থান করে নিয়েছে।

সুদক্ষ এই শিল্পী ১৯৯৩ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প বিভাগে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিকে শিক্ষা শুরু করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় দীক্ষিত নতুন প্রজন্ম সূচনা করে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের নতুন ধারা। এই ধারার পথিকৃৎ হিসেবে আমরা প্রথমে অলক রায়। আবু সাঈদ তালুকদার, স্বপন কুমারকে এবং পরবর্তী প্রজন্মে দেবাশীষ পাল আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল, নূরুল আমীন, মাসুদুর রহমানদের মতো স্বনামধন্য শিল্পীদের পাই। পূর্বপ্রজন্ম মা শুরু করেছিলেন এরা তাকে আরো এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। শিল্পী নূরুল আমীন তাঁর ছাত্রজীবনেই নানান মাধ্যম যেমন, আর্দেনওয়ার, স্টোনওয়ার ইত্যাদির অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মৃৎশিল্প যেহেতু ব্যবহারিক এবং সৃজনশীল ধারার একটি শিল্প তাই শিক্ষানবীশ অবস্থাতেই প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ব্যবহারিক ও সৃজনশীল ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন যথেষ্ট নিষ্ঠা আর সততার সাথে। শিল্পী নূরুল আমীন তাঁর মেধা আর দক্ষতা দিয়ে আধুনিক কলা কৌশলের সমন্বয়ে তৈরি করেছেন দৃষ্টিনন্দন সব শিল্পকর্ম। মৃৎশিল্পের নানা ধরনের নির্মাণ সূত্র ও উপাদানের বৈচিত্র্যময় গবেষণার বিষয়টি তাঁর তৈরি শিল্পকর্মেরই সাক্ষ্য বহন করে।

শিল্পগুরু আবু সাঈদ তালুকদারের একনিষ্ঠ ছাত্র নূরুল আমীন শিল্পশিক্ষা যথার্থভাবেই গ্রহণ করেছেন। শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার নব্বই এর দশকে শিক্ষকতার পাশাপাশি মৃৎশিল্পের স্টুডিও নির্মাণ করেন। শিল্পী চীনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের করণকৌশলের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন তাঁর নির্মিত স্টুডিওতে। তাঁর এই গবেষণা ও শিল্পনির্মাণে সহযোগী শিল্পী হিসেবে নূরুল আমীন প্রায় সাত বছর এই স্টুডিওতে একনিষ্ঠ

ভাবে কাজ করেছেন। একই সাথে আয়ত্ব করেছেন প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও আধুনিক করাকৌশলের নানান দিক। ব্যক্তিগত গবেষণায় সমৃদ্ধ হয় শিল্পী নূরুল আমীনের শিল্পভাবনা। শিক্ষানবীশ থাকাকালীন তিনি চারুকলা ইনস্টিটিউটের জয়নুল গ্যালারিতে একক মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তার শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু ছিল ব্যবহারপযোগী মৃৎসামগ্রী। সেই সময় গ্লেজে নির্মিত শিল্পসামগ্রীগুলো শিক্ষার্থী , শিল্পী, দর্শক, সমালোচকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। শিল্পীর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, অর্জিত জ্ঞান, সৃষ্টিশীল মননশীলতার সাথে যুক্ত হয়েছিলো আধুনিক করণকৌশল নিয়ে তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান, যা কিনা তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত। তিনি কমন ক্লের সাথে আরো অন্যান্য উপাদান মিশ্রণের মাধ্যমে তাপমাত্রার সমন্বয়পূর্বক অনেক রকম গ্লেজের ফর্মূলা আবিষ্কার করেছেন। মৃৎশিল্পসামগ্রীতে আর্দেনওয়ার তাপমাত্রা ও স্টোনওয়ার তাপমাত্রা প্রয়োগ করে শিল্পকর্মে নতুনত্ব এনেছেন। মৃৎশিল্পের বহুবিধ নির্মাণ সূত্র ও উপাদানের বৈচিত্র্যময় গবেষণার বিষয়টি তাঁর তৈরি শিল্পকর্ম গুলোই সাক্ষ্য দেয়। তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিশীল ভাবনা আর বিন্যাস বর্তমানে আধুনিক মৃৎশিল্পের পথকে করছে মসৃণ।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পোড়ামাটির তৈজসপত্র অতি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল জীবনযাপনের অনুষঙ্গ হিসেবে কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যবহারের উপযোগিতাকে পাশ কাটিয়ে দৃষ্টিনন্দন শিল্পের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হচ্ছে, যা কারুশিল্পকে চারুশিল্পের সমমর্যাদায় উন্নীত করেছে। আর এই কাজটি অত্যন্ত সফলতার সাথে করে আসছেন প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পীরা। শিল্পী নূরুল আমীন এদেরই একজন। একজন শিল্পীকে একই সাথে হতে হয় কর্মী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কেননা, মাটি তৈরির শুরু থেকে পোড়ানো পর্যন্ত এর প্রতিটি ধাপে রয়েছে শিল্পীর শারীরিক ও মানসিক সম্পৃক্ততা। শিল্পী আমীর একজন প্রকৃত মৃৎশিল্পীর নিয়ম অনুসরণ করেই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় তাঁর শিল্পকর্মে আত্মনিবেদন করেছেন। ঐতিহ্যবাহী টেনকিন ধারন করে নিম্নতাপমাত্রায় পুড়িয়ে টেরাসিগিলা মাধ্যম ও অন্যান্য কলাকৌশলের পথ অতিক্রম করে আধুনিক রূপে শিল্পী নির্মাণ করেছেন তাঁর শিল্প। কয়েল পদ্ধতি, স্ল্যাব পদ্ধতি, ন্যারিয়্যাজসহ উচ্চ তাপমাত্রার নানা ধরনের ব্যবহারিক সামগ্রী। তৈরিতে মেধার প্রমাণ রেখেছেন। চৌকষ এই শিল্পী গতানুগতিক ধারায় শিল্পকর্মের কিছু অংশ হুইলে আর কিছু অংশ ফ্রি হ্যান্ড মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। এতে করে নতুন একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে শিল্পকর্মটি।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে যে ক'জন মৃৎশিল্পী ভিন্ন মেজাজে, নতুন ভাবনায় সৃজনশীল মৃৎশিল্প উপস্থাপন করেছেন, তাদেরই একজন শিল্পী নূরুল আমীন। অসংখ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত এই শিল্পী মৃৎশিল্পের সকল মাধ্যমেই কাজ করেছেন। ভাস্কর্য নির্মাণে শিল্পী তাঁর দক্ষতার পাশাপাশি বিষয়বস্তু নির্বাচনেও বৈচিত্র্যময়তা এনেছেন। মানুষ ও প্রকৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সবকিছুই উঠে এসেছে তার শিল্পকর্মে। শিল্পীর বৈপ্লবিক চেতনার সাথে প্রতিবাদের ভাষা খুব মজবুত, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। সাম্প্রতিক সময়ের নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, অত্যাচার আর ব্যভিচারের নানা মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ্য সৃষ্ট অনাচার ও মানবিক বিপর্যয় শিল্পীর শিল্পমনকে দারুণভাবে স্পর্শ করে। সামাজিক নৈতিক অবক্ষয়, প্রতিহিংসা, ঘৃণা ও অত্যাচারের নেতিবাচক বিষয়গুলি শিল্পীকে করেছে উৎকণ্ঠিত আর সেটাই তাঁর মৃৎশিল্পকর্মে জোড়ালো প্রতিবাদ হিসেবে উঠে এসেছে। গ্রামীণ কৃষিসমাজ শিল্পীকে প্রভাবিত করেছে। অন্ন

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনে কৃষকদের শ্রমকে শিল্পী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন। তাইতো কৃষিকাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যেমন লাঙল, মই, নিড়ানী প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে শিল্পী নূরুল আমীনের শিল্পকর্মে। তাঁর কাজে সমকাল ও অতীতের সম্পর্কসূত্র যেমন খুঁজে পাওয়া যায়। তেমনি গভীর বক্তব্যও রয়েছে যা শিল্প-বোদ্ধা থেকে শুরু করে সাধারন দর্শক মনেও দাগ কেটেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় দীক্ষিত নতুন প্রজন্মের তিন তরুণ স্বপ্নবান শিল্পী ড. আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল, শিল্পী ড. নূরুল আমীন আর শিল্পী মাসুদুর রহমান গড়ে তুলেছিলেন স্টুডিও 'ভার্টিক্যাল'। বর্তমানে প্রায় অর্ধশত দক্ষ কর্মী এখানে কাজ করছে। এখানে তৈরি শিল্পসামগ্রী যেমন ফ্লাওয়ার ভাস, আয়না, অলংকার, নানা রং ও অভিব্যক্তির মুখোশ নাগরিক জীবনে শিল্পকর্মের মর্যাদায় স্থান করে নিয়েছে। এই তিন তরুণ শিল্পী সাভারের শিমুলিয়া, ধামরাইয়ের কাকরান, কাগজিপাড়া, বরিশালের বাউফল, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পালপাড়ায় ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের নিয়ে কর্মশালা করেছেন। এর পিছনে তাদের এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হচ্ছে দেশজ মোটিফ, রং, উপকরণ, শৈল্পিক কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করা এবং বংশানুক্রমিক শিল্পীদের আধুনিক মৃৎশিল্পের ধারণা ও কৌশলের সাথে পরিচিত করা। সেইসাথে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প কেন বাজার হারাচ্ছে তা অনুধাবন করা ও এর মধ্যে দিয়ে একসঙ্গে কাজ করে রুগ্ন হয়ে যাওয়া হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও শিল্পীকে স্বরূপে ফিরিয়ে আনা। পালদের জন্মগত দক্ষতার সঙ্গে আধুনিকতা মিলিয়ে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। তাদের এই মহৎ উদ্যোগ সফল হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মশালা করা বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুম্ভকারদের অনেকের কাজই এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও এখন সেখানে বিনিয়োগ করছেন। আর এখানেই আজহারুল ইসলাম, নূরুল আমীন, মাসুদুর রহমানের সার্থকতা।

শিল্পে আত্মমগ্ন এই শিল্পী দেশ বিদেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে বহুল প্রশংসিত হন। ২০০৪ সালে নবীন এই শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে ভাস্কর্য মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়াও আরও অনেক পুরস্কার, স্বীকৃতি শিল্পী নিজ গুণে অর্জন করেছেন। জ্ঞান অন্বেষণকারী, গবেষক নূরুল আমীন 'বাংলাদেশেল মৃৎশিল্প : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। মৃৎশিল্পের সাধক এই শিল্পী ২০০৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত হন। তাঁর পেশা তাকে মৃৎশিল্প গবেষণায় আরও গভীরে যেতে সাহায্য করেছে। শিল্পী নূরুল আমীন তাঁর শিল্পকর্ম, মৃৎশিল্পের আধুনিক করণ কৌশল, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন এই প্রজন্মের শিক্ষার্থী শিল্পীদের মাঝে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১৮৬
শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৮৭
শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন-এর শিল্পকর্ম–২

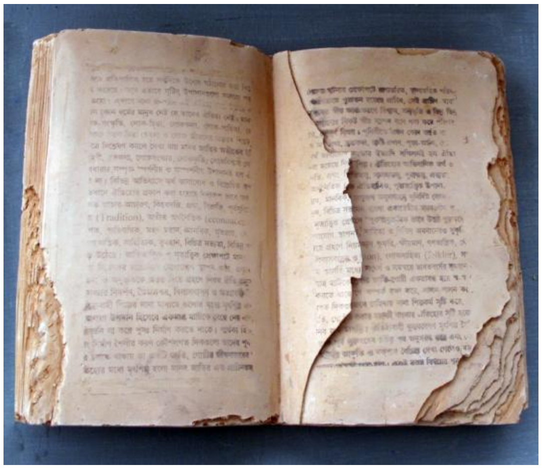

চিত্র–১৮৮
শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন-এর শিল্পকর্ম–৩

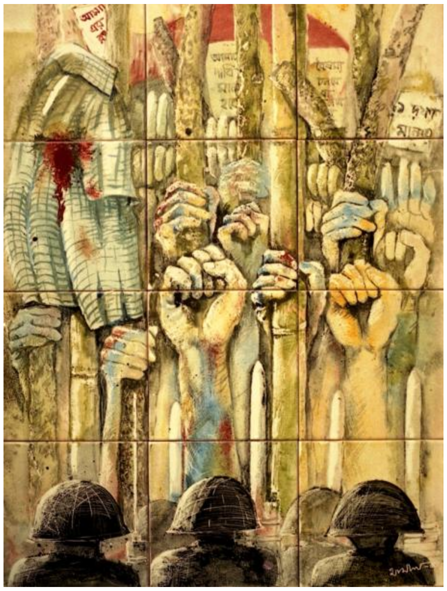

চিত্র–১৮৯
শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৯০
শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৯১
শিল্পী ডক্টর নূরুল আমীন-এর শিল্পকর্ম–৬

শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী

বর্তমান সময়ের তরুণ মেধাবী শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী তাঁর শিল্প কর্মে নান্দনিকতাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। শিল্পের ব্যবহারিক দিকটিও সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন তিনি। ১৭ নভেম্বর ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এই শিল্পী। শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি সহজাত ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠা একজন মানুষ চারুকলা অনুষদে থিতু হবেন এটাই স্বাভাবিক। শিল্পের প্রতি ভালোবাসার সহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর হয় না। চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগের মেধাবী এই ছাত্র পরবর্তী সময়ে মৃৎশিল্প বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তাঁর শিল্প কর্ম জীবন শুরু করেন।

শিল্পী সাব্বির আল রাজী মৃৎশিল্প নিয়ে কাজ করলেও পেন্টিং, ভাস্কর্য, গ্রাফিক ডিজাইনসহ শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন। শিল্পী মনে করেন এই সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছে মৃৎশিল্পী সাব্বির আল রাজী মৃৎশিল্পকে একজন শিল্পীর জন্য বৈচিত্র্যময় বিশাল কর্মক্ষেত্র বলে মনে করেন। কেননা এই শিল্পে একইসাথে ব্যবহারিক ও নান্দনিক সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিল্প ও বিজ্ঞান এর সমন্বয়ে চর্চিত হয় মৃৎশিল্প ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের বংশপরম্পরার শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে এই শিল্পে বিজ্ঞানের ব্যবহার করে আমাদের নিজের অজান্তে। পরম্পরার জ্ঞান ও নিজের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে প্রাচীনতম এই শিল্পের শিল্পীরা আদি থেকে আজ অবধি ঐতিহ্যকে নিয়ে এসেছেন যা সত্যিই বিস্ময়কর। প্রশিক্ষিত শিল্পীরা শিল্প ও বিজ্ঞানের সমন্বিত এই শিল্প নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন। শিল্পী সাব্বির আল রাজী ও তার ব্যতিক্রম নন। টেরাকোটা ভাস্কর্য, পটারি ইত্যাদি বিষয় তাঁর শিল্প কর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মৃৎশিল্পের মূলসুর যেমন সৃষ্টিশীলতা, ব্যবহারিক বিষয়, নান্দনিকতা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনা সুস্পষ্ট। তরুণ এই শিল্পী শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে শৈল্পিক সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক দিকের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি মৃৎশিল্পকে সাধারন মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছেন নিজস্ব শিল্পিত ভাবনার মোড়কে। এজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন মগ, মগ চা, সরবত ইত্যাদি খাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহৃত এই সামগ্রীটিকে শিল্পী এক অনবদ্য শৈল্পিক রূপে সামলে এনেছেন। তাঁর এই শিল্পসামগ্রীটি শিল্পবোদ্ধা থেকে শুরু করে সাধারণ সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে শৈল্পিক সৌন্দর্য ও ব্যবহার উপযোগী হওয়াতে। শিল্পীর মগগুলো গতানুগতিক সাধারণ মগ থেকে আলাদা। আকার, আকৃতি, নকশা, রং সবকিছুই। নিয়েই এক একটি মগ এক একটি শিল্পকর্ম। মৃৎশিল্প শিল্পী এই প্রজন্মের মানুষের কাছে মৃৎশিল্পের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে   করে শিল্পী সাব্বির আল রাজী শতভগা সফল বলে ধরে নেয়া যায়।

তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি শিল্পী সাব্বির আল রাজী ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের পিছিয়ে পড়া বংশপরম্পরার শিল্পীদের জন্য কিছু করার কথা ভাবছেন, যা কিনা একজন শিল্পীর মানবিক দিকটি তুলে ধরে। অসংখ্য পুরস্কারপ্রাপ্ত এই স্বপ্নবান শিল্পী মৃৎশিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন এটা আশা করাই যায়।

Dhaka University Institutional Repository

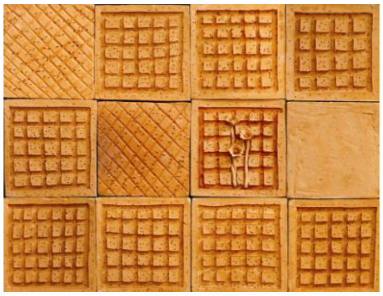

চিত্র–১৯২
শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৯৩
শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–১৯৪
শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–১৯৫
শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–১৯৬
শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–১৯৭
শিল্পী মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী-এর শিল্পকর্ম–৬

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার

মাটি ও মানুষ গভীরতর অর্থে অভিন্ন। পৃথিবীতে আদি থেকেই মৃত্তিকার সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্ক অত্যন্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শিল্পকলার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে এই গুরুত্বের অধিকাংশই ধারন করেছে মৃৎশিল্প। মৃৎশিল্পের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি মৃৎশিল্পের অনুকূলে হওয়াতে এখানে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প সবসময়ই জীবত ও শক্তিশালী। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন ফলে প্রাতিষ্ঠানিক মৃৎশিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের বোধকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছেন। এ দেশের শক্তিশালী পরম্পরার গড়নের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য ধারার মৃৎশিল্পের। তার এই ভাবনা থেকেই ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব' পাকিস্তান চারু ও কারুকলা' বর্তমান চারুকলা অনুষদ। এর মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে নব নব আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে আধুনিক কলাকৌশল সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প।

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের মধ্যে প্রথম সারির তথা পূর্বসূরি মৃৎশিল্পীর শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজন্মের মৃৎশিল্পী এবং সমকালের অপেক্ষাকৃত নবীন শিল্পীরা শিল্পাঙ্গনে নব মাত্রা যোগ করে অগ্রজ শিল্পস্রষ্টাদের সাফল্যেল পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এই ধারাবাহিকতায়ই আমরা পেয়েছি সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পী চিণ্ময়ী সিকদারকে। নবীন এই শিল্পী শুরু থেকেই তার কাজে স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার। শৈশব থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হওয়া এই শিল্পীর ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। জল রং-এ ছিল তার বিশেষ দক্ষতা। জল রং-এ তিনি একাধিকবার স্বর্ণপদক, রৌপ্যপদক পেয়েছেন এছাড়াও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন পেন্সিল স্কেচে। এই অর্জনগুলিই তাকে পরবর্তী সময়ে নিয়ে এসেছে চারুকলা অনুষদে।

শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগে পড়াশোনা করেন। বরাবরের মতো এখানেও তিনি তার সফলতা দেখিয়েছেন। মেধাবী এই শিল্পী এম.এফ.এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শিল্পীর একক প্রদর্শনীও রয়েছে। মৃৎশিল্পের সব মাধ্যমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও তিনি মূলত টেরাকোটা, টেবিলওয়ার, স্টুডিও পটারি করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। মাটির নমনীয় গুণ আর সর্বাংসহা স্বভাব অনুভব করেই এই তরুণ শিল্পী নানা ধারার কাজে তাঁর শিল্প সৌকর্যের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীর কাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁর শিল্পকর্মগুলো নরম, কোমল আদলে গড়া, কাঠিন্যতাকে দুর্বোধ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে মূলত গড়নে দিয়েছেন টাইলস থেকে শুরু করে তার তৈরি নানা পানপাত্র ও অন্যান্য ভাস্কর্য। মাটির আঁধারকে প্রাণময় করে উপস্থাপন করার মধ্যে দিয়েই শিল্পীর স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। প্রাণহীন মাটির শিল্পকর্মগুলো বিশেষ ভঙ্গির মাধ্যমেই ভাষা পেয়েছে। অনেক নির্জীব মৃৎপাত্রই কোন না কোন প্রাণির ছায়া অবলম্বন করে যেমন কোন পাত্র দেখলে মনে হয় ঠোঁট আছে, যেমন পানির জগ। ভাত রাধার হাঁড়ি গর্ভের স্ফীতি দিয়ে কথা বলে। কাখে যে কলসি নেয়া হয় তার কণ্ঠ ও নিচের প্রশস্ত অংশ শরীরি সত্তাকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে। অনেক পানপাত্রকে চিন্ময়ী মানুষের অবয়বে বা মানুষ ভাবনায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিশেষ করে নারী শরীরণী হয়ে উঠেছে ‘টি সেট’ এর পটগুলো। কখনওবা টি-পট এসেছে পাখির আদলে।

পটারি অনেক সময়ই মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণির অবয়ব ধারণ করে মানুষের সংসারে সজীব কোন সদস্যের মত উপস্থাপিত হয়ে থাকে। ঘট-পট, ঘড়া-সরা সবই মানুষের অবলম্বন, আত্মীয়ের মত ঘনিষ্ঠ। এই সবের সঙ্গে তার সখ্য, ঘনিষ্ঠ যোগ এবং একারণেই হয়তো প্রাণ নিরপেক্ষ শুধু জ্যামিতিক হিসেব দিয়ে তা গড়া হয় না। চিন্ময়ী এই সত্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাই মাটির স্বভাব কাজে লাগিয়ে সাধারণ তৈজসপত্রকে আক্ষরিক অর্থেই প্রাণি রূপে উত্তীর্ণ করেছেন তিনি। এতে তার কাজে ভাস্কর্যের মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অনেক সময় মাটিতে বিছানো প্রাণিরূপময় অনেকগুলো পাত্র স্থাপনা শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে স্পর্শ করতে চেয়েছে। শিল্পীর প্রিমিটিভ বা আদিম নামের কাজ দুটিতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পাত্রের বৈশিষ্ট্য নেই। একটি বড় ও একটি ছোট পাত্র যেন গ্রীবা উঁচিয়ে মা ও শাবকরূপী কোন প্রাণির মহড়া দিচ্ছে। পাত্র গুলোর গায়ে অনেক গুহা চিত্রের মোটিভ রয়েছে। চিন্ময়ী তার মৃৎপাত্রে আদিমতার সংকেত সংযুক্ত করেছেন। নানা নকশা, গুহাচিত্রের প্রাণিজ ও ও উদ্ভিজ মোটিফে আকীর্ণ তার মৃৎপাত্রের শরীর। আদিম মানুষের সব বস্তুর মধ্যেই বিশ্বাস ও ঐন্দ্রজালিক ভাবনার সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই চিন্ময়ী মাটির আধারকে রহস্যের আধারে রূপান্তরিত করার কথা ভেবেছেন। নানা জ্যামিতিক নকশা, প্রাণি, কীট-পতঙ্গেও রৈখিক কাঠামো আঁকার জন্য প্রত্নগন্ধী হয়ে উঠেছে শিল্পী চিন্ময়ী সিকদারের কাজ। (মইনুদ্দীন খালেদ, ২০০৯ : ক্যাটালগ) মইনুদ্দীন খালেদ, ২০০৯, চিন্ময়ী সিকদারের একক প্রদর্শনীর ক্যাটালগ)

শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার নারী শিল্পী বলেই হয়তো মৃৎশিল্পকে তারই যন্ত্রণার ফসল, আপন সন্তান হিসেবে দেখছেন। এই মৃন্ময়ীরা চিন্ময়ীর আত্মজা। শিল্পীর কাজে নারীর মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে।

মৃৎশিল্পে চারু ও কারু শিল্পের সমন্বয় যেমন ঘটেছে তেমনি আবার শিল্প ও বিজ্ঞান একইসাথে যুক্ত হয়েছে। এই মাধ্যমে শিল্পচর্চা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং দুরূহও বটে। তাইতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও অনেক শিল্পীই তাদের শিল্প প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন না। সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে চিন্ময়ী সিকদার তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পকর্ম উপস্থাপনে শিল্পীর সহজ সরল আকৃতি-সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এবং পরিমিতিবোধ লক্ষণীয়। আধুনিক শিল্পের ত্রিমাত্রিক ধারা এবং চিত্রকলার সার্থক ব্যবহারের দিকটি তাঁকে অন্যান্য মৃৎশিল্পীদের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। তাঁর মৃৎশিল্পকর্মে সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ সার্থক। শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিশীল ভাবনা আর বিন্যাসে আধুনিক মৃৎশিল্পের পথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে উৎসাহিত করবে নতুন প্রজন্মকে। সেই সাথে গতিশীল মাত্রায় সুপরিশীলিত হবে মৃৎশিল্পের আধুনিক থেকে আধুনিকতর চর্চা।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–১৯৮
শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার-এর শিল্পকর্ম–১

চিত্র–১৯৯
শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার-এর শিল্পকর্ম–২

চিত্র–২০০
শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৩

চিত্র–২০১
শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৪

চিত্র–২০২
শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৫

চিত্র–২০৩
শিল্পী চিন্ময়ী সিকদার-এর শিল্পকর্ম–৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্টুডিও পটারি

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্টুডিও পটারি

সময়ের আর্বতে মৃৎশিল্পেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। মৃৎশিল্পের আঙ্গিকগত প্রকাশভঙ্গিতে যুক্ত হয়েছে শিল্পীর শিল্পবোধ, শিল্পচেতনা, নান্দনিকতা, ফর্ম, শেপ, কালার ও করণকৌশলগত দিক। বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে শিল্পকর্মে ব্যবহৃত নানা উপকরণে ও এসেছে পরিবর্তন সাথে ব্যবহারিক সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে সেইসাথে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছে এবং নতুন নতুন শিল্পীরা এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় আধুনিক মৃৎশিল্প বা স্টুডিও পটারি বা স্টুডিওভিত্তিক মৃৎশিল্পচর্চা।

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগায় এই শিল্পের পরিসরও স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত আধুনিক মৃৎশিল্পকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যেমন–

ক. স্টুডিও মৃৎশিল্প

খ. ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা বাণিজ্যিক মৃৎশিল্প

গ. স্থাপত্য মৃৎশিল্প (বাণিজ্যিকভাবে তৈরি স্থাপত্য নির্মাণ সহায়ক)

এই ভাগ মৃৎশিল্প নির্মাণের ধরণ, করণকৌশল, ব্যবহার উপযোগিতা এবং শিল্পগুণ বিবেচনা সাপেক্ষে করা হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী ও স্টুডিও পটারগণ তাদের কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছেন কখনও নান্দনিক বোধ থেকে, কখনও দার্শনিক কারণে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘরে বসেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ব্রিটেনে এদের সংখ্যা মুষ্ঠিমেয় হলেও ইটালীতে যথেষ্ট সংখ্যায় বিরাজমান ছিল। লুইগি গ্যদেঞ্জি এদের মধ্যে একজন যিনি ছোট পরিসরে চর্চা করেছেন। এ ধরনের চর্চা শুরু হয়েছিল ১৭০০ সন থেকে্ তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত খোলামেলা মনের একজন শিল্পী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মতান্তরে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘটে যাওয়া ইটালির আর্ট নভ (Art Noaveau) বিপ্লব শিল্পকলার আরো একধাপ উৎকর্ষের নতুন যাত্রা যোগ করে। বিশেষ করে ‘প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মানুষের জীবন-যাত্রায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণায় বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।” (চারুকলা ইনস্টিটিউট স্মরণীকা, ২০০৪ : ৯৪) মৃৎশিল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া, নতুন নতুন আবিষ্কার, তত্ত্বীয় ও কলাকৌশল প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং আধিক সংখ্যক ভিন্ন পেশাজীবী মানুষের এই শিল্প নির্মাণে অংশগ্রহণ প্রভৃতির ফলে মৃৎশিল্প উত্তরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায় মিথ্যার জয়জয়কার এবং অস্থিরতার যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তারই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের শিল্পীরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নতুনের অন্বেষা বা নবতর শিল্পভাষার সন্ধান করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই স্মল স্কেল আর্ট (Small-scale) পটারিকে সস্তা (Mass Produced) মৃৎপাত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। ব্রিটিশ পটার বার্নাড লীচ (Bernard Leach) এবং জাপানে শোজি হামদা (Shoji hamada) স্টুডিও পটারি আন্দেলনের (Studio Pottery Movement) মাধ্যমে এই অবস্থার উন্নতি ঘটান। লীচ জাপানে (১৯২০ সাল) মৃৎশিল্পে উচ্চশিল্প গ্রহণের পর দেশে ফিরে কর্নওয়েল এর সেন্ট আইভস-এ St. IVES) স্টুডিও স্থাপনের মাধ্যমে স্টুডিওভিত্তিক মৃৎশিল্প চর্চার সূচনা করেন।' (Grath Clark : 136) শিল্পী লীচ দেখলেন দৈনন্দিন ব্যবহার্য তৈজসপত্র বা আধুনিক মৃৎশিল্প নির্মাণে স্থানীয় মাটি বেশ উপযোগী। মৃৎশিল্প যে কেবল ব্যবহারিক শিল্পই নয়, এর যে নান্দনিক শিল্পগুণ রয়েছে যা ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে যার ব্যবহারিক গুণাবলির চেয়ে নান্দনিক গুণাবলিই প্রাধান্য পাবে, এ সকল ভাবনা তিনিই প্রথম ভেবেছিলেন। লীচ আরও ভেবেছিলেন একই পটারির দ্বিতীয় কোন কপি থাকবে না। তাঁর এসকল ভাবনা থেকেই নেয়া পদক্ষেপের কারণেই আজকের মৃৎশিল্প অনেক উন্নত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। 'জার্মানের ফিলিপ রোজেনথাল (Philip Rossenthai) কোম্পানি তাদের নির্মাণকৃত টেবিলওয়্যার সামগ্রীগুলো ব্যবহার উপযোগিতা ও নান্দনিক উৎকর্স বাড়ানোর জন বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের কোম্পানিতে নিয়োগ দান অপরিহার্য মনে করেছিলেন। (আজহারুল, ২০১১ : ১৬২)

মৃৎশিল্প অবিস্মরণীয় অবদান রাখার জন্য যে সকল শিল্প অগ্রণী ভূমি রেখেছেন তাদের মধ্যে শিল্পী তাপিও রিকালা (Tapio Wirkkala) হেনরি মুর (Henrimoor) লর্ড কুইনবেরি (Lord Queenbery), ওয়ালটার গ্রোপিয়ামস, (Walter Gropius) ভিক্টর পাজামোর (Victor Pasmore) এডুয়ারদো পাওলোজি (Eduardo Paolozzi) এবং সালভাদর দালি (Salvador Dali) অন্যতম।

'জাপানের মাশিকো (Mashiko) নামক স্থানে শোজি হামদা ৪০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রীতিকে গবেষণা কাজের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করেন।'

এাড়া আরও যাদের পটারি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে তাদের মধ্যে পাবলো ইন্ডিয়ান (Pueblo Indian) মারিয়া মার্টিনেজ (Maria Martinez) লুসি এম. লুইস (Sucy M. Lewis) এবং ইংল্যান্ডের ওয়েজ উড গ্রুপ (Wedge Wood) এর নাম উল্লেখযোগ্য)। 'এই গ্রুপ ইউরোপে সফর তৈজস মৃৎশিল্পের পণ্যোৎপাদনে অগ্রদূত এবং বর্তমানেও তারা উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে'।

বিংশ শতকে আধুনিক শিল্পান্দোলনে অংশ হিসেবে মৃৎশিল্পের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয় চিত্রকর ও ভাস্করদের মৃৎশিল্প মাধ্যমে আত্মনিয়োগ ও নানামুখী মৃৎপাত্র নির্মাণ ইত্যাদি সৃজনশীল মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পীদের সাথে অন্য শিল্পমাধ্যমের গুণী শিল্পীগণ সম্মিলিতভাবে শিল্পকর্ম সম্পাদন করেছেন। মৃৎশিল্প নির্মাণে পাবলো পিকাসোর শিল্পকর্মগুলো এক অভিনব সৃষ্টি। পাবলো পিকাসোর (১৮৮১-১৯৭৩) ও হেনরি মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪) স্টুডিও ভিত্তিক

সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পিকাসো ফ্রান্সের মৃৎশিল্পী জর্জ ও সুসান রেমির (Georges and Susan Ramie) সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পিকাসো মৃৎশিল্পে কল্পিত রূপের পরিবর্তন ঘটান। পিকাসোর তৈরি মৃৎপাত্রে প্রাণি ও ফিগারের অপূর্ব সমন্বয় কাল্পনিক পরিবর্তনেরই ফল। অন্যদিকে হেনরি মাতিস মৃৎশিল্পকে চিত্রকলার ভিত্তি হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ব্রাশ দিয়ে মৃৎপাত্রগুলো রেখা ও ফর্মের অনুরূপে রঞ্জিত করেছেন।

১৯৩০-এর দশকে রাজনৈতিক কারণ এবং শিল্পীদের ওপর নেমে আসা নানা রকম নির্যাতন নিষ্পেষণের কারণে বহু মৃৎশিল্পী স্বদেশ ত্যাগ করেন। লুসি রি (Lucie Rie), হ্যান্স কপার (Hans Coper), মাইজা গ্রোটেল (Maija Grotell) এবং নাটজলার (Natzler) তাদের মধ্যে অন্যতম তাঁরা অস্ট্রিয়া, জার্মানি, স্ক্যান্ডিনোভিয়া থেকে ইংল্যান্ড পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডে যাওয়ার পূর্বে ভিয়েনাতে মৃৎশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত লুসি ১৯৩৯ সালে একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন। লুসি ঐতিহ্যবাসী রীতির সাথে চাকচিক্য বর্জিত সাদামাটা আঙ্গিকে অভিনব সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইতালির মৃৎশিল্প ঐতিহ্যের সাথে যাদের নাম জড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে লিওনাসিলো লিওকার্ডি (Leoncillo Leonarde) অন্যতম। তাঁর নির্মিত মৃৎপাত্র বিংশ শতকের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার প্রভাব প্রতীয়মান হয়। তাঁর মৃৎশিল্পের মডেল নির্মাণে স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয় এবং কিউবিস্ট ও ফিউচারিস্ট চিত্রকলার প্রভাবে স্বল্প পোড়ামাটির উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার মৃৎশিল্পে স্থান করে নেয়। ১৯৩০ এর দশকে ইতালির চিত্রকর লুসিয়ো ফন্টানো (Lucio Fontana) (১৮৮৯-১৯৭৩) মাটির ওপর ত্রিমাত্রিক স্থির জীবন চিত্র অঙ্কন করেন যা, বিমূর্ত চিত্রকলার প্রাক আবয়বিক কাঠামো।

মৃৎশিল্পী সোজি হামাদা এবং বানার্ড লীচ এর বন্ধুত্বের ফলশ্রুতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৃৎশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভাবের আদান প্রদান হয়েছিল। বানার্ড লীচ বলেন যে, সিরামিক শিল্প নিয়ে পড়াশুনা করতে তাঁকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উৎসাহিত করেছিলো, তা হলো রাকু পার্টিতে অংশগ্রহণ। সে সময় রাকু গ্লেজ মৃৎশিল্পে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আনন্দদায়ক একটি গ্লেজ মাধ্যম। উপস্থিত অনুষ্ঠানে মৃৎশিল্পীরা প্রত্যেকেই একটি পাত্রকে গ্লেজের মাধ্যমে রাকু উপযোগী করে রঞ্জিত করার পর রাকু চুল্লিতে ফায়ারিং করে পূর্ণাঙ্গ মৃৎশিল্প তৈরি করে। উল্লিখিত গ্লেজের আবেদন অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও আনন্দদায়ক যা শিল্প, শিল্পী এবং দর্শকদের তাৎক্ষণিক বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে। সোজি হামদা মৃৎশিল্প নির্মাণে ব্যবহার করেছেন স্থানীয় কাদামাটি। পরবর্তীতে আশপাশের বন থেকে সংগ্রহকৃত ছাই দিয়ে মৃৎপাত্রের চকচকে গ্লেজ তৈরি করেছেন। হামাদার তৈরি মৃৎপাত্রে জাপানের সমৃদ্ধ গ্রামীণ সিরামিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে। বার্নাড লীচ যখন ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন তখন হামাদ তাকে চুল্লি (kila) তৈরি এবং স্টুডিও প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন।

১৯৫০-এ দশকে বৈশ্বিক মিথষ্ক্রিয়া অন্য যে মৃৎশিল্পী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তিনি হলেন জাপানের কিটাওজি রোসানজিন(Kitaoji Rosanjin 1883-1956) । রোসানজিন মূলত নিজেকে ক্যালিগ্রাফার শিল্পী এবং রেস্তোরার মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রেস্তোরায় ব্যবহৃত মৃৎপাত্রের বহুমাত্রিক উপস্থাপনে রোসানজিন বহুমাত্রিক নকশার মাস্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ক্যালিওগ্রাফি অঙ্কনের দক্ষতা এবং নীল

Dhaka University Institutional Repository

রঙের সমন্বয়ে মৃৎপাত্র রঞ্জিত করেন। এই শিল্পী মৃৎশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমসহ বিজেন (Bizen) ওরিবি (Oribe) শিনো (Shino) সীটো (Seto) এবং পোসিলেন (Porcelain) ইত্যাদি সফলভাবে নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত পটারি ও মৃৎপাত্র সমসাময়িক অন্য শিল্পীদের চেয়ে ভিন্ন এবং প্রভাবমুক্ত ছিল।

বর্তমান আধুনিক মৃৎশিল্প যে দুজন স্টুডিও মৃৎশিল্পীর কাছে ভীষণভাবে ঋণী তারা হচ্ছেন Barnard Leach (UK) এবং Peter Voulkos (USA) তাঁরা তাদের স্ব-স্ব প্রজন্মের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ। মৃৎশিল্পী ছিলেন। লীচ (Leach) ১৯৪০-এর দশকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মৃৎশিল্প নির্মাণ ও আবিষ্কার দর্শনের ন্যায্যতা দানের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শিল্পী শিল্পের এ মাধ্যমে এতই বোধগম্য ও সমৃদ্ধ জ্ঞান ছিল যে, মৃৎশিল্প কৌশল আন্দোলনের কল্যাণকে সহজে আয়ত্ব করেছিলেন। লীচের কাজের প্রভাব জার্মান, ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পড়েছিল।

১৯০৯ সালে লীচ জাপানে মৃৎশিল্প নির্মাণ শুরু করেন। ১৯২০ সালের পর ইংল্যান্ডে এসে St. Ives Cornwall এ স্টুডিও স্থাপন করেছিলেন এবং স্টুডিও মৃৎশিল্পে গভীর মনোনিবেশ করেন। ইউরোপ আধুনিক স্টুডিও পটারির জনক লীচ। তাঁর লেখা দ্য পটারস বুক (The Potter's Book) মৃৎশিল্প নির্মাণ সহায়ক এবং গুণগত মানের জন্য বইটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

শিল্পবোদ্ধারা মনে করেন, স্টুডিও মৃৎশিল্প নির্মাণের ধারাবাহিকতা অত্যন্ত গতিশীল কারণ এর মধ্যে রয়েছে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর প্রযুক্তিগত উন্নত গবেষণা। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের গতিধারার স্টুডিও মৃৎশিল্প ব্যবহার উপযোগিতার সাথে সাথে ডেকোরেশনেও স্বকীয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে আর শিল্পীরাও স্টুডিও মৃৎশিল্প নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যেহেতু মৃৎশিল্প প্রয়োজনের চাহিদা মেটায় আবার দৃষ্টিনন্দিত সময়োপযোগী সাজসজ্জায় স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশ ঘটানোর মতো শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম।

ইউরোপীয় চিত্রকরদের অনেকেই স্টুডিও পটারির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মৃৎশিল্পকে তাদের শিল্প মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের অনেকেই মাটির স্কেচের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্টুডিও পটারির প্রভাবে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইউরোপীয় মৃৎশিল্প কারখানায় কারুশিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের সাথে বিশ্ববরণ্য শিল্পীদেরও নিয়োগ দেয়া হতো। গুস্তভসবার্গ সুইডেন, ডেনমার্কে রয়েল,কোপেনহেগেন ও ফিনল্যান্ডের অ্যারাবিয়াতে এবং জার্মানের রোজেনথাল সহ বিভিন্ন কোম্পানির সাধারণ শিল্পী ও বাণিজ্যিক মৃৎশিল্পীদের সমন্বয় ঘটানো হয়। শিল্পীদের সাধারণত নিযুক্ত করা হতো তাদের দক্ষতার কারণে। সে সময় কোম্পানির উৎপাদিত টেবিলওয়ার সামগ্রীগুলোর ব্যবহার যোগিতা ও নান্দনিক উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্যে বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদেরকে কোম্পানিতে নিয়োগ দেয়অ অপরিহার্য মনে করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী যাদুঘর ও গ্যালারিতে প্রদর্শিত এ সকল শিল্পকর্ম সৃষ্টিশীলতা ও বাণিজ্যিকীকরণের সমন্বয়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও বিক্রি হতো। (মোঃ আজহারুল, ২০১১ : ১৭৪)

যুগে যুগে মৃৎশিল্প শিল্পকলা চর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই শিল্পের আছে নিজস্ব উপকরণ, কৌশলাদী, বিশেষ পদ্ধতি এবং পোড়ানোর তাৎপর্য। আর এই পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যময়তা ও

বৈপরীত্যের ফলেই মৃৎশিল্পকর্মের মাধ্যমগত পার্থক্য বা ভিন্নতা এবং স্বকীয়তা সহজে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই শিল্পমাধ্যমটি মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি ও বিবর্তনের ধারা যেমন বিকশিত করেছে, তেমনি একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক করণকৌশলের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত করেছে। বর্তমানে এ শিল্প মাধ্যমটি ঐতিহ্যবাহী বংশপরম্পরার গণ্ডি থেকে এবং একই সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ধারাবাহিকতার পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্টুডিও ভিত্তিক শিল্প হিসেবে রূপ লাভ করেছে। সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার কারণে এ শিল্প বর্তমানে প্রধান শিল্পের সমপর্যায়ে স্থান লাভে সক্ষম হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী বংশপরম্পরার শিল্পীদের সাথে স্টুডিও শিল্পীদের সাথে পার্থক্য হলো প্রশিক্ষিত শিল্পীরা দ্রততার সাথে ফর্মের রূপ পরিবর্তন করে ইচ্ছামাফিক নতুনতর রূপ দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে একজন বংশ পরম্পরার শিল্পী তাঁর বাজারের কথা ভেবে শিল্পের রূপ দেন। এভাবে তারা ক্রমশ: শিল্প থেকে দূরে সরে আসেন। সেক্ষেত্রে স্টুডিও পটারকে একজন আদ্যোপান্ত সৃজনশীল স্বাধীন শিল্পী বলা চলে। আর একজন সৃজনশীল শিল্পীর কাজ নিঃসন্দেহে উঁচুমানের শিল্পকর্ম হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে।

কালের পরিক্রমায় আধুনিক শিল্পান্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে মৃৎশিল্প ক্রমশঃ বিশ্ব শিল্পকলায় এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সমকালীন পাশ্চাত্যের নামীদামি শিল্পী এবং ভাস্করদের হাতে যখন মাটি উঠে এসেছে, তখন মাটিই যেন সোনা হয়ে শিল্পকলার জগতকে চমকে দিয়েছে। পাবলো পিকাসো, হেনরি মাতিস, সালভাদর দালি, ভাসিলি জান্দিলস্কিসহ আরো বহু শিল্পী মৃৎশিল্পে তাদের দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'কালের প্রবাহে 'স্টুডিও পটারি' হয়ে উঠেছে শিল্পিত এক অতি উচ্চমার্গীয় শিল্পমাধ্যম। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মান, ডেনমার্ক, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি সকল দেশেই স্টুডিও সিরামিকের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। শিল্পীর একান্ত নিজস্ব শিল্পময় নান্দনিক মনোভঙ্গি প্রকাশের জন্যে এই মাধ্যমটি হয়ে ওঠে তুমুল জনপ্রিয়।

স্টুডিও পটারি বা সিরামিক্স বাংলাদেশে শিল্প হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় যখন ১৯৬২ সালে ঢাকায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত চারুকলা ইনস্টিটিউট মৃৎশিল্প বিভাগ স্থাপিত হয়। মীর মোস্তফা আলি (জন্ম ১৯৩২) ছিলেন এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান। তিনি ইংল্যান্ড থেকে স্টুডিও এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিরামিক্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে কোইচি তাকিতা (১৯২৭) নামক একজন জাপানি বিশেষজ্ঞ বিভাগ চালুতে সহযোগিতা করেন। এ বিভাগের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে মরণ চাঁদ পাল (১৯৪৬) একনজ কুমার পরিবারের ছেলে। তিনি ১৯৬৫ সালে জয়নুল আবেদিনের উৎসাহে এ বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এ থেকে প্রতিফলিত হয় জয়নুল আবেদিনের বাংলার লোকশিল্পের প্রতি অসীম উৎসাহ এবং শিল্পভাষার সাথে ছাত্রদের পরিচিত করার আন্তরিক প্রয়াস। (লালা রুখ, ২০০৭ : ৪৯৪-৪৯৫)

শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার (১৯৫৪-২০০৫) এ বিভাগে শিক্ষা শেষে চীনদেশে উচ্চতর শিক্ষা শেষে চীনদেশে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই বিভাগে শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্লেজ করা মৃৎপাত্র নিয়ে নিরীক্ষা করেন। স্টুডিও পটারিকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা দানে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। বর্তমানে এ বিভাগ থেকে

পাশ করে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের স্টুডিও পটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। (লাল রুখ, ২০০৭ : ৪৯৫)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃৎশিল্প বিভাগে কর্মরত শিক্ষক প্রফেসর ডঃ আবদুল মতিন তালুকদার বরেন্দ্র অঞ্চলে আধুনিক 'স্টুডিও পটারি'র একজন প্রথম সারির গবেষক। কৃতী এই শিল্পী পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে মৃৎশিল্পের উচ্চতর শিক্ষার দরজা উন্মোচন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগের কৃতীছাত্র বর্তমানে মৃৎশিল্প বিভাগেরই শিক্ষক শিল্পী দেবাশীষ পাল চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ইত্যাদি বেশ ক'টি দেশে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গকে উপজীব্য করে বৃহৎ পরিসরে মৃৎশিল্প নির্মাণ ও নিরীক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন এই শিল্পী। চারুকলা অনুষদের আর এক গুণী শিল্পী এবং শিক্ষক স্বপন কুমার সিকদার তার স্টুডিওতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মৃৎশিল্প কর্মে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করছেন। শিল্পী নিরলসভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ঐতিহ্যকে ধরে রেখে শিল্প সামগ্রীকে আরো বেশি আধুনিক আবেদনময় করে সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য রূপে গড়ে তোলা যায়। চারুকলা অনুষদ, ঢাকার শিল্পী ও শিক্ষক মোঃ আজহারুল ইসলাম শেখ তাঁর স্টুডিও 'ভার্টিক্যাল' এ মৃৎশিল্পকে নিয়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা ও নিরীক্ষার কাজ করে যাচ্ছেন। শিল্পী একটি ধারায় প্রভাবিত না হয়ে প্রতিনিয়তই ধারা পরিবর্তন করে কাজ করছেন। তাঁর কাজে বৈচিত্র্যতার স্বাদ পাওয়া যায় ভালোভাবেই।

প্রাতিষ্ঠানিক দীক্ষায় শিক্ষিত স্টুডিও শিল্পী অলক রায়, আবু সাঈদ তালুকদার এ প্রজন্ম ও ধারার অন্যতম শিল্পী। নিজস্ব স্টুডিওতে মৃৎশিল্প নিয়ে করেন নানা নিরীক্ষা। শিল্পী স্বপন কুমার পাল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ব্যবহারিক মৃৎশিল্পকে আধুনিক ফার্ম দিয়েছেন। নন্দিত হয়েছে তাঁর কাজও। অলক রায়, আবু সাঈদ তালুকদার, স্বপন কুমার পালদের পথ ধরে দ্বিতীয় প্রজন্মের দেবাশীষ পাল, আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল, নূরুল আমিন, মাসুদুর রহমানসহ আরও বেশ কিছু শিল্পী মৃৎশিল্পকে নিয়ে ব্যবহারিক এবং নিরীক্ষাধর্মী শিল্পকর্ম করছেন।

বর্তমান সময়ে স্টুডিও শিল্পে সক্রিয় শিল্পীদের মধ্যে দেবাশীষ পাল, স্বপন কুমার পাল এবং ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখের নাম উল্লেখযোগ্য। ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন 'একজন স্টুডিও পটার প্রকৃত অর্থে অন্যান্য শিল্পীর মতোই স্বাধীন। একজন শিল্পী যেমন শিল্পকর্ম তৈরির পুরো কাজটা নিজে করেন তেমনি একজন স্টুডিও পটারকে শিল্প নির্মাণে এর চিন্তা থেকে শুরু করে এর বস্তুগত রূপ পর্যন্ত সমস্ত কাজই শিল্পীকেই করতে হয়। একজন স্টুডিও পটার একাধারে শিল্পী, চিন্তাবিদ, রসায়নবিদ, শ্রমিক এবং সর্বোপরি একজন মানুষ। স্টুডিও পটারের শিল্প সৃষ্টির দায়িত্ববোধের ফলে সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম।' অল্প কথায় বলা যায়; প্রথমত, একজন স্টুডিও পটার একজন শিল্পী। শিল্পী হিসেবে তাঁর কাজ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও রূপের সমৃদ্ধি ঘটানো। দ্বিতীয়ত, যেহেতু মৃৎশিল্প বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনও ব্যাপকভাবে মূলধারার শিল্প হিসেবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেনি সেহেতু এই শিল্পের ব্যাপক প্রসারের বিষয়টি চিন্তা করে নবতর সৃজনশীল আবিষ্কারের পাশাপাশি সাবলীল

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনের কাজটিও শিল্পীকে সম্পন্ন করতে হয়। একজন স্টুডিও পটার তাঁর শিল্পকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তর বা ধাপ নিজস্ব শিল্পবোধ দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ মাটি তৈরি থেকে শুরু করে কাঠামো নির্মাণ, অলংকরণ, শুকানো পোড়ানো, গ্লেজ করা প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পীর নখদর্পণে। শিল্পী স্টুডিও তে তাঁর শিল্পকর্মটির জন্য চাহিদা অনুযায়ী মাটির রেসিপি তৈরি করেন। তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেটিকে কাজের উপযোগী করে তোলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পকর্মের কাঠামো বা ফর্মটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য কখনও হুইলে থ্রোইং করে, কখনও কয়েল পদ্ধতিতে টিপে টিপে বা মাটির স্ল্যাব তৈরি করে, তা জোড়া লাগিয়ে কাঠের টুলস দ্বারা পিটিয়ে কাঙ্ক্ষিত আকারটি পান। ফর্ম তৈরির পর তার গায়ে পূর্ব পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী কোন অংশে মাটি পেন্টিং করে, সরু কয়েল লাগিয়ে স্ল্যাব পেস্টিং করে, কোন অংশ চাকু দ্বারা কেটে বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুলস দিয়ে এনগ্রেভ করে টেকচার, লাইন, ছিদ্র ইত্যাদির মাধ্যমে অলংকরণের কাজটি করে থাকেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে শিল্পী কাজ করতে করতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে অনেক সময় আগের ফর্ম থেকে বেরিয়ে নতুন একটি ফর্মে রূপান্তর করে থাকেন অনেক সময়। কাঠামো তৈরির সময় পটার লাইনিং হুইলের (ব্যান্ডিং হুইল) মধ্যে রেখে কাজটি করেন যাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজটি করা যায় কেন না এতে শিল্পীর সুবিধা হয়। সম্পূর্ণ কাঠামো নির্মাণ শেষ হলে শিল্পকর্মটি স্বাভাবিকভাবে ঘরে রেখে বা রৌদ্রে শুকিয়ে পোড়ানোর উপযোগী করা হয়।

স্টুডিও পটাররা তাদের শিল্পকর্ম ভালোভাবে শুকানো হয়ে গেলে আধুনিক চুল্লিতে (গ্যাস চুল্লি, বৈদ্যুতিক চুল্লি) ৬০০° সেঃ -৮০০° সেঃ তাপমাত্রায় বিস্কুট ফায়ারিং করা হয়। আর এই তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয় পাইরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে। বিস্কুট ফায়ারিং এর পর ঘষে পরিষ্কার করে তার গায়ে গ্লেজ দেওয়া হয়। ব্রাশিং, ডিপিং ও স্প্রেয়িং এই তিনটি পদ্ধতিতে গ্লেজ করা হয়। গ্লেজ তৈরি হয় শিল্পীর নিজস্ব রেসিপি অনুযায়ী বা তিনি কোন গ্লেজ করবেন তার রেসিপি অনুসারে। গ্লেজ-এর উপকরণ হিসেবে লেড, সিলিকা, সোডা, এ্যাশ, বোরাক্স, ফেল্ডস্পার, বেন্টোনাইট ক্লে, অ্যালুমিনিয়াম কেওলিন, জিংক অক্সাইড, ফ্রিট ও বিভিন্ন কালারিং অক্সাইড (আয়রন, কপার, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, ম্যাংগানিজ, টিটেনিয়াম, এন্টিমানিয়াম ইত্যাদি অক্সাইড) পাত্রের গায়ের কাঁচা গ্লেজকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে নির্ধারিত উচ্চ তাপ মাত্রায় দ্বিতীয়বারের মতো পোড়ানো হয়। আর এই পোড়ানোর তাপমাত্রা মৃৎশিল্পী নিজেই নির্দিষ্ট করে নেন গ্লেজের ধরণ অনুযায়ী। পোড়ানোর পর পাত্রের গায়ে চকচকে পাতলা কাঁচের মত যে আবরণ হয় সেটাই গ্লেজ। এই ভাবেই স্টুডিও পটার তার নান্দনিকতা ও স্বতন্ত্র শিল্পবোধ দিয়ে পটারি নির্মাণ করেন। যার ব্যবহারিক দিকের চেয়ে সৃজনশীল গুণাবলীই বেশি। পরিলক্ষিত হয়।

স্টুডিও পটার মৃৎশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর পটারি করে থাকেন। যেমন আর্থেনওয়ার (লেড গ্লেজ, ট্রাইকালার গ্লেজ, মেজলিকা, ফ্রিট গ্লেজ ইত্যাদি), স্টোনওয়ার (সফট গ্লেজ, হার্ড গ্লেজ, ক্রিস্টালাইন গ্লেজ, ম্যাট গ্লেজ, সল্ট গ্লেজ, ক্র্যাকগ্লেজ, মেরিয়াস বডি ইত্যাদি)। আবার কখনও কখনও গ্লেজ ছাড়াই পোড়ামাটির পটারি নির্মাণ করেন স্টুডিও পটার এবং কখনও দেশীয় টেরাসিগিলাটা ব্যবহার করে পটারিকে সমৃণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যকে ধারণ করা একটি জাতি গোষ্ঠির যেমন দায়িত্ব তেমনি সেই ঐতিহ্যের বিকাশ সাধন এবং যুগোপযোগী করে এর রূপের, চিন্তাধারার পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন সাধন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করছেন প্রশিক্ষিত বা স্টুডিও পটাররা।

'স্বাধীন' শিল্পী হিসেবেই দেখা হয় একজন স্টুডিও পটারকে। একজন শিল্পী তার শিল্পকর্মটি যেমন নিজেই সম্পন্ন করেন, তেমনি একজন স্টুডিও পটারও শিল্প নির্মাণের চিন্তা থেকে শুরু করে এর বস্তুগত রূপ পর্যন্ত সমস্ত কাজটি নিজেই করে থাকেন। তাই বলা হয় একজন স্টুডিও পটার একাধারে শিল্পী। চিন্তাবিদ, রসায়নবিদ, শ্রমিক এবং সর্বোপরি একজন মানুষ। এই শিল্পীর শিল্প সৃষ্টিতে দায়িত্ব এবং শিল্পের প্রয়োজনে সমাজে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই স্টুডিও শিল্পীকে বিশদ আলোচনার সুযোগ থেকেই যা। অল্প কথায় বলা যায় স্টুডিও পটার প্রথমত: একজন শিল্পী। শিল্পী হিসেবে তাঁর কাজ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এর গুণগত মানের সমৃদ্ধি ও প্রসার ঘটানো। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্প এখনও ব্যাপকভাবে মূলধারার শিল্প হিসাবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেনি সুতরাং শিল্পের ব্যাপক প্রসারের বিষয়টি চিন্তা করে নতুন নতুন সৃজনশীল উপায় আবিষ্কারের কাজটিও শিল্পীকে সম্পন্ন করতে হয়।

বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পীরা যখন মাটিকে চাকায় রেখে একইভাবে বহু বছর ধরে চর্চিত রীতির আদলে একই অলংকারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ডেকোরেশন পিস তৈরি করতে থাকেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তার শিল্পগুণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। অপরদিকে একজন আধুনিক স্টুডিও পটার ঐতিহ্যের ধারাতেই চাকায় মাটি রেখে সেই মুহূর্ত থেকেই এর কাঠামোকে কিভাবে আরো আধুনিক করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। আর এখানেই কুম্ভকারদের সাথে স্টুডিও পটারের শৈল্পিক পার্থক্য। প্রাথমিক অবস্থার সেই মাটির আকারটি শিল্পীর (স্টুডিও পটার) চোখে নতুন কোন "ফর্ম" হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। অর্থাৎ শিল্পী এই ফর্মটিকে সচেতনভাবেই চিহ্নিত করে থাকেন। একই সাথে নতুন আবিষ্কৃত ফর্মটিকে "স্থায়িত্ব দেয়ার জন্যে নতুন উপায় আবিষ্কার করতে থাকেন। শিল্পী সফলতার সঙ্গে সেটি সম্পাদনও করেন। এভাবেই স্টুডিও পটার সৃষ্টি করেন নতুন নতুন শিল্প কর্ম আর জন্ম দেন প্রাসঙ্গিক রীতি ও করণ কৌশল। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দই প্রধান।

স্টুডিও পটারের নতুন আবিষ্কার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ধারক কুম্ভকারদেরকে বর্তমান সময়ে যথেষ্ট স্বাভাবিক করতে সমর্থ হয়েছে। এর প্রমাণ মেলে বর্তমান সময়ের কুম্ভকারদের তৈরি করা পটারিগুলোকে আধুনিক স্টুডিও পটারদের বিভিন্ন উপকরণের অনুকৃতির উপস্থিতি দেখে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে একজন স্টুডিও পটার কখনও অবচেতন মনে আবার কখনওবা সজ্ঞানে একটি মহান সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন। একজন প্রতিষ্ঠত স্টুডিও পটারের কাজে উৎসাহী হযে নতুনরাও উৎসাহী হন ফলে এই ধারাটির শাখা প্রশাখা বিস্তার হয়। লুকানো শিল্প সম্ভারের বাঁকে বাঁকে নতুন প্রকাশ শৈলীর উদ্ভব ঘটে, তৈরি হয় শিল্পের নতুন ভাষা যা আপন গতিতে চলতে থাকে।

শিল্পতাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক বোরহান উদ্দিন খন জাহাঙ্গীর-এর সাথে একমত হয়ে বলতে হয় স্টুডিও পটারির শক্তি এবং সমস্যা ভেবে দেখবার মতো। একজন স্টুডিও পটারের হাতের তৈরি শিল্পকর্মের মানবিক ঐতিহ্য

অত্যন্ত শক্তিশালী কেনন এই শিল্পকর্ম জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকাও রেখে থাকে। আবার কারখানা তথা মেশিনকে ঐতিহ্যের সম্প্রসারণ কাজেও ব্যবহার করা সম্ভব। স্টুডিও পটারির গড়ন এবং নক্সা বা চিত্র, কারখানায় ব্যপ্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে দু স্তরের অর্থনীতির কথা ভাবতে পারি। এক স্তরে স্টুডিও পটারি অন্য স্তরে কারখানার উপাদান। এই দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার মধ্য দিয়ে কারখানার ব্যাপক উৎপাদনে একজন শিল্পীর ব্যক্তি ভাবনা, দক্ষতা, নান্দনিকতা ও শিল্পবোধের ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

শিল্পী যদি স্টুডিও পটারির সাথে সাথে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ডিজাইন করেন অথবা তাঁর সৃজনশীল পটারির ফর্ম বা আদল ব্যাপক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তবে স্টুডিও পটার ও স্টুডিও পটারি অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা সমন্বিত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। স্টুডিও পটারির এই ফাংশনার দিকটা ভেবে দেখবার মতো। কেননা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের চাহিদা আছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে। সেই চাওয়া পাওয়ার একদিকে স্টুডিও পটারি অন্যদিকে কারখানা। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাথে সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটানে গেলে, তা স্বাভাবিকভাবেই আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। এই বোধ একজন মানুষকে এভাবেই উপহার দিতে পারে। তাই একজন পটারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মৃৎশিল্প বিজ্ঞান ও শিল্পমিশ্রিত একটি শিল্প মাধ্যম। আদি থেকে আজ অবধি বংশপরম্পরার মৃৎশিল্পীরা অর্থাৎ কুমার বা কুম্ভকার সম্প্রদায়ের লোকেরা পারিবারিক পেশা হিসেবে এই শিল্প চর্চা করে আসছেন। বংশ পরম্পরাগত দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমন্বিত জ্ঞঅন তাদেরকে এই শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। পরবর্তীকালে কালের পরিক্রমায় এই শিল্প পেশাটি পারিবারিক শিল্প বা বংশপরম্পরায় এই সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিকেন্দ্রিক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আধুনিক মৃৎশিল্প বা স্টুডিও ভিত্তিক মৃৎশিল্পের সূচনা।

বাংলাদেশে ১৯৬২ খৃঃ মীর মোস্তফা আলী ও তাকিতার যুক্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে আধুনিক মৃৎশিল্প বা স্টুডিও মৃৎশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। শিল্পী মীল মোস্তফা আলীকে তাই স্টুডিও পটারির অগ্রদূত বলা হয়। পরবর্তীকালে শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার এই শিল্পকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন। এরপর শিল্পী অলক রায়, শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, শিল্পী দেবাশীষ পাল, শিল্পী আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল শিল্পী রবিউল ইসলাম, শিল্পী নূরুল আমীন সহ অন্যাত্র স্বনামধন্য শিল্পীরা অব্যাহতভাবে স্টুডিও পটারির বিভিন্ন নিরীক্ষামূলক কর্মে নিজেকে যুক্ত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় ঐ বংশপরম্পরার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে স্থবির হতে না দিয়ে গতিশীল রাখতেই স্টুডিও পটাররা প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচ্ছেন। বলা যায় পরম্পরার মৃৎশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একই সাথে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পকে বিশ্ব শিল্প দরবারে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্য থেকেই একাডেমিক রীতিতে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আধুনিক মৃৎশিল্প বা স্টুডিও ভিত্তিক মৃৎশিল্প চর্চার সূচনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটারি

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটারি

ইন্ডস্ট্রি শব্দটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যন্ত্র এবং জনবলের সমন্বয়ে গড়ে উঠা একটি প্রতিষ্ঠান। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটারি নির্মাণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞটি অনেক মানুষ এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে ব্যাপক চাহিদার জন্যে একই পটারি বহুসংখ্যায় নির্মাণ করা হয়। আর এই জন্যেই নির্মাণের পদ্ধতিগত এবং যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে আধুনিক উপায়ে পটারি নির্মাণ করা হয়। ইন্ডাস্ট্রিতে একজন শিল্পী ডিজাইন তৈরি করেন, একজন অভিজ্ঞ কেমিস্ট মাটির রেসিপি, গ্লেজের রেসিডি ও তাপমাত্রা নির্ধারণ করে দেন যাতে পোড়ানোর সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন সমস্যা না হয় বা এর গুণগত মান ঠিক হয়। ব্যাপক উৎপাদনের জন্যে পটারির মোল্ড (মোল্ড হচ্ছে সাধারণত প্লাস্টার অব প্যারিস দ্বারা তৈরি ফাকা নেগেটিভ আদল। মোল্ড এর ভিতরে তরল কাঁদা মাটি ঢেলে পজেটিভ আদল কাঙ্ক্ষিত আকার' তৈরি করা হয়) তৈরি করেন অন্য কেউ। কারিগর ও তদারককারীদের তত্ত্বাবধানে পুরো কাজটি যন্ত্র সম্পন্ন করে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পটারিতে ব্যবহারের বিষয়টি মুখ্য হয়ে দেখা দেয় অর্থাৎ ব্যবহারের উপযোগী করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বিশ্ব বাজারের চাহিদা চিন্তা করে মানুষের রুচি অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়।

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির কারণে কারখানায় উৎপাদিত মৃৎশিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। বিশ্বের প্রায় সব দেশে বেশিরভাগ মানুষের কাছে নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্র এবং অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি তৈজসপত্র সমাদৃত হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কারখানাভিত্তিক মৃৎশিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে। বাণিজ্যিক মৃৎশিল্পের উন্নয়নের গতিধারা অব্যাবহত রাখতে কারখানায় নিয়োজিত শিল্পী, গবেষকরা সবসময় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষকগণ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে ব্যবহারিক মৃৎশিল্পকে আরো নান্দনিক এবং সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রেখে আরও উন্নত থেকে উন্নততর করা যায়।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে মৃৎশিল্পের ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের এই ভূখণ্ডে মৃৎশিল্পের অতীত ঐতিহ্য সুদৃঢ় হওয়ায় বাংলাদেশে উন্নত মানের বাণিজ্যিক মৃৎশিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বের বড় বড় তৈজস ও স্থাপত্য মৃৎশিল্পের কারখানাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে এদেশের কারখানাগুলো আকর্ষণীয় মজবুত ব্যবহারোপযোগী, মৃৎসামগ্রী তৈরি করছে। বাংলাদেশ থেকে পোশাকশিল্প, চামড়া শিল্প, কারুশিল্প, ওষধসহ বিভিন্ন সামগ্রী ব্যাপক সংখ্যক রপ্তানি হচ্ছে, এই রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম। এদেশের কারখানায় তৈরি মৃৎশিল্প উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের চাহিদা পূরণ করেও পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে রপ্তানি হচ্ছে। এই রপ্তানিকৃত মৃৎসামগ্রী বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। প্রতিনিয়ত গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বাণিজ্যিক মৃৎশিল্প সামগ্রীর মৌলিক উপাদানসহ নকশারও পরিবর্তন ঘটেছে সময়ের সাথে সাথে। ধারাবাহিকভাবে মানুষের চাহিদা, জীবনযাপন, রুচিবোধ ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে এই শিল্পে রূপান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বাণিজ্যিক মৃৎশিল্প কারখানা তাজমা সিরামিক স্থাপিত হয়েছিল বগুড়ায় ১৯৫৮ সালে্ তাজমা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি নামের এই প্লসন্টটি ছিল ছোট এবং এখানে চীনা মাটির বাসন কোসন তৈরি হতো। সমসাময়িক সময়ে এমসিআই, ন্যাশনাল ও ঢাকা সিরামিক নামের ইন্ডাস্ট্রি কাজ শুরু করে। ১৯৬২ সালে স্থাপিত 'পাকিস্তান সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি যা পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তরকালে পিপলস সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' নামে পরিচালিত হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর আওতায় স্থাপিত হয় 'বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরি' সংক্ষেপে 'বিআইএসএফ' স্বাধীনতা উত্তর আমাদের দেশে অনেকগুলো কারখানা মৃৎশিল্পের তৈজসপত্র নির্মাণে গৌরবময় ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এর মধ্যে পিপলস সিরামিকস, বেঙ্গল সিরামিকস, বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস, মুন্নু সিরামিকস, শাইনপুকুর সিরামিকস, প্যারাগণ সিরামিকস, স্টার সিরামিকস, মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রকে সুপরিশীলিত করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মান ও নান্দনিকতায় পূর্ণ ব্যবহারিক মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিশ্চিত করেছে। তুলনামূলকভাবে সুলভ মূল্যের গ্যাস এবং সস্তা শ্রমের কারণে এদেশে সিরামিক শিল্প খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্নু সিরামিকস

মুন্নু সিরামিক বাংলাদেশের বৃহত্তম সিরামিক ইন্ডাস্ট্রির একটি। ১৯৮৫ সালে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে এই কোম্পানি চিনামাটির বাসন তৈরি করলেও পরবর্তীতে সকল ধরনের সিরামিক পণ্য উৎপাদন করে। মৃৎশিল্পে পোরসিলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মুন্নুর উৎপাদিত সামগ্রীর পূর্বে এদেশে বিশেষ করে পোরসিলেন পাত্র বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। ফলে অধিক মূল্যে শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণির ক্রেতারাই কিনতে পারতো। কিন্তু মুন্নু সিরামিকস কোম্পানির পোরসিলেন উৎপাদনের পর এটি মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে যেসব কোম্পানি মৃৎপাত্র উৎপাদন করেছে তার বেশিরভাগ স্টোনওয়ারের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত সৌন্দর্য এবং ব্যবহারিক দিক থেকে পোরসিলেন স্বাভাবিকভাবেই স্টোনওয়ারে চেয়ে অনেক উন্নত। ফলে পোরসিলেনের তৈরি খাবারের থালা, বাসন, কাপ, প্লেটসহ নানান ব্যবহারে সামগ্রী দেশের বাজারে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। সব শ্রেণির মানুষ ব্যবহার করছে মুন্নুর মৃৎসামগ্রী। মুন্নু সিরামিকস এদেশে এবং বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছে তার গুণগত মান দিয়ে।

মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি প্রথম দিকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দৈনন্দিন ব্যবহারের চরম উপযোগিতা এবং পোরসিলেন তৈজসপত্রের সৌন্দর্যের আকর্ষণে রপ্তানি করার সুযোগ পায়। পোরসিলেন রপ্তানিকারক কোম্পানি হিসেবে মুন্নুই প্রথম বাংলাদেশের কারখানায় তৈরি মৃৎসামগ্রীকে গৌরবের সাথে বিশ্ববাজারে উপস্থাপন করে, যা বর্তমানে একটি প্রিমিয়াম কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত। কারখানায় উৎপাদিত মৃৎসামগ্রীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুন্নু সিরামিকসের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পোরসিলেনের বিভিন্ন মাধ্যম সহ বোন চায়না, আইভরি চায়না এবং Red Bon China উৎপাদন করে মুন্নু সিরামিক। বোন চায়নার মৌলিক উপাদানের সাথে বিশুদ্ধ পানি ও ওয়েলস মিশ্রণ, তারপর ফিল্টার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার ইত্যাদির ফলে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বোন চায়না সামগ্রী তৈরি হয়। নিজস্ব করণকৌশল। আকৃতি এবং নতুনত্বের নকশায় প্রায় ত্রিশ বছল ধরে গ্রাহকদের গৃহসজ্জার ও দৈনন্দিন তৈজসপত্রে বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। মৃৎশিল্প কারখানা হিসেবে মুন্নু এ দেশে প্রথম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। এর মধ্যে নর্থ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা, ওয়েস্টার্ন ইউরোপ, ইস্টান ইউরোপ, ইস্টান এশিয়া, সাইথইস্ট এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুন্নুর উৎপাদিত সামগ্রী বৃহৎ বাজার তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশের উন্নত সুপারশপগুলোতে নিজস্ব লেবেল মুন্নুর মৃৎসামগ্রী বিক্রি হচ্ছে যা বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে গেছে। মুন্নুর নিজস্ব মুদ্রণ ও প্যাকেজিং ক্ষেত্র থাকার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর গুণগতমান বজায় রেখে পণ্য বিপণন করতে সক্ষম।

আধুনিক করণকৌশল প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠানটি দুই মিলিয়ন মৃৎসামগ্রী তৈরি করতে সক্ষম, এখঅনে উৎপাদিতত পণ্যগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। এই কোম্পানিতে নিয়োজিত রয়েছেন দেশি-বিদেশি অনেক দক্ষ গবেষক ও রসায়নবিদ। তাদের তৈরি খাবারের থালা, বাসন Cokurree, Foodstuffs প্রকৃতি পণ্য CERAM দ্বারা পরীক্ষিত যা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় বাজার মান নিয়ন্ত্রণানুযায়ী সীসা ও ক্যাডমিয়াম মুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্নু সিরামিসক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব সময় বিশ্ববাজারের সেরা প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। স্থানীয় এবং বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে কোম্পানি সচেতন রয়েছে। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও এর ব্যবহার বিষয়ে কারখানায় কর্মরত মৃৎশিল্পী ও কারিগরদের প্রয়োজনানুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বংশ পরম্পরার দক্ষ মৃৎশিল্পীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের অভিজ্ঞতার প্রভাব উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভালো প্রভাব ফেলে। কারণ পরম্পরার শিল্পীরাই শুধুমাত্র মৃৎশিল্পের শুরু থেকে উৎপাদনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে তাৎক্ষণিক বিষয়াবলির প্রতি যত্নশীল আত্মনিয়োগ করতে পারেন। একই সাথে আধুনিক করণকৌশলের সাথে যুক্ত হয় পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে বংশ পরম্পরার দক্ষতা। প্রায় পাঁচ হাজার দক্ষ ও অদক্ষ শিল্পী, কারিগরদের সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে নারী পুরুষ সকলেই সমান মর্যাদায় কাজ করে যাচ্ছেন। মৃৎসামগ্রী উৎপাদনের গতিশীলতার জন্য দক্ষ ও অদক্ষ কারিগরদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনে বিদেশে প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। একই আকার ও আকৃতি পুনর্নির্মাণের নিয়ম, মাটির ধরন বা প্রকৃতি, আধুনিক মেশিনের যথার্থ ব্যবহার, তাপমাত্রা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। রসায়নবিদ, শিল্পী ও কারিগরদের সম্পৃক্ততার ফলে মুন্নু সিরামিকসের আকার আকৃতিগত নিরীক্ষা এমনকি নকশায় ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

মুন্নু সিরামিকের আগে এদেশে বেঙ্গল সিরামিকস, বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস এবং পিপলস্ সিরামিকস-এর দৈনন্দিন তৈজস সামগ্রীতে যে মূল্যবান অবদান রেখেছে তারই ধারাবাহিকতায় মুন্নু সিরামিক আরও এক ধাপ উৎকর্ষের মাত্রায় পৌঁছেছে। মুন্নুর পটারী, ভাস্কর্য আদলে শোপিস, ক্রেতার কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

মুন্নু সিরামিকের উৎপাদিত সামগ্রীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখতে পাই থালা, বাটি, টি-সেট, সর্বোপরি ডিনারসেটে ধবধবে সাদা রঙের গ্লেজ। গ্লেজ ব্যবহারে নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বেশির ভাগ সামগ্রীতে উজ্জ্বল রঙের উপর আধুনিক ভাবধারার নকশাঙ্কন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের করণকৌশল নির্ভর তৈজসপত্র মুন্নু সিরামিকসের আগে অন্য কোন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে পারেনি। কোন কোন মৃৎপাত্রে ব্যবহার করা হয়েছে কমলা, সবুজ, নীল ইত্যাদি রং ফলে স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্য এসেছে আবার সাদা রঙের পাত্রে ব্যবহার করা হয়েছে কালো রঙের তুলির টানে গতিশীল রেখা এবং জ্যামিতিক রেখার মধ্যবর্তী জায়গায় মৌলিক রং। শিল্পী কান্দেনেস্কির চিত্রকলার মতো আধুনিক ভাবধারা ফুটে উঠেছে মৃৎপাত্রে। উক্ত কারখানায় কর্মরত শিল্পীরা সৃজনশীল দক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণির ক্রেতার চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, পাত্রের আকৃতি ও মূল গ্লেজের সাথে সমন্বয় করে নকশা তৈরি করে চলেছেন মুন্নুর উৎপাদিত মৃৎসামগ্রীই তার সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যবিত্তের চাহিদা পূরণে এবং উচ্চবিত্তের জন্য সাদার উপর সোনালি ও রূপালি রংয়ের নকশায় নানান ধরনের ডনারসেট। উচ্চমূল্যের এ সব সামগ্রী অভিজাত ভাবগাম্ভীজ্য পরিপূর্ণ। মুন্নুর উৎপাদিত সামগ্রীর সকল নকশায় রয়েছে সৃজনশীল ভাবধারায় নতুনত্বের প্রকাশ। সব মিলিয়ে বলা যায় মুন্নু সিরামিকস, সিরামিস ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–২০৪
মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র–১

চিত্র–২০৫
মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র–২

চিত্র–২০৬
মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র–৩

চিত্র–২০৭
মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র–৪

চিত্র–২০৮
মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র–৫

চিত্র–২০৯
মুন্নু সিরামিক-এর তৈজসপত্র–৬

শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.

১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরু করে শাইনপুকুর সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি। প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেই পোরসেলিন এবং বোন চায়না পণ্য উৎপাদনে শাইনপুকুর সিরামিকস লি. গ্রাহকদের মধ্যে বিপুল চমক সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পোদ্যক্তা প্রতিষ্ঠানে বেক্সিমকোর একটি অন্যতম সিস্টার কনসার্ন হলেও স্বাস্থ্যসম্মত মৃৎশিল্প পণ্য উৎপাদন, যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ এবং সহজলভ্যতার কারণে এটি একটি পরিচিত ব্র্যান্ডের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

শাইনপুকুর অন্যান্য সিরামিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মতো নিজস্ব বিদ্যুতায়িত কারখানা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পানি প্রবাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ও বাস্তবানুগ অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির মোট বিনিয়োগ ৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হলেও, বোন চায়না ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। শাইনপুকুর সিরামিকস দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও অত্যন্ত সরবে প্রবেশ করেছে। চীন এবং জাপানী প্রযুক্তির চাহিদা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বরাবরই আছে। এখনকার উৎপাদিত ধবধবে সাদা কারুকার্যময় পণ্য বিশ্বের যে কোন পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। এটা আমাদের দেশের জন্য গর্বের। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় এই ব্র্যান্ডের পণ্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে বহুবার। ২০১০ সালে রপ্তানিতেও পেয়েছে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি। এই বছর শাইনপুকুরের নীট বিক্রি ছিল ১,৯২৬,৭৪ মিলিয়ন টাকা বা বাংলাদেশের সেক্টরওয়াইজ রেকর্ড। (বার্ষিক রিপোর্ট ২০১০) বিভিন্ন কাঁচামাল বর্হিবিশ্ব থেকে আমদানি করলেও ইউরো বা ডলারের বিপরীতে টাকার মানদণ্ডে প্রতিনিয়ত যে রকমফের পরিলক্ষিত হয়; শাইনপুকুর সিরামিকস্ সন্তোষজনকভাবে সেই অবমূল্যায়নের বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সাধারণ ক্রেতারা একই দামে একই পণ্য বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারছে। খরচ নিয়ন্ত্রণ ও বাহুল্য খরচ ব্যবস্থাপনায় কোম্পানিটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

শাইনপুকুর একাডেমিক মৃৎশিল্পীদের পাশাপাশি পরম্পরা ও ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের কর্মসংস্থানেও ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের সুপ্রাচীন পাল বংশীয় মৃৎপণ্যের আবহমান ধারাকে এই প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভরতার মাধ্যমে অনেক উঁচুস্তরে উন্নীত করেছে। মোল্ড নির্মাণে পরম্পরার শিল্পীদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। চিত্রাঙ্কন, অলংকরণ, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় শৈল্পিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে একাডেমিক শিল্পীদের অংশগ্রহণ উৎপাদিত পণ্যকে দান করেছে কমপ্লিট আউটলুক।

শাইনপুকুর সিরামিক একটি বহুল পরিচিত বাংলাদেশী ব্র্যান্ড। উদ্যোক্তাদের পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মীবাহিনীর নিরলস পরিশ্রম, নতুন নতুন প্রযুক্তির সমাবেশ এবং সমকালীন বৈশ্বিক সিরামিক সামগ্রী সম্পর্কে সজাগ পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিকে দান করেছে বিশিষ্টতা। বোন চায়না ইউনিট এবং DECAL ইউনিট সংযোজনের ফলে পণ্যের মার্জিত আকৃতি ও ডিজাইনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। শাইনপুকুর ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নানান বাজেটের সিরামিক পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে ফলে সব শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে এই ব্র্যান্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে বিরাট জনগোষ্ঠীর

একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রতিষ্ঠানে জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ পাচ্ছে। দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমবাজার সৃষ্টিতে এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাই সবদিক থেকে মিলিয়ে বলা যেতেই পারে প্রতিষ্ঠানটি শুধু বাংলাদেশ নয় দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এটি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পাওয়ার দাবীদার।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–২১০
শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র–১

চিত্র–২১১
শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র–২

চিত্র–২১২
শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র–৫

চিত্র–২১৩
শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র–৪

চিত্র–২১৪
শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র–৬

চিত্র–২১৫
শাইনপুকুর সিরামিকস্ লি.-এর তৈজসপত্র–৬

ফার সিরামিকস লি.

বাংলাদেশে সিরামিক শিল্প অর্ধ শতাব্দীর পুরানো হলেও গত দু'দশকে দ্রুত বিকশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ফার সিরামিকস লি. রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মৃৎশিল্প তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং বিদেশে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে দুই ধরনের পোরসিলেন সামগ্রী তৈরিত হয়ে থাকে। প্রথমে সাধারণ পোরসিলেন তৈরির মধ্য দিয়ে স্থানীয় বাজার এবং পরবর্তীতে হার্ড পোরসিলেন এর তৈরি উন্নত মানসম্পন্ন থালা বাসন সহ গৃহস্থালি তৈজস সামগ্রী এবং হোটেল রেস্টুরেন্টে পরিবেশনের যাবতীয় সামগ্রী উৎপাদনকে নিশ্চিত করে। এখানে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সিরামিকের মতো উন্নত মান বজায় রাখতে জামার্নি ও ইতালির প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে ফার সিরামিকস তার গুণগত মান দিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। ফার সিরামিকস সামগ্রীর মধ্যে Faer Euro Fine porcelain, Farr fine Ivory এবং Farr high Alumina porcelain নির্মিত হচ্ছে সম্পূর্ণ আধুনিক করণকৌশল প্রয়োগ করে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং মূল উপাদান মাটি ব্যবহৃত হচ্ছে শীর্ষ প্রযুক্তির প্রক্রিয়ায়।

ফার সিরামিকস তাদের গুণগত মান ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট সচেতন। এখানে হার্ড পোরসিলেন ব্যবহৃত হয় প্লাস্টিক ক্লে ফলে স্বল্প সময়ে অর্থাৎ বারো ঘণ্টায় পোড়ানো সহ উৎপাদন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়। গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি শীর্ষস্থান বজায় রাখতে শিল্পসামগ্রী তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়। নিউজিল্যান্ড থেকে আনা হয় নিউজিল্যান্ড কেওলিন, জাপান থেকে বলক্লে ও এল্যুমিনা। চায়না থেকে চায়নাক্লে, ফেলস্পার, কোয়ার্জ্য এবং ভারত থেকে অন্যান্য কাঁচামাল। গ্লেজের উপাদান হিসেবে গোল্ড ও মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত নানান রাসায়নিক অক্সাইড জার্মানি থেকে সংগ্রহ করা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সবগুলো ধাপই স্বয়ংক্রিয় মেশিনে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয় যেমন স্বল্পচাপের কাস্টিং ও উচ্চ চাপের কাস্টিং। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দুই ঘণ্টায় ফায়ারিং সহ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় গ্লেজ ও গ্লস্ট ফায়ারিংয়ের পর ডেকোরেশন ফায়ারিং করা হয়ে থাকে।

দৃষ্টিনন্দিত, পছন্দসই, মজবুত মৃৎশিল্প তৈরির এবং মান ধরে রাখার জন্য রয়েছে গবেষণাগারে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডিজাইনার ও মডেলার যৌথভাবে নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুনতর পাত্রের আকৃতি, গ্লেজ, নকশা এমনকি যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করে। প্ল্যান্টে ব্যক্তিদের আরো চৌকস করতে জার্মান, ইতালিসহ বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণ দেওয়ানো হয়। এছাড়াও রয়েছে বিদেশি প্রযুক্তিবিদ যারা উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উৎকর্ষতায় নিয়োজিত। বিপণনের জন্য রয়েছে অভিজ্ঞ মার্কেন্টিং স্টাফ যারা স্থানীয় বাজার ও রপ্তানির কাজে জড়িত। স্বনামধন্য এই কোম্পানিতে নিয়োজিত সাধারণ কর্মী বা কারিগরদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভাল কাজের মাধ্যমে সম্মানজনক স্বীকৃতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

ফার সিরামিকসের তৈরি মৃৎসামগ্রীগুলো নতুনত্বের ভঙ্গীমায় উদ্ভাসিত। কারণ চায়না, জাপান ও ইউরোপের যাবতীয় আধুনিক কৌশলের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এখানে। চায়নার ঐতিহ্যবাহী কোবাল্ট অক্সাইডের নীল রং ব্যবহারের উপস্থিতির বিন্যাসকে অতিক্রম করে লাল, কমলা, বেগুনি, খয়েরী রঙের মাধ্যমে নকশাঙ্কন করা হয়েছে বর্তমানের রুচির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে। ফলে আধুনিকতা ও বৈচিত্র্যময়তা এসেছে গড়নে ও নানান ধরনের নকশায়। ফুল, লতা, পাতার ভেতরে সোনালী রঙের ব্যবহার মৃৎসামগ্রীকে আরও আকর্ষণীয়

করেছে। সময়োপযোগী ধ্যানধারণায় নাগরিক জীবনের প্রাসঙ্গিকতায় তুলে ধরা হয়েছে জ্যামিতিক নকশা। অল্প রঙের মার্জিত এসব নকশা মানুষের ভালো লাগাকে দীর্ঘ সময় ধরে রাখে। High Alunina Porcelain এবং Fine Ivory অত্যন্ত উজ্জ্বল সাদা রং তৈরি করে ফলে সাদা ব্যবহার করা পাত্রের আকৃতির বৈচিত্র্যতা ফার সিরামিক সামগ্রীকে করেছে অনন্য। ফলে এই সিরামিক সামগ্রী দেশের অর্থনৈতিক ভীত তৈরিতে সহায়ক হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–২১৬
ফার সিরামিকস লি.-এর তৈজসপত্র–১

চিত্র–২১৭
ফার সিরামিকস লি.-এর তৈজসপত্র–২

চিত্র–২১৮
ফার সিরামিকস লি.-এর তৈজসপত্র–৩

চিত্র–২১৯
ফার সিরামিকস লি.-এর তৈজসপত্র–৪

চিত্র–২২০
ফার সিরামিকস লি.-এর সিরমিকস্ শোপিস–৫

চিত্র–২২১
ফার সিরামিকস লি.-এর তৈজসপত্র–৬

প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

প্যারাগন সিরামিকস বাংলাদেশের সিরামিকস ইন্ডস্ট্রিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। সাম্প্রতিককালে মৃৎশিল্প তৈজসপত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্যারাগন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলছে। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কি: মি: দূরে গাজীপুর জেলার মির্জাপুরে অবস্থিত এই ইন্ডাস্ট্রি দশ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে। এর বিনিয়োগের পরিমাণ পণ্যের মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কারখানাভিত্তিক সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক মৃৎশিল্প তৈরিতে এই প্রতিষ্ঠানটি খুব অল্প সময়েই নিজের জায়গা করে নিয়েছে এবং সিরামিক বাজারে খ্যাতি অর্জন করেছে।

প্যারাগন সিরামিকস শুরু থেকেই নতুন প্রযুক্তিসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করায় আধুনিক তৈজসপত্রের বাজার খুব সহজেই ধরতে পেরেছে। এখানকার কারখানায় উৎপাদিত মৃৎশিল্প নির্মাণ পদ্ধতি সবসময় বিজ্ঞানভিত্তিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিকতা নির্ভর। এই কারখানা উন্নতমানের SKKAND TAKASAGO জাপান থেকে আনা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মৃৎসামগ্রী তৈরি করেছে। প্রায় ১৪০০০ দক্ষ কারিগর, শিল্পী রসায়নবিদ, প্রকৌশলী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মচারী কর্মকর্তাগণ এই শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রে একনিষ্ঠ মনে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য রয়েছে অত্যন্ত আধুনিক গবেষণাগার, গ্যাস দিয়ে উৎপাদিত নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিজস্ব ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। একটি আন্তর্জাতিক মানের কারখানায় প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে রয়েছে। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেয়। হয়েছে। মৃৎসামগ্রীর ব্যবহারিক ও নান্দনিক দিকের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও এরা যথেষ্ট সচেতন। প্যারাগন জাপানী প্রযুক্তিতে এ দেশের দক্ষ কারিগর ও শিল্পীদের মেধার সমন্বয়ে উন্নত মানের পোরসিলেন মৃৎসামগ্রী তথা তৈজসপত্র উৎপাদন করে চলেছে, যা কিনা সম্পূর্ণ আয়রণ ফ্রি। ম্যাগনেটিভ মেশিনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত মাটিতে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করে পোরসিলেন বডি তৈরি করা হচ্ছে। ফলে পোরসেলিন সামগ্রী হয়ে উঠছে ধবধবে সাদা এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের ফলে লক্ষ্য করা যায় ট্রান্সপারেন্ট ভাব। এই কারখানায় প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার পিস খাবারের থালা বাসন, টিকেট, মগ, ডিনারসেট সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা হয়ে থাকে। অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয় গ্লেজ এবং ডিকল মুদ্রণের মাধ্যমে ফায়ারিং প্রক্রিয়া। মৃৎশিল্পের অলঙ্করণে ডিকল মুদ্রণ প্রক্রিয়া যে কোন কারখানায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ কাগজের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক অক্সাইডের প্রলেপ দিয়ে ডিকল স্টিকার তৈরি করা হয়। এমনকি ফটোগ্রাফিক ডিকলে ও স্টিকার তৈরি করা হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বের সবগুলো কারখানাতেই ডিকল প্রিন্ট প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে প্যারাগন সিরামিকসের নিজস্ব মুদ্রণ প্রেসে বর্ণাঢ্য রঙে ডিকল স্টিকার তৈরি করে এবং পরবর্তীতে মৃৎসামগ্রীতে তাপমাত্রার মাধ্যমে এর প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। উক্ত কারখানায় উৎপাদিত নকশার রং সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা যায়। প্যারাগন ষোল রঙের নকশা সহ গ্লোড, প্লাটিনাম ব্যবহার করছে যা পুরোপুরি লেড অক্সাইড, ক্যাডমিয়াম অক্সাইড ও বেরিয়ামমুক্ত। মৃৎসামগ্রী উৎপাদনে বেশিরভাগ কারখানা জিগারজালি ও কাস্টিং মেশিন ব্যবহার করে। প্যারাগনের প্রেসার কাস্টিং প্রক্রিয়া অত্যন্ত আধুনিক হওয়ায় প্রচলিত মৃৎসামগ্রীর গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তাদের মৃৎসামগ্রীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে আকার আকৃতিতে জ্যামিতিক নকশা দেখা যায়। চারকোণা আকৃতির থালা বাটিসহ প্রায় দশটি নতুন আকৃতির সামগ্রী রয়েছে। মৃৎসামগ্রীর আকৃতির সাথে জ্যামিতিক নকশা বর্তমান সময়ের ক্রেতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়োজিত শিল্পী ও রসায়নবিদগণ তাদের সৃজনশীল মেধা দিয়ে প্রতিনিয়ত মৃৎসামগ্রীর উন্নয়নে নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে গতিশীলভাবে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়ে চলেছে বাংলাদেশে কারখানায় তৈরি মৃৎশিল্প। একইসাথে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ধারার কারিগর, শিল্পী এমনকি শিক্ষিত অশিক্ষিত হাজার লোকের। প্যারাগন বর্তমানে দেশের বাজারে আলোচিত তাদের উৎপাদিত মৃৎসামগ্রীর কারণে এবং প্রতিনিয়ত বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছে।

চিত্র–২২২
প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র–১

চিত্র–২২৩
প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র–২

চিত্র–২২৪
প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র–৩

চিত্র–২২৫
প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র–৪

চিত্র–২২৬
প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র–৫

চিত্র–২২৭
প্যারাগন সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর তৈজসপত্র–৬

ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরী লি.

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প একসময় লোকজ শিল্প হয়ে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণ করলেও কালের আর্বতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এখন নাগরিক জীবনেও মৃৎশিল্প অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। নাগরিক জীবনে ব্যবহৃত মৃৎশিল্প স্থাপত্য মৃৎশিল্প নামেত পরিচিত। বর্তমানের যে কোন স্থাপত্যকর্মে যেমন অফিস, আদালত থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিগত গৃহ নির্মাণেই এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশের স্থাপত্য মৃৎশিল্প তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর। এটিই এদেশের সর্বপ্রথম বিদেশি করণকৌশল নির্ভর স্থাপত্যের অনুষঙ্গ এবং স্যানেটারি ওয়ার সামগ্রী নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই ইন্ডাস্ট্রি তার উৎপাদন ধারা অব্যাহত রেখেছে। এটি প্রতিষ্ঠার আগে এ দেশে ইনস্যুলেটর ও স্যানেটারি সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো। ফলে ক্রেতারা বাধ্য হয়ে উচ্চমূল্যে ক্রয় করত। পরবর্তীতে B.IS..F দেশীয় মাটি ও বিদেশি নানান উপাদানের মিশ্রণে বিভিন্ন ওয়ার তৈরি করে স্বল্প মূল্যে পৌঁছে দেয় এদেশের সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে। সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সামগ্রী দেশের প্রতিটি জেলার বিপণন কেন্দ্রে রয়েছে। ফলে সারা দেশের সরকারি ও সেসরকারি ভবন নির্মাণে এর উৎপাদিত টাইলস ও স্যানেটারি ওয়ার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই কোম্পানির উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে টাইলস, কমোড, ইনস্যুলেটর। এসব তৈরির কাঁচামাল হিসেবে নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদা মাটি ব্যবহার করা হয়। বিজয়পুরের মাটির সাথে চায়নাক্লে অথবা বলক্লের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় মৃৎসামগ্রী তৈরির উপযোগী মাটি। B.I.S.F এ টাইলস তৈরি করা হয় আধুনিক পদ্ধতিতে টাইলস প্রেস মেশিনে যা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়। উন্নত প্রক্রিয়ায় ড্রাই প্রসেজ সমাপ্ত করার পর বিশালাকৃতির গ্যাস চুল্লিতে তা পোড়ানো হয় এবং বিভিন্ন গ্লেজ প্রদান করা হয়।

আধুনিক স্থাপনায় টাইলস একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। আর নতুন নতুন স্থাপত্যের সামগ্রী তৈরির কোম্পানীগুলো আধুনিক করণকৌশলের কারণে বড় বড় টাইলস ও নির্মাণ করছে সফলতার সাথে। তথাপি B.I.S.F এর উৎপাদিত ৬"×৬" ইলসের শক্ত, মজবুত ও উজ্জ্বলতার ধারা এখনো বজায় রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি যখন উৎপাদন শুরু করে তখন ঢাকায় শুধুমাত্র শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড ও ইতালীর টাইলস পাওয়া যেতো ৪"×৪" আর এগুলো তখন শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণির চাহিদাই পূরণ করতে পেরেছিল। কিন্তু B.I.S.F সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় উৎপাদিত সামগ্রীর সাধারণ মূল্যর কারণে মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। ফলে B.I.S.F স্বাভাবিক ভাবেই অল্প সময়ে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। B.I.S.F-এ কর্মরত রয়েছেন বংশপরম্পরার দক্ষ কারিগর। তাদের অভিজ্ঞতা এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন অনেক মোল্ড ম্যান ও শিল্পী গবেষক। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন ও রাসয়নিক উপাদানের গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন রসায়নবিদ। জিগার জলি মেশিন, কাস্টিং পদ্ধতি ও টাইলস প্রেস মেশিনে উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎপাদানে দিয়েছে নতুন মাত্রা টাইলসে ব্যবহার করা হচ্ছে দৃষ্টিনন্দিত গ্লেজে বিভিন্ন রকম রং। যেমন সাদা, ক্রিম, হালকা নীল, ধূসর খয়েরী, খয়েরী গোলাপী, ফিরোজা, হলুদ, হালকা হলুদ, হালকা সবুজ, গাঢ় সবুজ ইত্যাদি উৎপাদিত সকল টাইলসের আকার সমান এবং কখনো হালকা রঙের

Dhaka University Institutional Repository

নকশা লক্ষ করা যায়। চারকোণা টাইলরেস চারদিকে সমভাবে ফুলের নকশা ক্রেতাদের বিশেষ আকর্ষণ করে। এছাড়াও তৈরি করা হয়েছে ফটোগ্রাফিক ডিটেলে পানি জমে থাকার নকশা। স্যানেটারী সামগ্রী যেমন বেসিন, কমোড, ইউরেনাল কমোড ও প্যানে ব্যবহার করেছে বিভিন্ন রকমের গ্লেজ এবং বৈচিত্র্যময় রং। উচ্চ তাপমাত্রা (১২০০° ডিঃ সেঃ) প্রয়োজনের ফলে স্যানেটারি সামগ্রীগুলো স্থায়িত্বের দিক থেকে নিশ্চিত হয়েছে। B.I.S.F -এর স্বল্প মূল্যের এইসব স্যানেটারি সামগ্রী দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

B.I.S.F আর একটি বিশেষত্ব আছে, সেটা হচ্ছে এটি বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠার সেখানে নিয়মিত তৈরি হচ্ছে বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত মৃৎসামগ্রী। একে ইনস্যুলেশন ওয়ার বলা হয়। ইনস্যুলেশান পণ্যের মধ্যে রয়েছে Pin Insulation, Suspention Insulation, Line post Insulation, Bushing, Spol Insulation, Support Insulation যা উচ্চ ভোল্টেজ সহনশীল। উল্লেখিত সামগ্রী বাংলাদেশে বিদ্যুৎ প্রদান ও সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়াও কোম্পানির মোল্ড সেকশনের কর্মরত শিল্পীরা মোল্ড পদ্ধতিতে পটারী তৈরির সৃজনশীলতায় নিয়োজিত রয়েছেন, যা দেশের বাজারে শিল্পপ্রেমী মানুষকে আকৃষ্ট করে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–২২৮
ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী–১

চিত্র–২২৯
ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী–২

চিত্র–২৩০
ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী–৩

চিত্র–২৩১
ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী–৪

চিত্র–২৩২
ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী–৫

চিত্র–২৩৩
ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানেটারী ওয়ার ফ্যাক্টরীর সামগ্রী–৬

আর. এ. কে. সিরামিকস

আর. এ. কে সিরামিকস উচ্চ মানের এবং বাথওয়ার পণ্য উৎপাদনে প্রতিশ্রুতিশীল একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৯ সালে প্রাইভেট শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে ঢাকার গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এই কোম্পানি পোরসিলেন টাইলস তৈরির বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। উৎপাদিত টাইলসের দাম ও নান্দনিকতার সার্বিক গুণাগুণ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কোম্পানির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১১৫ মিলিয়ন এবং বার্ষিক বিক্রয় প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার। এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্থাপত্য নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আর.এ.কে এর তৈরি টাইলস ও বাথওয়ার সামগ্রী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই সিরামিকস ইন্ডস্ট্রিটি প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন রং ও নকশার আট হাজার টাইলস উৎপাদন করে থাকে। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য নানান আকৃতির টাইলস তৈরি হয় যেমন শিল্পজাত টাইলস, ১০ সে. মি.×১০ সে. মি. থেকে ১২৫ সে. মি.×১৮৫ সে. মি. আবার ১২৫ সে. মি.×১৮৫ সে.মি. আকৃতির উন্নতমানের গ্লেজ পোরসেলেনাটো স্ল্যাব যা Exclusive water and ডিজাইন পদ্ধতিতে নির্মিত। ইতিমধ্যে এই সিরামিকস ইন্ডাস্ট্রি আরও একটি অত্যাধুনিক প্রযক্তির প্ল্যান্ট নির্মাণ করেছে। প্ল্যান্টটির নাম রাস আল খাইমাহ্। এখানে প্রতিদিন ২২৭.০০০ স্কয়ার মিটার টাইলস তৈরি হয়। বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের দশটি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিদিন আট হাজার পিস বাথওয়ার উৎপাদন করছে।

আর.এ.কে. সিরামিক যেমন উন্নত মানের সামগ্রী উৎপাদন করছে তেমনি এদেশের দক্ষ কারিগর সহ শিল্পী ও গবেষকদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছে। উন্নত প্রযুক্তি পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা করে চলেছে। তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে দেয়াল ও মেঝের টাইলস, গ্লেজ পোরসেলেনাটো এবং বাথওয়ার। এর সবকিছুই বিশ্বমানের পণ্য হিসেবে বাজারে সমাদৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা টাইলস কমোড, বেসিনসহ বিভিন্ন সামগ্রী অবলোকনে এটি স্পষ্ট হয় যে, আর.এ.কে.-এর উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। এখানেই কোম্পানির আধুনিক গবেষণাগারে বিশেষজ্ঞরা প্রতিনিয়ত তথ্য ও করণ কৌশলের উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া স্বতন্ত্র্য ডিজাইন উন্নয়নের জন্য ইতালি ও স্পেনের নেতৃস্থানীয় গবেষণাগারের সাথে চুক্তি রয়েছে। স্থাপত্য মৃৎশিল্পের সুবিস্তৃত প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্যের মূল্য, গুণাগুণ, স্থায়িত্ব ইত্যাদি এদেশের যে কোন ভবন নির্মাণের পথকে সুগম করেছে। পরিশেষে এটাই বলা যায় গ্রাহকের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে আর.এ.কে. সিরামিকস।

চিত্র–২৩৪
আর. এ. কে. সিরামিকের সামগ্রী–১

চিত্র–২৩৫
আর. এ. কে. সিরামিকের তৈজসপত্র–২

চিত্র–২৩৬
আর. এ. কে. সিরামিকের সামগ্রী–৩

চিত্র–২৩৭
আর. এ. কে. সিরামিকের তৈজসপত্র–৪

চিত্র–২৩৮
আর. এ. কে. সিরামিকের তৈজসপত্র–৫

চিত্র–২৩৯
আর. এ. কে. সিরামিকের তৈজসপত্র–৬

ফু-ওয়াং সিরামিকস

ফু-ওয়াং সিরামিকস ১৯৯৫ সালে চায়না ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালে স্থাপত্য মৃৎশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। ফু-ওয়াং সিরামিকস প্রতিযোগিতামূলক মূল্য স্বাতন্ত্র্য নকশা আকৃতি ও মডেলের বৈচিত্র্যতাময় ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় Brand Value তৈরি করেছে। ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কারখানায় ব্যবহার করেছে উচ্চমানসম্পন্ন কাঁচামাল ও ইতালীর চুল্লিসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দেশি বিদেশি প্রকৌশলী এবং দক্ষ শিল্পী ও কারিগরদের নিবেদিত কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উৎপাদনের মান উন্নয়নের জন্য এই কোম্পানি ইউরোপের টাইলস উৎপাদন কোম্পানির সাথে পাল্লা দিয়ে Laxuries glaze টাইলস তৈরি করে যা দেয়াল ও মেঝের জন্য বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য কোম্পানির টাইলসগুলো সাধারণত টাইলস প্রেস যন্ত্রের সাহায্যে ছাঁচে ফেলে একবারেই সম্পন্ন করা হয়ে থাকলেও ফু-ওয়াং সিরামিকস তুলনামূলক টাইলসের পুরুত্ব বেশি নিয়ে নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে একটু বড় করে তৈরি করে। পরবর্তীতে সর্বাধুনিক মুদ্রণ ও লেজারকাট প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট মাপে কাটা হয়। এতে করে টাইলসের চারটি বাহু সঠিকভাবে সমান রাখা সম্ভব হয়।

ফু-ওয়াং সিরামিকস টাইলস তৈরিতে Lazer cut প্রযুক্তি ব্যবহার করে। বলায় যায় Lazer cut এর বাংলাদেশের টাইলস জগতের পরিচয় ঘটে এ কোম্পানির মাধ্যমেই যা কিনা উন্নতমানের ব্যবহারোপযোগী টাইলস তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে। Homogeneous টাইলস উৎপাদনের মাধ্যমে ফু-ওয়াং স্থাপত্য মৃৎশিল্প বাণিজ্যিক বিনিয়োগ সৃষ্টি করে গতিশীল রূপায়ন ঘটিয়েছে। একই সাথে দেয়াল ও মেঝের টাইলস তৈরিতে অল্প সময়ে ব্যাপক সাফল্য অর্জন এবং বিদেশের বাজারে নিজেদের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

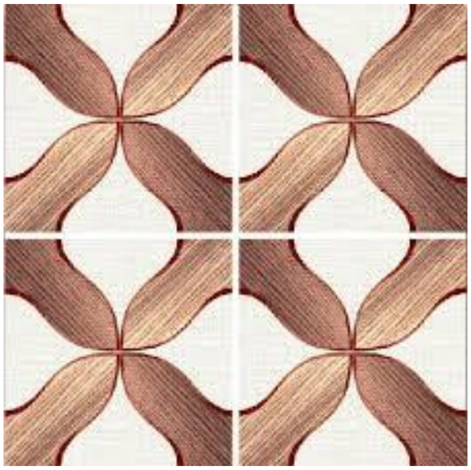

চিত্র–২৪০
ফু-ওয়াং সিরামিকের সামগ্রী–১

চিত্র–২৪১
ফু-ওয়াং সিরামিকের সামগ্রী–২

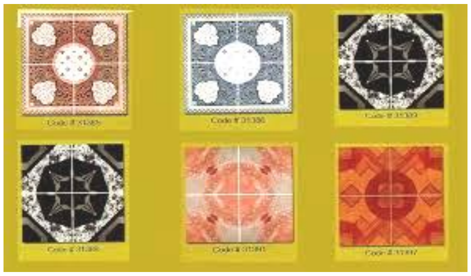

চিত্র–২৪২
ফু-ওয়াং সিরামিকের সামগ্রী–৩

চিত্র–২৪৩
ফু-ওয়াং সিরামিকের সামগ্রী–৪

চিত্র–২৪৪
ফু-ওয়াং সিরামিকের সামগ্রী–৫

চিত্র–২৪৫
ফু-ওয়াং সিরামিকের সামগ্রী–৫

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. লালা রুখ সেলিম, মৃৎশিল্প, চারু ও কারুকলা (লালা রুখ সেলিম সম্পাদিত) বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা –৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

২. সম্পাদিত শেখ মনির উদ্দিন, 'ভাস্বর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল মৃৎশিল্পের নান্দনিক রূপকার'।

৩. চারুকলা ইনস্টিটিউট স্মরণীকা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, ২০০৪।

৪. Grath Clark. The Potters Art, Rhadan Press Ltd. Uk.

৫. 'বাংলাদেশের মৃৎশিল্প : রূপ রূপান্তর' অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ, ২০১১।

৬. মোঃ হালিমুল ইসলাম (খোকন), 'মৃৎশিল্পে আমার ভাবনা', অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, এম.এফএ ১৯৯৫, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭. কুটির শিল্প বাংলাপিডিয়া bn.banglapedia.org.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা মূলত কৃষিকেন্দ্রিক। গ্রামীণ জীবনযাত্রার মধ্যেই বিকশিত হয়েছে গ্রামীণ সংস্কৃতি। গ্রামের বসতিগুলো বিভিন্ন পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে মৃৎশিল্পগোষ্ঠী অন্যতম। সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় বস্তুগত জিনিস যেমন তৈজসপত্র বা গৃহস্থালির সামগ্রী, পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকার, যন্ত্রপাতি, ঘর বাড়ি যেমন স্থান পায় ঠিক তেমনি অবস্তুগত সংস্কৃতির যেমন আইন কানুন, রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। তাই অবস্তুগত সংস্কৃতি ও বিভিন্ন রীতিনীতি ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির বস্তুগত সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এবং এদুটো ক্ষেত্রের সংযোগ ঘটেছে মৃৎশিল্পে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' এবং 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল' নামক গ্রন্থে কুম্ভকার সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা যায়, যাতে রাঢ়ীয় কুম্ভকারদের প্রাচীনত্ব বোঝা যায়। রাঢ়ীয় কুম্ভকাদের মধ্যে কয়েকটি উপভাগ বা থাক আছে সেগুলো হচ্ছে সিংহহাজারী, বারহাজারী, গণগণ্যা ও রাজহাটি। এসব ভাগ ছাড়া রাঢ়ীয় কুম্ভকারদের মধ্যে মগয়া, গড়য়া, গবুড়া প্রভৃতি থাক আছে। আঞ্চলিক থাক বা উপভাগগুলো বাদেও রাঢ়ীয় কুম্ভকারদের মধ্যে ভেরা (ভার বহনকারী) এবং বাজার‍্যা (বাজার গমনকারী) নামক আরো দুটি থাক বা উপভাগের উদ্ভব ঘটেছে। কুম্ভকারদের উদ্ভব নিয়েও বহু কাহিনী–কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে। (দীপংকর, ২০০২ : ৩)

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন মৃৎশিল্পের বিকাশ বা বিস্তার একান্তভাবেই অনুকূল সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন অঞ্চলে একারণেই স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃৎশিল্পের নানা সামগ্রী যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি প্রয়োজনের নিরিখে অদলবদল বা রূপান্তর ঘটেছে বহু উপকরণেও। শিল্পকলার রূপ ও নানা সময়ে পাল্টে গেছে। লোকশিল্প সে হিসাবে লোকায়ত সমাজজীবনের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও শিল্পভাবনার এক ধারা। লোকায়ত শিল্পধারার জন্ম সে সময়েরই। নদীবহুল অখণ্ড বাংলার মাটির গুণাগুণ শিল্পরূপ পেয়েছে নানাভাবে। শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনে নয়, অন্য এক শিল্পরূপের ধারাও গড়ে উঠেছিল। নীহাররঞ্জর রায় লিখেছেন "সেই পরিচয় স্বভাবতই ধরা পড়িবার কথা মৃৎশিল্পে, বিশেষত গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিবিস্তৃত বাংলাদেশ। নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে, মাঠের মধ্যে বসিয়া কাদা লইয়া খেলা, আঁটালো মাটির নরম ঢেলা লইয়া বিচিত্র রূপ গড়া ও ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ও গড়া দৈনন্দিন জীবনের চলতি মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী কামনা-বাসনার, আনন্দ-বেদনা, বিচিত্র গতি ও স্থিতির নানারূপ এই মুহূর্তে আছে পরের মুহূর্তে নাই, এমন সব রূপের বাতি জ্বালানো এবং নেভানো, মাটির পরম তাল লইয়া খেলার ইহাই তো প্রকৃতি।"

ভদ্র-বিলাসী সম্প্রদায় থেকে পৃথক তাকে লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

লোকশিল্পের উপাদান অবশ্যই প্রকৃতিদত্ত : তা অকৃত্রিম

প্রকৃতিদত্ত উপাদান (natural endowment)

↓

১. বংশজ	২. পরিবেশগত	৩. শিক্ষা বা কৃষ্টিমুলক
(Hereditary)	(Environmental)	(Developed through culture or nature)

লোকশিল্প অবশ্য ব্যক্তিগত হয়েও কখনো কখনো সমাজের অঙ্গ হয়ে যায় যখন সার্থক শিল্প ব্যক্তি থেকে সমষ্টি তথা অঞ্চল ও দেশের সমাজ সমাজ-জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার প্রতিনিধিত্ব করে।

আবার মোটাদাগে শিল্প-ব্যাখ্যা তিনটি ধারায় বিভক্ত–

১. মনস্তত্বমূলক

২. সমাজতাত্ত্বিক

৩. স্টাইলিস্টিক

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনটিই পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এটিকে এমনভাবে দেখানো যায়–

বস্তুজগৎ ⟶ শিল্পীর মনোজগৎ ⟶ শিল্পজগৎ

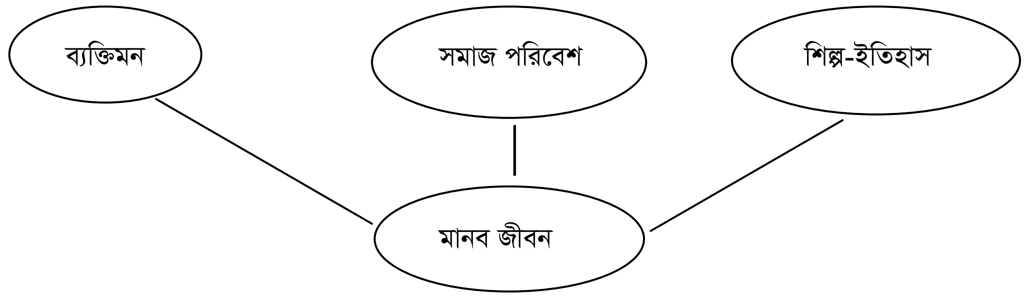

সমাজ, শিল্প ও ব্যক্তি মনের সম্বলিত যে মানবসমাজ তা মৃৎশিল্পীদের কর্মময় জীবনের রূপ।

মৃৎশিল্পীদের শিল্পকর্ম, তাদের জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এই শিল্পকর্মই তাদের অর্থ উপার্জনের পথ, তাদের বিনোদন, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। একই সাথে এই শিল্প সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যকে উজ্জীবিত করেছে। মৃৎশিল্পসামগ্রীর যে চর্চা তা

বৃহত্তর সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক আদান প্রদানের উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক টিকে আছে। শুধুমাত্র সামাজিক আদান-প্রদানই নয় বরং অর্থনৈতিক লেনদেন ও এই মৃৎশিল্পের সঙ্গে মিশে আছে।

পাল পাড়াগুলোতে আঞ্চলিক ও কারিগর বৈশিষ্ট্যে সামান্য পার্থক্যে দেখা গেলেও সামগ্রিকভারেব একটি ছন্দোবদ্ধ রূপ ভেসে ওঠে। কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজের প্রয়োজনে এই মৃৎশিল্পধারা গ্রামীণ অর্থনীতির মোড়কেই টিকে আছে। মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরির প্রয়োজনীয় মাটি সংগ্রহ, মাটি তৈরি, রং তৈরি, হাতে ও চাকে শিল্পটির সঠিক আকার দেওয়া, ভালভাবে শুকানো, পোড়ানো ও বিপণনের মধ্যে কাজের ধারাবাহিকতা দেখা যায়। পাল পাড়ায় শুধু পুরুষ ও মহিলাই নয় পরিবারের ছোট বড় সকল সদস্যই কমবেশী এই কাজের সাথে জড়িত থাকে। চাক ব্যবহারে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকলেও আর সব কাজেই মহিলাদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। তাই কুমোরপাড়াতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নানা কাজের কর্মযজ্ঞ চলতে থাকে। এরপর বিপণনের জন্য স্থানীয় বাজারে তৈরি মৃৎসামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে বাঁকে করে, সাইকেলে, ট্রলি, ভ্যানে, গরুর গাড়িতে এবং নৌকায় করে দূরদূরান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। নিজেদের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের তথা বিদেশের বাজারেও এই মৃৎশিল্পসামগ্রী জায়গা করে নিয়েছে আপন শৈল্পিক সৌন্দর্যে।

বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রধান বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও মৃৎসামগ্রীর চাহিদা ও অর্থনৈতিক বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অবস্থানে কোনও বিশেষ জিনিসের উৎপাদন বা আমদানির সঙ্গে অন্য সামগ্রী বা বিশেষ বিষয়ের চর্চা ত্বরান্বিত হতে পারে। যেমন দইয়ের ব্যাপক চাহিদার জন্য বগুড়ায় দইয়ের হাঁড়ির বেশি তৈরি হয় একইভাবে গুড়ের জন্য যশোরে গুড়ের হাঁড়ি বা ঠিলা, বরিশালে শস্য জাতীয় খাবার সংরক্ষণের জন্য মটকা, সুন্দরবনের জেলেরা পানির জন্য বড় জ্বালা ব্যবহার করে তাই ঐ সকল অঞ্চলের পালপাড়ায় প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মৃৎসামগ্রী বেশি উৎপাদিত হতে দেখা যায়। আবার বিশেষ বিশেষ সামগ্রীর আমদানি বা উৎপাদন মৃৎশিল্পের বিষয়কে উদ্যোগহীন করে। দু'তিন দশক আগেও মেলা বা উৎসবে মাটির খেলনা পুতুলের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। বিকল্প বিভিন্ন আকর্ষণীয় খেলনার প্রচলন তখন ছিলনা আবার মাটির তৈজসপত্রের স্থান দখল করেছে বিভিন্ন ধাতব পাত্র। ফলে গৃহস্থালীর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মৃৎসামগ্রীর ব্যবহার কমে এসেছে। সময়ের সাথে সাথে বিকল্প সামগ্রীর উদ্ভাবন মৃৎশিল্পীদের সরল সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাস্তবতার সাথে তাল মিলাতে তারা হিমশিম খাচ্ছে, পেশা পরিবর্তন করছে যা এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের জন্য হুমকিস্বরূপ।

গ্রামীণ জনসমাজে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং মৃৎশিল্পের প্রয়োজনীয় দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচিত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যেও মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পীদের কথা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই যে সাহিত্যে উঠে আসা লোককথা যা কিনা কুম্ভকারদের জীবনঘনিষ্ঠ আচার আচরণ তুলে ধরেছে সেখান থেকেও আমরা এই শিল্পগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

একসময় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ছিল মূলত প্রাগ-ধনতান্ত্রিক। শহরভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠলেও গ্রামের সহজ সরল পরিবেশে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ বাস করতো। আর এই সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মূল অবলম্বনই গড়ে ওঠে কৃষিকে ঘিরে। এর মূল কারণ হিসেবে বলা যায়, বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব, অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিলের উপস্থিতি। যেহেতু, নদী মাতৃক বাংলার ভেতর দিয়ে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বয়ে চলেছে অসংখ্য নদ-নদীর স্রোত ধারা, সেহেতু এ অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতি, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রধান সুতিকাগার হয়ে আছে এখান উর্বর মাটি। আর এ কারণেই কৃষির সাথে "বাংলার ভূ-প্রকৃতি তার নদ নদীর বিস্তার এবং পলিমাটির প্রাচুর্য, তাকে গড়ে তুলেছে মৃৎশিল্প চর্চার এক আদর্শ ও অনন্য ক্ষেত্র হিসেবে।"

অসংখ্য নদী বিধৌত এই বাংলার মাটি অত্যন্ত সহজলভ্য হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, নানাবিধ গৃহস্থলী দৈনন্দিন চাহিদা আর ধর্মীয় প্রয়োজনে এই মাটির ব্যবহার হয়ে আসছে সেই সুপ্রাচীন কাল হতেই। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িই একসময় তৈরি হয়েছে মাটি দিয়ে। এইসব মাটির ঘরের উঠোনে অর মেঝেতে অসংখ্যবার মাটির প্রলেপ পড়েছে। রান্না হয়েছে মাটির চুলায় মাটির তৈরি তৈজসপত্র ব্যবহার করে। লোকায়ত জীবনের গৃহস্থালির তৈজস পত্রের মধ্যে রয়েছে হাঁড়ি, পাতিল, সরা, সানকি, মুড়ি ভাজার ঝাঁঝড়ি, পিঠা তৈরির পাত্র, দুই রাখার পাত্র, সুপারি রাখার মটকা, কলস প্রভৃতি। এছাড়া আছে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের খেলনা, পুতুল এবং ধর্মীয় কাজে মাটির তৈরি বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা মূর্তি।

মৃৎশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে পরম্পরাগতভাবে সেই প্রাচীন কাল থেকে সমাজের যে সম্প্রদায়টি কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাদেরকে বলা হয় তুমার বা কুম্ভকার সম্প্রদায়। সনাতন হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে এদের উপাধি হল "পাল" আর মুসলমান হলে "কুলাল"। যে নামেই ডাকা হোক না কেন তারা উভয় সমাজেই নিম্ন সামাজিক মর্যাদাই পেয়েছে। মৃৎশিল্পী কুম্ভকাররা নিতান্ত অজবী অশিক্ষিত বলে তাদের স্থান সমাজের শ্রেণি বিন্যাসের নিম্নতম পর্যায়েই থেকে গেল। যদিও তারা তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের পুরাতন ধারা আজও প্রচলিত রয়েছে। প্রথাগত মৃৎশিল্পকে অবলম্বন করে গ্রাম বাংলার শত শত পরিবার তাদের জীবন ধারণ করছে। এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের সাথে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত। মৃৎশিল্পের মাধ্যমে একজন শিল্পীর দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা একজন থেকে অন্যজনে অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় পিতা থেকে পুত্রে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বহমান। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীগণ তাদের এই ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে লালন ও ধারণ করে চলছে সুদূর অতীত থেকে বহমান বর্তমান পর্যন্ত। অক্ষরজ্ঞান শূন্য এই মানুষগুলো তাদের শৈল্পিক মনের ছোঁয়ায় নানা ধরনের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মৃৎসামগ্রী তৈরি করে আসছে। মোহাম্মদ শাহজালাল 'বাংলাদেশের মৃৎশিল্প' গ্রন্থে যেসব মৃৎসামগ্রীর হদিস দিয়েছেন তা হলো 'মাটির তৈরি পানির কলস, সরা, জলপাত্র, জলকান্দা, মাটির হাঁড়ি, পাতিল, কড়াই, শানকি (ভাত খাবার পাত্র), মুড়ি ভাজার ঝাঁঝর, থালা, বাসন, গামলা, বদনা, লবণের বাটি পিঠা তৈরির পাত্র, পানের ডাবর, সুপারি রাখার মটকা, দই রাখার পাত্র, মালসা (আগুন রাখার পাত্র), তামুক খাবার কলকি, হুক্কা, ধূপদানি, ফুলদানি, ছাইদানি, মাটির প্রদীপ,

দীপাধার, পিদিম, কুপি, ফুলের টব, ধান, চাল ও চিনি সংরক্ষণের জন্য বড় আকারের মটকা, ঝাড় অথবা জ্বালা, (গরুকে খাবার দেবার জন্য বড় গামলা অথবা চাঁড়া) এবং কলসি, পাতিল ঢাকার জন্য বিভিন্ন আকারের ঢাকনা ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মৃৎপাত্র। এ ছাড়া নানা বিধ পুতুল ও খেলনা।

কুম্ভকাররা অতীতে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে মৃৎশিল্পের যোগান দিতেন। তারা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ও শৌখিন মৃৎসামগ্রীর বিনিময়ে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেতেন। সেই থেকে আজও মাটির কাজ কুমার সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা পেশা। বাংলাদেশেল কিছু কিছু জায়গায় মুসলমানদেরও মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরি করতে দেখা যায়। মুসলমান কুম্ভকারদের উপাধি হচ্ছে 'কুলাল;। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার জোবরা গ্রাম, উখিয়া উপজেলার রাজপালং, রাঙ্গুনিয়ার ১৫ নং লালানগর ইউনিয়নের বন রাজার পাড়া, এছাড়া নোয়াখালী জেলার চম্পকনগর গ্রামেও মুসলমান মৃৎশিল্পীরা আছেন। এরা সবাই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে মৃৎপাত্র তৈরি করেন। মুসলমান মৃৎশিল্পীরা সংখ্যায় নগণ্য। মূলত বাংলাদেশের মৃৎশিল্প হিন্দু কুমার সম্প্রদায়ের বৃত্তি।

কুম্ভকারদের সমাজ সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট ধর্মীয় প্রভাব রয়েছে। কাজ শুরুর আগে চাক পূজা, মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর সময় চুলায় আগুন দেবার আগে কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও পালন করে থাকে যেমন চুলায় আগুন দেবার আগে চুলার চারদিকে ধূপ দেয়া। একটা পানির পাত্রে সোনা রূপা রেখে সেই পানি চুলায় ছিটিয়ে দেয়া। চুলার এক কোণে উঠান ঝাড় দেবার 'পিছা' রাখা হয় যাতে চুলায় কারো কুদৃষ্টি না পড়ে। চুলার কাছে মেয়েদের যেতে দেয়া হয় না। কুমররা বৈশাখ মাসে চাকের কাজ বন্ধ রাখেন। চাক বন্ধ নিয়ে কুম্ভকারদের আদি ঐতিহ্যের সঙ্গে শাস্ত্রকথাও মিশে আছে। ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ-এ যেমন জানা যায়, ভস্মাসুর বা অসুর শিবকে তপস্যা করে বর পায়। বরটি হল, যার মাথায় হাত দেবে সে ভস্প হবে। যখন অসুর পরীক্ষা করার জন্য শিবের মাথাতেই হাত দিতে চেয়েছিল তখন শিব ভয়ে পালিয়ে কুমোরদের চাকের মধ্যে লুকিয়েছিল। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে ঘটেছিল বলে ওইদিনি থেকে চাক চালানো হয় না। যখন শিবকে পাওয়া গেল না, তখন সব দেবতারা যুক্তি করে এবং পুরুষ মোহিনী মূর্তি ধারণ করে। এরপর ভস্মাসুরকে ভুলিয়ে নিজের মাথায় নিজে হাত তুলে ভস্ম হয়। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন ভস্ম হয়। এরপর চাকের কাজ আবার শুরু হয়। শাস্ত্রকথা ছাড়াও কুম্ভকারদের নিয়ে উপাখ্যান আছে তা হলো শিবের বিয়ের সময় সপ্তঋষি ঘট চেয়েছিলেন শিবের কাছে। এ সময় শিব কিছু না পেয়ে তার রূদ্রাক্ষ দিয়ে একটি মানুষ আকৃতি তৈরি করলেন। এই মানুষকেই শিব আদেশ দিলেন তাকে একটা ঘট তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তখন সেই মানুষটি ঘট তৈরির জিনিসপত্র চাইলেন শিবের কাছে। শিব তখন কৃষক ডেকে তার কাছ থেকে সুদর্শন চক্র নিয়ে সেই মানুষটিকে দিলেন। ওই সুদর্শন চক্রই হচ্ছে চাক। ওই চাকটি ঘোরাবার জন্য লাঠি দিলেন, যেটি শিবের ত্রিশূল ছাড়া কিছু নয়। ভারতমাতা মাটি দিলেন। এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে জলের কমন্ডুল পেলেন। তাছাড়া তৈরি জিনিস চাক থেকে কাটার জন্য শিব নিজের পৈতে থেকে একটি সুতো দিলেন। এরপর তৈরি হওয়ার পর ভাটিতে পুড়িয়ে শিবকে দেওয়া হল। এজন্য ব্রাহ্মণদের নয়টি পৈতার সুতো আছে, অন্যটি কুম্ভকারদের কাছে মোট দশটি পৈতার সুতো ছিল। রূদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি মানুষটিই কুম্ভকার যারা রুদ্রপাল বলে পরিচিত,

সংক্ষেপে পাল বলা হয়। এরপর কাজের বিভাগ ইত্যাদিতে ভিত্তি করে বিভিন্ন পদবির উৎপত্তি হয়। (দীপঙ্কর, ২০০৩ : ১৪)। এই শাস্ত্রকথা, উপাখ্যান এসব নিয়েই মৃৎশিল্পীদের সাংস্কৃতিক জীবন।

মৃৎশিল্পীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন মৃৎশিল্পকে ঘিরেই। বিশেষ সূচনা লগ্ন থেকেই আমরা দেখি নিতান্তই প্রয়োজন গৃহাস্থালীর সামগ্রী পর্যায়ক্রমে শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে। একসাথে চারু ও কারু শিল্পের সমন্বয় ঘটেছে মৃৎশিল্পে। আর এই মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন মৃৎশিল্পকে ঘিরেই আর্বতিত।

বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে অর্থনীতি একটি প্রধান বিষয়। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও এই অর্থনৈতিক বিষয় এবং এই শিল্পের চাহিদা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের রকমফেরে মৃৎশিল্পের নব রূপায়ণ যেমন ঘটেছে, অর্থনৈতিক চাহিদা চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে এই মৃৎশিল্প ধারার কারিগরদের মধ্যে পেশা পরিবর্তন করার প্রবণতা বেড়ে গেছে।

বর্তমানে বংশ পরম্পরার এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প আর মৃৎশিল্পীদের জীবন কর্মচাঞ্চল্যময়, নির্ঝঞ্ঝাট নেই। মৃৎশিল্প সামগ্রীর বিকল্প হিসাবে আসা এ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টিল, অত্যাধুনিক মেলামাইন এবং সর্বশেষ সর্বনাশা আঘাত হিসেবে আসা সহজলভ্য প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন এখন একঘরে করে ফেলেছে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে। তার উপর 'মড়ার উপর খড়ার ঘা' এর মত শিল্পসামগ্রী তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল আগে বিনামূল্য ও সহজলভ্য হলেও বর্তমানে দামী ও দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। আগে মৃৎশিল্পীগণ মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান মাটি বিভিন্ন জমি এবং নদী থেকে অনেকটা বিনামূল্যেই সংগ্রহ করতে পারতেন। অথচ এখন মৃৎশিল্পের এই প্রধান উপকরণটি সংগ্রহ করতে তাদের অনেক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, এর পাশাপাশি জ্বালানি কাঠের সংকটের কারণে মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর কাজেও উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। এ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টিল, মেলামাইন ও প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদার কাছে মৃৎশিল্প সামগ্রীর জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার সমস্যার যোগ হয়েছে। ফলে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন এখনকার শিল্পীরা।

যুগের আর্বতে মৃৎশিল্পের পটপরিবর্তন আর সংসারের অর্থকষ্টের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মৃৎপল্লীর অনেকেই এখন আর এই পেশার প্রতি তেমন আগ্রহী হচ্ছেন না এমনকি পরবর্তী প্রজন্মকে এ কাজে নিয়োজিত করতেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। যার ফলে অবধারিতভাবেই এই শিল্প তার জৌলুস হারিয়ে ফেলছে।

শিল্পী মাত্রই আত্মভিমানী প্রচারবিমুখ। মৃৎশিল্পীরাও তার ব্যতিক্রম নয় তাই নীরবে পেশা ছাড়ছেন কেউ আবার শিল্পকর্মের পাশাপাশি অন্য কিছু করছেন আবার কেউ কেউ বহু কষ্টে এই পেশাই ধরে রেখেছেন। নানারকম সমস্যায় জর্জরিত মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। শিল্পী অরুণ পাল বলেন, পালদের ছেলেরা আর পাল হবে না, আমরাও চাই না। এই কাজে পরিশ্রম বেশি কিন্তু দাম নেই। সামাজিকভাবে প্রাপ্য সম্মানটুকুও পাওয়া যায় না। তার উপর বাজার অনিশ্চিত। সরকার উদাসীন, নির্দিষ্ট ক্রেতা নেই, মহাজনই ভরসা।

শিল্পী সুকুমার পাল নিজ পেশা ছেড়ে চরে যাচ্ছেন কারণ কারিগররাই এখন শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। দেখে দেখে কিছুটা শিখে ছাঁচে তৈরি করছে ফুলের টব, দইয়ের হাঁড়ি কিছু তৈজসপত্র, খেলনা, ইত্যাদি বাজারে বিকোচ্ছেও বেশ। তাতে শৈল্পিক রূপ তেমন না থাকলেও অসুবিধা নেই সস্তায় দিতে পারছে, ক্রেতাও আছে। তাতে জাতশিল্পী পড়ছে বিপদে। তার শিল্পী মন দারিদ্রতার সাথে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না।

শিল্পী সুবল পাল আক্ষেপ করে বলেন, আগেকার শিল্পীরাও দরিদ্র আর অসহায় ছিলেন কিন্তু এখনকার মতো অসুস্থ পরিবেশ ছিলনা তখন। জীবন ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর। ক্রেতারা আসতেন শিল্পের টানে। বিক্রি কম ছিল কিন্তু ভালে জিনিসের ভালো দাম পেতেন, শিল্পী হিসেবে সম্মানও ছিল। আরও আছে, আগে কাঁচামাল কেনার খরচ, শো-রুমের খরচ, ইলেকট্রিক বিল, ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ, অর্ডার ধরার ধান্দা এসব ছিল না। নিশ্চিতে এক মনে শিল্পকাজ করে গেছেন। এখন সেটা সম্ভব না।

শিল্পী দীলিপ পাল স্বপ্ন দেখেন তার কলেজে পড়া ছেলে পড়া শেষে চাকরি করবে, তাদের রোজগার বাড়বে। তখন ধীরে সুস্থে শিল্পকাজ করবেন। দুঃখ করলেন ছেলকে তার শিল্পজ্ঞান দিতে পারলেন না বলে। এখন যারা সহকারী হিসেবে কাজ করে তাদের কাজে মধ্যম মানের, তেমন দক্ষতা কারিগরি তো নেই রক্তে। জাতিবিদ্যা তো নয়। দেখে দেখে খানিকটা শেখে। মাটি কেমন করে ছানতে হয়, ছাঁচ বানাবার কৌশল কি কি, রং আর তুলির ব্যবহারের ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝে নেয়। তারপর একদিন চরে গিয়ে আসল শিল্পীর ছাঁচ নকল করে রেট কমিয়ে সস্তায় মহাজনের হাতে তুলে দেয়। যেহেতু সে শিল্পী নয় সেহেতু তার উচ্চাশাও নেই। মাঝখানে জাত শিল্পীরা মার খাচ্ছে। নতুন কাজে উৎসাহ নেই। মনের মাধুরী দিয়ে একটা মডেল বানালেই কিছুদিনের মধ্যে নকলে বাজার ভরে যাবে। এই সত্যিটা বোঝার পরে আসলেই কাজটা করা যায় না।

আবার অনেক শিল্পীই আছেন যাঁরা অবস্থার চাপে পড়ে, অবস্থাপন্ন মালিকদের কাছে দিন মজুর বা মাসিক হিসাবে কাজ করেন। যদিও এভাবে কাজ করতে তার শিল্পীসত্তার রক্তরক্ষণ হয়। কিন্তু নিরূপায় শিল্পী না পারেন পরম্পরার এই শিল্পকে ছেড়ে যেতে, না পারেন মন খুলে কাজ করতে। আর নিজের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে পরবর্তী প্রজন্মকে এই কাজে যুক্ত করতে চান না।

কোথাও কোথাও শিল্পীরা এতটাই অভিমানী যে কথা বলতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। নিরক্ষর এই শিল্পীরা মনের ভিতর যে অব্যক্ত যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন তার দেখা মেলে নিস্প্রাণ ভেজা অসহায় চোখে। অথচ কতই না সমৃদ্ধ এই শিল্পের ইতিহাস। রাজধানীর শখের হাঁড়ির শিল্পী কিশোরী পাল জানান সিদুঁর কুসুন্ধী এবং বসন্তপুরের শখের হাঁড়ির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিহার এবং দুবলহাটির মহারাজারা। আরও জানালেন 'তাঁর পিতার তৈরি একটি অপূর্ণ নকশা শোভিত শখের হাঁড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলিহারের মহারাজা কৃষ্ণেন্দু রায় নাকি সেই আমলে এক হাজার টাকা বকশিস প্রদান করেছিলেন। স্বর্নালী সেই দিনের কথা বলতে গিয়ে দু'টি চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এই দুঃখ করে বলেন আগে মেলা শুরুর এক মাস আগে থেকেই তারা জিনিসপত্র তৈরির প্রস্তুতি নিতেন। কামারগাঁ, ধুরইল, কালীগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ, মান্দা, খেতুর এবং তানোরের মেলায় ও নওগাঁ এবং রাজশাহীর আষাঢ় মাসের রথের মেলায় তাদের উৎপাদিত মৃৎশিল্পসামগ্রী প্রচুর বিক্রি হতো। মেলা এখনও আছে কিন্তু আধুনিক এবং কৃত্রিম দ্রব্যের দাপটে শখের হাঁড়ি কোনঠাসা হয়ে পড়েছে।

শুধু যে শখের হাঁড়িই কোনঠাসা তা নয় এর সাথে আছে খেলনা পুতুল, লক্ষ্মীর সরা। কতই না উজ্জ্বল দিন এই সব শিল্পকর্ম অক্ষরজ্ঞানশূন্য এই শিল্পীরা শিল্পজ্ঞানে কি ভীষণ সমৃদ্ধ কিন্তু দিনের পর দিন ধাতব আধুনিক যন্ত্রপাতির তৈরি ধাতব আর প্লাস্টিক সামগ্রীর দাপটে কিছুতেই তারা পেরে উঠছেন না। তার উপর আবার সব কিছুর দাম বাড়লেও মৃৎসামগ্রীর দাম বাড়েনা। এই শিল্পীরা না পায় তার শিল্পকর্মের দাম, না পায় তার শ্রমের দাম।

অল্পে তুষ্ট এই শিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে যার প্রভাব পড়ছে তার শিল্পকর্মে। আবার সামাজিকভাবে শিল্পী হিসেবে তেনম সম্মান পান না। তাই অর্থনৈতিক দুরবস্থার সাথে সাথে তাদের শিল্পীমনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির কারণে এই শিল্প সংশ্লিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন এখনকার শিল্পীরা এর সাথে যোগ হয়েছে প্রতিষ্ঠানিক ও নান্দনিক শিক্ষার অভাব, শিল্প চর্চা কমে যাচ্ছে। চাকের ব্যবহার কমে ছাঁচের ব্যবহার বেড়ে গেছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে নানাবিধ শিল্পমানসম্পন্ন মৃৎপাত্রগুলো।

সব রকম লোকশিল্পের শিল্পীদের মধ্যে কুমোরদের অবস্থাই সম্ভবত দারিদ্রতম। অথচ মানব সভ্যতার শুরু থেকেই এই শিল্পের শিল্পীরা সক্রিয় চলমান। অথচ অবস্থার তেমন পরিবর্তন তো হয়নি বরং দিন দিন ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প কোনঠাসা হয়ে পড়ছে।

একমাত্র গ্রামীণ সমাজের যেখানে স্বল্পবিত্তের ও সীমিত আয়ের মানুষের নিবাস, শুধু সেইসব অঞ্চলেই মৃৎপাত্র ব্যবহারের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন থেকে যখন কোনো জিনিসের চাহিদা তিরোহিত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার বিকাশের পথও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আর তাই পাল সম্প্রদায় আজ পেশাগত দিক থেকে চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে।

গ্রাম বাংলায় শুধু অর্থনৈতিক বিষয় বিন্যাসের মধ্যেই নয়, সামগ্রিকভাবে গ্রাম সমাজের ভিত্তি মৃৎশিল্প–কারিগরদের উপস্থিতিতে মজবুত ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রামজীবনের এমন উপকরণের মধ্যেই বেঁচে থাকে বাংলার সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। গ্রামাঞ্চলে পোড়ামাটির শিল্পের যে চর্চা তা বৃহত্তর সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক আদান-প্রদানের উপর ভিত্তি করে এ সম্পর্ক টিকে আছে। শুধুমাত্র সামাজিক আদান-প্রদানই নয়, অর্থনৈতিক লেন-দেন এই মৃৎশিল্পের সঙ্গে মিশে আছে। গৃহস্থালির দৈনন্দিন প্রয়োজনে যে বিভিন্ন মাটির মাত্রের প্রয়োজন হতো আজ তা কিছুটা কমে এসেছে। সময়ের সাথে সাথে নানা বিকল্প সামগ্রীর উদ্ভাবন এই মৃৎশিল্পের ধারাটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। নগরজীবনে বস্তুগত সংস্কৃতির যে চাহিদা তা অনেকাংশেই এই মৃৎশিল্প তথা মৃৎপাত্রকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হাঁড়ি, সরা, গামলা, কড়াই, প্রদীপ, দীপাসন, ধুনুচি ইত্যাদি নানান পোড়া মাটির অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিকল্প সামগ্রী নগর জীবন তো বটেই, গ্রাম জীবনে সামগ্রিক ব্যবহারেও চলে এসেছে।

আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ও ধর্মভিত্তিক প্রয়োজন ও অনুষঙ্গে আজও মৃৎপাত্রসহ মৃৎশিল্পের বহু সামগ্রীর ব্যবহার দেখা যায়। আক্ষরিক অর্থে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে মৃৎ-সংস্কৃতির কিছু প্রয়োজনীয়তা আজও দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির সঙ্গে বেঁচে থাকার নিরন্তর কৌশল তার সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাস,

Dhaka University Institutional Repository

রীতিনীতি সবকিছু জড়িয়ে আছে। এলাকাগত ভাবে এই বৈশিষ্ট্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকট, আবার আঞ্চলিক প্রচলনের উপর ভিত্তি করে এই ধারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ। (দীপঙ্কর, ২০০২ : ১৩৫)।

গ্রামজীবনে কর্মধারার মধ্যে গড়ে উঠেছে এক সামঞ্জস্য। বিভিন্ন গ্রামে যেখানে পোড়ামাটির কাজের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা কারিগরি বৈশিষ্ট্যে তারতম্য দেখা গেলেও কাজের ধরন এবং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে ছন্দোবদ্ধ বিষয়টি ফুটে উঠে। কৃষিপ্রধান গ্রামীণ জনসমাজে প্রয়োজনে, গ্রামীণ অবস্থানে এই মৃৎশিল্প ধারা গ্রামীণ অর্থনীতির মোড়কেই টিকে আছে। মৃৎশিল্পের সামগ্রী তৈরির প্রয়োজনীয় মাটি সংগ্রহ, মাটি তৈরি, রং তৈরি, হাতে ও চাকে উদ্দিষ্ট সামগ্রীর সঠিক রূপদান ও বিপণনের মধ্যে কাজের এক ধারাবাহিকতা দেখা যায়। শুধু পুরুষরাই নয়, বাড়ির মহিলারাও এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। চাকে তৈরি সামগ্রীর ক্ষেত্রে মহিলাদের বিধিনিষেধ ছাড়া সামগ্রিকভাবে সকল কাজেই মহিলাদের অংশগ্রহণ দেখা যায়। মোড়ামাটির কাজে বিশিষ্ট গ্রামগুলোতে তাই দেখা যায় সংশ্লিষ্ট নানা কাজে যুক্ত এক কর্মযজ্ঞ। বহু জাতিবিশিষ্ট বাংলার গ্রামে নিজস্ব চাহিদা মেটানো ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভৌগোলিক চৌহদ্দির চাহিদাও মেটে।

তবে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলের মৃৎশিল্প সামগ্রী আবার তাদের অতীত ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশের বাজারেও তাদের সফল পদচারণা লক্ষ্যণীয়। এদের মধ্যে আছে শরীয়তপুরের মৃৎশিল্প, বিজয়পুরের মৃৎশিল্প, সাতক্ষীরার টালি, রাজশাহীর শখের হাঁড়ি, বরিশালের মদনপুরা মৃৎশিল্প, নাটোরের মৃৎশিল্প। দেখা গেছে যে সকল অঞ্চলের শিল্পীরা তাদের কাজের সাথে আধুনিক নকশার সমন্বয় ঘটিয়েছেন তারাই কিছুটা স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছেন।

সময়ের সাথে সাথে মানুষের চাহিদার ও পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনৈতিক ভাবে অসচ্ছল শিল্পী গোষ্ঠীর স্বচ্ছলতা দিতে প্রয়োজন আধুনিক কারিগরি শিক্ষা দেয়া, নকশায় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করা, অধিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন মটর চালিত চাকের ব্যবস্থা করা, অস্তিত্বের সংকটে পড়া মৃৎশিল্পীদের কার্যকরী সহযোগিতা করার দরকার রাষ্ট্রের, সযত্ন প্রচেষ্টা প্রয়োজন সকলের।

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান চিত্রসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–২৪৬
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–১

চিত্র–২৪৭
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–২

চিত্র–২৪৮
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–৩

চিত্র–২৪৯
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–৪

চিত্র–২৫০
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–৫

চিত্র–২৫১
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র–২৫২
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–৭

চিত্র–২৫৩
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–৮

চিত্র–২৫৪
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–৯

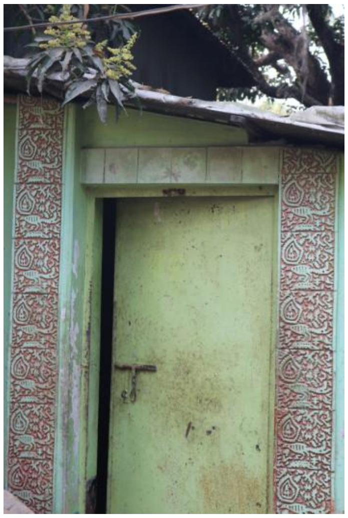

চিত্র–২৫৫
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–১০

চিত্র–২৫৬
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–১১

চিত্র–২৫৭
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান–১২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২৫৮
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান-১৩

চিত্র-২৫৯
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান-১৪

চিত্র-২৬০
পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের বাসস্থান-১৫

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র :

১. পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প, দীপঙ্কর ঘোষ।

২. [আবুল মনসুর, ‘ঐতিহ্যের উৎস : বাংলার মৃৎশিল্প, সুন্দরম, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা

মৃৎশিল্প ঐতিহ্যবাহী শিল্প। যে সকল শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প তার মধ্যে অন্যতম। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ধারক ও বাহক এদেশের কুম্ভকারগণ। আবহমান কাল ধরে নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র, শিশুতোষ খেলনা, পুতুল প্রভৃতি হাজারো বছরের ঐতিহ্যের ধারক এই মৃৎশিল্প বংশ পরম্পরায় আমাদের কুম্ভকারগণ হাতের কৌশলে নির্ভেজাল নিজস্ব প্রকৃতি ও মৌলিক বৈশিষ্ট নিয়ে নির্মাণ করে আসছে আজ অবধি।

এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প কালের আর্বতে কোথাও কোথাও তার জৌলুস হারালেও কোথাও আবার বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে জেগে উঠছে। সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন হয়েছে সেই সাথে মৃৎশিল্পসামগ্রীতেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর চাহিদা কমেছে আর বেড়েছে সৌখিন গৃহসজ্জা সামগ্রীর। সেই সাথে বেড়েছে সম্ভাবনাও, তবে সম্ভাবনার দুয়ার খোলার কৃতিত্বের সিংহ ভাগটাই দিতে হয় প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পীদের। কেননা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীগণ গবেষণা করে মৃৎশিল্পকে যেমন আধুনিক ও যুগপোযোগী করে তুলেছে একই সাথে বংশরপরম্পরার মৃৎশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুগের সাথে তাল মেলানোর উপযোগী করে তুলতেও তারা সচেষ্ট। যার ফলে নির্মিতক সামগ্রীর বিষয়ের পরিবর্তনের পাশাপাশি নির্মাণ কৌশলগত দিকেরও পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। পূর্ব পুরুষের চাকের চাইতে আধুনিক প্যাডেল হুইলেই এখন এইপ কুম্ভকারগণ বেশি ব্যবহার করছেন। ভাতের হাঁড়ি, শানকি, মুড়ির কোলা ইত্যাদির পরিবর্তে ইংরেজি ফুলের টব, ল্যাম্প স্ট্যান্ড, বিভিন্ন রকম ফুলদানী ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে বেশি পরিমাণে। আর তাইতো প্লাস্টিক সামগ্রীর সহজ ব্যবহার, অ্যালুমিনিয়াম, মেলামাইন সামগ্রীর ভিড়ে মৃৎশিল্পসামগ্রী একদিকে কোনঠাসা হয়ে পড়লেও অন্যদিকে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

অতএব বলা যায়, ঐতিহ্যবাহী যে মৃৎশিল্প দেশিয় সংস্কৃতির ধারক, বিশ্ব বাজারে যার গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান, তার স্বকীয়তাকে বজায় রাখার জন্য ঠিক এই সময়েই প্রশিক্ষিত শিল্পীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ এবং সঠিক দিকনির্দেশনা এই শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এ কথাই মনে করিয়ে দেয়। আর এতেই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প বাঁচবে, তার নিজস্ব ঢঙে নিজস্ব গুণে হাজার বছর।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্পের সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণালব্ধ আলোচনা

অষ্টম অধ্যায় ।। প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্পের সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণালব্ধ আলোচনা

মৃৎশিল্প এদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের প্রাচীন শিল্প নিদর্শন গুলোর মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম স্থান দখল করে আছে। আবার কালের পরিক্রমায় আধুনিক মৃৎশিল্পও স্বমহিমায় শিল্পকলার একটি বিশেষ স্থান দখন করে আছে। এই যে আমাদের অতীত ঐতিহ্য, গৌরবগাঁথার ধারক ও বাহক মৃৎশিল্প, যা কিনা অপার সম্ভাবনাময় তার পিছনে কিছু কথা আছে। প্রদীপের নিচেই যেমন অন্ধকার থাকে ঠিক তেমনি মৃৎশিল্পের সম্ভাবনার পিছনে হারিয়ে যাওয়া বা বিলুপ্তির কালো ছায়া পড়েছে। তবে হতাশাগ্রস্ত হবার মতো অবস্থায় এখনও আমরা যাইনি। মৃৎশিল্পের দূরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বের করবো, আর সমাধানের পথ ধরেই আমরা পৌঁছে যাব সম্ভাবনায়। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি বংশপরাম্পরার দক্ষ শিল্পীগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পীগণ। যাদের উপর নির্ভর করেই আমরা মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা দেখতে পাই।

বাংলাদেশের বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মৃৎশিল্প যা তার স্বকীয় ঐতিহ্যে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। এই শিল্পের শিল্পীরা এখনও সনাতন পদ্ধতিতেই মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরি করছে প্রথাগত মৃৎশিল্পকে অবলম্বন করে গ্রামবাংলার শত শত পরিবার তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের সঙ্গে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা, চিন্তা, চেতনা ও সংস্কৃতি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা একজন থেকে অন্যজনে অর্থাৎ পিতা থেকে পুত্রে, এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বহমান। এভাবেই বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে লালন ও ধারণ করে আসছে সুদূর অতীত থেকে আজ অবধি। এমন সুদক্ষ শিল্পীগোষ্ঠীর কাছে আজকাল পৈতৃক পেশার এই শিল্পকে বয়ে চলা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। মৃৎশিল্প তৈরিতে সহজলভ্য ও অতি সাধারণ সরঞ্জামাদি প্রয়োজন হয় সেটুকুর বন্দোবস্ত করাও দিন দিন খরচান্ত হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মৃৎশিল্পের সমস্যা

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প বর্তমানে সঙ্কটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এখানে মৃৎশিল্পে বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রধান কাঁচামাল মাটির সমস্যা :

আমাদের এই সঙ্কট বা সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে। কেননা এই সমস্যার জন্য আমাদের ঐতিহ্যবাহী সম্ভাবনাময় এই শিল্প যুগের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই আমাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের মধ্যে দিয়ে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। এঁটেল মাটি মৃৎশিল্পের প্রাণ। মৃৎশিল্পের কাঁচামাল হচ্ছে এঁটেল মাটি কেননা এই মাটি আঠালো তাই মৃৎসামগ্রী তৈরির উপযুক্ত এবং বহুল ব্যবহৃত। খাল, বিল, হাওড়, জলাভূমি, কোথাও কোথাও সমতলভূমি থেকেও এই এঁটেল মাটি সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে খাল-বিল ভরাট হয়ে যাওয়া আবার বর্ষার জলাবদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে সারা বছরের মাটি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। এভাবে মাটি সংরক্ষণ করাটাও কষ্টসাধ্য। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রকোপ থেকে বাঁচিয়ে রাখা সংরক্ষিত মাটি অনেক সময় শুকিয়ে এমন শক্ত হয়ে ওঠে যে সেগুলো পানি দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে মৃৎসামগ্রী তৈরির উপযোগী হিসেবে প্রস্তুত করাও যথেষ্ট শ্রমসাধ্য হয়ে পড়ে। তবে কায়িক পরিশ্রমের চেয়েও মাটি কিনতে যে অর্থ ব্যয় করতে হয় সেটা পাল বা কুমারদের চাপের মুখে ফেলে দেয়। এরপর আবার আছে পোড়ানোর লাকড়ির খরচ, সেটাও তো কিনতে হয়। পূর্বে মাটি বা লাকড়ি কিনতে হতো না। জমির মালিক বিনামূল্যে মাটি দিত বিনিময়ে কুমাররা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় হাঁড়ি-পাতিল, কলস, প্রদীপদানি, পিঠার খোলা ইত্যাদি তৈরি করে দিত। কখনওবা কুমাররা প্রয়োজনীয় মৃৎসামগ্রী খাদ্যশস্যর সাথে বিনিময় করত এখন সেই প্রথা আর নেই। অর্থ দিয়েই সব কিনতে হয়। আর মাটির দামও দিনদিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে দ্রুত নগরায়নের জন্য জলাভূমি ও নিম্নাঞ্চল ভরাট হয়ে যাচ্ছে ফলে মাটি সংগ্রহের জমি কমে যাচ্ছে। আবার আগে নদীর পানি নিচে নামার সাথে সাথে নদী থেকে মাটি সংগ্রহ করা হতো। বর্তমানে নদীগুলোর নাব্যতা হারানোতে বালুমাটির চর উঠেছে যা কিনা মৃৎসামগ্রী তৈরির সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এতে করে মাটির দাম বাড়ার সাথে সাথে, দূর-দূরান্ত থেকে মাটি আনার খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে তিনশ জন মৃৎশিল্পীর মধ্যে দুই শত নব্বই জনই মাটিই প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জ্বালানি সমস্যা :

মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরিতে মাটির মতো জ্বালানি ও অপরিহার্য। মৃৎসামগ্রী তৈরির পর সঠিকভাবে পোড়ানোর মধ্য দিয়েই তা ব্যবহার উপযোগী হয়ে উঠে। আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিনামূল্যে জ্বালানি সংগ্রহ করতেন এখন সেটাও কিনতে হয়। মৃৎসামগ্রী পোড়াতে জ্বালানি হিসেবে মূলত কাঠ, কয়লা, লতা, পাতা খড়, ছন, বাঁশের গোঁড়া ইত্যাদি কাজে লাগে। পালরা আগে এগুলো কারো বাঁশের ঝাড়, কারো আমবাগন, কারো আখের ক্ষেত জ্বালানি সংগ্রহ করতো। যার বাগান থেকে বা জমি থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতো তিনি আবার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় মাটির হাঁড়ি-পাতির পালপাড়া থেকে বিনামূল্যে নিয়ে আসতেন। বর্তমানে অর্থের বিনিময়ে জ্বালানি সংগ্রহ করা হয়। বৃহৎ আকারের মাটির জিনিস পোড়ানোর চুলা বা ‘পুন’-এ একবারে প্রায় এক হাজার টাকার জ্বালানি লেগে যায়। ফলে মৃৎশিল্পীদের উপর মাটির সাথে জ্বালানির খরচও যুক্ত হয়। এছাড়াও যে সকল মৃৎশিল্পিরা একটু বড় পরিসরে কাজ করছেন তারা গ্যাসের চুল্লী ব্যবহার করেন এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোয় বর্তমানে গ্যাস সংকটে পড়েছে। কেউ কেউ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আধুনিক নক্সা ও যন্ত্রপাতির অভাব :

বাংলাদেশের বংশ পরাম্পরার মৃৎশিল্পীরা এখনও সনাতন পদ্ধতিতে খুব সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতির সহায়তায় সেই আদি থেকে আজ অবধি মৃৎশিল্প সামগ্রী তৈরি করে আসছে। পাল বা কুমারদের প্রধান যন্ত্রই হচ্ছে চাক। লাঠির সাহায্যে চাক ঘুরিয়ে মৃৎপাত্র তৈরি করা হয়। চাক ঘুরাতে যেমন শক্তির প্রয়োজন হয় তেমিন চাকে কাজ করা সময়সাপেক্ষও বটে। এছাড়া ছাঁচেও মৃৎসামগ্রী তৈরি করা হয়। আধুনিক যন্ত্র যেমন প্যাডেল হুইল ব্যবহার করেও স্বল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশি মৃৎপাত্র সহ অন্যান্য শিল্প সামগ্রী তৈরি করা যায়। যদিও ইদানিং স্বল্প পরিসরে এই প্যাডেল হুইলের ব্যবহার হচ্ছে। মৃৎপাত্র পোড়ানোর ব্যবস্থাও সেই আগের অবস্থাতেই আছে। মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর চুলা যা ‘পুন’ নামে পরিচিত সেটাতে পোড়ানোর বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এবং একাবরে খুব বেশি পণ্য পোড়ানো সম্ভব না। আর এভাবে পোড়ানোর বেশ সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমের কাজ। এক্ষেত্রে মৃৎপাত্র পোড়ানোর উপযোগী গ্যাসের চুল্লী ভীষণ উপকারী হবে মৃৎশিল্পীদের জন্য। অবশ্য এক্ষেত্রে গ্যাসের লাইনের জন্য সরকারি সহায়তা আবার এই চুলার ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এছাড়া আরও একটা জিনিস ভীষণ প্রয়োজন তা হচ্ছে মৃৎসামগ্রী ও মৃৎশিল্পের গতানুগতিক নক্সার পরিবর্তন ঘটানো। আধুনিক যুগপযোগী নক্সা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মৃৎশিল্পের উন্নয়ন সম্ভব। আধুনিক নক্সার অভাবে একদিকে যেমন সনাতন নক্সা একঘেয়ে হয়ে পড়ছে আবার যুগের পরিবর্তনের সাথে এবং পরিবর্তিত প্রয়োজনের সাথে তাল মেলাতে অপরাগ হয়ে পড়ছে। তাই মৃৎশিল্পে আধুনিক নকশা এখন সময়ের চাহিদা।

দক্ষ কারিগর সংকট :

বংশ পরাম্পরার শিল্পীরা শৈশব থেকেই হাতে কলম এই কাজটি শিখে থাকেন। তাই স্বাভাবিক ভাবে যে দক্ষতার প্রয়োজন তা তাদের আছে। এখানে দক্ষতা বলতে ‘চাকে’ ব্যবহারের মতো সনাতন পদ্ধতি ছেড়ে মৃৎশিল্প তৈরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দক্ষতার কথা বোঝানো হয়েছে। আবার মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর জন্য গ্যাসের চুল্লি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দক্ষতার প্রয়োজন। এতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এতে মৃৎশিল্পের আধুনিকায়ন ঘটানো সম্ভব হবে। দক্ষ শিল্পী তৈরিতে প্রয়োজন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। তবে বংশপরম্পরার এই শিল্পীদের অনেকেই আবার বংশগত ঐতিহ্যিক প্রাচীন পদ্ধতিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার কথা বললেন। আবার অনেকেই মৃৎশিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার কথাই বললেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিপণন প্রক্রিয়ায় সমস্যা :

মৃৎশিল্পের উত্তরণের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া। ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার পেছনে রয়েছে ক্রুটিপূর্ণ বিপণন প্রক্রিয়া বা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা। মৃৎশিল্পের শিল্পীরা যে ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না বা ত্রুটিযুক্ত বিপণন প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব। বাজারে ক্রেতার কাছে মৃৎশিল্পসামগ্রী পৌঁছাতে বেশ কয়েকটি ধাপ পার হতে হয়।

মৃৎশিল্পী → পাইকারী → ক্ষুদ্রব্যবসায়ী → ক্রেতা।

পাইকারী ব্যবসায়ীরা পাল পাড়া থেকে কম দামে মৃৎপণ্য কিনে নিয়ে যায়। এরপর তারা কখনও কখনও ক্রেতার কাছে আবার কখনওবা ক্ষুদ্রব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। ক্রেতারা তখন ক্ষুদ্রব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মৃৎপণ্যটি কিনে থাকেন। এতে করে মৃৎশিল্পীর সাথে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ হয়ে ওঠে না। তৈরি মৃৎসামগ্রী বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়াতে এই শিল্পীরা কম মূল্য পাইকারকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। মাঠপর্যায়ের গবেষণায় মৃৎপণ্য বিপণন কেন্দ্রগুলোতে দেখা যায়, মৃৎশিল্প সামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা থাকায় পাইকার বা মধ্যস্থতাকারীরা কম মূল্যে মৃৎশিল্প গ্রামের শিল্পীদের কাছে থেকে কিনে এনে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে এ সকল বিপণনকেন্দ্রে বিক্রি করে অনেক বেশি লাভ করে থাকেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মৃৎশিল্পীরাই লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

প্লাস্টিক, ধাতব ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রসার :

বাংলাদেশের লোকায়াত জীবনে মাটির ব্যবহার এত ব্যাপক যে, মাটি ছাড়া সাধারণ মানুষের জীবন কল্পনাও কর যায় না। গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহস্থলীর প্রায় সমস্ত জিনিস-পত্রই মাটি দিয়ে তৈরি করা হতো। কিন্তু বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের হাওয়া এখন গ্রামবাংলায়ও পৌঁছে গেছে। এমন একটা সময় ছিল যখন মাটির তৈরি জিনিস ছাড়া জীবন-যাপন অসম্ভব ছিল। মাটির তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, বাটি, গামলা, খোড়া, সরা, সানকি, কলস, জলকান্দা, জগ, মগ প্রভৃতি বাংলাদেশের গ্রামঞ্চলের সব বাড়িতেই কম বেশি ব্যবহার হতো। কিন্তু বর্তমানে প্লাস্টিক ও ধাতব তৈজসপত্রের দৌরাত্মে মৃৎসামগ্রী ক্রমস কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভারের তৈরি হাঁড়ি, পাতিল কলস, গামলা, বাটি, গ্লাস, ঢাকনা ইত্যাদির টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের কারণে এবং ব্যবহার ও সংরক্ষণ সহজ হওয়াতে খুব দ্রুত মৃৎপাত্রের স্থান দখল করে নিয়েছে। এইসব ধাতব তৈজসপত্র। বর্তমানে খুব কম সংখ্যক লোকই আছে যারা মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিলে রান্না করে। মাটির তৈজসপত্র যেখানে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা অনেক বেশি সেখানে অ্যালুমিনিয়াম সিলভারের তৈরি হাঁড়ি-পাতিলের দাম একটু বেশি হলেও একবার কিনলে অনেকদিন ব্যবহার করা যায়। আবার প্লাস্টিকের গামলা, ঝুড়ি, ঢাকনা, বালতি, জগ, মগ, গ্লাসের দাম তুলনামূলক কম এবং টেকসই হওয়াতে ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও আছে পলিথিনের ব্যবহার আগে যেখানে গুড় বা মিষ্টি বিক্রি হতো মাটির হাঁড়িতে সেখানে এখন পলিথিনে করে কাগজের প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। এতে করে মৃৎসামগ্রী ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে এবং মৃৎশিল্পের ভবিষ্যৎ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মৃৎশিল্পে বিদ্যমান সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান :

মৃৎশিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে আদিম এবং সমৃদ্ধ শিল্প হিসেবে দেখা হয়। আবহমানকাল থেকে মৃৎশিল্পতার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে চলে আসছে। সৃষ্টির আদিম সভ্যতা থেকে উত্তরিত হয়ে সমগ্র মানব ইতিহাসের ধারায় আজ অবধি ব্যপ্তি ও গুরুত্বে মৃৎশিল্পের সঙ্গে অন্য কোন শিল্পের তুলনাই চলে না। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ এবং একটি দেশের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে প্রবাহমান এই মৃৎশিল্প। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এই শিল্প আজ সমস্যায় জর্জরিত। যুগের পরিবর্তনের হাওয়ায় কিছুটা বিধ্বস্ত। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সময়ের দাবি। কেননা এই শিল্প যেমন আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উপাদান তেমনি এর বিলুপ্তি আমাদের আত্ম পরিচয়ের জন্য হুমকিও বটে। তাই এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখানে মৃৎশিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সম্ভাব্য সমাধান উল্লেখ করা হলো–

→ মৃৎশিল্পের প্রধান কাঁচামাল মাটি ও জ্বালানি খরচ অর্থাৎ মৃৎশিল্পসামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত সুলভমূল্য ও সহজসাধ্য করতে হবে।

→ মৃৎশিল্পীদের সহজ শর্তে ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা করা।

→ বংশপরাম্পরার মৃৎশিল্পীদের কাছে আধুনিক যন্ত্রপাতি পৌঁছে দেয়া এবং তা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া।

→ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৃৎশিল্পীদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আরও দক্ষ করে তুলতে হবে।

→ মৃৎশিল্পের আকার ও নক্সার গতানুগতিক ধারা পরিবর্তন করে মৃৎশিল্পীদের নাগরিক জীবনের চাহিদা অনুযায়ী মৃৎশিল্পের আধুনিকীকরণে উৎসাহিত করতে হবে।

→ মৃৎশিল্পের বাজার ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে উৎপাদন ও বিক্রি বৃদ্ধি পায়।

→ প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি সবাইকে সচেতন ও উৎসাহিত করতে হবে।

→ মৃৎশিল্পের গুণগত মান বাড়িয়ে তা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে, মেলায় প্রদর্শনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

→ বর্হিঃবিশ্বে মৃৎশিল্পের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশী পর্যটকদের আমাদের মৃৎশিল্প সম্পর্কে জানাতে হবে।

→ বর্তমানে গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে মৃৎশিল্পকে নান্দনিক ভাবে উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে মৃৎসামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব।

→ সনাতন পদ্ধতিতে মৃৎসামগ্রী পোড়ানোর পরিবর্তে গ্যাসের চুল্লিতে পোড়ানোর সুবন্দোবস্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে গ্যাসের জন্য সরকারি সহায়তা এবং গ্যাসের চুল্লি ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

→ মৃৎশিল্প নিয়ে গবেষণা ও নতুন সৃজনশীল চিন্তাভাবনার সাথে সাথে নতুন কর্মপদ্ধতি, আধুনিক ও যুগোপযোগী নকশা ও নতুন নতুন প্রযক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। এতে করে মৃৎশিল্পের সমৃদ্ধি তরান্বিত হবে।

→ ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের যথাযথ সম্মান ও সম্মানী নিশ্চিত করতে হবে।

পরম্পরার শিল্পীদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের জন্যও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন–

→ কারখানা ভিত্তিক মৃৎশিল্প ছাড়া বাংলাদেশের সার্বিক মৃৎশিল্প সংশ্লিষ্টদের অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করার জন্য গঠনমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

→ গবেষণা বা নিরীক্ষামূলক শিক্ষা পদ্ধতির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি চাপিয়ে না দিয়ে স্বাধীন শিল্পচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

→ মৃৎশিল্প নির্মাণে তত্ত্বীয় এবং কলাকৌশলগত বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

→ মৃৎশিল্প বিজ্ঞান ও শিল্প মিশ্রিত ভারী ও ব্যয়বহুল। তাই একাডেমিক শিক্ষার পরে এই শিল্পীরা যাতে শিল্পকর্মে নিয়োজিত থাকতে পারে সেজন্য নির্মাণ আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে।

→ মৃৎশিল্প নির্মাণ ও স্থাপনে সরকারিভাবে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন।

→ মৃৎশিল্পের জন্য আলাদাভাবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের মৃৎশিল্প নির্মাণে সফলতা পরিলক্ষিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নীতি নির্ধারকদের সজাগ দৃষ্টি থাকলে এ শিল্পের উত্তরোত্তর মান বৃদ্ধি পাবে। মৃৎশিল্প আরও গতিশীল হবে এবং সৃজনশীল শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যমগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে মৃৎশিল্প সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্পীদের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

পরম্পরার শিল্পীদের মতামত

পরম্পরা শিল্পী বলতে আমরা বংশ পরম্পরার পেশাজীবী শিল্পীগোষ্ঠীকেই বুঝে থাকি। মৃৎশিল্পীরাও তেমনি এক পরম্পরা শিল্পগোষ্ঠী। মৃৎশিল্পের সাথে মানব সমাজের সম্পর্কের ইতিহাস দীর্ঘদিনের এবং মানব সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে মৃৎশিল্পের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। বাংলাদেশ যে সব শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে সমৃদ্ধ মৃৎশিল্প তার মধ্যে প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প হিসেবে সমাদৃত। এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ধারক ও বাহক এদেশের প্রথাগত মৃৎশিল্পীগণ। যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য তৈজসপত্র, শিশুতোষ খেলনা পুতুল ইত্যাদি কয়েকশ বছরের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প সামগ্রী বংশ পরম্পরায় আমাদের কুম্ভকারগণ হাতের নিপুণ গুণে আকর্ষণীয় মোহনীয় নির্ভেজাল প্রভৃতি মৌলিক যোগ্যতা নির্মাণ করে আসছে।

বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প গবেষণার শুরুতেই এ কথা বহুবার শুনেছি আর গবেষণার শেষের দিকে এসে উপলব্ধি করেছি কথাটি সম্পূর্ণ সত্যি নয় আংশিক সত্যি। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কম বেশি কুম্ভকার বা পালদের দেখা মেলে। এর অন্যতম কারণ এই দেশ নদীমাতৃক দেশ।

সাধারণত নদীর তীরবর্তী এলাকায়ই পালদের বসতি গড়ে উঠে। কেননা মৃৎশিল্প তৈরির কাঁচামাল মাটি সংগ্রহ, আবার তৈরির পর মৃৎশিল্পসামগ্রী বাজারজাতকরণে নদীপথে খরচ কম পরে। পালপাড়াগুলো ঘুরে দেখা যায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের পুরাতন ধারা আজও প্রচলিত রয়েছে। প্রথাগত মৃৎশিল্পকে অবলম্বন করে গ্রাম বাংলার শত শত পরিবার তাদের জীবন ধারণ করছে। এই শিল্পের সাথে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।

মৃৎশিল্পের মাধ্যমে একজন শিল্পীর দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা একজন থেকে অন্যজনে অর্থাৎ পিতা থেকে পুত্রে এক পুরুষ থেকে অন্যপুরুষে বহমান। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীগণ তাদের এই ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকে লালন ও ধারণ করে চলছে সুদূর অতীত থেকে বহমান বর্তমান পর্যন্ত। এই পর্যন্ত সব ঠিকই আছে অসুবিধা হলো কালের আবর্তনে যুগের পরিবর্তন সর্বত্র পরিবর্তনের যে জোয়ার এসেছে এর আঁচ মৃৎশিল্পেও লেগেছে। আর তাই অতি সরল সাধারন এই শিল্পীদের মধ্যে যারা একটু কৌশলী হতে পারেনি সেখানেই হেরে যাচ্ছে এই শিল্পীরা। আগেই বলা হয়েছে যে যুগের পরিবর্তনের সাথে বাংলাদেশের প্রথাগত মৃৎশিল্পে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ছোঁয়া লেগেছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে প্লাস্টিক, এ্যালুমিনিয়মের তৈজসপত্রেও দৌরাত্মে মাটির তৈজসপত্র কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এই সময় মৃৎসামগ্রীর বিষয়বস্তুর পাশাপাশি সাজ সরঞ্জাম বা উপকরণের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন আগে যেখানে শুধুই মাটির চাক ব্যবহৃত হতো এখন সেখানে পায়ে চালিত হুইল এবং আরো উন্নততর ইলেকট্রিক হুইল এসেছে। এক সময় শুধুমাত্র বিভিন্ন মাটি গুলিয়ে মৃৎশিল্পসামগ্রী রং করা হতো বর্তমানে রাসায়নিক উপকরণের সাহায্যে রং করা হয়। যেমন নানা রকমের অক্সাইডও এ্যানামেল গ্লেজ। এই যে পরিবর্তনের ধারা, এই ধারার সঙ্গে যে সকল পরম্পরার শিল্পীরা তাল মেলাতে পারছেন না, দুঃখজনক

Dhaka University Institutional Repository

হলেও সত্যি সেখানেই মৃৎশিল্প চাপের মুখে পড়েছে। আবার যেসব শিল্পীরা কৌশলী হয়েছেন, পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সেখানে তৈরিও হয়েছে অপার সম্ভাবনা। বিপণন প্রক্রিয়াতেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া আগে মৃৎশিল্পসামগ্রী বিক্রি হতো শুধু বিভিন্ন পার্বণ বা মেলায়। কিন্তু এখন মৃৎসামগ্রী বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। যেমন ঢাকার অদূরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাছে গড়ে তোলা হয়েছে মৃৎশিল্পের পর্যটন বাজার। এছাড়াও ঢাকায় শিশু একাডেমির প্রাঙ্গণে, হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ও ধানমন্ডির বিভিন্ন স্থানে এবং বিভাগীয় শহরে মৃৎশিল্পের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেই সাথে আড়ং, কারিকা, কারুপণ্য, কুমুদিনী, প্রর্বতনা, যাত্রা, অরণ্য, এসমাটস ভবন, বিসিকসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের শো-রুমে মৃৎশিল্প পণ্যের দেখা মেলে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন শো-রুমে সরবরাহ করছে। এসব প্রতিষ্ঠিত শো-রুমগুলোর সঙ্গে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী জড়িত থাকায় তাদের পরিকল্পনা ও ডিজাইন অনুযায়ী মৃৎসামগ্রী তৈরি হচ্ছে। আমাদের মৃৎশিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে এবং এই সমিতির মাধ্যমের দেশিয় বাজারের পাশাপাশি বিদেশেও বাজারজাত করা হচ্ছে। যা বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা সূচিত করেছে।

মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় একই সাথে দেখা মেলে বিলুপ্তির পথে মৃৎশিল্পের যাত্রা, আবার কখনও সম্ভাবনার শুভ সূচনা। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের পরম্পরার শিল্পীদের মত অনুযায়ী মৃৎশিল্প বিকাশের পথে বাধাসমূহ এবং সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে দেয়া হলো :

ময়মনসিংহের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে হতাশা বিরাজমান। কারণ হিসেবে বলেন কাঁচ, প্লাস্টিক মেলামাইন, দস্তা, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্র সহজলভ্য, ব্যবহার আরামদায়ক, হালকা এবং টেকসই হওয়াতে খুব দ্রুত বাজার দখল করে নিয়েছে। আর একটি অসুবিধার কথা জানান, আগে পালরা মৃৎশিল্প তৈরির কাঁচামাল যেমন মাটি ও বালুসহ খড়কুটো বিনামূল্যে সংগ্রহ করতো। বর্তমানে এগুলো কিনতে হয় ফলে খরচ বেড়ে গেছে কিন্তু সেই অনুযায়ী দাম পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এই শিল্পীরা হতাশ হয়ে পৈত্রিক পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ময়মনসিংহের সদর উপজেলার বলাশপুর এলাকায় কয়েকটি পাল পরিবার যুগ যুগ ধরে এই শিল্পকর্মের সাথে জড়িত। এরকম আরও আছে ময়মনসিংহের চরাঞ্চলে, ত্রিশাল উপজেলার বইলর, কামারপাড়া, রাণীগঞ্জ, বালিপাড়া এলাকার শতাধিক পাল পরিবার। এদের কেউ কেউ আবার বলেন আগে যা তৈরি করতেন এখন তা না করে এই সময়কার চাহিদা অনুযায়ী সামগ্রী তৈরি করে ভালো আছেন। সুমা রানী পাল (৩৬), সুনিল পাল (৪৩) বলেন আগের মতো হাঁড়ি, কলস না চললেও নাসার্রির টব, ঘর বাড়ি এবং প্রতিষ্ঠানের শোভা বর্ধনকারী মাটির তৈরি টব ও মিষ্টির দোকানের দইয়ের পাত্র তৈরি করে ভালো আছেন। এমন আরও অনেকে আছেন যারা পেশা পরিবর্তন না করে তৈরি সামগ্রীতে পরিবর্তন এনেছেন।

সিলেটের বড়লেখার হাঁড়িপাতিলের কদর ছিল পুরো সিলেটজুড়ে কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন শুধুমাত্র কয়েকটি পরিবার বড়লেখা উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়নের কুমারপাড়া (খদানগর) গ্রামে বসবাস করছেন। কিছুদিন আগেও ৩০টি পরিবার এই শিল্পকর্মের সাথে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে পাঁচটি পরিবার বংশ পরম্পরার এই পেশাকে আঁকড়ে আছে। প্রবীণ এক শিল্পী শতীনন্দন পাল বলেন তাদের অতীত আর

বর্তমানের অবস্থা সম্পর্কে। দিনে দিনে এই শিল্প সংকুচিত হয়ে পড়ছে। সমস্যা একই মূল কাঁচামাল মাটি, লাকড়ি দাম বেড়ে গেছে সে অনুপাতে তৈরি সামগ্রীর দাম তো বাড়েইনি বরং চাহিদা কমে গেছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য মৃৎসামগ্রী হলো হাঁড়ি, কলস শানসি, বাটি, গ্লাস, বদনা, চাড়ি, মটকি বা মটাক, পিঠার ছাঁচ, সরা, ঢাকনা, ঘড়া, ঘাগড়া, ঝাঁজর, প্রদীপ, পাঁজাল বা ধুপতি, ফুলের টব, পুতুল, প্রতিমা, মূর্তি প্রভৃতি রুদ্র পাল বলেন আগে ১০ ১৫ দিন পরপর পাইকাররা তাদের বায়না করা মৃৎসামগ্রী এসে নিয়ে যেতেন। আর এখন নিজেদেরই উদ্যোগ নিতে হয় বিক্রির জন্য। এখানকার শিল্পীরা মনে করেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও বাজারজাতকরণে সাহায্য পেলেই তাদের অতীত বর্তমানে ধরা দেবে।

সাভার, ধামরাই, নয়ারহাট, কাকরান মৃৎশিল্পের জন্য–উল্লেখযোগ্য। এখানকার শিল্পকর্মে যুক্ত। আগে হাঁড়ি, পাতিল, খেলনাসহ অন্যান্য সামগ্রী তৈনি করলেও বর্তমানে মাটির টব, টালি ও ফরমাশ অনুযায়ী বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে থাকেন। এরা পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যময় পেশা ধরে রেখেছেন । এখানে এই পেশা বেশ অর্থকরি হয়ে উঠেছে এবং এদের তৈরি সামগ্রী উন্নত মানের হওয়াতে বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে। তবে নির্মাণ কৌশলে তাঁরা হারিয়ে ফেলছে তাঁদের ঐতিহ্যকে। তার মাটির চাকের পরিবর্তে পায়ে চালিত হুইল মেশিন ও ছাঁচের ব্যবহার করছে। এখানকার হাজীপুর, কাগজিপাড়া, নয়ারহাট, কাকরানের মৃৎশিল্পীরা আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করার জন্য বেশ উৎসাহী। ঐতিহ্যবাহী পুনের পরিবর্তে তাঁরা গ্যাসের চুল্লী নির্মাণ করতে আগ্রহী। সব কিছুই মিলিয়ে এখানকার মৃৎশিল্পীরা অপার সম্ভাবনার কথাই জানালেন।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় পাল পাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে। এক সময় সব কুমাররাই হাঁড়ি, পাতিল, সরা, পিঠার ছাঁচ, ঘটি, শানকিও প্রদীপদানি, বদনা তৈরি করলেও এখন যুগের চাহিদা অনুযায়ী তারা মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। যেমন গৃহসজ্জা সামগ্রী, ফুলের টব, টালি, দইয়ের হাঁড়ি, দইয়ের বাটি, বাগানে শোভা বর্ধনকারী ছোট মটকা ইত্যাদি। আবার কোন কোন এলাকা তাদের অতীত সুনাম ধরে রেখে আগের জিনিসই তৈরি করছে যেমন বাগেরহাটের তালেঘর, লাউপালার হাঁড়ি। কলসি, সরা ইত্যাদি মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

রংপুরের কেরানিপাড়া, মোমিনপুর, পালপাড়া, বারাতি পালপাড়া, শান্তিপুর পালপাড়া ছাড়াও পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ, পীরগাছা, কাউনিয়া উপজেলার কিছু গ্রামেও পালদের দেখা মেলে। এখানকার পালদের কাজের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেমন কৃষকের বীজ সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকারের কোলা বা হাড়া, শীতের সময় গাছীদের রসের ভাঁড়ের জন্য ভাঁড় বা হাঁড়ি, গুড় রাখার জন্য মটকি, জালা, বর্ষা মৌসুমে গাছ লাগানোর টব, পূজা পার্বণে দেব-দেবীর মূর্তি, পূজার উপকরণ ঘট, সরা, ছোট কলস আবার মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকার, মাটির খেলনা, ব্যাংক চিত্রিত হাঁড়ি ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন। এখানকার মৃৎশিল্পী ভূপতি চন্দ্র পাল, নালিনীকান্ত পাল, অর্চনা রানী পাল নিজ পেশায় সন্তুষ্ট।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ সদরসহ আরও কিছু এলাকায় পালদের বসতি রয়েছে। এখানকার মৃৎশিল্পীরা হাঁড়ি, পাতিল, কলসসহ, ফুলের টব, কুয়ার চাক, হুলোই বা মালসা, বিভিন্ন ধরনের তাওয়া যেমন পাঁচ তাওয়া, তিন তাওয়া, সরা, ঢাকুন, ধূপ দেওয়ার ধূপোচি, মুড়ি ভাজা ঝাঁঝড়, লালিগুড় রাখার পাত্র, বিভিন্ন আকৃতির মাটির ব্যাংক ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন। এছাড়া এরা মৌসুমভিত্তিক

দেবদেবীর প্রতিমাও গড়ে থাকেন। মৃৎশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে লাভ বেশি প্রতিমা তৈরিতে। সিরাজগঞ্জের মৃৎশিল্পীরা মৃৎপাত্র তৈরির পর হালকা শুকিয়ে সুচালো বাঁশের চটা দিয়ে নানা নকশা এঁকে থাকেন। এখানকার শিল্পীরা পরিশ্রম অনুযায়ী সঠিক দাম পান না বলে জানান। মধ্যস্থকারী ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব মৃৎশিল্পের একটি বড় সমস্যা এতে করে তারা লাভের মুখ দেখতে পায় না। এখানকার শিল্পীরা মনে করেন বাজারজাতকরণে সরকারি হস্তক্ষেপ, সহজ শর্তে ঋণ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে তারা আবার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের কুমাররা গুড় সংরক্ষণের জন্য গুড়ের বা মিডার বড়ো কলসি তৈরি করতেন। সে সময় হাঁড়ি, কলস ইত্যাদির প্রচলন থাকলেও বর্তমানে পিঠার খোলই বেশি তৈরি হয়। দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের খোলের মান উৎকৃষ্ট। তাই নিজের এলাকা ছাড়িয়েও দেশের অন্যান্য স্থানেও এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। মৃৎশিল্পীরা বলেন এখানকার মইনা মাটিতে এমন উপাদান রয়েছে যা দিয়ে উন্নতমানের পিঠার খোল তৈরি হয়। মেয়েরাই বেশি একাজের সাথে যুক্ত। বর্তমানে গ্রামে এমনকি শহরেও পিঠার খোলার বেশ চাহিদা রয়েছে। শীতকালে গ্রামের লোকজন পিঠা খায়। তাঁরা আরও জানান, মুসলমানদের কোরবানি ঈদে খোলার চাহিদা বেশি থাকে। তখন চিতল পিঠা, খোলাজা পিঠা, আটার রুটি, চালের রুটি বানানো বা সেকার জন্য মাটির খোলা বা তাবা ব্যবহৃত হয়। পিঠার খোলার চাহিদা বেশি থাকায় দক্ষিণ আঁধার মানিক গ্রামের সাথে উত্তর আঁধার মানিক গ্রামেও এই পিঠার খোলা তৈরি হয়। এখানে তৈরি পিঠার খোলা বৃহত্তর নোয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়। এখানকার শিল্পীরা কেউ কেউ মনে করেন অন্য কাজ শেখেননি এই কাজেই তাদের পরদর্শীতা তাই চাইলেও পেশা পরিবর্তন করতে পারছেন না। আবার সীমা রানী পাল, আনিতা রানী পালের মতো অনেকেই তার পেশা নিয়ে সন্তুষ্ট এতেই তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা আছে বলে জানান।

ঠাকুরগাঁও জেলার মৃৎশিল্পীদের জীবন যাপন অতি সাধারণ। এই জেলার অধিকাংশ কুমারদের বাড়ি মাটির তৈরি। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও হাঁড়ি, পাতিল, পূজার ও বিয়ের ঘট, প্রদীপ সানজাল (ধূপদানি), ফুলের টব ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে পাশাপাশি এরা কারেন্ট জালের শিকলও তৈরি করেন। ঠাকুরগাঁয়ের মৃৎশিল্পীরা আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে তবুও বংশপরম্পরার এই পেশাটিকেই তারা ভালোবাসে। প্লাস্টিক, এ্যালুমিনিয়ামকে তাদের দুভার্গ্যের জন্য দুষলেও সমাধান সম্পর্কে এরা অজ্ঞ। তবে অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও কাঁচামালের দাম এবং সঠিক দামে বাজারজাত করতে না পারাটাই মূল সমস্যা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের মৃৎশিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। এখানকার বংশ পরম্পরার মৃৎশিল্পীদের মধ্যে পেশা নিয়ে তেমন কোন অসন্তোষ দেখা যায়নি। এখানকার মৃৎশিল্পরাও সব ধরনের মাটির জিনিস তৈরি করেন তবে বেশি চলে তাওয়া বা খোলা, ঢাকনা, প্রেশার কুকারের তাওয়া, দৈ এর কাতারি বা ডাবগা ইত্যাদি। মাটির খোলার চাহিদা বেশি হবার কারণ চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনপ্রিয় লোকখাদ্য কালাইয়ের রুটি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয় এই খোলা। এই লোকখাদ্য কালাই-এর রুটি তৈরির জন্য আধুনিক কোন পাত্র ব্যবহার করা যায় না। একমাত্র খোলা ব্যবহার করেই এই লোকখাদ্য উপাদেয় হয়ে ওঠে। শিল্পী গৌরপালের নিজের দোকানঘর

Dhaka University Institutional Repository

আছে সেখানে প্রতিদিন ৩০০-৪০০ টাকার বিক্রি হয় বলে জানালেন। বিক্রির তালিকায় এক নম্বরে মাটির খোল এবং পরেই টব বেশি বিক্রি হয়ে থাকে। তবে এখানকার মৃৎশিল্পীরাও ঘর-গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য সকল মৃৎসামগ্রীই তৈরি করে থাকেন। আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে তারাও মাটির পাত্রে রান্না বান্না করেন। তারা মনে করেন মাটির পাত্রে রান্না খাবার ভালো হজম হয় তাই অসুখ বিসুখ ও কম হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কুম্ভকারদের নিপুণ হাতের তৈরি মৃৎশিল্পসামগ্রী জেলাবাসীর কাছে খুবই প্রিয়। আর তাই পুরুষানুক্রমে পাওয়া এই পেশাকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবতেই পারেনা। এই পেশাকে তারা সম্মানের সাথে ধরে রেখেছেন।

নরসিংদী জেলার শিবপুর, কামরাব, জসরবাজার, চন্দনাপুর, সাটুরিয়া, চন্দনপুরসহ আরও বেশ কিছু জায়গায় কুম্ভকারদের বসত রয়েছে। তবে এখানকার পালপাড়াগুলোতে চাকের ব্যবহার দেখা যায় না। বললেই চলে এরা মূলত ছাঁচ ব্যবহার করেই মৃৎসামগ্রী তৈরি করে। নরসিংদী জেলার পরম্পরার শিল্পীরা হাঁড়ি, পাতিল, কলস, ঘটি, দইয়ের হাঁড়ি, খেলনা ইত্যাদি সবকিছুই তৈরি করে ছাঁচে। এখানকার মৃৎশিল্পের লোকায়ত নকসার মধ্যে দৈনিন্দিন ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য যেমন ধানের ছড়া, ফুল, লতা-পাতা এ ধরনের গ্রাম বাংলার নিজস্ব নকশার ব্যবহার দেখা যায়। ফুল, লতা ও পাতা সুখ সমৃদ্ধি, ধানের ছড়া ঐশ্বর্য ও জীবন বিকাশের প্রতীক। রংয়ের মধ্যে আকাশি, লাল, হলুদ, সাদা রংয়ের ব্যবহার দেখা যায়। নরসিংদী জেলার অবস্থা তেমন ভালো না হলেও এখানকার প্রতিমা শিল্পীরা ভালো আছেন। প্রতিমা শিল্পীদের অধিকাংশই বংশপরম্পরায় প্রতিমা নির্মাণ করেন যেমন যোগেশ্বর পালের ছেলে রূপন পাল, কৃষ্ণ লাল পালের ছেলে রতন চন্দ্র পাল, বিপ্লব চন্দ্র পাল, নারায়ণ চন্দ্র পাল, নিখিল পালের ছেলে সুবল পাল, রাজকুমার পালের ছেলে সুকুমার পাল এদের অধিকাংশেরই বাবার কাছে হাতেখড়ি। প্রতিমা শিল্পীরা তাদের উপার্জন নিয়ে সন্তুষ্ট। নারায়ণ চন্দ্র পাল বলেন “এই কাজে সম্মান ও অর্থ দুটোই মেলে।” নরসিংদী জেলার নরসিংদী, বেলাব, মনোহরদী, শিবপুর, প্রতিমা শিল্প এলাকা হিসেবে প্রসিদ্ধ। তবে এই জেলার মৃৎশিল্পীদের মধ্যে লক্ষ্মী প্রতিমা মেয়েরাই তৈরি করে। এখানকার শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভাল না হলেও প্রতিমা শিল্পীরা স্বচ্ছল এবং নিজ পেশায় সন্তুষ্ট।

লক্ষ্মীপুরের প্রায় প্রতি উপজেলায় পাল পাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে। এটি যেহেতু একটি পারিবারিক পেশা তাই শুরু থেকে শেষ অবধি মেয়েদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মৃৎসামগ্রীর চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে না। বরং দেশের অন্যান্য স্থান থেকে প্রয়োজনীয় মৃৎসামগ্রী আনা হয়। কারণ পেশা পরিবর্তন। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন। ফলে মৃৎশিল্পীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শান্তিপাল, রামকৃষ্ণ পাল, মিনা পালসহ আরও অনেকে মৃৎসামগ্রী তৈরিতেক পূর্বপুরুষদের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এখানকার শিল্পীরা চাহিদা কমে যাওয়া ও পেশা পরিবর্তনের ব্যাপারে দায়ী করেন শিল্প তৈরির কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়া, বিদেশি শিল্পজাত দ্রব্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতা, শ্রম অনুযায়ী দাম না পাওয়া সেই সাথে যথাযথ সম্মান না পাওয়া ও পূর্বপুরুষের পেশায় অনীহার কারণ। লক্ষ্মীপুরে এখনও যে সব শিল্পীরা কাজ করে যাচ্ছেন সুনামের সাথে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং বাজারজাতকরণে সাহায্য করানো তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, বন রাজার পাড়ার মৃৎপল্লীকে কুলাল পাড়া বলে। এখানকার শিল্পীরা সবাই মুসলমান। মুসলিমদের সাধারণত এই পেশায় দেখা যায় না। মুসলিম পালপাড়াগুলো 'কুলাল পাড়া' নামেই পরিচিত। বর্তমানে ৫০-৬০টি পরিবার সরাসরি এই কাজের সাথে জড়িত। কুলালপাড়ার শিল্পী মো. জারিফ আলী, সেলিম, ইস্কান্দার, নুরুল হক, কাঞ্চন, নুরুল ইসলামদের সাথে কথা বলে জানা গেল তাদের কাজের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সাপ্লাই দিতে পারছে না। কারণ হিসেবে বলেন কাঁচামালের দামের কথা। এছাড়া এনজিওগুলোর কাছে থেকে লোন নিয়ে লোন শোধ করতে না পারায় লোনে জর্জরিত হয়ে আছে। হাতে টাকা না থাকায় কাঁচামাল কেনা এবং কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সহজ শর্তে সরকারি ঋণ পেলে ভীষণ উপকার হতো বলে জানান। কেননা লোন দিয়ে উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করছে এনজিওগুলো।

বাজারজাতকরণ আরেকটি বড় সমস্যা মৃৎশিল্পীদের জন্য। এখানকার শিল্পীরা নিজ উদ্যোগে তৈরিকৃত মৃৎসামগ্রী কাপ্তাই, বিলাইছড়ি,বরকল, মায়ানীবাজার, মারিশ্যা, লংগদু, শুভলং গেরোয়া রানীরহাট ও রাঙামাটিতে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যায়। এখান থেকেই ব্যাপারীরা বা পাইকারী ব্যবসায়ীরা এসে মৃৎশিল্প পণ্য কিনে নিয়ে যায়। পাইকাররা মৃৎশিল্পীদের কখনই ন্যায্যমূল্য দেয়না ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও কোন উন্নয়ন হয় না। চট্টগ্রামের কুলাল পাড়ায় আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হলেই পেশা পরিবর্তন করছে এবং অস্বচ্ছল পরিবারগুলোই শুধুমাত্র পেশাটি ধরে রেখেছে। সার্বিক অবস্থা দেখে বলা যায় স্বল্প মূল্য ঋণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা পেলেই এই শিল্পীরা ঘুরে দাঁড়াবে। দারুণ ফিনিশিং তাদের কাজে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলেই এখানকার মৃৎশিল্প যে কতটা সম্ভাবনাময় তা তার প্রমাণ মিলবে।

সাতক্ষীরা মৃৎশিল্পীরা একসময় হাঁড়ি, পাতিল, গামলা, থালা, ঝাঁজর, মটকি, কড়াই, কুয়ার পাট, শিশুদের খেলনা সহ আরও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করলেও বর্তমানে প্লাস্টিক, সিরামিক, মেলামাইন এর দৌরাত্মে মৃৎশিল্পের কারিগররা কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। কেননা এই পেশায় পরিশ্রম বেশি আয় কম। মাটির জিনিসের চাহিদা কমে গেছে তাই আর্থিক সংকটে পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। মৃৎশিল্পী ভৈরব চন্দ্র পাল বলেন সরকারি সাহায্য পেলে বংশপরম্পরার এই শিল্পে টিকে থাকাটা সহজ হতো। মজার বিষয় হচ্ছে এই সাতক্ষীরার কলারোয়ার মৃৎশিল্পীরা তাদের গতানুগতিক শিল্পসামগ্রী তৈরি না করে মাটি দিয়ে নান্দনিক টালি তৈরি করে শুধু নিজেদের ভাগ্যের চাকাই নয় ঘুরিয়েছে দেশের অর্থনৈতিক চাকাও। এই টালি শিল্পকে কেন্দ্র করে কলারোয়া উপজেলায় গড়ে উঠেছে শিল্প পল্লী। শুধু কলারোয়ার মুরারী কাঠির পালপাড়া নয়, সাতক্ষীরা ও কলারোয়ার আশেপাশের পালপাড়ায় গড়ে উঠেছে প্রায় দেড়শ' কারখানা।

কাকরানের মৃৎশিল্পীরা একসময় দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র তৈরি করলেও এখন ফরমায়েশ অনুযায়ী বেশির ভাগ মৃৎসামগ্রী তৈরি করেন। কাকরানের শিল্পী কমল পাল মৃৎশিল্পের কাজ শেখেন দাদা ক্ষেত্রপাল ও বাবা দীনবন্ধুপালের কাছে। শিল্পী বিভিন্ন ধরনের মৃৎসামগ্রী তৈরি করলেও বর্তমানে সবচেয়ে বেশি করছেন দইয়ের হাঁড়ি। তার কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দইয়ের হাঁড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাঁচে তৈরি হলেও তিনি চাকে দইয়ের হাঁড়ি তৈরি করেন। সীমিত লাভ থাকে। পিস প্রতি কখনও পঞ্চাশ পয়সা কখনও এক টাকা লাভ

Dhaka University Institutional Repository

পান। শিল্পী তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় অবস্থা নিয়েই অসন্তুষ্ট তবুও মৃৎশিল্পের সম্ভাবনার ব্যাপারে আশাবাদী। শিল্পী কমল পাল মনে করেন প্রশিক্ষণ এবং সরকার থেকে মৃৎসামগ্রীর দাম নির্ধারণ করে দিলে মাটি তাদের স্বচ্ছলতা দেখাবেই।

পটুয়াখালীর বাউফলের মৃৎশিল্প বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শুধু ঘুরে দাঁড়িয়েছে বললে ভুল হবে এখানকার নান্দনিক শিল্পসামগ্রী বিশ্ব বাজারে স্থান নিয়েছে। এখানকার মৃৎশিল্পীদের মাটির তৈরি দৃষ্টিনন্দন শিল্পসামগ্রী ইটালি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, ইউএসএ, স্পেন, জাপান, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ডে রপ্তানি হচ্ছে। একসময় এই মৃৎসামগ্রী বিক্রি হতো ধান-চালের বিনিময়ে তারপর নামমাত্র দামে আর এখন ডলারে। কখনও ইউরো ডলার কিংবা আমেরিকান ডলার, কখনও বা ব্রিটিশ পাউন্ডে বিক্রি হয় তাঁদের পণ্য। একসময় শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র বাসনকোসন তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল পালপাড়াগুলো। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এখানকার শিল্পীরা আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছে সাদরে। প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন গ্রহণ করেছে তেমনি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের আদি পেশাকে মেধা আর কৌশল দিয়ে পাল্টে ফেলেছেন তাঁরা। আগে হাঁড়ি-পাতিল, জালের কাঠি, পুতুল, কলস, বাচ্চাদের খেলনা, রসের হাঁড়িসহ গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত নানা ধরনের মৃৎসামগ্রী তৈরি করত। বর্তমানে এই শিল্পীরাই ফরমায়েশ অনুযায়ী কখনও ক্যাটালগ দেখে চায়ের কাপ, পিরিচ, গ্লাস, প্লেট, মগ, জগ, তরকারির বাটি, মিষ্টির বাটি, ফলের প্লেট, মোমদানি, কয়েলদানি, এ্যাশট্রে, ডিনারসেট, শোপিস ইত্যাদি দৃষ্টিনন্দন নানা পণ্য তৈরি করে দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্ববাজার দখল করেছে।

বিশ্বেশ্বর পাল, বরুণ পাল, গোবিন্দ চন্দ্র পাল, লক্ষ্মীরাণী পাল, তপন পাল, বিমল পালের মত অন্যরাও নিজেদের মেধা, বিচক্ষণতা আর কৌশলকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এমন একটা সময় যাচ্ছিল যখন এই এলাকার পালরা পৈতৃক পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় চলে যায়। আবার অনেকে ভারতে চলে যায়। তাদের এই দুর্দিনে এগিয়ে আসে চারুকলা ইনস্টিটিউটের কিছু উদ্যোগী ছাত্র এবং বিসিক। বিদেশি ক্যাটালগ দেখে সময়োপযোগী নতুন ডাইস, মৃৎশিল্পের আকার, রং, বার্নিশে এখানকার মৃৎশিল্প সামগ্রী নান্দনিক বৈচিত্র্যের শৈল্পিক সম্ভার নিয়ে বাজারে আসে। এর পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্রমাগত এর চাহিদা বাড়তে থাকে। সাথে সাথে বিদেশে রপ্তানির বাজার সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনের সুসংবাদে এ পেশা থেকে ছেড়ে যাওয়া বহু পাল পরিবার তাদের পূর্বপুরুষের পেশায় ফিরে এসেছে। বাউফলের মৃৎশিল্পীদের সেই দুঃখ কষ্টের জীবন আর নাই। তাদের জীবন জীবিকার মোড় ঘুরে গেছে। এখানকার শিল্পীরা রং ও ডিজাইন নিজ হাতে করে থাকেন। অপূর্ব সেই ডিজাইন ও রং। সরকার এদিকে সুনজর দিলে বাউফলের মৃৎসামগ্রী দেশ বিদেশে আরও সুনাম কুড়াবে।

বাউফলের মৃৎশিল্পীদের আধুনিকীকরণের জন্য এগিয়ে এসেছে বেসরকারি সংস্থা স্পিড ট্রাস্ট। এই সংস্থা ইতিমধ্যে তিনশ পালকে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং বিনামূল্যে হুইল প্যাড ও বৈদ্যুতিক চুল্লিও দিয়েছে। বর্তমানে বাউফলের মদনপুরা, বিলবিলাস, কনকাদিয়া, ও বগা পালপাড়া থেকে তাদের উৎপাদিত মৃৎশিল্পপণ্য লঞ্চ ও বাসে করে ঢাকা আসে। আবার কারখানাতেও খুচরা ও পাইকারি ভাবে

শিল্পপণ্য বিক্রি করা হয়। দেশি বিদেশি পর্যটকরা ঐতিহ্যবাহী এই পালপাড়ায় ঘুরতে এসে শিল্পপণ্য কিনে নিয়ে যান কখনওবা মৃৎশিল্পপণ্য কিনতেই এখানে আসেন বলে জানালেন গোবিন্দ পাল।

একটি জাতির পরিচয় তার ঐতিহ্যে আর জাতিকে সুদৃঢ় রাখতে হলে ঐতিহ্যের চর্চা অপরিহার্য। মৃৎশিল্প আমাদের ঐতিহ্যময় শিল্প এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে বংশপরম্পরার জাত শিল্পীরা। নিরক্ষরতা, প্রযুক্তির ব্যবহারে অজ্ঞতা, আধুনিক নক্সার ব্যাপারে ধারণা না থাকায় এই জাত শিল্পীরা যুগের সাথে তাল মিলাতে পারছেনা, ফলে বংশপরম্পরার এই পেশাটি অনেকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। যারা আছে তারাও অনেক কষ্ট স্বীকার করে পৈতৃক পেশাটি ধরে আছে কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে এই পেশায় আনতে সাহস করছে না। আর আমরা মৃৎশিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে দুঃখ করছি। কিন্তু যতদিন এই জাত শিল্পীরা আছেন এই শিল্পের সম্ভাবনাও ততদিন থাকবে। শুধু প্রয়োজন বাজারজাতকরণে সরকারি সহায়তা, কোথাও কোথাও সহজশর্তে ঋণ প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, মৃৎশিল্প সামগ্রীর যুগপোযোগী সম্পর্কে ধারণা দেয়া, বৈদ্যুতিক চুল্লী স্থাপন এমন কিছু সাহায্য সহযোগিতা। এই সাহায্যগুলো এখনও পাচ্ছেন তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে। পরিকল্পিতভাবে সাহায্য করলে সব জেলার শিল্পীরাই এর সুবিধাটুকু পাবেন। শিল্প তো এই শিল্পীদের রক্তে মিশে আছে তাই সম্ভাবনাও আছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষিত শিল্পীদের মতামত

যে সকল শিল্পী একাডেমিক শিক্ষা ও শিল্পকর্ম পাশাপাশি করেন তাদেরকে প্রশিক্ষিত শিল্পী বলা হয়। বুদ্ধিদীপ্ত ও মননকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলীর পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে একজন শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেন 'মৃৎশিল্প' নির্মাণের মধ্যে দিয়ে। একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী আধুনিক প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ চর্চার মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্পের মান উন্নয়ন করে থাকেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে মৃৎশিল্পের আঙ্গিকগত প্রকাশভঙ্গি পাল্টে গেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক এই শিল্পকর্মে শিক্ষার্থী শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান একে অপরের পরিপূরক। যেহেতু এই শিল্পকর্ম ব্যয়বহুল এবং অনেক জায়গার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষার সমাপ্তিতে এই শিল্পীদের এককভাবে এই শিল্পকর্ম করা শুধু কষ্টকর তাই নয় বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থী থাকাকালীন সময়ে তারা একাডেমিক ল্যাব গ্যাসের চুল্লি ব্যবহারের সুবিধা পেলেও শিক্ষা সমাপর্ণের পরে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। একজন নবাগত শিল্পীর জন্য তখন বৃহৎ পরিসরের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়ে উঠে না ফলে শিল্পীর শিল্পকর্মে স্থবিরতা চলে আসে যা আমাদের কারোরই কাম্য না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ও শিল্পের প্রতি ভালোবাসা থাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

শিল্পী মীন মোস্তফা আলী, শিল্পী মরণ চাঁদ পাল, শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার এর মত গুণী শিল্পীরা এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিল্পী গড়ে তোলা শক্ত ভিত্তি করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে শিল্পী আলোক রায়, স্বপন কুমার সিকদার, দেবাশীষ পাল, রবিউল ইসলাম, ড. আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল, ড. আবদুল মতিন তালুকদার, ড. নূরুল আমীন, মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী, চিন্ময়ী সিকদার, মাসুদুর রহমান, সহ আরও অনেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রাতিষ্ঠানিক মৃৎশিল্পীদের প্রতিথযশা এই শিল্পীরা ঐতিহ্য বহনকারী পরম্পরার শিল্পীদের প্রতিই সহানুভূতিশীল। খ্যাতিনামা এই সব গুণী শিল্পীরাও মনে করেন বাংলাদেশের মৃৎশিল্প সম্ভাবনাময়। তাঁদের মতে বংশ পরাম্পরার মৃৎশিল্পীদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা, গতানুগতিক নকশার পরিবর্তন, সঠিক উপায়ে বাজারজাত করা। বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ বেশি কার্যকরী হবে। একই সাথে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে যুগ যুগ ধরে আঁকড়ে ধরে থাকা এই শিল্পীরা তাদের শিল্পসত্তার পূর্ণ ব্যবহার করে মৃৎশিল্পর সম্ভাবনাকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীদের জন্যও কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে প্রতিবছর যে সব শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হবে না। আমাদের প্রতিথযশা শিল্পীরা মনে করেন, যেহেতু মৃৎশিল্প একটি ব্যয়বহুল শিল্প এবং এই শিল্পকর্ম করতে বৃহৎ পরিসর প্রয়োজন হয়, সেহেতু কিছুটা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও মৃৎশিল্পর গবেষক শিল্পীরা এবং নবাগত ও সদ্য পাশকৃত শিল্পীরা একসাথে আলোচনার মাধ্যমে নবাগত শিল্পীদের কাজের জন্য সুবিধাজনক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সদ্য শিক্ষা সমাপ্তকারী একজন শিল্পীর পক্ষে স্টুডিও গড়ে তোলা বা ফায়ারিং এর জন্য ব্যক্তিগত বন্দোবস্ত প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। অথচ দীর্ঘসময় গুণী শিল্পী শিক্ষকদের সংস্পর্শে থাকা এইসব শিল্পীরাও মৃৎশিল্পের জন্য বিপুল সম্ভাবনার আঁধার। এই নতুন শিল্পীদের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে সরকারিভাবে মৃৎশিল্প গবেষণাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে করে নতুন শিল্পীরা নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের অত্যন্ত গুণী, মেধাবী সাধক শিল্পীদের পরবর্তী প্রজন্মও মৃৎশিল্পকে বিশ্ব শিল্প দরবারে অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন বলেই আসা করি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে মৃৎশিল্পে সফলতা পরিলক্ষিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নীতি নির্ধারকদের সজাগ দৃষ্টি ও আন্তরিকতা থাকলে এই শিল্প উত্তরোত্তর অনেক বেশি গতিশীল হয়ে উঠবে এবং সৃজনশীল শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যমগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে মৃৎশিল্প সময়োপযোগী ও উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকজ শিল্পের গৌরবময় অংশ এই মৃৎশিল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মৃৎশিল্পীরা, ঐতিহ্যবাহী কিন্তু অবহেলিত মৃৎশিল্পকে আরো উন্নত বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক পেইন্টিং ও ভাস্কর্য গুণে গুণান্বিত ও শিল্পমান সমৃদ্ধ করে। উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে নিয়ে আমাদের মৃৎশিল্পকে বিশ্বমানের করে সবার কাছে শিল্পসম্মতভাবে গ্রহণীয় করে তুলবে বলেই প্রত্যাশা। আর আমাদের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে মৃৎশিল্পের কাণ্ডারী শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, শিল্পী দেবাশীষ পাল, শিল্পী রবিউল ইসলাম, শিল্পী ড. আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল আরও বেশ কিছু শিল্পী প্রতিনিয়ত এই শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা করেছেন এবং গবেষণায় সফলতাও আসছে। তাইতো আমরা মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। এই গুণী শিল্পীরা মৃৎশিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ আলোচনা

মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য যে শিল্পের সূচনা হয়েছিল আদিকালে। মানুষের সৌন্দর্যবোধের তাড়নার সেই শিল্পে এসেছে যুগোপযোগী ধ্যান ধারণা। তাই অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের মত আধুনিক নান্দনিক ভাবধারায় বিকশিত হয়েছে আজকের মৃৎশিল্প। পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মৃৎশিল্প সব চেয়ে প্রাচীনতম শিল্প। শিল্পকলার ইতিহাসে মৃৎশিল্প মাধ্যমটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। মৃৎপাত্র, মৃৎভাস্কর্য, নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্র, খেলনা, পুতুল, স্টুডিও মৃৎশিল্প, স্থাপত্য মৃৎশিল্প, টেরাকোটা ইত্যাদির রয়েছে সুবিশাল ক্ষেত্র ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য।

ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প আদি থেকে আজ অবধি এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যেমন কিছু সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে তেমনি আবার শিল্পীরা তাদের মেধা ও নান্দনিকবোধকে পরিপক্ক করেছে। বর্তমানের প্রেক্ষিতে আধুনিক মানুষের জীবন বাস্তবতার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিদিনের প্রয়োজনে নান্দনিক মূল্যবোধের নানান পর্যায়ে মৃৎশিল্পীরা কাজ করে চলেছে নিরলসভবে। আজকে এই সময়ে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে মৃৎশিল্পের কিছু কিছু দিক যেমন উদ্বেগজনক ঠিক তেমনি বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের বহুকিছু নিয়ে আমরা ভীষণ আশাবাদী। আর এই আশার ভিতরেই রয়েছে অপরার সম্ভাবনা।

মৃৎশিল্পে সম্ভাবনার সবচেয়ে বড় দিকটি হচ্ছে আমাদের একদিকে আছে মৃৎশিল্পের বংশ পরাম্পরার জাত শিল্পী, আর একদিকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠা পরবর্তীতে প্রশিক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের স্বনামধন্য শিল্পীগণ।

প্রাচীনকালে মৃৎশিল্প মানেই যে কেউ বুঝতো মাটির জিনিসপত্র। কখনো কখনো তা ছিলো গরিবের পণ্য। পণ্যের তালিকায় ছিল মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, কলস, মিষ্টির হাঁড়ি, দইয়ের মালসা, বাসন, সরা, শিশুদের খেলনা, মাটির ব্যাংক। কিন্তু ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে পণ্য তালিকা। মানুষের চাহিদার কথা বিবেচনা করে মৃৎশিল্পে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। মৃৎশিল্পের সৌখিন ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। বাসা বাড়ির পাশাপাশি অফিসে শোভাবর্ধনে মৃৎশিল্প তার জায়গা করে নিয়েছে কখনো টেরাকোটার ফলকে, কখনও নান্দনিক ফুলের টব আর হাতি ঘোড়া বা মৃৎভাস্কর্যের মাধ্যমে। ফলে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করলে সেটা ভুল হবে।

দেশের চাহিদা মিটিয়ে ক্রমান্বয়ে এসব মাটির তৈরি সামগ্রী এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কিছু সংখ্যক ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পী সম্প্রদায় তাদের প্রথাগত মৃৎশিল্পের গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে এসে নতুন ধরনের বা আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করে ভিন্ন ধরনের মৃৎসামগ্রী তৈরি করেছেন। এতে সামগ্রিকভাবে প্রথাগত মৃৎশিল্পের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে যুগোপযোগী নকশার মৃৎসামগ্রী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

বাউফলের মৃৎশিল্পী বিশ্বেশ্বর পাল, গৌতম পাল, বিমল পাল, বরুণ পাল, লক্ষ্মীরানী পাল। তপন পাল, বিপুল পাল, মনির হোসেন, শাহ আলম মৃধা প্রমুখের হাতের তৈরি মৃশিল্পের পণ্য এখন বিদেশের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এক সময় মৃৎপণ্য বিক্রি হতো ধান চালের বিনিময়ে আর এখন বিক্রি হচ্ছে ডলারে। কখনো ইউরো ডলার আবার কখনো আমেরিকান ডলারে কখনও বা ব্রিটিশ পাউন্ডে বিক্রি হয় তাদের পণ্য এখানকার শিল্পীরা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের আদি পেশাকে মেধা আর কৌশল দিয়ে, গতানুগতিক নকশার পরিবর্তন ঘটিয়ে এই শিল্প নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। শিল্পীদের ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও বেড়েছে। বেকারত্ব ঘুচেছে আর সৃষ্টি হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থানকে। বাউফলেল মৃৎশিল্পসামগ্রী এশিয়া মহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে্ এছাড়াও কানাডা, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের মতো শিল্পোন্নত দেশের বাজারও দখল করেছে এখানকার শিল্প পণ্য।

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার টালি শুধু বিদেশিদের নজর কাড়েনি ঘুরিয়েছে দেশের অর্থনৈতিক চাকাও। টালি এখন সাতক্ষীরার এক নম্বর অর্থনৈতিক খাত। কোন মেশিন বা যন্ত্র ছাড়াই সম্পূর্ণ হাতের তৈরি টালি দখল করে নিয়েছে ইউরোপের বাজার। ২০০০ সালের পর থেকে মাটির তৈরি টালি বিদেশে রফতানি হতে থাকে। প্রথমে টালি ইটালির বাজার দখল করে। পরে তা বিস্তৃত হয়ে নেদারল্যান্ডস, দুবাই, স্পেন, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের বাজারে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। কংক্রিট বা টাইলসকে পিছনে রেখে সাতক্ষীরার পোড়ামাটির টালি বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে রয়েছে। সমৃদ্ধ করেছে দেশের অর্থনীতিকে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে তুলে ধরেছে বিশ্ব দরবারে।

কুমিল্লার সদর দক্ষিণের বিজয়পুর ইউনিয়নের জেলখানা বাড়ির তৈরি মাটির জিনিসপত্র দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন বিদেশের মাটিতে স্থান করে নিয়েছে। বিজয়পুরে উৎপাদিত পণ্যগুলো দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও বেশ সমাদৃত। বিশ্বের প্রায় ১৫টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে এখানকার মৃৎশিল্প পণ্য। আমেরিকা, লন্ডন, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা, জাপান, হল্যান্ড, ইতালিসহ বিশ্বের প্রায় ১৫টি দেশের রপ্তানি হচ্ছে। এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখা, বিস্তার ঘটানো ও মান উন্নয়নের জন্য এখানে মৃৎশিল্পের ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী, বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, অক্সফোর্ড ভার্সিটির একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের মিলিটারী চীফ, ইংল্যান্ডের অথমন্ত্রী, সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মর্জিনাসহ আরও অনেক বিদেশি ব্যক্তিবর্গ বিজয়পুরের মৃৎশিল্প কারখানা পরিদর্শন করেছেন এবং এখানকার মৃৎশিল্পসামগ্রী তাদেরকে মুগ্ধ করেছে।

সমগ্র বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের চিত্র এমন না হলেও যেহেতু এরা বংশপরাম্পর জাত শিল্পী তাই সবাই কম বেশি দক্ষ। এই সব শিল্পীরা সঠিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, যুগোপযোগী নকশা ও বাজারজাতকরণে সরকারি বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলেই মৃৎশিল্পের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে বলেই বিশ্বাস সংশ্লিষ্টদের।

আমাদের মৃৎশিল্পে অন্যতম আর একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছেন আমাদের প্রশিক্ষিত দেশবরেণ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনকারী মৃৎশিল্পীগণ। শিল্পী মরণচাঁদ পাল আবু সাঈদ তালুকদার, অলক রায়, স্বপন কুমার সিকদার, রবিউল ইসলাম, আজহারুল ইসলাম শেখ, দেবাশীষ পাল, আবদুল মতিন তালুকদার, নুরুল, মোহাম্মদ সাব্বির আল রাজী, চিন্ময়ী সিকদার প্রমুখ শিল্পীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেন মৃৎশিল্পের মান উন্নয়নের জন্য। কখনও মৃৎশিল্পে ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে টেরাকোটাকে নতুন ফর্মে উপস্থাপন করে। আবার কখনো সম্পূর্ণ মৌলিক ধারার মৃৎশিল্পকর্ম আবার কখনওবা মৃৎভাস্কর্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার মধ্যে দিয়ে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই গবেষণার সুফল শিক্ষার্থী শিল্পী থেকে শুরু করে বংশ পরম্পরার শিল্পীরাও পাচ্ছেন। প্রশিক্ষিত শিল্পীরা মৌলিক বিষয় নিয়েও প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। মাটি ও গ্লেজের অণু পরমাণু বিশ্লেষণসহ শিল্পকর্মের উন্নয়ন, রাকু গ্লেজ ও অন্যান্য গ্লেজ নিয়ে গবেষণা, মৃৎশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের তাপমাত্রা ও কাঁচামালে নতুন ফর্মূলা আবিষ্কারের মধ্যেই রয়েছে মৃৎশিল্পের অপার সম্ভাবনার হাতছানি। আমাদের প্রশিক্ষিত মৃৎশিল্পীরা যে শুধু শিল্পগবেষণা কর্ম দিয়েই আত্মমগ্ন তা নয় বরং ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতেও তারা সচেষ্ট।

শিল্পী মরণচাঁদ পাল এবং পরবর্তীতে তারই যোগ্য উত্তরসূরী শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার সরাসরি ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে ধরে রাখতে ও মান উন্নয়নের কাজে সক্রিয়। তাঁরা ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণ আটিয়ে মৃৎশিল্পকে যুগোপযোগী করে তুলেছেন। আর তাইতো শহুরে আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে মৃৎশিল্প সামগ্রীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার এবং তার যোগ্য উত্তরসূরী শিল্পী রবিউল ইসলাম শিল্পী দেবাশীষ পাল সহ অন্যান্যরা বিভিন্ন গবেষণাধর্মী মৃৎশিল্প শিল্পকর্মের মাধ্যমে বিশ্ব শিল্পদরবারে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। শিল্পী আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চলের মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ এই শিল্পের সম্ভাবনারকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিল্পী আজহারুল ইসলাম প্রথাগত মৃৎশিল্প ও প্রচীন মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যগত পরম্পরার সাথে শৈশবের সম্পর্ক, চারুকলা শিক্ষা থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা এবং একাডেমিক শিল্পভাবনার সমন্বিত মেলবন্ধন তৈরি করেছেন। শিল্পী লোকায়েত ও প্রাতিষ্ঠানিক মৃৎশিল্পীদের কাজ প্রত্যক্ষ করে তাদের শিল্পভাবনা অনুসন্ধান করেছেন এবং নিজের ও ঐতিহ্যগত শিল্পধারার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। শিল্পী আমাদের হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে নতুনভাবে, ভিন্ন মাত্রায়, সময়োপযোগী বিন্যাসে তুলে ধরেছেন। দেশ বিদেশে। একটি বৃহৎ পরিসরে শিল্পী তাঁর গবেষণাকর্ম করছেন এবং নবাগত শিল্পী ও পরম্পরার শিল্পীদের সেখানে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। ঢাকার অদূরে সাভারের হেমায়েতপুরে শিল্পী আজহারুল ইসলামের স্টুডিও ও কারখানা। এখানে কাজ করছে সদ্য পাশ করা চারুকলার মৃৎশিল্পীরা ফলে তাঁরা এই মিডিয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে ও দেশের মৃৎশিল্প বিকাশে সদা তৎপর। তাছাড়া এখানে ঐতিহ্যবাহী পাল সম্প্রদায়ের অনেক লোকশিল্পীরা সক্রিয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। এতে করে প্রাতিষ্ঠানিক মৃৎশিল্পচর্চার সাথে বাংলার লোক ঐতিহ্যিক মৃৎশিল্পের একটা সমন্বয় ঘটেছে। এবং শিল্পকর্মে নুতনত্ব এসেছে। এখানকার শিল্পকর্মগুলো তাই স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর রুচির চাহিদা পূরণের এক অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। আর এখানেই সম্ভাবনার সূত্রপাত।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক মৃৎশিল্পীদের প্রত্যেকের শিল্পকর্মেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্য ও গুণগত। মানের দিক থেকে তা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক শিল্পমানসম্পন্ন। ষাটের দশকে বাংলাদেশে নতুনভাবে মৃৎশিল্প চর্চার সূচনা হয। এক্ষেত্রে যার অবদান সবচেয়ে তিনি হলেন এ দেশের কৃতি শিল্পী অধ্যাপক মলি মোস্তফা আলী। তাঁর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এ দেশে নতুন প্রজন্মের মৃৎশিল্পী গড়ে উঠছে প্রতিবছর। এই সাধক শিল্পীর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো কম্পোজিশন ১, ২, ৩ টাইলস পেইন্টিং, আনগ্লেজ ডেকোরেশন। এছাড়াও মৃৎশিল্পের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সৃষ্টিশীল একাধিক স্টোন ওয়ারে র মৃৎপাত্র নির্মাণ করছেন এই কৃতি শিল্পী ষাটের দশকের আর একজন কৃতি শিল্পী হলেন স্ত্রী মরণচাঁদ পাল। পরম্পরার এই শিল্পী চারুকলায় শিল্প শিক্ষা সমাপ্ত করে পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পুতুলকে কিছুটা নিজস্ব সন ্দীয়তা দিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে দেশে এবং বিদেশে রপ্তানি পণ্য হিসাবে নির্মাণ করেন। এছাড়া একাধিক ব্যবহারিক স্টোন ওয়ারের মৃৎপাত্র নির্মাণ করছেন তিনি। এগুলোর মধ্যে ফুলদানী, টি-সেট, ছাইদানী, পুতুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরণচাঁদের বাড়ির সামনে মাটির ফলকে লেখা মৃৎরাজ। এটা তার স্টুডিও। নিজেকে তিনি মৃৎরাজ বলেন। অহংকারে নয়, মাটিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। কারণ মাটি এমন স্বর্ণ প্রসবা যে তাকে রাজা বানিয়ে দিয়েছে। রায়ের বাজারের এই বাড়ি থেকে হাতি ঘোড়ায় চড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সাগর পাড়ি দিয়ে যাচ্ছে অন্য মহাদেশে। আট হাজার হাতি যাচ্ছে কানাডায়। দুই হাজার মিনি ঘোড়া যাচ্ছে জাপানে। দুই হাজার কচ্ছপ এগোচ্ছে আমেরিকার দিকে। (মইনুদ্দিন, ২০০৪ : প্রথম আলো) জাত শিল্পী শ্রী মরণচাঁদ পাল দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের মৃৎশিল্পের সম্ভাবনার পথ।

স্বাধীনত্তোর অর্থাৎ সত্তর, আশ এবং নব্বই এর মৃৎশিল্পীরা নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদেরই একজন শিল্পী আবু সাঈদ তালুকদার। যিনি এই চারুকলা বিভাগ থেকে এবং পরে চীন থেকে আধুনিক মৃৎশিল্পের উপর শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফিরে এসে তিনি মৃৎশিল্প বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। চীন থেকে শিখে টেকনিক বা পদ্ধতিতে নিজে শিল্পকর্ম করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখিয়েছেন। গ্লেজ নিয়ে এই শিল্পীর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা রয়েছে। তিনি ক্রিস্টালাইন গ্লেজের অনেক মৃৎপাত্র তৈরি করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য মৃৎকর্মের মধ্যে ফুলদানী, ক্রিস্টালাইজ পটারি, টি-সেট ইত্যাদি রয়েছে। তার শিল্পকর্মগুলো এই প্রজন্মের (মইনুদ্দীন খালেদ, প্রথম আলো, ১৫ অক্টোবর ২০০৪)। শিল্পীদের বিস্মিত করে। অনুপ্রাণিত করে। আর এক গুণী শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্প গবেষক এই শিল্পীর অনেক নকশা পরম্পরার শিল্পীরা ব্যবহার করে ভীষণ উপকৃত হয়েছেন। সমাজ সচেতন শিল্পী রবিউল ইসলামের কাজে শৈশব যেমন ফিরে এসেছে তেমনি সমাজের অসংগতিও ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর শিল্পকর্মে। তাঁর কাজের এই ধারাটি মৃৎশিল্পকে শিল্পের এক অনন্য স্থানে নিয়ে গেছে। দেশ-বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই খ্যাতনামা শিল্পীর শিল্পকর্ম সংগৃহীত আছে। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন শিল্পী দেবাশীষ পালের মৃৎশিল্পকর্মে মুক্তিযুদ্ধ থেকে হালের রোহিঙ্গা ইস্যু সবই উঠে এসেছে। মৃৎশিল্পকে সাধারণ হাঁড়ি-পাতিল থেকে তুলে এনে এক অনবদ্য শিল্পরূপ দিতে সফল হয়েছেন শিল্পী দেবাশীষ পাল। শিল্পী আজহারুল ইসলাম মৃৎশিল্পের ব্যবহারিক ও নান্দনিক দিককে একসাথে উপস্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পীর করা এই শিল্পকর্মগুলোর মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্পের নতুন প্রাণ পেয়েছে। শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম এখনকার মৃৎশিল্প।

শিল্পগত বৈশিষ্ট্য মৃৎশিল্পে নানাভাবে ফুটে উঠে। সময়ের ধারাবাহিকতায় মৃৎশিল্পে পরাম্পরা শত শত বছর পেরিয়ে আজও তার ঐতিহ্য ধরে রয়েছে। ধর্মীয় কাহিনী ও সাধারণ ও শিল্পবোদ্ধাদের ফরমায়েশ বিষয়ের বাইরেও সমকালীন পোড়ামাটির শিল্পে স্থান করে নিয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় উৎসব, নাগরিক জীবনের নানান বিষয়। এ শিল্প মাধ্যমের উপকরণ ও উপস্থাপনের বিষয় নিয়ে গবেষণা হচেছ প্রতিনিয়ত। পোড়া মাটির ভাস্কর্য এবং পোড়ামাটির ফলক, তৈজসপত্র তৈরিতে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশ্রণ সকল পর্যায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।

আমাদের মৃৎশিল্পের দুটি শক্তিশালী ধারা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার একটি ধারণ করেছেন বংশপরম্পরার জাত শিল্পীরা অপরটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠা শিল্পমনস্ক মেধাবী প্রশিক্ষিত শিল্পীরা। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বর্তমানের মৃৎশিল্প যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত তা আমাদের সচেতনতা, কিছু সরকারি বেসরকারি সহায়তায় সমাধান করা সম্ভব। যে দেশের ভৌগোলিক অবস্থা মৃৎশিল্পের উপযোগী এবং যাদের আছে পরম্পরার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাত শিল্পী ও গৌরবজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য আবার একইসাথে অত্যন্ত মেধাবী প্রশিক্ষিত শিল্পী, যারা আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে মৃৎশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই দেশের মৃৎশিল্প সম্ভাবনাময়তার পথে হাঁটবে সেটাই স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মৃৎশিল্প মানবসভ্যতার অনবদ্য এক সৃষ্টি। ধারণা করা হয় মানুষের সৃষ্ট শিল্পকর্মগুলির মধ্যে মৃৎশিল্পই প্রথম এবং সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প। এই শিল্পকে 'খাঁটি সৃজনশীল শিল্প'ও বলা যায়। কেননা কোন কিছুর অনুকরণ নয় বরং প্রয়োজন এক শৈল্পিক মনের মেলবন্ধনেই তৈরি হয় এই শিল্প। হেনরি মর্গান (Henry Morgan) মৃৎশিল্পের আবিষ্কারকে বন্যদশা থেকে মানুষের উত্তরণের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মৃৎশিল্প এক বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আর এই শিল্পের শিল্পীরাও বংশপরম্পায় পরম ভালবাসায় শুরু থেকে আজ অবধি এই শিল্পকর্ম করে আসছেন।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রাচীন সভ্যতাগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। অতএব ধরে নেয়া যাক সভ্যতা গড়ায় নদীল ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতা ছিল নদীভিত্তিক। যেমন নীলনদের তীরে গড়ে উঠেছে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয় সভ্যতা, হোয়াংহো আর ইয়াং জেকিয়া নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতা, সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতা [(শাহনেওয়াজ, ২০০৭ : ৫৭) তথ্য নির্ণয় এ কে এম শাহনেওয়াজ, বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৭, পৃ: ৫৭] এই বসুন্ধরার গর্ভে লুকানো আছে প্রাচীন মানুষের বহু হাজার বছরের পুরানো সব মৃত্তিকা আধার। আশিরিয়, মিশরীয়, চৈনিক, মায়া, গ্রিক, সিন্ধু, আজটেক সভ্যতার মাটির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর একটা বড় অংশ পাওয়া গেছে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননক্ষেত্র থেকে। বাংলাদেশের প্রত্নক্ষেত্রগুলোতে যে পোড়ামাটির ফলক ও অন্যান্য তৈজসপত্র পাওয়া গেছে সে সমস্ত নিদর্শন অবশ্যই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।

মানবসভ্যতার বিকাশ ও সংস্কৃতির রূপনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। আবহমান কাল থেকে মানসসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান যে এদেশের সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদেশটা নদী দিয়ে ছক কাটা। হাজার নদীর অববাহিকা থেকে পাওয়া নরম মাটি নিয়ে এক সৃজনশীল শিল্পিত পেশা গড়ে উঠেছে। এই পেশাজীবীদেরকে আমরা কুমার, কুম্ভকার, পাল বা মৃৎশিল্পী হিসেবে চিনে থাকি। মাটি মানুষের শৈল্পিক প্রকাশের মৌলিক উপাদান। নরম মাটি সামান্য স্পর্শে নান্দনিক রূপ লাভ করে। আবার পোড়ালে এই মাটির অবিনশ্বর রূপ দেখতে পাই। আমাদের অতীতের সাথে বর্তমানের জীবনযাত্রার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে এই মাটির শিল্প কখনও পরিবর্তিত রূপে, আবার কখনও অপরিবর্তিত রূপে।

জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদনদী বাংলাদেশের সভ্যতার মূল উৎস। এ অঞ্চলে বড় বড় পাহাড় পর্বত অর্থাৎ পাথুরে পাহাড় না থাকায় পাথরের ভাস্কর্য বা মূর্তি তৈরির প্রচলন তেমন দেখা যায়নি। তারপরও অল্প সংখ্যক যে পাথরের মূর্তি রয়েছে তার কাঁচামাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পীরা তাদের শিল্পসভার সাক্ষর রেখেছে মাটির তৈরি শিল্পকর্মে। খালবিল, নদনদী কখনও চাষের জমি থেকে শিল্পকর্মের উপযুক্ত মাটি সংগ্রহ করে অতি সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি আর কৌশল অবলম্বন করে শিল্পীরা সৃজনশীল শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। মৃৎশিল্পে সবসময় দুটো বিষয়ের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় এর একটি হচ্ছে নান্দনিক দিক অপরটি ব্যবহারিক দিক। গার্হস্থ্য ব্যবহারিক সামগ্রী যেমন হাঁড়ি-পাতিল, প্লেট-

Dhaka University Institutional Repository

গ্লাস, বাটি, কলস, সরা, মটকা ইত্যাদি যেমন তৈরি করেন তেমনি ধর্মীয় প্রয়োজনে টেরাকোটা ফলকে ফুল-লতাপাতা, পশুপাখি, জীবজন্তু, সমসাময়িক মানুষের জীবনযাত্রা ফুটিয়ে তুলেছেন নান্দকি রূপে। ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত সরা, ঘট, তুলসী মঞ্চ, প্রতিমা তৈরি করেন শিল্পী মনের সুষমা দিয়ে।

মৃৎশিল্পে আমাদের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নখননে উঠে এসেছে প্রাচীন সময়ের নানা উপকরণ আর এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মৃৎশিল্পসামগ্রী পাওয়া গেছে। চন্দ্রকেতুগড়, বানগড়, তমলুক, কর্ণসুবর্ণ, পা ু রাজার ঢিবি পাহাড়পুর, গোবিন্দ ভিটা, ময়নামতি, মহাস্থানগড়, উয়ারি-বটেশ্বরসহ এদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রাচীন বাংলার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নিদর্শনসমূহ থেকেই আমরা আমাদের গৌরবজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে জানতে পারি। তাইতো এই শিল্পের শিল্পীদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। গ্রামীণ কুমারেরা চাক ব্যবহারে যে নৈপূণ্য দেখান, তা সতিই বংশ পরম্পরায় শেখা শিল্প করণকৌশলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। একটি পরিবারের ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মহিলা, পুরুষ প্রত্যেকেই কাজটির সাথে পরম মমতায় জড়িয়ে থাকেন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। তারা শিল্পের কাজটি করেন পরম মমতায়।

বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীরা শিল্পচর্চার ইতিহাসে এক উন্নততর মাত্রা যোগ করেছে। একদিকে পরম্পরার শিল্পীরা পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে অপরদিকে সমকালীন প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীরা মৃৎশিল্পকে ব্যবহারিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না করে নতুনতর ভাবনায় মৃৎশিল্প নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন। শিল্পীরা এক নিবিড় ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে আধুনিক কলাকৌশলের সহায়তায় সৃজনশীল মৃৎশিল্প নির্মাণ করছেন সাম্প্রতিক সময়ের মৃৎশিল্প সৃজনশীল বা আধুনিক ভাবধারার উপস্থাপনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। কালের পরিক্রমায় তা আধুনিক থেকে আধুনিকতর রূপ লাভ করছে।

'মৃৎশিল্প' শব্দটির অর্ন্তনিহিত অর্থই হচ্ছে মাটিকে শিল্পকলায় উত্তীর্ণ করার অভিনিবেশ। আর সেটাই যুগ যুগ ধরে করে আসছে আমাদের মৃৎশিল্পীরা। জীনবঘনিষ্ঠ এই শিল্প তৈরি করা হয় ধৈর্য্য ও গভীর মনোযোগের সাথে। কাঁচামাল অর্থাৎ মাটি সংগ্রহ করা, মাটিকে শিল্পসামগ্রী তৈরির উপযোগী করা, চাকে, ছাঁচে অথবা হাতে মৃৎশিল্পটি তৈরি করে সাবধানতার সাথে শুকাতে হয়। ধীরে সুস্থে, রেখে ঢেকে, অল্প অল্প খোলা রেখে শুকাতে হয় কেননা দীর্ঘসময় বাতাসে বা তাপে রেখে দিলে তা ফেটে যাবে। যথাযথভাবে শুকানোর পর তা পোড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় চুলায় আগুনে দিতে হয়। অত্যন্ত মনোযোগী থেকে আস্তে তাপমাত্রা বাড়িয়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে হয়। তাপমাত্রার বেশি কম হলে মৃৎসামগ্রীগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর পোড়ানো শেষ হলে চুলা ঠাণ্ডা হবার জন্য সময় দিতে হয়। এরপরই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি পাওয়া যাবে। এই সম্পূর্ণ কাজটি করার ব্যাপারে প্রথাগত শিল্পীদের কোন রকম পুঁথিগত বিদ্যা নেই। সম্পূর্ণ কাজটি করেন পরম্পরালব্ধ জ্ঞান, নিজস্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শিল্পী মনের মাধুর্য মিশিয়ে। একটা সময় পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চললেও যুগের পরিবর্তনের হাওয়ায় বিচলিত এই শিল্পীরা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে কুমাররা কোনঠাসা হয়ে পড়ছেন ফলে বিলুপ্তির সুর শোনা যায় কোথাও কোথাও। আশার কথা কুম্ভকার বা কুমাররা জাত শিল্পী আর তারা তাদের এই পৈত্রিক পোশাকে সম্মান করে

এবং ভালোবাসে। তাই তাদের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে সাহায্যের হাত বাড়ালে শিল্পীরা ঘুরে দাঁড়াতে পারত। কিছু প্রশিক্ষণ, বাজারজাত করলে সহায়তা, নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা এবং স্বল্পমূল্য পালদের সরবরাহ করা, সহজ শর্তে ঋণ দেয়া এমনি কিছু সাহায্য পেলেই মৃৎশিল্প তার অপার সম্ভাবনার পথটি আমাদের দেখিয়ে দিত।

বাংলাদেশের প্রশিক্ষিত শিল্পীদের কেউ কেউ জাত শিল্পী অর্থাৎ বংশ পরম্পরার শিল্পী। এদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পী মরণ চাঁদ পাল শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার, শিল্পী দেবাশীষ পাল এমন আরও কয়েকজন শিল্পী। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন পথিকৃৎ মৃৎশিল্পী আছেন যারা পাল পরিবার থেকে আসেননি সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত শিল্পী, দেখা যায় তারাও শৈশব থেকেই শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন। অর্থাৎ পরিবারেই তারা সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠেছেন। তাইতো শিল্পজগতে সাবলীলভাবে নিজেদের শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এদের মধ্যে শিল্পী অলোক রায, শিল্পী আবু সাঈদ কালুকদার, শিল্পী ড. আবদুল মতিন তালুকদার, শিল্পী ড. আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল শিল্পী রবিউল ইসলাম, শিল্পী নুরুল আমীন সহ আরও বেশ কয়েকজন শিল্পী আছেন। প্রশিক্ষিত শিল্পীরেদ প্রায় সবর কাজ অর্থাৎ শিল্পকর্মই আন্তর্জাতিক মানের। প্রশিক্ষিত এই শিল্পীরা যেমন গতানুগতিক ধারার বাহিরে কাজ করেছেন তেমন প্রতিনিয়ত গবেষণা করে মৃৎশিল্প মানকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন। শিল্পীরা ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্তনির্দশনের মৌলিক, নান্দনিক ও দার্শনিক গুণাবলির সাথে নিজস্ব শিল্পদর্শের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন কিছু তৈরি করে মৃৎশিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

নদী তীরবর্তী অঞ্চলে পড়ে ওঠা পাল পাহাড় পালরা বা কুমার সম্প্রদায়ের কুমার বা কুম্ভকারেরা ঐতিহ্যধারা মৃৎশিল্প তৈরি করেন। অর্থাৎ এদের শিল্প কর্ম তৈরিতে কারিগরি দক্ষতা ও কাঁচামাল ব্যবহারের ধরন সম্পূর্ণ বাংশপরাম্পরাগত। অপরদিকে সুন্দরের ক্ষতি সহজাতে আকর্ষণ থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক মৃৎশিল্পের উদ্ভব। প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত শিল্পীরা স্টুডিও মৃৎুশিল্পের চর্চায় পেয়েছেন সুনাম, পেয়েছেনে সফলতা। আধুনিক ‘স্থাপত্য মৃৎশিল্পের বিজ্ঞানসম্মত বিবর্তন এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন শিল্পীদের সৃজনশীল গুণাবলীরই বহিঃপ্রকাশ। শিল্পীর শিল্পবোধ, সৃজনশীল গুনাবলীল কারণে সহজলব্য আট দিয়েই আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে নির্মিত হচ্ছে স্থাপত্য মৃৎশিল্প।

মৃৎশিল্পে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এই শিল্প মাধ্যমটি সমসাময়িককালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মৃৎশিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে কারখানাগুলোর অবদানের পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রশিক্ষিত এই শিল্পীরা ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতায় যুক্ত করে তাদের করণকৌশল ঠিক করেছেন। বিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তির সমন্বয়ে শিল্পভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে টেরাকোটার ফলকে। আর এতে করে সহজলভ্য হয়ে উঠছে টেরাকোটার ফলক। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠা টেরাকোটা ফলক এখন শৌখিন সাধারণ মানুষের গৃহসজ্জার অনুষঙ্গ। সেইসাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধে। ওর নানা বিষয়াবলির সাথে আবহমান গ্রাম বাংলার রূপসম্বলিত বিষয়ভিত্তিক টেরাকোটার ফলকগুলি ঐতিহ্যের গৌরব বহন করে চলছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে টেরাকোটা ফলকের শৈল্পিক উপস্থাপনে ভিন্নতা লক্ষণীয়। ঐতিহ্যের

চেতনার সাথে শিল্পীদের শিল্পদর্শন আর গবেষণার দিকটি পরিস্ফুটিত হয়। টেরাকোটা শিল্পের সাথে স্থাপত্য শিল্পের নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যের পথচলা শুরু হয়েছে। পরম্পরার ধারাবাহিকতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর গবেষণার ফলে বর্তমানে টেরাকোটা ফলক উচ্চমার্গীয় শিল্পে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্যের গৌরবময় সুবিশাল ক্ষেত্রের মধ্যে মৃৎশিল্প অন্যতম। অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ এই শিল্পটি ক্রেতার চাহিদা পূরণ করেছে শৈল্পিক সুষমায়। বংশ পরম্পরার এই শিল্পটি যুগের পরিবর্তনের হাওয়ায় ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। এতে করে পাল বা কুমাররা সামাজিক গুরুত্ব হারাচ্ছে। ফলস্বরূপ পেশা পরিবর্তন অথবা দেশ ত্যাগের মতো দুঃখজনক ঘটনাও ঘটছে। এত কিছুর পরও সম্ভাবনা আছে এজন্যই বলা শিল্পী তার এই গুণ যেহেতু পরম্পরা থেকে অর্জন করেছে তাই তার কাজ স্বাভাবিকভাবেই উন্নতমানের। পৈত্রিক পেশা সেজন্য এই পেসার সাথে নাড়ীর টান রয়েছে। ঐতিহ্যময় শিল্পের শিল্পীরা নিতান্তই অপরাগ হয়ে দেশ অথবা পেশা পরিবর্তনের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ নিরক্ষর এই শিল্পীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষক, প্রযুক্তির ব্যবহার স্বল্প সুদে সরকারি ঋণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করতে পারলে তারা খুব সহজেই অতীতের গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে।

প্রশিক্ষিত শিল্পীরা তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান, আধুনিক নক্সা, বর্তমান সময়ে চাহিদা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পরম্পরার শিল্পীদের সাহায্য করতে পারেন, এতে তারা উপকৃত হবেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বাউফলের মৃৎশিল্পের কথা বলা যায়। কিন্তু এটা পর্যাপ্ত নয় বৃহৎ পরিসরে এই সহযোগিতা প্রয়োজন। শুধু সরকার বা প্রশিক্ষিত শিল্পীরা এগিয়ে আসলেই হবে না বেসরকারি সহযোগিতা, মৃৎপাত্র ব্যবহারের উপকারীতা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এই শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। আমাদের দেশের প্রশিক্ষিত শিল্পীদের কাজ আন্তর্জাতিক মানের। এই শিল্পীরা প্রতিনিয়ত মৃৎশিল্প নিয়ে গবেষণায় যথেষ্ট সফলতাও পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। এদের অনেকে ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার যোগসূত্র ঘটিয়ে মৃৎশিল্পকে অনন্য মাত্রায় উপস্থাপন করেছে যা শিল্পবোদ্ধাদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। প্রশিক্ষিত শিল্পীদের মধ্যেও সবার পক্ষে ব্যক্তিগত ‘স্টুডিও পটারি’ করা সম্ভব হয় না কেননা এক্ষেত্রে স্থান এবং বৈদ্যুতিক চুলায় পোড়ানোর বন্দোবস্ত করা প্রধান বাধাস্বরূপ। সরকারিভাবে ‘বিসিক’ কিছুটা সাহায্য করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তাই প্রশিক্ষিত শিল্পীদের বিশেষ করে শিক্ষার্থী শিল্পীদের জন্য এই সরকারি সহযোগিতা ভীষণ প্রয়োজন।

সরকারি, বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, সুপরিকল্পনা, প্রশিক্ষিত শিল্পীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান, পরম্পরার শিল্পীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সমন্বয় ঘটলেই এদেশের মৃৎশিল্প বিশ্ববাজারে নিজের জায়গা ঠিক করে নেবে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে আমাদের মৃৎশিল্প। শুধু প্রয়োজন আন্তরিক সহযোগিতা। আমাদের আছে বংশ পরম্পরার জাত শিল্পী, আমাদের আছে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষিত শিল্পী তাইতো বিলুপ্তির পথে হাঁটতে থাকা এই শিল্পের এখনও রয়েছে অপার সম্ভাবনা।

সহায়ক গ্রন্থ:

তোফায়েল আহমদ : ‘লোকশিল্পের ভুবনে’ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০০, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

সিতারা খোরশেদ : ‘মৃৎশিল্পে বাংলাদেশ’ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সংস্থা, মার্চ ১৯৮৪

শফিকুর রহমান চৌধুরী : ‘বাংলাদেশের মৃৎশিল্প’ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪০২।

সৈয়দ আলী আহসান : ‘শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য’ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রথম প্রকাশ আগস্ট–১৯৮৩

সালাহউদ্দিন আহমেদ : ‘শিক্ষণে চারু ও কারুকলা’ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ‘লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯

আব্দুস সাত্তার : ‘শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি’ প্রথম প্রকাশ–১৯৮৯।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বঙ্গলক্ষীর ঝাঁপি’ আনন্দ পাবলিকশার্স, কলকাতা–১৩৮৬।

খগেশকিরণ তালুকদার : ‘বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা’ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

নীহাররঞ্জন রায় : ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ (আদিপর্ব) দে’জ পাবলিশিং চতুর্থ সংস্করণ আষাঢ়–১৪১১।

শ্রী মোঃ অসিত কুমার হালদার : ‘ভারতের শিল্পকথা’ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রকাশ-১৯৩৯।

মোঃ মোশারফ হোসেন : ‘প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ’ বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জৈষ্ঠ ১৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

হাশেম খান : ‘চারুকলা পাঠ’ প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০১, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।

অজয় রায় : ‘আবহমান বাংলা’ সম্পাদক মোস্তফা নুরউল ইসলাম ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯৯।

দীনেশ চন্দ্র সেন : ‘বৃহৎ বঙ্গ’ (সুপ্রাচীনকাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত) প্রথম খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পুনমুর্দ্রণ জানুয়ারী ১৯৯৩।

দীপঙ্কর ঘোষ : ‘পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প’ লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা ডিসেম্বর ২০০২।

নীহার ঘোষ : ‘বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য, প্রথম প্রকাশ মে ২০০০ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র।

চিন্তামনি কর : ‘ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্য’ (খৃঃ পৃঃ ৩০০-৫০০ খৃষ্টাব্দ) অনুবাদক মুনতাসীর মামুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৪।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : ‘বাংলার ভাস্কর্য’ সুবর্ণরেখা কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৬।

সুধীর চক্রবর্তী : ‘কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ’ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫।

তোফায়েল আহমেদ : ‘লোকশিল্প, সংজ্ঞা ও পরিধি’ বাংলাদেশের লোকশিল্প, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন (১ম সংকলন) প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৯০, আগস্ট ১৯৮৩।

: ‘লোক ঐতিহ্যর দশ দিগন্ত’ বাংলা একাডেমী প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৯।

: শখেল হাঁড়ি, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলা পিডিয়া, খণ্ড ১০, ঢাকা, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

বুলবন ওসমান : ‘বিশ্বশিল্পের ইতিহাস (আদিপর্ব) ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : ‘বাংলাদেশের লোকশিল্প’ ডানা প্রকাশনী, ঢাকা। দ্বিতীয় প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮০।

মোহাম্মদ শাহজালাল : ‘বাংলাদেশের মৃৎশিল্প’ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

অনুপম হায়াৎ : ‘পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ’ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ২০০১।

ফয়েজুল আজিম : ‘বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও উপনিবেশিক প্রভাব’ বাংলা একাডেমী প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০০।

ইরফান হাবিব : ‘সিন্ধু সভ্যতা’ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৪, প্রকাশক সলিলকুমার গাঙ্গুলী।

শিরিন রত্নাগার : ‘হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে’ প্রথম সংস্করণ ২০০৩ প্রকাশক সলিলকুমার গাঙ্গুলী।

নন্দলাল বসু : ‘শিল্পচর্চা’ প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৬৩, প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক বিশ্বভারতী।

আ.ক.ম. যাকারিয়া, : ‘বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ’ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

বিনয় ঘোষ, : ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ পুস্তক প্রকাশক কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ সাধারণতন্ত্র দিবস, জানুয়ারি ১৯৫৭।

নীরু শামসুন্নাহার : ‘পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ রীতি ও ভবন গাত্রে এর ব্যবহার’ (প্রবন্ধ) জাদুঘর সমাচার।

সুফি মুস্তাফিজুর রহমান মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান : “উয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে’ জানুয়ারী ২০১২, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

গুরুসদয় দত্ত	:	‘বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য’ মে ২০০৮, ছাতিম বুক্স্‌, কলকাতা।
ওয়াকিল আহমদ	:	‘বাংলার চারু ও কারু লোকশিল্প’ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, গতিধারা, ঢাকা।
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	:	‘বাংলার লুপ্তপ্রায় শিল্প’ ফেব্রুয়ারী ২০১৮, হাতেঘড়ি, ঢাকা।
শামসুজ্জামান খান [সম্পা-]	:	বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা চাঁপাইনবাবগঞ্জ’ জুন ২০১৪, বাংলা একাডেমী ঢাকা।
শামসুজ্জামান খান [সম্পা.]	:	সিরাজগঞ্জ, মে ২০১৪।
	:	ঠাকুরগাঁও, জুন ২০১৪।
	:	লক্ষ্মীপুর, জুন ২০১৪।
	:	নরসিংদী, জুন ২০১৪।
	:	ফেনী জুন, ২০১৪।
	:	বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, জুন ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
মুহম্মদ আবদুল জলিল	:	‘শখের হাঁড়ি’ মে ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
শফিকুর রহমান চৌধুরী	:	‘বাংলাদেশের মৃৎশিল্প’ ডিসেম্বর ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ড. রতন কুমার	:	‘রংপুর জেলার মৃৎশিল্প’ ডিসেম্বর, ২০১২, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।
মিহির ভট্টাচার্য	:	‘লোকশ্রুতি’ প্রবন্ধ সংকলন, নভেম্বর ১৯৯৯ লোকসংস্কৃতি) ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলকাতা।

মিহির ভট্টাচার্য [সম্পা.] দীপঙ্কর ঘোষ : ‘বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, জানুয়ারি ২০০৪, সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : লোকায়ত দর্শন, ভাদ্র ১৩৬৩, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ড. ভ্রদ্যোত ঘোষ : ‘বাংলার লোকশিল্প’ ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৪, ঋজীক, কলকাতা।

সামিনা নাফিজ : ‘পুতুল : বাংলার প্রাণ-প্রতিমা’ মার্চ ২০০৯, আদিগন্ত প্রকাশনী, ঢাকা।

মোকারম হোসেন : ‘বাংলাদেশের মেলা’ ফেব্রুয়ারি ২০০৪, ঐতিহ্য, ঢাকা।

হুমায়ূন রহমান : ‘বাংলাদেশের মৃৎশিল্প’ ২০০৬, গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

ফয়জুল আলম পাপ্‌পু : ‘বাংলাদেশের মৃৎশিল্প পরিচিত’ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, আপন প্রকাশ ঢাকা।

মালিনী ভট্টাচার্য [সম্পা.] : ‘লোকশ্রুতি’ জুন ২০০৩, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলকাতা।

মালিনী ভট্টাচার্য
- তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
- ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
- পল্লব সেনগুপ্ত সৌমেন সেন
- সুহৃদকুমার ভৌমিক
- বরুণকুমার চক্রবর্তী
- মানস মজুমদার
- দিব্যজ্যোতি মজুমদার
- প্রদীপ ঘোষ

[সম্পাদকমণ্ডলী] : ‘লোকশ্রুতি’ জুন ২০০৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

ড. মো. রফিকুল আলম : ‘বিশ্বের মৃৎশিল্প’ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনন্যা, ঢাকা।

শেখ মনির উদ্দিন [সম্পা.] : ‘ভাস্কর আজহারুল ইসলাম শেখ চঞ্চল মৃৎশিল্পের নান্দনিক রূপকার’ জুলাই ২০১৪, বাংলালিপি, ঢাকা।

মো. জাহাঙ্গীর হোসেন : ‘লোকশিল্প’ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা।

লালারুখ সেলিম : ‘চারু ও কারুকলা’ ২০০৭ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

এনামুল হক : ‘প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য’ ২০০৭, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান [সম্পা.] : ‘সাহিত্য পত্রিকা’ অক্টোবর ২০১৭, রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ড. মোহাম্মদ হেমায়েত হোসেন জুয়েল : ‘প্রথাগত মৃৎশিল্প’ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, সাহিত্য বিকাশ, ঢাকা।

কামাল আহমদ : শিল্পকলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

নাজিমউদ্দিন আহম্মদ : মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ঢাকা, ১৯৬৬

এনামুল হক : প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

B.M Morrision, Lalmai, a Cultural Center of Early Bengal An Archacolcogical Report and Historical Analysis. University of Washington Press Seattle and London-1974.

T. Banerjee, 1992 Chalcolithic Painted Pottery of Pandurajardhibi. Pratuasamiksha. Ed. Sengupta, PP, 77-84 Calcutta.

G.L and Paul Possehl Rissman 1992 Chronologics in old world orchacology. Ed. Robert W. Enrich. Vol(i); 463

B and Saraswati Kishore Behura 1966 Pottery Technique in Present India, PP. 39-75 Culcutta.

Dr. Nazimudding Ahmed "Recent Discoverise at Bhasu-Bihar" Bangladesh Lalit Kala, Journal of the Dacca Musseum, Edt. Enamul Haque, Vol-1, Number-1, January-1975.

S.S Biswas Terracotla Art of Bengal with foreword by Porf. Niharranjan Ray, 1st Pub-1981, Agam Kalla Prakashasn, Delhi.

Bimal Kumar Datt "Bengal Temples" Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. New Delhi 1st Pub-1975

Mnahan, F.J. "The Early, History of 'Bengal' Baransi-1974.

S.C. Mukherji "Archacological Activities in West Bengal" Pratna-Samiksha, Edt. Gautam-Sengupta, Journal of the Directorate of Archacology. Govt. of west Bengal. Vol-1992.

Dhaka University Institutional Repository

Asok Datta	The Art of Pottery Paintings in Bangal Durins Black and Red ware (Chalcolithic) Journal of Bangal Art Vol. 1, 1996.
Gautam Sengupta	“Archacology of Coastal Bangal.